রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ষড়্‌বিংশ খণ্ড

বিশ্বভারতী

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁহার যত রচনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে তাহার অধিকাংশের প্রকাশ সমাপ্ত হইল ; তবে 'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' এবং 'পথে ও পথের প্রান্তে' ভবিষ্যতে রবীন্দ্র-রচনাবলীর এক বা একাধিক খণ্ডে অন্যান্য চিঠিপত্রের সহিত মুদ্রিত হইবে এবং 'গীতবিতান'ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ডান্তরে প্রকাশিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের দেহাবসানের স্বল্পকাল পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ছড়া' ও 'শেষ লেখা' বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত হইল। ভবিষ্যতে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-সকল খণ্ড প্রকাশিত হইবে সেগুলিতে পূর্বোক্ত কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত এই-সকল রচনাও মুদ্রিত হইবে— রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পরে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা যেগুলি এ পর্যন্ত কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, এবং পাণ্ডুলিপি-নিবদ্ধ রচনাবলী।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

ছড়া

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে,
কর্মরথের ঘড়্‌ঘড়ানি
যে-মুহূর্তে থামে,
এলোমেলো ছিন্নচেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানি নে কোন্‌ স্বপ্নরাজ্যের
শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত—
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ—
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি,
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে।
একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চার দিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়।

পষ্ট আলোর সৃষ্টি-পানে
যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাতন এ কি।

বাইরে থেকে দেখি একটা
নিয়ম-ঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী
কেউ তা নাহি জানে।
খেয়াল-স্রোতের ধারায় কী সব
ডুবছে এবং ভাসছে—
ওরা কী-যে দেয় না জবাব,
কোথা থেকে আসছে।
আছে ওরা এই তো জানি,
বাকিটা সব আঁধার—
চলছে খেলা একের সঙ্গে
আর-একটাকে বাঁধার।
বাঁধনটাকেই অর্থ বলি,
বাঁধন ছিঁড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিক্‌হারা।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৫ জানুয়ারি ১৯৪১

১

সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।
বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য,
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না গান্য।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজে রে ডুগডুগি।
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগবুগি।
রামছাগলের ভারি গলায় ভ্যাভ্যা রবের ডাকে
সুড়সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে
বাতাসেতে ঘন ঘন কোদাল যেন পাড়ে।
হাঁচির পরে সারি সারি হাঁচি নামার চোটে
তেঁতুলবনে ঝড়ের দমক যেন মাথা কোটে,
গাছের থেকে ইঁচড়গুলো খসে খসে পড়ে,
তালের পাতা ডাইনে বাঁয়ে পাখার মতো নড়ে।
দত্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া,
আঁৎকে উঠে কাঁখের থেকে বউ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান,
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।
টেবিলেতে তুফান ওঠে চা-পেয়ালার তলে,
বিষম লেগে শৌখিনদের চোখ ভেসে যায় জলে।
বিদ্যালয়ের মঞ্চ-'পরে টাক-পড়া শির টলে—
পিঠ পেতে দেয়, চ'ড়ে বসে টেরিকাটার দলে।
গুঁতো মেরে চালায় তারে, সেলাম করে আদায়,
একটু এদিক-ওদিক হলে বিষম দাঙ্গা বাধায়।

লোকে বলে, কলঙ্কদল সূর্যলোকের আলো
দখল ক'রে জ্যোতির্লোকের নাম করেছে কালো।
তাই তো সবই উলট-পালট, উপর-নামন নীচে—
ভয়ে ভয়ে নিচু মাথায় সমুখটা যায় পিছে।
হাঁচির ধাক্কা এতখানি, এটা গুজব মিথ্যে—
এই নিয়ে সব কলেজপড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধোঁকা ; রাগল অপর পক্ষে—
বললে, পড়াশুনোয় কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে,
অন্য দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্ সে।
এর পরে দুই দলে মিলে ইঁট পাটকেল ছোঁড়া—
চক্ষে দেখায় সর্ষের ফুল, কেউ বা হল খোঁড়া।
পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের এ পারেতে একেই বলে লড়াই।
সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।
সত্য হোক বা মিথ্যে হোক তা, আদমদিঘির পাড়ে
বাঁদর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে।
রামছাগলের দাড়ি নড়ে, বাজে রে ডুগডুগি—
কাংলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগবুগি।

কালিম্পং
১৫ মে ১৯৪০

২

কদমাগঞ্জ উজাড় করে
আসছিল মাল মালদহে,
চড়ায় পড়ে নৌকোডুবি
হল যখন কালদহে,
তলিয়ে গেল অগাধ জলে
বস্তা বস্তা কদমা যে

পাঁচ মোহানার কৎলু ঘাটে
ব্রহ্মপুত্র নদ-মাঝে।
আসামেতে সদ্‌কি জেলায়
হাংলু-ফিড়াঙ পর্বতের
তলায় তলায় ক'দিন ধরে
বইল ধারা সর্বতের।
মাছ এল সব কাৎলাপাড়া
খয়রাহাটি ঝেঁটিয়ে,
মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে
পাঁকের তলা ঘেঁটিয়ে।
চিনির পানা খেয়ে খুশি
ডিগবাজি খায় কাংলা,
চাঁদামাছের সরু জঠর
রইল না আর পাতলা।
শেষে দেখি ইলিশমাছের
জলপানে আর রুচি নাই,
চিতলমাছের মুখটা দেখেই
প্রশ্ন তারে পুছি নাই।
ননদকে ভাজ বললে, তুমি
মিথ্যে এ মাছ কোটো ভাই,
রাঁধতে গিয়ে দেখি এ যে
মিঠাই-গজার ছোটোভাই।
মেছোনিকে গিন্নি বলেন,
ঝুড়ির ঢাকা খুলো না,
মাছের রাজ্যে কোথাও যে নেই
এ মৌরলার তুলনা।
বাগীশকে কাল শুধিয়েছিলেম,
ব্রহ্মা কি কাজ ভুলল,
বিধাতা কি শেষবয়সে
ময়রাদোকান খুলল।

যতীন ভায়ার মনে জাগে
ক্রমবিকাশ থিয়োরি,
গল্ব্ল্যাডারে ক্রমে ক্রমে
চিনি জমছে কি ওরই।
খগেন বলে, মাছের মধ্যে
মাধুর্য নয় পথ্যাচার—
চচ্চড়িতে মোরব্বাতে
একাত্মবাদ অত্যাচার।
বেদান্তী কয়, রসনাতে
রসের অভেদ গলতি,
এমন হলে রাজ্যে হবে
নিরামিষের চলতি।
ডাক পড়েছে অধ্যাপকের
জামাইষষ্ঠী পার্বণে—
খাওয়ায় তাকে যত্ন করে
শাশুড়ি আর চার বোনে
মাছের মুড়ো মুখে দিয়েই
উঠল জেগে বকুনি,
হাত নেড়ে সে তত্ত্বকথা
করলে শুরু তখুনি—
কলিযুগের নিমক খেয়ে
আমরা মানুষ সকলেই,
হঠাৎ বিষম সাধু হয়ে
সত্যযুগের নকলেই
সব জাতেরই নিমকি থেকে
নিমক যদি হটিয়ে দেয়,
সকল ভাঁড়েই চিনির পানার
জয়ধ্বনি রটিয়ে দেয়,
চিনির বলদ জোড়ে এসে
সকল মিটিং-কমিটি,

চোখের জলেই নোন্‌তা হবে
বাংলাদেশের জমিটি।
নোনার স্থানে থাকবে নোনা,
মিঠের স্থানে মিষ্টি—
সাহিত্যে বা পাকশালাতে
এরেই বলে কৃষ্টি।
চিনি সে তো বার-মহলের,
রক্তে বসত নোন্‌তার—
দোকানে প্রাণ মিষ্টি খোঁজে,
নুন যে আপন ধন তার।
সাগরবাসের আদিম উৎস
চোখের জলে খুলিয়ে দেয়,
নির্বাসনের দুঃখটা তার
আখের খেতে ভুলিয়ে দেয়
অতএব এই—
কী পাগলামি,
কলম উঠল খেপে,
মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে
মিলের স্কন্ধে চেপে।
কবির মাথা ঘুলিয়ে গেছে
বৈশাখের এই রোদে,
চোখের সামনে দেখছে কেবল
মাছের ডিমের বোঁদে।
ঠাণ্ডা মাথায় ঘুচুক এবার
রসের অনাবৃষ্টি,
উলটোপালটা না হয় যেন
নোন্‌তা এবং মিষ্টি।

৩

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা
সে-বছর পুষেছিল একপাল পায়রা।
বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকাবাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্‌-বক্‌-বকমে।

৪

খবরের কাগজেতে shock দিল বক্ষে,
প্যারাগ্রাফে ঠোক্কর লাগে তার চক্ষে।
তিন দিন ধ'রে নাকি দুই দলে পোড়াদয়
ঘুড়ি-কাটাকাটি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি হয়।
কেউ বলে ঘুড়ি নয়, মনে হয় সন্ধ—
পোলিটিকালের যেন পাওয়া যায় গন্ধ।
'রানাঘাট-সমাচারে' লিখেছে রিপোর্টার—
আঠারোই অঘ্রানে শুরু হতে ভোরটার
বেশি বই কম নয় ছয়-সাত হাজারে
গুণ্ডার দল এল সবজির বাজারে।
এ খবর একেবারে লুকোনোই দরকার,
গাপ করে দিল তাই ইংরেজ সরকার।
ভয় ছিল কোনোদিন প্রশ্নের ধাক্কায়
পার্লিয়ামেণ্টের হাওয়া পাছে পাক খায়।
এডিটর বলে, এতে পুলিসের গাফেলি।
পুলিস বলে যে, চলো বুঝেসুঝে পা ফেলি;
ভাঙল কপাল যত কপালেরই দোষ সে,
এসব ফসল ফলে কন্‌গ্রেসি শস্যে।
সবজির বাজারেতে মুলো মোচা সস্তায়
পাওয়া গেল বাসি মাল ঝাঁকা ঝুড়ি বস্তায়।

ঝুড়ি থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল চালতা,
যশোরের কাগজেতে বেরিয়েছে কাল তা।
'মহাকাল' লিখেছিল, ভাষা তার শানানো—
চালতা ছোঁড়ার কথা আগাগোড়া বানানো ;
বড়ো বড়ো লাউ নাকি ছুঁড়েছে দু পক্ষে,
শচীবাবু দেখেছে সে আপনার চক্ষে।
দাঙ্গায় হাঙ্গামে মিছে ক'রে লোক গোনা,
সংবাদী সমাজের কখনো এ যোগ্য না।
আর-এক সাক্ষীর আর-এক জবানি—
বেল ছুঁড়ে মেরেছিল দেখেছে তা ভবানী।
যার নাকে লেগেছিল সে গিয়েছে ভেবড়ে,
ভাগ্যেই নাক তার যায় নাই থেবড়ে।
শুনে এডিটর বলে, এ কি বিশ্বাস্য—
কে না জানে নাসাটা যে সহজেই নাশ্য।
জানি না কি ও পাড়ায় কোনোখানে নাই বেল ;
ভবানী লিখল, এ যে আগাগোড়া লাইবেল।
মাঝে মাঝে গায়ে প'ড়ে চেঁচায় আদিত্য—
আমারে আরোপ করা মিথ্যাবাদিত্ব !
কোন্ বংশে যে মোর জন্ম তা জান তো,
আমার পায়ের কাছে করো মাথা আনত।
আমার বোনের যোগ বিবাহের সূত্রে
ভজু গোস্বামীদের পুত্রের পুত্রে।
এডিটর লেখে, তব ভগ্নীর স্বামী যে
গো বটে গোয়ালবাসী, জানি তাহা আমি যে।
ঠাট্টার অর্থটা ব্যাকরণে খুঁজতে
দেরি হল, পরদিনে পারল সে বুঝতে।
মহা রেগে বলে, তব কলমের চালনা
এখনি ঘুচাতে পারি, বাড়াবাড়ি ভালো না।
ফাঁস করে দিই যদি, হবে সে কি খোশনাম,
কোথায় তলিয়ে যাবে সাতকড়ি ঘোষ নাম।

জানি তব জামাইয়ের জ্যাঠাইয়ের যে বেহাই
আদালতে কত ক'রে পেয়েছিল সে রেহাই।
ঠাণ্ডা মেজাজ মোর সহজে তো রাগি নে,
নইলে তোমার সেই আদরের ভাগিনে
তার কথা বলি যদি— এই ব'লে বলাটা
শুরু ক'রে ঘেঁটে দিল পঙ্কের তলাটা।
তার পরে জানা গেল গাঁজাখুরি সবটাই,
মাথা-ফাটাফাটি আদি মিছে জনরবটাই।
মাছ নিয়ে বকাবকি করেছিল জেলেটা,
পচা কলা ছুঁড়ে তারে মেরেছিল ছেলেটা।
আসল কথাটা এই অটলা ও পটলা
বাধালো ধর্মঘটে জন ছয়ে জটলা।
শুধু কুলি চারজন করেছিল গোলমাল—
লালপাগড়ি সে এসে বলেছিল, তোল্ মাল।
গুড়ের কলসিখানা মেতে উঠে ফেটেছিল,
রাজ্যের থেঁকিগুলো শুঁকে শুঁকে চেটেছিল।
বক্তৃতা করেছিল হরিহর শিকদার—
দোকানিরা বলেছিল, এ যে ভারি দিকদার।
সাদা এই প্রতিবাদ লিখেছিল তারিণী,
গ্রামের নিন্দে সে-যে সইতেই পারে নি।
নেহাত পারে না যারা পাব্‌লিশ না ক'রে
সব-শেষ পাতে দিল বর্জাই আখরে।
প্রতিবাদটুকু কোনো রেখা নাহি রেখে যায়,
বেল থেকে তাল হয়ে গুজবটা থেকে যায়।
ঠিকমতো সংবাদ লিখেছিল সজনী—
সহ্য না হল সেটা, শুনেছে বা ক'জনই।
জ্যাঠাইয়ের বেহাইয়ের মামলাটা ছাড়াতে
যা ঘটেছে হাসি তার থেকে গেল পাড়াতে।
আদরের ভাগনের কী কেলেঙ্কারি সে,
বারাসতে বরিশালে হয়ে গেছে জারি সে।

হিতসাধনী সভায় চাঁদাচুরি কাণ্ড
ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা ব্রহ্মাণ্ড।
ছেলেরা দুভাগ হল মাগুরার কলেজে—
এরা যদি বলে বেল, ওরা লাউ বলে যে।
চালতার দল থাকে উভয়ের মাঝেতে,
তারা লাগে দু দলের সভা-ভাঙা কাজেতে।
দলপতি পশ্চাতে রব তোলে বাহবার,
তার পরে গোলেমালে হয়ে পড়ে যা হবার।
ভয়ে ভয়ে ছি-ছি বলে কলেজের কর্তারা,
তার পরে মাপ চেয়ে চলে যায় ঘর তারা।

একদা দু এডিটরে দেখা হল গাড়িতে,
পনেরো মিনিট শুধু ছিল ট্রেন ছাড়িতে।
ফোঁস করে ওঠে ফের পুরাতন কথা সেই,
ঝাঁজ তার পুরো আছে আগে ছিল যথা সেই।
একজন বলে বেল, লাউ বলে অন্যে,
দুজনেই হয়ে ওঠে মারমুখো হন্যে।
দেখছি যা ব্যাপার সে নয় কম তর্কের,
মুখে বুলি ওঠে আত্মীয় সম্পর্কের।
পয়লা দরের knave, idiot কি কেবল,
liar সে, humbug, cad unspeakable—
এই মতো বাছা বাছা ইংরেজি কটুতা
প্রকাশ করিতে থাকে দুজনের পটুতা।
অনুচর যারা, তারা খেপে ওঠে কেউ কেউ—
কুকুরটা কী ভেবে যে ডেকে ওঠে ভেউ-ভেউ।
হাওড়ায় ভিড় জমে, দেখে সবে রঙ্গ—
গার্ড এসে করে দিল যাত্রাই ভঙ্গ।
গার্ডকে সেলাম করি; বলি, ভাই বাঁচালি,
টার্মিনাসেতে এল বেলছোঁড়া পাঁচালি।

ঝিনেদার জমিদার বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হেলেদুলে হাঁসগুলো চলে বাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্‌-বক্‌-বকমে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৯ মার্চ ১৯৪০

৪

বাসাখানি গায়ে-লাগা আর্মানি গির্জার—
দুই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জার।
কাবুলি বেড়াল নিয়ে দু দলের মোক্তার
বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোখ তার।
হানাহানি চলছেই একেবারে বেহোঁশে,
নালিশটা কী নিয়ে যে, জানে না তা কেহ সে।
সে কি লেজ নিয়ে, সে কি গোঁফ নিয়ে তকরার,
হিসেবে কি গোল আছে নখগুলো বখরার।
কিংবা মিয়াঁও ব'লে থাবা তুলে ডেকেছিল—
তখন সামনে তার দু ভাইয়ের কে কে ছিল।
সাক্ষীর ভিড় হল দলে দলে তা নিয়ে,
আওয়াজ যাচাই হল ওস্তাদ আনিয়ে।
কেউ বলে ধা-পা-নি-মা, কেউ বলে ধা-মা-রে—
চাঁই চাঁই বোল দেয়, তবলায় ঘা মারে।
ওস্তাদ ঝেঁকে ওঠে, প্যাঁচ মারে কুস্তির—
জজসাব কী ক'রে যে থাকে বলো সুস্থির।
সমন হয়েছে জারি, কাবুলের সর্দার
চলে এল উটে চড়ে— পিছে ঝাড়ুবরদার।
উটেতে কামড় দিল, হল তার পা টুটা—
বিলকুল লোকসান হয়ে গেল হাঁটুটা।
খেসারত নিয়ে মাথা তেতে ওঠে আমিরের,
ফউজ পেরিয়ে এল পাঁচিলটা পামিরের।

বাজারে মেলে না আর আখরোট-খোবানি,
কাঁউসিল ঘরে আজ কী নাকানিচোবানি।
ইরানে পড়েছে সাড়া গবেষণাবিভাগে—
এ কাবুলি বিড়ালের নাড়িতে যে কী ভাগে
বংশ রয়েছে চাপা, মেসোপোটেমিয়ারই
মার্জারগুষ্টির হবে সে কি ঝিয়ারি।
এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরি—
নাইল-তটিনী-তট-বিহারিণী কিশোরী।
রোঁয়াতে সে ইরানী যে নাহি তাহে সংশয়,
দাঁতে তার এসীরিয়া যখনি সে দংশয়।
কটা চোখ দেখে বলে পণ্ডিতগণেতে,
এখনি পাঠানো চাই Wimবিল্ডনেতে।
বাঙালি থিসিসওলা পড়ে গেছে ভাবনায়—
ঠিকুজি মিলবে তার চাটগাঁ কি পাবনায়।
আর্মানি গির্জার আশেপাশে পাড়াতে
কোনোখানে এক তিল ঠাঁই নাই দাঁড়াতে।
কেম্‌ব্রিজ খালি হল, আসে সব স্কলারে—
কী ভীষণ হাড়কাটা করাতের ফলা রে।
বিজ্ঞানীদল এল বলিন ঝাঁটিয়ে,
হাতপাকা জন্তর-নাড়িভুঁড়ি-ঘাঁটিয়ে।
জজ বলে, বিড়ালটা কী রকম জানা চাই,
আইডেন্‌টিটি তার আদালতে আনা চাই।
বিড়ালের দেখা নাই— ঘরেও না, বনে না ;
মিঁয়াউ আওয়াজটুকু কেউ আর শোনে না।
জজ বলে, সাক্ষীরে কোন্‌খানে ঢুকোলো,
অত বড়ো লেজের কি আগাগোড়া লুকোলো।
পেয়াদা বললে, লেজ গেছে মিউজিয়মে
প্রিভিকৌঁসিলে-দেওয়া আইনের নিয়মে।
জজ বলে, গোঁফ পেলে রবে মোর সম্মান ;
পেয়াদা বললে, তারো নয় বড়ো কম মান—

মিউনিকে নিয়ে গেছে ছাঁটা গোঁফ যণ্ডেই,
তারে আর কোনোমতে ফেরাবার পথ নেই।
বিড়াল ফেরার হল, নাই নামগন্ধ ;
জজ বলে, তাই ব'লে মামলা কি বন্ধ।
তখনি চৌকি ছেড়ে রেগে করে পাচারি,
থেকে থেকে হুংকারে কেঁপে ওঠে কাছারি।
জজ বলে, গেল কোথা ফরিয়াদী আসামী !
হুজুর, পেয়াদা বলে, বেটাদের চাষামি !
শুনি নাকি দুই ভাই উকিলের তাকাদায়
বলে গেছে, আমাদের বুঝি বেঁচে থাকা দায় !
কণ্ঠে এমনি ফাঁস এঁটে দিল জড়িয়ে,
মোক্তারে কী করিবে সাক্ষীরে পড়িয়ে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

৫

ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে
দেউলচূড়ার ত্রিশূলে ;
কলুবুড়ি শাকসবজি
তুলেছে পাঁচমিশুলে।
চাষী খেতের সীমানা দেয়
উঁচু ক'রে আল তুলে ;
নদীতে জল কানায় কানায়,
ডিঙি চলে পাল তুলে।
কোমর-ঘেরা আঁচলখানা,
হাতে পানের কৌটা—
ঘোষপাড়াতে হন্‌হনিয়ে
চলে নাপিতবউটা।
গোকুল ছোঁড়া গুঁড়ি আঁকড়ে
ওঠে গাছের উপুরি,

পেড়ে আনে থোলো থোলো
কাঁচা কাঁচা সুপুরি।
বর্ষাজলের ঢল নেমেছে,
ছাপিয়ে গেল বাঁধখানা,
পাড়ির কাছে ডুবো ডিঙি
যাচ্ছে দেখা আধখানা।
লখা চলে ছাতা মাথায়,
গৌরী-কনের বর—
ড্যাংড্যাভাড্যাং বাদ্যি বাজে,
চড়কডাঙায় ঘর।

ভাণ্ডমালী লাউডাঁটাতে
ভরেছে তার ঝাঁকাটা,
কামার পিটোয় ঢুম্ঢুমিয়ে
গোরুর গাড়ির চাকাটা।
মাঠের ধারে ধক্ধকিয়ে
চলতি গাড়ির ধোঁওয়াতে
আকাশ যেন ছেয়ে চলে
কালো বাঘের রোঁওয়াতে
কাঁসারিটা বাজিয়ে কাঁসা
জাগিয়ে দিল গলিটা,
গিন্নিরা দেয় ছেঁড়া কাপড়
ভর্তি ক'রে থলিটা।
ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে
বসে আছেন সেজোবউ,
মোচার ঘণ্ট বানাতে সে
সবার চেয়ে কেজো বউ।
গামলা চেটে পরখ করে
দড়ি দিয়ে বাঁধা গাই,

উঠোনের এক কোণে জমা
রান্নাঘরের গাদা ছাই।
ভালুকনাচের ডুগডুগি ওই
বাজছে পাইকপাড়াতে,
বেদের মেয়ে বাঁদরছানার
লাগল উকুন ছাড়াতে।
অশথতলায় পাটল গোরু
আরামে চোখ বোজে তার,
ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায়
কচি ঘাসের খোঁজে তার।
ছকুমালী খেতের থেকে
তুলছে মুলো ভাদুরে,
পিঠ আঁকড়ে জড়িয়ে থাকে
ছেলেটা তার আদুরে।
হঠাৎ কখন বাদুলে মেঘ
জুটল এসে দলে দল,
পসলা কয়েক বৃষ্টি হতেই
মাঠ হয়ে যায় জলে জল।
কচুর পাতায় ঢেকে মাথা
সাঁওতালী সব মেয়েরা
ঘোষের বাগান থেকে পাড়ে
কাঁচা কাঁচা পেয়ারা।
মাথায় চাদর বেঁধে নিয়ে
হাট থেকে যায় হাটুরে;
ভিজে কাঠের আঁঠি বেঁধে
চলছে ছুটে কাঠুরে।
নিমের ডালে পাখির ছানা
পাড়তে গেল ওরা কি—
পকেট ভরে নিয়ে গেল
কাঠবিড়ালির খোরাকি।

হালদারদের মেয়েটা ওই—
দেখি তারে যখুনি
মাঠে মাঠে ভিজে বেড়ায়,
মা এসে দেয় বকুনি।
গোলাকৃতি গড়নটা ওর,
সবাই ডাকে বাতাবি ;
খুদু বলে, আমার সঙ্গে
সাঙাৎনি কি পাতাবি।
পুকুরপাড়ে ছড়িয়ে আছে
তেলের শিশির কাঁচভাঙা,
জেলের পোঁতা বাঁশের খোঁটায়
বসে আছে মাছরাঙা।
দক্ষিণে ওই উঠল হাওয়া,
বৃষ্টি এখন থামল কি।
গাছের তলায় পা ছড়িয়ে
চিবোয় ভুলু আমলকি।
ময়লা কাপড় হিস্‌হিসিয়ে
আছাড় মারে ধোবাতে ;
পাড়ার মেয়ে মাছ ধরতে
আঁচল মেলে ডোবাতে।
পা ডুবিয়ে ঘাটের ধারে
ঘোষপুকুরের কিনারায়
মাসিক-পত্র পড়ছে বসে
থার্ড ইয়ারের বীণা রায়।
বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে
লক্‌লকি।
বাঁশের পাতা চমকে ওঠে
ঝক্‌ঝকি।
চড়কডাঙায় ঢাক বাজে ঐ
ড্যাড্যাংড্যাঙ।

মাঠে মাঠে মক্‌মকিয়ে
ডাকছে ব্যাঙ

উদীচী [শান্তিনিকেতন]
২০ অগস্ট ১৯৪০

৬

খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে ;
পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে।
আপনি এল ব্যাক্‌টিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই।
হাঁসপাতালের মাখন ঘোষাল বলেছিল, ভয় নাই।
সে বলে, সব বাজে কথা, খাবার জিনিস খাদ্য—
দশ দিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশজনারই শ্রাদ্ধ।
শ্রাদ্ধের যে ভোজন হবে কাঁচাতেঁতুল দরকার,
বেগুনমুলোর সন্ধানেতে ছুটল ন্যাড়াসরকার।
বেগুনমুলো পাওয়া যাবে নিলফামারির বাজারে,
নগদ দামে বিক্রি করে তিন টাকা দাম হাজারে।
দুমকাতে লোক পাঠিয়েছিল, বানিয়ে দেবে মুড়কি—
সন্দেহ হয় ওজনমতো মিশল তাতে গুড় কি।
সর্ষে যে চাই মণ দু'তিনেক ঝোলে ঝালে বাটনায়,
কালুবাবু তারই খোঁজে গেলেন ধেয়ে পাটনায়।
বিষম খিদেয় করল চুরি রামছাগলের দুধ,
তারই সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গমভাঙানির খুদ।
ঐ শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি ;
দেশবিদেশে শহরগ্রামে গলা-কাটার ধুম কী।
খাঁচায় পোষা চন্দনাটা ফড়িঙে পেট ভরে ;
সকাল থেকে নাম করে গান, হরে কৃষ্ণ হরে।

বালুর চরে আলুহাটা— হাতে বেতের চুপড়ি,
খেতের মধ্যে ঢুকে কালু মুলো নিল উপ্‌ড়ি।

নদীর পাড়ে কিচিরমিচির লাগালো গাঙশালিখ যে,
অকারণে ঢোলক বাজায় মুলোখেতের মালিক যে।
কাঁকুড়খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা,
বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে মুচিপাড়ার লোকরা।
পাটনাতে নীলকুঠির গঞ্জে খেয়া চালায় পাটনি,
রোদে জলে নিতুই চলে চার পহরের খাটনি।
কড়াপড়া কঠিন হাতে মাজা কাঁসার কাঁকনটা,
কপালে তার পত্রলেখা উল্কিদেওয়া আঁকনটা।
কুচোমাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে,
মেছনি তার সাত গুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে।
ও পারেতে খড়্গপুরে কাঠি পড়ে বাজনায়,
মুন্সিবাবু হিসেব ভোলে জমিদারের খাজনায়।
রেডিয়োতে খবর জানায়, বোমায় করলে ফুটো,
সমুদ্দুরে তলিয়ে গেল মালের জাহাজ দুটো।
খাঁচার মধ্যে ময়না থাকে, বিষম কলরবে
ছাতু ছড়ায়, মাতায় পাড়া আত্মারামের স্তবে।

হুইস্‌ল্ দিল প্যাসেঞ্জারে সাঁৎরাগাছির ড্রাইভার—
মাথায় মোছে হাতের কালি, সময় না পায় নাইবার।
ননদ গেল ঘুঘুডাঙায়, সঙ্গে গেল চিন্তে—
লিলুয়াতে নেমে গেল ঘুড়ির লাঠাই কিনতে।
লিলুয়াতে খইয়ের মোওয়া চার ধামা হয় বোঝাই,
দাম দিতে হায় টাকার থলি মিথ্যে হল খোঁজাই।
ননদ পরল রাঙা চেলি, পাল্কি চড়ে চলল—
পাড়ায় পাড়ায় রব উঠেছে গায়ে-হলুদ কল্য।
কাহারগুলো পাগড়ি বাঁধে, বাঁদি পরে ঘাগরা,
জমাদারের মামা পরে শুঁড়তোলা তার নাগরা।
পাঁড়েজি তাঁর খড়ম নিয়ে চলেন খটাৎ খটাৎ,
কোথা থেকে ধোবার গাধা চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ।

খয়রাডাঙার ময়রা আসে, কিনে আনে ময়দা—
পচা ঘিয়ের গন্ধ ছড়ায়, যমালয়ের পয়দা।
আকাশ থেকে নামল বোমা, রেডিয়ো তাই জানায়,
অপঘাতে বসুন্ধরা ভরল কানায় কানায়।
খাঁচার মধ্যে শ্যামা থাকে, ছিরকুটে খায় পোকা,
শিস দেয় সে মধুর স্বরে, হাততালি দেয় খোকা।

হুইস্‌ল্‌ বাজে ইস্টিসনে, বরের জ্যাঠামশাই
চমকে ওঠে— গেলেন কোথায় অগ্রদ্বীপের গোঁসাই।
সাঁৎরাগাছির নাচনমণি কাটতে গেল সাঁতার,
হায় রে কোথায় ভাসিয়ে দিল সোনার সিঁথি মাথার।
মোষের শিঙে ব'সে ফিঙে লেজ দুলিয়ে নাচে—
শুধোয় নাচন, সিঁথি আমার নিয়েছে কোন্‌ মাছে।
মাছের লেজের ঝাপটা লাগে, শালুক ওঠে দুলে;
রোদ পড়েছে নাচনমণির ভিজে চিকন চুলে।
কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে ডাকল কোলাব্যাঙ,
খড়্‌গ্‌পুরের ঢাকে ঢোলে বাজল ড্যাড্যাংড্যাং।
কাঁপছে ছায়া আঁকাবাঁকা, কলমিপাড়ের পুকুর—
জল খেতে যায় এক-পা-কাটা তিনপেয়ে এক কুকুর।
হুইস্‌ল্‌ বাজে, আছে সেজে পাইকপাড়ার পাত্রী,
শেয়ালকাঁটার বন পেরিয়ে চলে বিয়ের যাত্রী।
গ্যাগোঁ করে রেডিয়োটা, কে জানে কার জিত—
মেশিন্‌গানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।
টিয়ের মুখের বুলি শুনে হাসছে ঘরে পরে—
রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।

দিন চলে যায় গুন্‌গুনিয়ে ঘুমপাড়ানির ছড়া,
শানবাঁধানো ঘাটের ধারে নামছে কাঁখের ঘড়া।
আতাগাছের তোতাপাখি, ডালিমগাছে মৌ,
হীরেদাদার মড়্‌মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ।

পুকুরপাড়ে জলের ঢেউয়ে দুলছে ঝোপের কেয়া,
পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া।
খোকা গেছে মোষ চরাতে, খেতে গেছে ভুলে,
কোথায় গেল গমের রুটি শিকের 'পরে তুলে।
আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে,
কলম আমার বেরিয়ে এল বহুরূপীর বেশে।
আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁয়ে,
আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের শেওলা-ঘেরা নায়ে।
কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড়পুতুলের বিয়ে,
বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিয়ে।
ছাইয়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকে পাড়ার খেঁকি কুকুর,
পাল্কিহাটে বেতোঘোড়া চলে টুকুর-টুকুর।
তালগাছেতে হুতোমথুমো পাকিয়ে আছে ভুরু,
তক্তিমালা হড়মবিবির গলাতে সাতপুরু।
আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া,
দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয়-দানোয়-পাওয়া।
ভাগ্যলিখন ঝাপসা কালির, নয় সে পরিষ্কার—
দুঃখসুখের ভাঙা বেড়ায় সমান যে দুই ধার।
কামারহাটার কাঁকুড়গাছির ইতিহাসের টুকরো,
ভেসে চলে ভাঁটার জলে উইয়ে-ঘুনে-ফুকরো।
অঘটন তো নিত্য ঘটে রাস্তাঘাটে চলতে,
লোকে বলে, সত্যি নাকি !— ঘুমোয় বলতে বলতে।
সিন্ধুপারে চলছে হোথায় উলটপালট কাণ্ড,
হাড় গুঁড়িয়ে বানিয়ে দিলে নতুন কী ব্রহ্মাণ্ড।
সত্য সেথায় দারুণ সত্য, মিথ্যে ভীষণ মিথ্যে,
ভালোয় মন্দে সুরাসুরের ধাক্কা লাগায় চিত্তে।
পা ফেলতে না ফেলতে হতেছে ক্রোশ পার।
দেখতে দেখতে কখন যে হয় এসপার-ওসপার।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি,
লম্বা দাঁড়ার করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়াডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর,
লেজখানা যায় ছিঁড়ে,
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
কুটছে নতুন চিঁড়ে।
কলেজপাড়ায় শেয়াল তাড়ায়
অন্ধ কলুর গিন্নি।
ফটকে ছোঁড়া চট্‌কিয়ে খায়
সত্যপিরের সিন্নি।
মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে,
ঢোলে কুল্লুক ভট্ট,
ইলিশের ডিম ভাজে বঙ্কিম,
কাঁদে তিনকড়ি চট্ট।
গরানহাটায় সজনেডাঁটা
কিনছে পুলিস সার্জন,
চিৎপুরে ঐ নাগা সন্ন্যাসী
কাত হয়ে মরে চারজন।
পঞ্চায়েতের চুপড়ি বেতের,
সর্ষেখেতের চাষী;
কাঁচালঙ্কার ফোড়ন লাগায়
কুড়োনচাঁদের মাসি।
পটলডাঙায় চক্ষু রাঙায়
মুর্গিহাটার মিঞা;
শম্ভু বাজায় তম্বুরাটায়
কেঁয়াও-কেঁয়াও-কিঞা।

ঠন্‌ঠনে আজ বেচে লণ্ঠন
চার পয়সায় আটটা।
মুখ ভেংচিয়ে হেড্‌মাস্টার
মস্তরে করে ঠাট্টা।
চিন্তামণির কয়লাখনির
কুলির ইনফ্লুয়েঞ্জা ;
বিরিঞ্চিদের খাজাঞ্চি ঐ
চণ্ডীচরণ সেন-জা।
শিলচরে হায় কিলচড় খায়
হস্টেলে যত ছাত্র ;
হাজি মোল্লার দাঁড়িমাল্লার
বাকি একজন মাত্র।
দাওয়াইখানায় শিঙাড়া বানায়,
উচ্চিংড়েটা লাফ দেয় ;
কনেস্টেবল পেতেছে টেব্‌ল্‌
খুদিরে চায়ের কাপ দেয়।
গুবরেপোকার লেগেছে মড়ক,
তুবড়ি ছোটায় পঙ্কু ;
স্তায়রত্নের ঘাড়ের উপর
কাকাতুয়া হানে চঞ্চু।
সিরাজগঞ্জে বিরাট মিটিং,
তুলো-বের-ক'রা বালিশ ;
বংশু ফকির ভাঙা চৌকির
পায়াতে লাগায় পালিশ।
রাবণের দশ মুণ্ডে নেমেছে
বকুনি ছাড়ায়ে মাত্রা ;
নেড়ানেড়ি দলে হরি-হরি বলে,
শেষ হল রামযাত্রা।

পুনশ্চ [শান্তিনিকেতন]
১৯ নভেম্বর ১৯৪০

রাত্তিরে কেন হল মর্জি,
চুল কাটে চাঁদনির দর্জি।
চুমরিয়ে দিল তার জুলফি,
নাপিত আদায় করে full fee।
চাঁদনির রাঁধ্নি সে আসে যায়,
বঁড়শি-বেহালা থেকে বাসে যায়।
ভবুরাম ওর পাড়াপড়শী,
বেচে সে লাঠাই আর বঁড়শি।
আর বেচে যাত্রার বেয়ালা,
আর বেচে চা খাবার পেয়ালা।
চা খেয়ে সে দিল ঘুম তখ্নি,
সইল না গিন্নির বকুনি।
কটকের নেত্ত মজুমদার,
সে বটে সুবিখ্যাত ঘুমদার।
কালু সিং দেয় তারে পাক্কা
তিন মণ ওজনের ধাক্কা।
হাই তুলে বলে, এ কী ঠাট্টা—
ঘড়িতে যে সবে সাড়ে-আটটা।
চৌকিদারের মেজো শালী সে
পড়ে থাকে মুখ গুঁজে বালিশে।
তাই দেখে গলাভাঙা পালোয়ান
বাজখাঁই সুরে বলে, আলো আন্।
নীচে থেকে বলে হেঁকে রহমৎ,
বাংলা জবানি তুমি কহো মৎ।
ও দিকে মাথায় বেঁধে তোয়ালে
ভিখুরাম নাচে তার গোয়ালে।
তোয়ালেটা পাদরির ভাইঝির,
মোজা-জোড়া খড়দার বাইজির।

পিরানের পাড়ে দেয় চুমকি,
ইরানেতে সেলাইয়ের ধুম কী।
বোগদাদে তাই যাবে আলাদিন
শাশুড়ি যতই ঘরে তালা দিন।
শাশুড়ির মুখঢাকা বুর্খায়,
পাছে তারে ঠেলা মারে গুর্খায়।
চুরি গেছে গুর্খার ভেঁপুটি,
এজলাসে চিন্তিত ডেপুটি।
ডেপুটির জুতো যোড়া সাটিনেই,
কোনোখানে দাঁতনের কাঠি নেই।
দাঁতনের খোঁজে লাগে খটকা,
পেয়াদা ঘি আনে তিন মটকা।
গাওয়া ঘি সে নয়, সে-যে ভয়সা—
সের-করা দাম পাঁচ পয়সা।
বাবু বলে, দাম খুব জেয়াদা,
কাজে ইস্তফা দিল পেয়াদা।
উমেদার এল আজ পয়লা
গোয়াড়ির যত গোড়ো গয়লা।
পয়লায় ঘরে হাঁড়ি চড়ে না,
পদ্মরে ছেড়ে খাঁদু নড়ে না।
পদ্ম সেদিন মহা বিব্রত,
বুধবারে ছিল তার কী ব্রত।
ভাশুর পড়ল এসে সমুখে,
দুধ খেয়ে নিল এক চুমুকে।
চেপে এল লজ্জা শরমটা,
টেনে দিল দেড়-হাত ঘোমটা।
চুঁচড়োয় বাড়ি হরিমোহনের,
গঙ্গায় স্নানে গেছে গ্রহণের।
সঙ্গে নিয়েছে চার গণ্ডা
বেছে বেছে পালোয়ান ষণ্ডা।

তাল ঠোকে রামধন মুন্সি,
কোমরেতে তিন পাক ঘুন্সি।
দিদি বলে, মুখ তোর ফ্যাকাশে,
ভালো করে ডাক্তার দেখাসে।
বলে ওঠে তিনকড়ি পোদ্দার,
আগে তুই উকিলের শোধ্ ধার।
ভিখু শুনে কেঁদে চোখ রগড়ায়,
একদম চলে গেল মগরায়।
মগরায় খুদি নিয়ে খুকে
খেজুরের আঁটিগুলো গুনছে—
যেই হল তিন-কুড়ি পাঁচটা,
দেখে নিল উনুনের আঁচটা।
ননদের ঘরে ক'রে ঘি চুরি
তখনি চড়িয়ে দিল খিচুড়ি।
হল না তো চালে ডালে মেলানো,
মুশকিল হবে ওটা গেলানো।
সাড়া পায় মাছওয়ালা মিস্তের ;
বলে, পাকা রুই চাই তিন সের।
বনমালী মাছ আনে গামছায় ;
বলে, ও যে এক্ষুনি দাম চায়।
আচ্ছা, সে দেখা যাবে কালকে—
ব'লেই সে চলে গেল শালকে।
মুন্সি যখন লেখে তৌজি,
জলে নামে শালকের বউ ঝি।
শালকের ঘাটে ভাঙা পাল্কি ;
কালু যাবে বানিচঙে কাল কি।
বানিচঙে ঢেঁকি পাকা-গাঁথ্নি,
ধান কাটে কালুদার নাৎনি।
বানিচঙ কোন্ দেশে কোন্ গাঁয়,
কে জানে সে যশোরে কি বনগাঁয়।

ফুটবলে বনগাঁর মোক্তার
যত হারে, তত বাড়ে রোখ তার।
তার ছেলে হরেরাম মিত্তির,
আঁক ক'ষে ব্যামো হল পিত্তির।
মুখ চোখ হয়ে গেল হলদে,
ওরে ওকে পলতার ঝোল দে।
পলতা কিনতে গেল ধুবড়ি,
কিনল গুগলি এক-চুবড়ি।
হুগলির গুগলি কী মাগগি,
ভাঙা হাটে পাওয়া গেল ভাগ্যি।
ধুবড়িতে মানকচু সস্তা,
ফাউ পেল কাগজ দু বস্তা।
দেখে বলে নীলমণি সরকার—
কাগজে হরুর খুব দরকার;
জ্যামিতি অতীত তার সাধ্যর,
যতই করুন তারে মারধোর।
কাগজে বসিয়ে রেখে নারকেল
পেন্সিলে কাটে ব'সে সারকেল।
সারকেল কাটতে সে কী বুঝে
খামকাই ঠেকে গেল ত্রিভুজে।
সইতে পারে না তার চাপুনি,
পালাজ্বরে দিল তারে কাঁপুনি।
শ্রাদ্ধবাড়িতে লেগে ঠাণ্ডা
হেঁচে মরে ত্রিবেণীর পাণ্ডা।
অবেলায় খেতে বসে দারোগা,
শির শির ক'রে ওঠে তারো গা।
টাট্টু ঘোড়ার এক গাড়িতে
ডাক্তার এল তার বাড়িতে।
সে-ঘোড়াটা বেড়া ভাঙে নম্বর,
চিহ্ন রাখে না খেত-খন্দর।

নন্দ বিকেলে গেল হাবড়ায়,
সারি সারি গাড়ি দেখে ঘাবড়ায়।
গোনে ব'সে, তিন চার পাঁচ সাত,
আউড়িয়ে যায় সারা ধারাপাত।
শুনে শুনে পারে না যে থামতে,
গল্‌গল্‌ ক'রে থাকে ঘামতে।
নয় দশ বারো তেরো চোদ্দ,
মনে পড়ে পয়ারের পদ্য।
কাশীরাম দাসে আনে পুণ্য,
দশে আর বিশে লাগে শূন্য।
'কাশীরাম কাশীরাম' বোল দেয়,
সারাদিন মনে তার দোল দেয়।
আঁকগুলো মাথা থাকে ঘোলাতে,
নন্দ ছুটেছে হাটখোলাতে।
হাটখোলা শ্বশুরের গদি তার—
সেইখানে বাসা মেলে যদি তার
এক সংখ্যায় মন দেবে ঝাঁপ,
তার চেয়ে বেশি হলে হবে পাপ।
আর নয়, আর নয়, আর নয়—
কখনোই দুই তিন চার নয়।

উদীচী [শান্তিনিকেতন]
২০ জানুয়ারি ১৯৪০

৯

আজ হল রবিবার, খুব মোটা বহরের
কাগজের এডিশন ; যত আছে শহরের
কানাকানি, যত আছে আজগবি সংবাদ,
যায় নিকো কোনোটার একটুও রঙ বাদ।
'বার্তাকু' লিখে দিল, গুজরানওয়ালায়
দলে দলে জোট করে পাঞ্জাবি গোয়ালায়

বলে তারা, গোরু পোষা গ্রাম্য এ কারবার
প্রগতির যুগে আজ দিন এল ছাড়বার।
আজ থেকে প্রত্যহ রাত্তির পোয়ালেই
বসবে প্রেপরিটরি ক্লাস এই গোয়ালেই।
স্তূপ রচা দুই বেলা খড়-ভুষি-ঘাসটার
ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইস্কুলমাস্টার।
হম্বাধ্বনি যাহা গো-শিশু গো-বৃদ্ধের
অন্তর্ভূত হবে বই-গেলা বিদ্যের।
যত অভ্যেস আছে লেজ ম'লে পিটোনো
ছেলেদের পিঠে হবে পেট ভ'রে মিটোনো

'গদাধরে' রেগে লেখে, এ কেমন ঠাট্টা—
বার্তাকু পরে পরে সাতটা কি আটটা
যা লিখেছে সব কটা সমাজের বিরোধী,
মতগুলো প্রগতির দ্বার আছে নিরোধি।
সেদিন সে লিখেছিল, ঘুঁটে চাই চালানো,
শহরের ঘরে ঘরে ঘুঁটে হোক জ্বালানো।
কয়লা ঘুঁটেতে যেন সাপে আর নেউলে,
ঝড়িয়াকে করে দিক একদম দেউলে।
সেনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেয়ালী
শহরের বুক জুড়ে আছে যেন হেঁয়ালি।
ঘুঁটে দিয়ে ভরা হোক, এই এক ফতোয়ায়
এক দিনে শহরের বেড়ে যাবে কত আয়।
গোয়ালারা চোনা যদি জমা করে গামলায়
কত টাকা বাঁচে তবে জল-দেওয়া মামলায়।
বার্তাকু কাগজের ব্যঙ্গে যে গা জ্বলে,
সুন্দর মুখ পেলে লেপে ওরা কাজলে।
এ-সকল বিদ্রূপে বুদ্ধি যে খেলো হয়,
এ দেশের আবহাওয়া ভারি এলোমেলো হয়

গদাধর কাগজের ধমকানি থামল,
হেসে উঠে বার্তাকু যুদ্ধেতে নামল।
বলে, ভায়া, এ জগতে ঠাট্টা সে ঠাট্টাই—
গদাধর, গদা রেখে লও সেই পাঠটাই।
মাস্টার না হয়ে যে হলে তুমি এডিটর
এ লাগি তোমার কাছে দেশটাই ক্রেডিটর
এডুকেশনের পথে হয় নি যে মতি তব,
এই পুণ্যেই হবে গোকুলেই গতি তব।

অবশেষে এ দুখানা কাগজের আসরে
বচসার ঝাঁজ দেখে ভয়ে কথা না সরে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১৭ মার্চ ১৯৪০

১০

সিউড়িতে হরেরাম মৈত্তির
পাঁজি দেখে সতেরোই চৈত্তির।
বলে, আজ যেতে হবে মথুরায়।
সেথা তার মামা আছে সতু রায়।
বেস্পতিবারে গাড়ি চড়ে তার,
চাকা ভাঙে নরসিংগড়ে তার।
তাই তার যাত্রাটা ঘুরুলে,
ফিরে এসে চলে গেল শুরুলে।
ঠিক হল যেতে হবে পেশোয়ার,
সেথা আছে সেজো মাসি মেসো আর
এসে দেখে একা আছে বউ সে,
মেসো গেছে পানিপথে পৌষে।
হাথুয়ার কাছাকাছি না যেতেই,
বাঙালি সে ধরা পড়ে সাজেতেই।

চোখ রাঙা ক'রে বলে দারোগা,
থানামে লে কর্ হম মারো গা।
ছোটো ভাই বেঁধে চিঁড়ে মুড়কি
সন্ন্যাসী হয়ে গেল রুড়কি।
ঠোক্কর খেয়ে পড়ে বোঁচকায়,
কুক্ষণে পা দুখানা মোচকায়।
শেষে গেল সুলতানপুরে সে,
গান ধরে মুলতান সুরে সে।
বেলাশেষে এল যবে বাম্‌ড়ায়
কী ভীষণ মশা তাকে কামড়ায়।
বুঝলে সে শান্ত যে হওয়া দায়,
গোরুর গাড়িতে চলে নওয়াদায়।
গোরুটা পড়ল মুখ থুবড়ি
ক্রোশ দুই থাকতেই ধুবড়ি।
কাটিহারে তুলে তাকে ধরল,
তখন সে পেট ফুলে মরল।
শুনেছে তিসির খুব নামো দর,
তাই পাড়ি দিতে গেল দামোদর
দামোদরে বুধুরাম খেয়া দেয়,
চেপে বসে ডেপুটির পেয়াদায়।
শংকর ভোরবেলা চুঁচড়োয়
হাউ-হাউ শব্দে গা মুচড়োয়।
নাড়াজোলে বড়োবাবু তখুনি
শুরু করে বংশুকে বকুনি।
বংশুর যত হোক খাটো আয়,
তবু তার বিয়ে হবে কাটোয়ায়।
শাঁখা হুঁকো বাঁধা নিয়ে খড়দার
ধার দিলে মতিরাম সর্দার।
'শাঁখা চাই' বলতেই শাঁখারি
বলে, শাঁখা আছে তিন টাকারই।

দর-কষাকষি নিয়ে অবশেষ
পুলিসথানায় হল সব শেষ।
সাসারামে চলে গেল লোক তার
খুঁজে যদি পাওয়া যায় মোক্তার।
সাক্ষীর খোঁজে গেল চেউকি,
গাঁজাখোর আছে সেথা কেউ কি।
সাথে নিয়ে ভুলুদা ও শশিদি
অনুকূল চলে গেছে ভসিদি।
পথে যেতে বহু দুখ ভুগে রে
খোঁড়া ঘোড়া বেচে এল মুঙেরে।
মা ও দিকে বাতে তার পা খুঁড়ায়,
পড়ে আছে সাত দিন বাঁকুড়ায়।
ডাক্তার তিনকড়ি সাণ্ডেল
বদলি করেছে বাসা বাণ্ডেল।
তাই লোক পাঠায় কোদাবুমায়,
চিঠি লিখে দিল সে ভোঁদার মায়।
সাতক্ষীরা এল চুপিচুপি সে,
তার পরে গেল পাঁচথুপি সে।
সেখানেতে মাছি প'ল ভাতে তার,
ঝগড়া হোটেলবাবু সাথে তার।
অতুল গিয়েছে কবে নাসিকে,
সঙ্গে নিয়েছে তার মাসিকে।
রাঁধবার লোক আছে মাদ্রাজি
সাত টাকা মাইনেয় আধ-রাজি।
লালচাঁদ যেতে যেতে পাকুড়ে
খিদেটা মেটায় শসা কাঁকুড়ে।
পৌছিয়ে বাহাদুরগঞ্জে
হাঁসফাঁস করে তার মন যে।
বাসা খুঁজে সাথি তার কাঙলা
খুলনায় পেল এক বাঙলা।

শুধু একখানা ভাঙা চৌকি,
এখানেই থাকে মেজো বউ কি।
নেমে গেল যেথা কামুজংশন,
ভিমরুলে করে দিল দংশন।
ডাক্তারে বলে চুন লাগাতে
জ্বালাটাকে চায় যদি ভাগাতে।
চুন কিনতে সে গেল কাটনি,
কিনে এল আমড়ার চাটনি।
বিকানিরে পড়ল সে নাকালে,
উটে তাকে কী বিষম ঝাঁকালে।
বাড়িভাড়া করেছিল শ্বশুরই,
তাই খুশি মনে গেল মশুরি।
শ্বশুর উধাও হল না ব'লে,
জামাই কি ছাড়া পাবে তা ব'লে।
জায়গা পেয়েছে মালগাড়িতে,
হাত সে বুলাতেছিল দাড়িতে,
ঝাঁকা থেকে মুর্গিটা নাকে তার
ঠোকর মেরেছে কোন্ ফাঁকে তার
নাকের গিয়েছে জাত রটে যায়,
গাঁয়ের মোড়ল সব চটে যায়।
কানপুর হতে এল পণ্ডিত,
বলে এরে করা চাই দণ্ডিত।
লাশা হতে শ্বেত কাক খুঁজিয়া
নাসাপথে পাখা দাও গুঁজিয়া।
হাঁচি তবে হবে শতশতবার,
নাক তার শুচি হবে ততবার।
তার পরে হল মজা ভরপুর
যখন সে গেল মজাফরপুর।
শালা ছিল জমাদার থানাতে,
ভোজ ছিল মোগলাই খানাতে।

জৌনপুরি কাবাবের গন্ধে
ভুরভুর করে সারা সন্ধে।
দেহটা এমনি তার তাতালে
যেতে হল মেয়ো-হাঁসপাতালে
তার পরে কী যে হল শেষটা
খবর না পাই করে চেষ্টা।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৭ মার্চ ১৯৪০

১১

মাঝরাতে ঘুম এল, লাউ কেটে দিতে
ছিঁড়ে গেল ভুলুয়ার ফতুয়ার ফিতে।
খুহু বলে, মামা আসে, এই বেলা লুকো।
কানাই কাঁদিয়া বলে, কোথা গেল হুঁকো।
নাতি আসে হাতি চড়ে। খুড়ো বলে, আহা,
মারা বুঝি গেল আজ সনাতন সাহা।
তাঁতিনীর নাতিনীর সাথিনী সে হাসে;
বলে, আজ ইংরেজি মাসের আঠাশে।
তাড়া খেয়ে ন্যাড়া বলে, চলে যাব রাঁচি।
ঠাণ্ডায় বেড়ে গেল বাঁদরের হাঁচি।
কুকুরের লেজে দেয় ইন্‌জেক্‌শ্যান,
মান্থ‌্লি টিকিট কেনে জলধর সেন।
পাঁজি লেখে, এ বছরে বাঁকা এ কালটা,
ত্যাড়াবাঁকা বুলি তার উলটা-পালটা—
ঘুলিয়ে গিয়েছে তার বেবাক খবর—
জানি নে তো কে যে কারে দিচ্ছে কবর।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৫ ডিসেম্বর ১৯৪০। বিকাল

শেষ লেখা

শেষ লেখা

১

সমুখে শান্তিপারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি,
লও লও হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি
ধ্রুবতারকার।

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

হয় যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা-অজানার।

পুনশ্চ [শান্তিনিকেতন]
৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯। বেলা একটা

২

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
প্রেমের অসীম মূল্য

সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে
হেন দস্যু নাই গুপ্ত
নিখিলের গুহাগহ্বরেতে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
সবচেয়ে সত্য ক'রে পেয়েছিনু যারে
সবচেয়ে মিথ্যা ছিল তারি মাঝে ছদ্মবেশ ধরি,
অস্তিত্বের এ কলঙ্ক কভু
সহিত না বিশ্বের বিধান
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
সবকিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্তবেগে
সেই তো কালের ধর্ম।
মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে,
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে
সেই তার আমি
অস্তিত্বের সাক্ষী সেই,
পরম-আমির সত্যে সত্য তার
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

৭ মে ১৯৪০

৩

ওরে পাখি,
থেকে থেকে ভুলিস কেন সুর,
যাস নে কেন ডাকি—
বাণীহারা প্রভাত হয় যে বৃথা
জানিস নে তুই কি তা।
অরুণ-আলোর প্রথম পরশ
গাছে গাছে লাগে,
কাঁপনে তার তোরই যে সুর

পাতায় পাতায় জাগে—
তুই যে ভোরের আলোর মিতা
জানিস নে তুই কি তা।
জাগরণের লক্ষ্মী যে ওই
আমার শিয়রেতে
আছে আঁচল পেতে,
জানিস নে তুই কি তা।
গানের দানে উহারে তুই
করিস নে বঞ্চিতা।
দুঃখরাতের স্বপনতলে
প্রভাতী তোর কী যে বলে
নবীন প্রাণের গীতা,
জানিস নে তুই কি তা।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। বিকাল

৪

রৌদ্রতাপ ঝাঁঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি,
সেথায় সান্ত্বনালেশ নাহি।
বুক ভরা তার
হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার।
শূন্যতার বাণী ওঠে করুণায় ভরা,
মর্ম তার নাহি যায় ধরা।
কুকুর মনিবহারা যেমন করুণ চোখে চায়,
অবুঝ মনের ব্যথা করে হায়-হায়;
কী হল যে, কেন হল, কিছু নাহি বোঝে—
দিনরাত ব্যর্থ চোখে চারি দিকে খোঁজে।

চৌকির ভাষা যেন আরো বেশি করুণ কাতর,
শূন্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
২৬ মার্চ ১৯৪১। বিকাল

৫

আরো একবার যদি পারি
খুঁজে দেব সে আসনখানি
যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী।

অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়,
অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে
আরবার রচি দিবে নীড়।

সুখস্মৃতি ডেকে ডেকে এনে
জাগরণ করিবে মধুর,
যে বাঁশি নীরব হয়ে গেছে
ফিরায়ে আনিবে তার সুর।

বাতায়নে রবে বাহু মেলি
বসন্তের সৌরভের পথে,
মহানিঃশব্দের পদধ্বনি
শোনা যাবে নিশীথজগতে।

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা,
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৬ এপ্রিল ১৯৪১। দুপুর

৬

ঐ মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১ বৈশাখ ১৩৪৮

৭

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
কোন্ অলক্ষিত পথ দিয়ে
সন্ধান মেলে না তার।

প্রত্যহ নূতন নির্মলতা
দিল তারে সূর্যোদয়
লক্ষ ক্রোশ হতে
স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেকধারা।
সে জীবন বাণী দিল দিবসরাত্রিরে,
রচিল অরণ্যফুলে অদৃশ্যের পূজা-আয়োজন,
আরতির দীপ দিল জ্বালি
নিঃশব্দ প্রহরে।
চিত্ত তারে নিবেদিল
জন্মের প্রথম ভালোবাসা।
প্রত্যহের সব ভালোবাসা
তারি আদি সোনার কাঠিতে
উঠেছে জাগিয়া ;
প্রিয়ারে বেসেছি ভালো,
বেসেছি ফুলের মঞ্জরিকে ;
করেছে সে অন্তরতম
পরশ করেছে যারে।
জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা,
দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে।
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে,
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,
তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে ;
কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
২৫ এপ্রিল ১৯৪১

৮

বিবাহের পঞ্চম বরষে
যৌবনের নিবিড় পরশে
গোপন রহস্য ভরে
পরিণত রসপুঞ্জ অন্তরে অন্তরে
পুষ্পের মঞ্জরি হতে ফলের স্তবকে
বৃন্ত হতে ত্বকে
সুবর্ণবিভায় ব্যাপ্ত করে।
সংবৃত সুমন্দ গন্ধ অতিথিরে ডেকে আনে ঘরে।
সংযত শোভায়
পথিকের নয়ন লোভায়।
পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বসন্তের মাধবীমঞ্জরি
মিলনের স্বর্ণপাত্রে সুধা দিল ভরি;
মধুসঞ্চয়ের পর
মধুপেরে করিল মুখর।
শান্ত আনন্দের আমন্ত্রণে
আসন পাতিয়া দিল রবাহূত অনাহূত জনে।
বিবাহের প্রথম বৎসরে
দিকে দিগন্তরে
শাহানায় বেজেছিল বাঁশি,
উঠেছিল কল্লোলিত হাসি—
আজ স্মিতহাস্য ফুটে প্রভাতের মুখে
নিঃশব্দ কৌতুকে।
বাঁশি বাজে কানাড়ায় সুগভীর তানে
সপ্তর্ষির ধ্যানের আহ্বানে।
পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বিকশিত সুখস্বপ্নখানি
সংসারের মাঝখানে পূর্ণতার স্বর্গ দিল আনি।
বসন্তপঞ্চম রাগ আরম্ভেতে উঠেছিল বাজি,
সুরে সুরে তালে তালে পূর্ণ হয়ে উঠিয়াছে আজি;

পুষ্পিত অরণ্যতলে প্রতি পদক্ষেপে
মঞ্জীরে বসন্তরাগ উঠিতেছে কেঁপে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
২৫ এপ্রিল ১৯৪১। সকাল

৯

বাণীর মুরতি গড়ি
একমনে
নির্জন প্রাঙ্গণে
পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার
যায় ছড়াছড়ি—
অসমাপ্ত মূক
শূন্যে চেয়ে থাকে
নিরুৎসুক।
গর্বিত মূর্তির পদানত
মাথা ক'রে থাকে নিচু,
কেন আছে উত্তর না দিতে পারে কিছু।
বহুগুণে শোচনীয় হায় তার চেয়ে
এক কালে যাহা রূপ পেয়ে
কালে কালে অর্থহীনতায়
ক্রমশ মিলায়।
নিমন্ত্রণ ছিল কোথা, শুধাইলে তারে
উত্তর কিছু না দিতে পারে—
কোন্ স্বপ্ন বাঁধিবারে
বহিয়া ধূলির ঋণ
দেখা দিল
মানবের দ্বারে।
বিস্মৃত স্বর্গের কোন্
উর্বশীর ছবি
ধরণীর চিত্তপটে

বাঁধিতে চাহিয়াছিল
কবি—
তোমারে বাহনরূপে
ডেকেছিল,
চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল,
কখন সে অন্যমনে গেছে ভুলি—
আদিম আত্মীয় তব ধূলি,
অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্‌বিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।
এই ভালো,
বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে
আজ পঙ্গু আবর্জনা
নিরস্ত গঞ্জনা
কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
বাধা দিতে জানে,
পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে হবে মেশে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৩ মে ১৯৪১। সকাল

১০

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
শূন্য ঝুলি আজিকে আমার ;

দিয়েছি উজাড় করি
যাহা কিছু আছিল দিবার,
প্রতিদানে যদি কিছু পাই—
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা—
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৬ মে ১৯৪১। সকাল

১১

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১৩ মে ১৯৪১। রাত্রি ৩-১৫ মিনিট

১২

তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে
বিচিত্র সজ্জিত আজি এই
প্রভাতের উদয়প্রাঙ্গণ।
নবীনের দানসত্র কুসুমে পল্লবে
অজস্র প্রচুর।
প্রকৃতি পরীক্ষা করি দেখে
ক্ষণে ক্ষণে আপন ভাণ্ডার,
তোমারে সম্মুখে রাখি পেল সে সুযোগ।
দাতা আর গ্রহীতার যে সংগম লাগি
বিধাতার নিত্যই আগ্রহ
আজি তা সার্থক হল,
বিশ্বকবি তাহারি বিস্ময়ে
তোমারে করেন আশীর্বাদ—
তাঁর কবিত্বের তুমি সাক্ষীরূপে দিয়েছ দর্শন
বৃষ্টিধৌত শ্রাবণের
নির্মল আকাশে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১৩ জুলাই ১৯৪১। সকাল

১৩

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে,

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
২৭ জুলাই ১৯৪১। সকাল

১৪

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
২৯ জুলাই ১৯৪১। বিকাল

১৫

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
৩০ জুলাই ১৯৪১। সকাল সাড়ে নয়টা

—

নাটক ও প্রহসন

মুক্তির উপায়

ভূমিকা

ফকির, স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গোঁফদাড়িতে মুখের বারো আনা অনাবিষ্কৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী। বাপের আদরের মেয়ে। তিনি টাকা রেখে গেছেন ওর জন্যে। ফকিরের বাপ বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে স্নেহ করেন, পুত্রের অপরিমিত গুরুভক্তিতে তিনি উৎকণ্ঠিত।

পুষ্পমালা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে। দূরসম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগাঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কৌতূহলের সীমা নেই। কৌতুকের জিনিসকে নানা রকমে পরখ করে দেখছে কখনো নেপথ্যে, কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালোবাসে।

পুষ্পমালার একজন গুরু আছেন, তিনি খাঁটি বনস্পতি জাতের। অগুরু-জঙ্গলে দেশ গেছে ছেয়ে। পুষ্পর ইচ্ছে সেইগুলোতে হাসির আগুন লাগিয়ে খাণ্ডবদাহন করে। কাজ শুরু করেছিল এই নবগ্রামে। শুনেছি, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পুণ্যকর্মে ব্যাঘাত ঘটেছে। তার পর থেকে পঞ্চশরের সঙ্গে হাসির শর যোগ করে ঘরের মধ্যেই সুমধুর অশান্তি আলোড়িত করেছে। সেই প্রহসনটা এই প্রহসনের বাইরে।

পাশের পাড়ার মোড়ল ষষ্ঠীচরণ। তার নাতি মাখন দুই.স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর দেশছাড়া। ষষ্ঠীচরণের বিশ্বাস পুষ্পর অসামান্য বশীকরণ-শক্তি। সেই পারবে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে। পুষ্প শুনে হাসে আর ভাবে, যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনটাকে সে সম্পূর্ণ করে দেবে। এই নিয়ে রবি ঠাকুর নামে একজন গ্রন্থকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে পত্রব্যবহার করেছে।

মুক্তির উপায়

প্রথম দৃশ্য

ফকির। পুষ্পমালা। হৈমবতী

ফকির। সোহং সোহং সোহং।

পুষ্প। ব'সে ব'সে আওড়াচ্ছ কী।

ফকির। গুরুমন্ত্র।

পুষ্প। কতদূর এগোল।

ফকির। এই, ইড়া নাড়িটার কাছ পর্যন্ত এসে গেল থেমে।

পুষ্প। হঠাৎ থামে কেন।

ফকির। ঐ আমার ছিঁচকাঁদুনি খুকিটার কীর্তি। মন্তরটা গুরগুর গুরগুর করতে করতে দিব্যি উঠছিল উপরের দিকে ঠেলে। বোধ হয় আর সিকি ইঞ্চি হলেই পিঙ্গলার মধ্যে ঢুকে পড়ত, এমন সময় মেয়েটা নাকিস্বরে চীৎকার করে উঠল— বাবা, নচঞ্চুস্। দিলুম ঠাস করে গালে এক চড়, ভ্যাঁ করে উঠল কেঁদে, অমনি এক চমকে মন্তরটা নেমে পড়ল পিঙ্গলার মুখ থেকে একেবারে নাভীগহ্বর পর্যন্ত। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

পুষ্প। তোমার গুরুর মন্তরটা কি অজীর্ণরোগের মতো। নাড়ির মধ্যে গিয়ে—

ফকির। হাঁ দিদি, নাড়ির মধ্যে ঘুটঘাট ঘুটঘাট করছেই— ওটা বায়ু কিনা।

পুষ্প। বায়ু নাকি।

ফকির। তা না তো কী। শব্দব্রহ্ম— ওতে বায়ু ছাড়া আর কিছুই নেই। ঋষিরা যখন কেবলই বায়ু খেতেন তখন কেবলই বানাতেন মন্তর।

পুষ্প। বল কী।

ফকির। নইলে অতটা বায়ু জমতে দিলে পেট যেত ফেটে। নাড়ি যেত পটপট করে ছিঁড়ে বিশখানা হয়ে।

পুষ্প। উঃ, তাই তো বটে— একেবারে চার-বেদ-ভরা মন্ত্র— কম হাওয়া তো লাগে নি।

ফকির। শুনলেই তো বুঝতে পার, ঐ-যে ও—ম্, ওটা তো নিছক বায়ু-উদ্গার। পুণ্যবায়ু, জগৎ পবিত্র করে।

পুষ্প। এত সব জ্ঞানের কথা পেলে কোথা থেকে। আমরা হলে তো পাগল হয়ে যেতুম।

ফকির। সবই গুরুর মুখ থেকে। তিনি বলেন, কলিতে গুরুর মুখই গোমুখী— মন্ত্রগঙ্গা বেরচ্ছে কল্‌কল্ করে।

পুষ্প। বি. এ.তে সংস্কৃতে অনার্স্‌ নিয়ে খেটে মরেছি মিথ্যে। অজীর্ণ রোগেও ভুগেছি, সেটা কিন্তু পাকযন্ত্রের, ইড়াপিঙ্গলার নয়।

ফকির। এতেই বুঝে নাও— গুরুর কৃপা। তাই তো আমার নাড়ির মধ্যে মন্তরটা প্রায়ই ডাক ছাড়ে গুরু গুরু গুরু শব্দে।

পুষ্প। আচ্ছা, ডাকটা কি আহারের পরে বাড়ে।

ফকির। তা বাড়ে বটে।

পুষ্প। গুরু কী বলেন।

ফকির। তিনি বলেন, পেটের মধ্যে স্থূলে সূক্ষ্মে লড়াই, যেন দেবে দৈত্যে। খাদ্যের সঙ্গে মন্ত্রের বেধে যায় যেন গোলাগুলি-বর্ষণ, নাড়িগুলো উচ্চস্বরে গুরুকে স্মরণ করতে থাকে।

হৈম। দুঃখের কথা আর কী বলব দিদি, পেটের মধ্যে গুরুর স্মরণ চলছে, বাইরেও বিরাম নেই। চরণদাস বাবাজি আছেন ওঁর গুরুভাই, সে লোকটার দয়ামায়া নেই, ওঁকে গান শেখাচ্ছেন। পাড়ার লোকেরা—

পুষ্প। চুপ চুপ চুপ, পতিব্রতা তুমি। স্বামীর কণ্ঠ যখন চলে, সাধ্বীরা প্রাণপণে থাকেন নীরবে। ফকিরদা, গলায় গান শানাচ্ছ কেন, গান্ধিজির অহিংসানীতির কথা শোন নি।

হৈম। তোমরা দুজনে তত্ত্বকথা নিয়ে থাকো। আমাকে যেতে হবে মাছ কুটতে। আমি চললুম। [প্রস্থান

ফকির। আমার কথাটা বুঝিয়ে বলি। গুরুর মন্ত্র, যাকে বলে গুরুপাক। খুব বেশি যখন জমে ওঠে অন্তরে, তখন সমস্ত শরীরটা ওঠে পাক দিয়ে; নাচের ঘূর্ণি উঠতে থাকে পায়ের তলা থেকে উপরের দিকে; আর, ঘানি ঘুরলে যেরকম আওয়াজ দিতে চায়, ভক্তির ঘোরে সেইরকম গানের আওয়াজ ওঠে গলার ভিতর দিয়ে। এই দেখো-না এখনি সাধনার নাড়া লেগেছে একেবারে মূলাধার থেকে— উঃ!

পুষ্প। কী সর্বনাশ! ডাক্তার ডাকব নাকি।

ফকির। কিছু করতে হবে না। একবার পেট ভরে নেচে নিতে হবে। গুরু বলেছেন, গুরুর মন্ত্রটা হল ধারক, আর নৃত্যটা হল সারক, দুটোরই খুব দরকার। (উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য)

গুরুচরণ করো শরণ-অ
ভবতরঙ্গ হবে তরণ-অ
সুধাক্ষরণ প্রাণভরণ-অ
মরণভয় হবে হরণ-অ।

পুষ্প। শুধু মরণভয়-হরণ নয়, দাদা। গুরুদক্ষিণার চোটে স্ত্রীর গয়না, বাপের তহবিল -হরণও চলছে পুরো দমে।

ফকির। ঐ দেখো, বাবা আসছেন বৌকে নিয়ে। বড়ো ব্যাঘাত, বড়ো ব্যাঘাত। গুরো।

পুষ্প। ব্যাঘাতটা কিসের।

ফকির। স্থূলরূপে ওঁরা আমাকে ফকির বলেই জানেন।

পুষ্প। আরো একটা রূপ আছে নাকি।

ফকির। ক্ষয় হয়ে গেছে আমার ফকির-দেহটা ভিতরে ভিতরে। কেবলই মিলে যাচ্ছে গুরুদেহের সূক্ষ্মরূপে। বাইরে পড়ে আছে খোলসটা মাত্র। ওঁরা আসলটাকে কিছুতেই দেখবেন না।

পুষ্প। খোলসটা যে অত্যন্ত বেশি দেখা যাচ্ছে। একেবারেই স্বচ্ছ নয়।

ফকির। দৃষ্টিশুদ্ধি হতে দেরি হয়। কিন্তু সব আগে চাই বিশ্বাসটা। ভগবৎ-কৃপায় এঁদের মনে যদি কখনো বিশ্বাস জাগে, তা হলে গুরুদেহে আর ফকিরের দেহে একেবারে অভেদ রূপ দেখতে পাবেন— তখন বাবা—

পুষ্প। তখন বাবা গয়ায় পিণ্ডি দিতে বেরবেন।

[ফকিরের প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর ও হৈমবতীর প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। (হৈমর প্রতি) বেয়াই ব্যাঙ্কে তোমার নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন। ফকির সেটা জানে, তাই তো ওর কিছু হল না।

পুষ্প। আর কী হলে আর কী হত, সে ভাবতে গেলে মাথা ধরে যায়।

বিশ্বেশ্বর। ম্যাকিননের হেড্‌বাবু আমার বন্ধুর শ্যালীপতি, সে বলেছিল, ফকির যা-হয় একটা কিছু পাস করলেই তাকে এসিস্টেন্ট স্টোর্‌কীপার করে দেবে। বাঁদরটা কেবল জেদ করেই বারে বারে ফেল করতে লাগল।

পুষ্প। ফেল করবার বিশ্রী জেদ আরো অনেক ছেলের দেখেছি। মিত্তিরদের বাড়ির মোতিলাল আমার সঙ্গে একসঙ্গেই পড়া আরম্ভ করেছিল। ম্যাট্রিকের এ পারের খোঁটা এমনি বিষম জেদ করে আঁকড়িয়ে রইল, ওর পিসেমশায় ওর কানে ধরে ঝিঁকে মারতে মারতে কান প্রায় ছিঁড়ে দিলেন কিন্তু পার করতে পারলেন না। চল্ ভাই হৈমি, পড়া করবি আয়— স্বামীর হয়ে পাস করার কাজটা তুই সেরে রাখবি চল্।

বিশ্বেশ্বর। যাও পড়তে, কিন্তু শোনো মা,— ফকির টাকা চাইলেই তুমি ওকে দাও কেন।

হৈম। কী করব বাবা, টাকা টাকা করে উনি বড়ো অশান্তি বাধান।

বিশ্বেশ্বর। ঐ দেখো-না, একটা রোঁওয়া-ওঠা বাঘের চামড়ার উপর বসে বিড়বিড় করে বকছে। এই ফকির, শুনে যা, বাঁদর। শুনে যা বলছি।

পুষ্প। মেসোমশায়, তোমার বুঝি সাহস হয় না ওকে ওর গণ্ডিটা থেকে টেনে আনতে!

বিশ্বেশ্বর। সত্যি কথা বলি, মা, ভয়-ভয় করে। ওর সব মন্তর-তন্তর ঠিক যে মানি তাও নয়, আবার না মানবার মতো বুকের পাটাও নেই। দেখো-না, ওখানটায় কিরকম খুদে পাগলা-গারদ সাজিয়েছে। গুরু কবে পাঁঠা খেয়েছিল, তার মুড়োর খুলিটা রেখেছে পশমের আসনে।

পুষ্প। ঐ জায়গাটাকে ও নাম দিয়েছে মোক্ষধাম। গুরুর সিগারেট-খাওয়া দেশলাই-কাঠিগুলো কাটা কাঁচকলার টুকরোর উপর পুঁতে পুঁতে গণ্ডি বানিয়েছে। ও বলে, কাঠিগুলোর আলো কিছুতেই নেবে না, যার দিব্যদৃষ্টি আছে সে চোখ বুজলেই দেখতে পায়। গুরুর একটা চা-সেটের ভাঙা পিরিচ এনেছে, সেটার প্রতিষ্ঠা হয়েছে গুরুর বর্মা চুরুটের প্যাক্‌বাক্সে। গুরু ভালোবাসেন সাড়ে আঠারো ভাজা, কিনে এনে নৈবেদ্য দেয় ঐ পিরিচ ভরে। বলে, ঐ পিরিচে যে পেয়ালা ছিল এক কালে, তার অদৃশ্যরূপ গুরুর অদৃশ্য প্রসাদ ঢালতে থাকে। মোক্ষধাম ভরে যায় দার্জিলিং চায়ের গন্ধে।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা মা, ঐ বড়ো বড়ো বোতলগুলো কী করতে সাজিয়ে রেখেছে! ওর মধ্যে গুরুর ফীভার-মিক্শ্চারের অদৃশ্যরূপ ভরে রেখেছে না কি!

পুষ্প। বল্-না হৈমি, ওগুলো কিসের জন্যে।

হৈম। দক্ষিণা পেলেই গুরু তালপাতার উপর গীতার শ্লোক লিখে সেগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দেন। গীতা-ধোওয়া জলে ঐ বোতলগুলো ভরা। তিন সন্ধে স্নান করে

তিন চুমুক করে খান। ওঁর বিশ্বাস, ওঁর রক্তে গীতায় বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমার সংসার-খরচের দশ টাকার পাঁচখানা নোট ঐ বন্যায় গেছে ভেসে। যাই, আমার কাজ আছে। [প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর। ওরে ও ফকুরে!

পুষ্প। আচ্ছা, আমি ওকে নিয়ে আসছি। (কাছের দিকে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে) ও ফকিরদা, করেছ কী!

ফকির। কেন, কী হয়েছে।

পুষ্প। গুরু হাঁসের ডিমের বড়া খেয়েছিলেন, তার খোলাটা পড়ে গেছে তোমার চাদর থেকে বারান্দার কোণে।

ফকির। (লাফ দিয়ে উঠে) এঃ, ছি ছি, করেছি কী!

পুষ্প। হতভাগা হাঁসটাকে পর্যন্ত বঞ্চিত করলে তুমি! সে তোমার পিছনে পিছনে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে যেত বৈকুণ্ঠধামে— সেখানে পাড়ত স্বর্গীয় ডিম।

ফকির। (বেরিয়ে এসে খোলাটা নিয়ে বারবার মাথায় ঠেকালে) ক্ষমা কোরো গুরু, ক্ষমা কোরো— এ অণ্ড জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের বিগ্রহ ; এর মধ্যে আছে চন্দ্র সূর্য, আছে লোকপাল দিক্‌পালরা সবাই। গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে।

পুষ্প। (চাদর চেপে ধ'রে) এসো, এখন তোমার বাবার কথাটা শুনে নাও।

[চাদরের খুঁটে ডিম বেঁধে ফকির বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করলে

বিশ্বেশ্বর। বাপু, ভক্তিটা খাটো করে আমার উক্তিটা মানো।

ফকির। কী আদেশ করেন।

বিশ্বেশ্বর। আর-একবার পাস করবার চেষ্টা করে দেখো।

ফকির। পারব না, বাবা।

বিশ্বেশ্বর। কী পারবি নে। পাস করতে না পাস করবার চেষ্টা করতে?

ফকির। চেষ্টা আমার দ্বারা হবে না।

বিশ্বেশ্বর। কেন হবে না।

ফকির। গুরুজি বলেন, পাশ শব্দের অর্থ বন্ধন। প্রথমে পাস, তার পরেই চাকরি।

বিশ্বেশ্বর। লক্ষ্মীছাড়া! কী করে চলবে তোমার! আমার পেন্সনের উপর? আমি কি তোমাকে খাওয়াবার জন্যে অমর হয়ে থাকব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— বৌমার কাছে টাকা চাইতে তোর লজ্জা করে না? পুরুষমানুষ হয়ে স্ত্রীর কাছে কাঙালপনা!

ফকির। আমি নিজের জন্যে এক পয়সা নিই নে।

বিশ্বেশ্বর। তবে নিস্ কার জন্যে।

ফকির। ওঁরই সদ্‌গতির জন্যে।

বিশ্বেশ্বর। বটে? তার মানে?

ফকির। আমি তো সবই নিবেদন করি গুরুজির ভোগে। তার ফলের অংশ উনিও পাবেন।

বিশ্বেশ্বর। অংশ পাবেন বটে! উনিই ফল পাবেন আঁঠিসুদ্ধ। ছেলেপুলেরা মরবে শুকিয়ে।

ফকির। আমি কিছুই জানি নে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) যা করেন গুরু।

বিশ্বেশ্বর। বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। তোর মুখ দেখতে চাই নে। [প্রস্থান

হৈমবতীর প্রবেশ

ফকির। কা তব কান্তা—

হৈমবতী। কী বকছ।

ফকির। কা তব কান্তা। কোন্ কান্‌তা হ্যায়।

হৈমবতী। হিন্দুস্থানী ধরেছ? বাংলায় বলো।

ফকির। বলি, কাঁদছে কে।

হৈমবতী। তোমারই মেয়ে মিন্তু।

ফকির। হায় রে, একেই বলে সংসার। কাঁদিয়ে ভাসিয়ে দিলে।

হৈমবতী। কাকে বলে সংসার।

ফকির। তোমাকে।

হৈমবতী। আর, তুমি কী! মুক্তির জাহাজ আমার! তোমরা বাঁধ না, আমরাই বাঁধি!

ফকির। গুরু বলেছেন, বাঁধন তোমাদেরই হাতে।

হৈমবতী। আমি তোমাকে যদি বেঁধে থাকি সাত পাকে, তোমার গুরু বেঁধেছেন সাতান্ন পাকে।

ফকির। মেয়েমানুষ— কী বুঝবে তুমি তত্ত্বকথা! কামিনী কাঞ্চন—

হৈম। দেখো, ভণ্ডামি কোরো না। কাঞ্চনের দাম তোমার গুরুজি কতখানি বোঝেন সে আমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর, কামিনীর কথা বলছ!

ঐ মূর্খ কামিনীগুলোই পায়ের ধুলো নিয়ে পায়ে কাঞ্চন যদি না ঢালত তা হলে তোমার গুরুজির পেট অত মোটা হত না। একটা খবর তোমাকে দিয়ে রাখি। এ বাড়ি থেকে একটা মায়া তোমার কাটবে। কাঞ্চনের বাঁধন খসল তোমার। শ্বশুরমশায় আমাকে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছেন, আমার মাসহারা থেকে তোমাকে এক পয়সাও আর দিতে পারব না।

পুষ্পর প্রবেশ

পুষ্প। ফকিরদা! মানে কী। তোমার শোবার ঘর থেকে পাওয়া গেল মাণ্ডুক্যোপনিষৎ! অনিদ্রার পাঁচন না কি!

ফকির। (ঈষৎ হেসে) তোমরা কী বুঝবে— মেয়েমানুষ!

পুষ্প। কৃপা করে বুঝিয়ে দিতে দোষ কী!

[ফকির হাস্যমুখে নীরব

হৈম। কী জানি ভাই, ওখানা উনি বালিশের নীচে রেখে রাত্তিরে ঘুমোন।

পুষ্প। বেদমন্ত্রগুলোকে তলিয়ে দেন ঘুমের তলায়। এ বই পড়তে গেলে যে তোমাকে ফিরে যেতে হবে সাতজন্ম পূর্বে।

ফকির। গুরুকৃপায় আমাকে পড়তে হয় না।

পুষ্প। ঘুমিয়ে পড়তে হয়।

ফকির। এই পুঁথি হাতে তুলে নিয়ে তিনি এর পাতায় পাতায় ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন, জ্বলে উঠেছে এর আলো, মলাট ফুঁড়ে জ্যোতি বেরতে থাকে অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে, ঢুকতে থাকে সুষুম্না নাড়ির পাকে পাকে।

পুষ্প। সেজন্যে ঘুমের দরকার?

ফকির। খুবই। আমি স্বয়ং দেখেছি গুরুজিকে, দুপুরবেলা আহারের পর ভগবদ্গীতা পেটের উপর নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়— গভীর নিদ্রা। বারণ করে দিয়েছেন সাধনায় ব্যাঘাত করতে। তিনি বলেন, ইড়াপিঙ্গলার মধ্য দিয়ে শ্লোকগুলো অন্তরাত্মায় প্রবেশ করতে থাকে, তার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। অবিশ্বাসীরা বলে, নাক ডাকে। তিনি হাসেন; বলেন, মূঢ়দের নাক ডাকে, ইড়াপিঙ্গলা ডাকে জ্ঞানীদের— নাসারন্ধ্র আর ব্রহ্মরন্ধ্র ঠিক এক রাস্তায়, যেন চিৎপুর আর চৌরঙ্গী।

পুষ্প। ভাই হৈমি, ফকিরদার ইড়াপিঙ্গলা আজকাল কী রকম আওয়াজ দিচ্ছে।

হৈম। খুব জোরে। মনে হয়, পেটের মধ্যে তিনটে চারটে ব্যাঙ মরীয়া হয়ে উঠেছে।

ফকির। ঐ দেখো, শুনলে পুষ্পদিদি? আশ্চর্য ব্যাপার! সত্যি কথা না জেনেই

মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গুরুজি বলে দিয়েছেন, মাণ্ডূক্য উপনিষদের ডাকটাই হচ্ছে ব্যাঙের ডাক। অন্তরাত্মা চরম অবস্থায় নাভীগহ্বরে প্রবেশ করে হয়ে পড়েন কূপমণ্ডূক, চার দিকের কিছুতেই আর নজর পড়ে না। তখনি পেটের মধ্যে কেবলই শিবোহং শিবোহং শিবোহং করে নাড়িগুলো ডাক ছাড়তে থাকে। সেই ঘুমেতে কী গভীর আনন্দ সে আমিই জানি— যোগনিদ্রা একেই বলে।

হৈম। একদিন মিন্তু কেঁদে উঠে ওঁর সেই ব্যাঙডাকা ঘুম ভাঙিয়ে দিতেই তাকে মেরে খুন করেন আর কি।

পুষ্প। ফকিরদা, সংস্কৃতে অনার্স নিয়েছিলুম, আমাকে পড়তে হয়েছিল মাণ্ডূক্যের কিছু কিছু। নাকের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে হেঁচে হেঁচে ঘুম ভাঙিয়ে রাখতে হত। হাঁচির চোটে নিরেট ব্রহ্মজ্ঞানের বারো আনা তরল হয়ে নাক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। ইড়াপিঙ্গলা রইল বেকার হয়ে। অভাগিনী আমি, গুরুর ফুঁয়ের জোরে অজ্ঞানসমুদ্র পার হতে পারলেম না।

ফকির। (ঈষৎ হেসে) অধিকারভেদ আছে।

পুষ্প। আছে বই-কি। দেখো-না, ঐ শাস্ত্রেই ঋষি কোন্-এক শিষ্যকে দেখিয়ে বলেছেন, সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ— এর আত্মাটা চার-পা-ওয়ালা। অধিকারভেদকেই তো বলে দু-পা চার-পায়ের ভেদ। হৈম, রাত্রে তো ব্যাঙের ডাক শুনে জেগে থাকিস, আর কোনো জাতের ডাক শুনিস কি দিনের বেলায়।

হৈম। কী জানি ভাই, মিন্তু দৈবাৎ ওঁর মন্ত্রপড়া জলের ঘটি উলটিয়ে দিতেই উনি যে হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন সেটা—

পুষ্প। হাঁ, সেটা চারপেয়ে ডাক। মিলছে এই শাস্ত্রের সঙ্গে।

ফকির। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

পুষ্প। ফকিরদা, তপস্যা যখন ভেঙেছিল শিব এসেছিলেন তাঁর বরদাত্রীর কাছে— তোমার তপস্যা এবার গুটিয়ে নাও; এই দেখো, বরদাত্রী অপেক্ষা করে আছেন লালপেড়ে শাড়িখানি পরে।

হৈমবতী। পুষ্পদিদি, বরদাত্রীর জন্যে ভাবনা নেই; পাড় দেখা দিচ্ছে রঙ-বেরঙের।

পুষ্প। বুঝেছি, গেরুয়া রঙের ছটা বুঝি ঘরের দেয়াল পেরিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে?

হৈমবতী। এরই মধ্যে আসতে আরম্ভ করেছেন দুটি একটি করে বরদাত্রী। গেরুয়া রঙের নেশা মেয়েরা সামলাতে পারে না। পোড়াকপালীদের মরণদশা আর-

কি! সেদিন এসেছিল একজন বেহায়া মেয়ে ওঁর কাছে মুক্তিমন্ত্র নেবে ব'লে। হবি তো হ, আমারই ঘরে এসে পড়েছিল— ছুটো-একটা খাঁটি কথা শুনিয়েছিলুম, মুক্তিমন্ত্রেরই কাজ করেছিল, গেল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে।

ফকির। দেখো, আমার মাণ্ডুক্যটা দাও।

পুষ্প। কী করবে।

ফকির। নারীর হাত লেগেছে, গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে।

পুষ্প। সেই ভালো, বুদ্ধি দিয়ে ধোওয়াটা তো হল না এ জন্মে।

ফকির। শুনে যাও, হৈম। আজকে গুরুগৃহে নবরত্নদান ব্রত। আমি তাঁকে দেব সোনা, একটা গিনি চাই।

হৈমবতী। দিতে পারব না, শ্বশুরমশায় পা ছুঁইয়ে বারণ করেছেন।

পুষ্প। তোমার গুরুজির বুঝি কাঞ্চনে অরুচি নেই!

ফকির। তাঁর মহিমা কী বুঝবে তোমরা! কাঞ্চন পড়তে থাকে তাঁর ঝুলির মধ্যে আর তিনি চোখ বুজে বলেন— হং ফট্। বাস্, একেবারে ছাই হয়ে যায়। যারা তাঁর ভক্ত তাদের এ স্বচক্ষে দেখা।

পুষ্প। ঝুলিতে যদি ছাই ভরবারই দরকার থাকে, কাঠের ছাই আছে, কয়লার ছাই আছে, সোনার ছাই দিয়ে বোকামি কর কেন।

ফকির। হায় রে, এইটেই বুঝলে না! গুরুজি বলেছেন, মহাদেবের তৃতীয় নেত্রে দগ্ধ হয়েছিলেন কন্দর্প, সোনার আসক্তি ছাই করতেই গুরুজির আবির্ভাব ধরাধামে। স্থূল সোনার কামনা ভস্ম করে কানে দেবেন সূক্ষ্ম সোনা, গুরুমন্ত্র।

পুষ্প। আর সহ্য হচ্ছে না, চল্ ভাই হৈমি, তোর পড়া বাকি আছে।

ফকির। সোহহং ব্রহ্ম, সোহহং ব্রহ্ম, সোহহং ব্রহ্ম।

পুষ্প। (খানিক দূরে গিয়ে ফিরে এসে) রোসো ভাই, একটা কথা আছে, বলে যাই। ফকিরদা, শুনেছি তোমার গুরু আমার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ফকির। হাঁ, তিনি শুনেছেন, তুমি বেদান্ত পাস করেছ। তিনি আমাকে বলে রেখেছেন, নিশ্চয় তোমাকে তাঁর পায়ে এসে পড়তে হবে, বেদান্ত যাবে কোথায় ভেসে! সময় প্রায় হয়ে এল।

পুষ্প। বুঝতে পারছি। ক'দিন ধরে কেবলই বাঁ চোখ নাচছে।

ফকির। নাচছে? বটে! ঐ দেখো, অব্যর্থ তাঁর বাক্য। টান ধরেছে।

পুষ্প। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি, ছাই করে দেবার মতো মালমসলা

আমার মধ্যে বেশি পাবেন না। যা ছিল সব পাস করতে করতে য়ুনিভার্সিটির আঁস্তাকুড়ে ভর্তি করে দিয়েছি।

হৈমবতী। কী বলছ ভাই, পুষ্পদিদি! কোন্ ভূতে আবার তোমাকে পেল।

পুষ্প। কী জানি ভাই, দেশের হাওয়ায় এটা ঘটায়। বুদ্ধিতে কাঁপন দিয়ে হঠাৎ আসে যেন ম্যালেরিয়ার গুরুগুরুনি। মনে হচ্ছে, রবি ঠাকুরের একটা গান শুনেছিলুম—

গেরুয়া ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!

ফকির। পুষ্পদি, তুমি যে এতদূর এগিয়েছ তা আমি জানতুম না। পূর্বজন্মের কর্মফল আর কি!

পুষ্প। নিশ্চয়ই, অনেক জন্মের অবুদ্ধিকে দম দিতে দিতে এমন অদ্ভুত বুদ্ধি হঠাৎ পাক খেয়ে ওঠে— তার পরে আর রক্ষে নেই।

ফকির। উঃ, আশ্চর্য! ধন্য তুমি! সংসারে কেউ কেউ থাকে যারা একেবারেই— কী বলব!

পুষ্প। একেবারে শেষের দিক থেকেই শুরু করে। রবি ঠাকুর বলেছেন—

যখনি জাগিলে বিশ্বে পূর্ণপ্রস্ফুটিতা

ফকির। বা বা, বেশ বলেছেন রবি ঠাকুর— আমি তো কখনো পড়ি নি!

পুষ্প। ভালো করেছ, পড়লে বিপদেই পড়তে। ভাই হৈমি, তোর সেই মটরদানার তুনলী হারটা আমাকে দে দেখি। মহাপুরুষদের দর্শনে খালি হাতে যেতে নেই।

হৈম। কী বল, দিদি! ও যে আমার শাশুড়ির দেওয়া!

পুষ্প। এ মানুষটিও তো তোর শাশুড়ির দেওয়া, এও সেখানে তলিয়েছে ওটাও সেখানে যাবে নাহয়।

ফকির। অবোধ নারী, আসক্তি ত্যাগ করো, গুরুচরণে নিবেদন করো যা কিছু আছে তোমার।

পুষ্প। হৈমি, বিশ্বাস করে দাও আমার হাতে, লোকসান হবে না।

ফকির। আহা, বিশ্বাস— বিশ্বাসই সব! আমার ছোটো ছেলেটার নাম দেব— অমূল্যধন বিশ্বাস।

পুষ্প। হৈমি, ভয় নেই, আমার সাধনা হারাধন ফেরানো। গুরুকৃপায় সিদ্ধিলাভ হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুরুধাম

শিষ্যশিষ্যাপরিবৃত গুরু। জটাজাল বিলম্বিত পিঠের উপরে। গেরুয়া চাদরখানা স্থূল উদরের উপর দিয়ে বেঁকে পড়েছে, ঘোলা জলের ঝরনার মতো। ধূপধুনা। গদির এক পাশে খড়ম, যারা আসছে খড়মকে প্রণাম করছে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলছে— গুরো। গুরুর চক্ষু মুদ্রিত, বুকের কাছে দুই হাত জোড়া। মেয়েরা থেকে থেকে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। দুজন দু পাশে দাঁড়িয়ে পাখা করছে। অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ।

গুরু। (হঠাৎ চোখ খুলে) এই-যে, তোমরা সবাই এসেছ, জানতেই পারি নি। সিদ্ধিরস্তু সিদ্ধিরস্তু। এখন মন দিয়ে শোনো আমার কথা।

সেবক। মন তো প'ড়েই আছে গুরুর চরণে।

[শিষ্যাদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না

গুরু। আজ তোমাদের বড়ো কঠিন পরীক্ষা। মুক্তির সাতটা দরজার মধ্যে এইটে হল তিনের দরজা। শিবোহং শিবোহং শিবোহং। এইটে কোনোমতে পেরলে হয়। যাদের ধনের থলি ফেঁপে উঠেছে উজুরি-রুগির পেটের মতো, তারা এই সরু দরজায় যায় আটকে, জাঁতাকলের মতো।

সকলে। হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু। এইখেনে এসে মুক্তির ইচ্ছেতেই ঘটে বাধা। কেউ বসে পড়ে, কেউ ফিরে যায়। তার পরে এক দুই তিন, ঘণ্টা পড়ল, বাস্— হয়ে গেল, ডুবল নৌকো, আর টিকি দেখবার জো থাকে না। ক্রিং খ্রিং ক্রম্।

সকলে। হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু। এতকাল আমার সংসর্গে থেকে তোমাদের ধনের লোভ কিছু হাল্কা হয়েছে যদি দেখি, তা হলে আর মার নেই। এইবার তবে শুরু হোক। ওহে চরণদাস, গানটা ধরো।

গুরুপদে মন করো অর্পণ,
    ঢালো ধন তাঁর ঝুলিতে—
লঘু হবে ভার, রবে নাকো আর
    ভবের দোলায় দুলিতে।

হিসাবের খাতা নাড় ব'সে ব'সে,
মহাজনে নেয় স্থদ কষে কষে—
খাঁটি যেই জন সেই মহাজনে
কেন থাক হায় ভুলিতে,
দিন চলে যায় ট্যাঁকে টাকা হায়
কেবলি খুলিতে তুলিতে।

গুরু। কী নিতাই, চুপ করে বসে বসে মাথা চুলকোচ্ছ যে? মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝি! আচ্ছা, এই নে, পায়ের ধুলো নে।

নিতাই। তা, গুরুর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। খুবই ভাবনা আছে মনে। কাল সারারাত ধস্তাধস্তি করে স্ত্রীর বাক্স ভেঙে বাজুবন্ধজোড়া এনেছি।

গুরু। এনেছ, তবে আর ভাবনা কী।

নিতাই। প্রভো, ভাবনা তো এখন থেকেই। বউ বলেছে, ঘরে যদি ফিরি তবে ঝাঁটাপেটা করে দূর করে দেবে।

গুরু। সেজন্যে এত ভয় কেন।

নিতাই। এ মারটা প্রভুর জানা নেই, তাই বলছেন।

গুরু। নারদসংহিতায় বলে, দাম্পত্যকলহে চৈব— ঝগড়া দুদিনে যাবে মিটে।

নিতাই। ঐ নারীটিকে চেনেন না। সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে মেলে না। নাম দিয়েছি হিড়িম্বা। তা, বরঞ্চ যদি অনুমতি পাই তা হলে দ্বিতীয় সংসার করে শান্তিপুরে বাসা বাঁধব।

গুরু। দোষ কী! বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা বলেছেন, অধিকন্তু ন দোষায়। সেইরকম দৃষ্টান্তও দেখিয়েছেন। পুরুষের পক্ষে স্ত্রী গৌরবে বহুবচন।

মাধব। তার মানে একাই এক সহস্র।

গুরু। উল্টো। আধ্যাত্মিক অর্থে পুরুষের পক্ষে এক সহস্রই একা। বড়ো বড়ো সজ্জন কুলীন বহু কষ্টে তার প্রমাণ দিয়েছেন। সেই জন্যেই এ দেশকে বলে পুণ্যভূমি— পুণ্যবিবাহকর্মে আমাদের পুরুষদের ক্লান্তি নেই।

মাধব। আহা, এ দেশের আধ্যাত্মিক বিবাহের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আর কখনো শুনি নি।

গুরু। কী গো বিপিন, প্রস্তুত তো? যেমন বলেছিলুম, কাল তো সারারাত জপ করেছিলে— সোনা মিথ্যে, সোনা মিথ্যে, সব ছাই, সব ছাই?

বিপিন। জপেছি। মোহরটা আরো যেন তারার মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল

মনের মধ্যে। (গুরুর পা জড়িয়ে ধ'রে) প্রভু, আমি পাপিষ্ঠ, এবারকার মতো মাপ করো, আরো কিছুদিন সময় দাও।

গুরু। এই রে! খোলো, খোলো দেখছি। সর্বনাশ হল। দিতে এসে ফিরিয়ে নেওয়া, এ যে গুরুর ধন চুরি করা! (ঝুলি এগিয়ে দিয়ে) ফেল্, ফেল্ বল্‌ছি, এখ্‌খনি ফেল্।

[বিপিন বহু কষ্টে কম্পিত হস্তে রুমাল থেকে মোহর খুলে নিয়ে ঝুলিতে ফেলল

এইবার সবাই মিলে বলো দেখি,—

সোনা ছাই, সোনা ছাই, সোনা ছাই।

নাহি চাই, নাহি চাই, নাহি চাই।

নয়ন মুদিলে পরে কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই।

[সকলের চীৎকারস্বরে আবৃত্তি

এই-যে, মা তারিণী! এস এস, এই নাও আশীর্বাদ। তোমার ভাবনা নেই, তুমি অনেক দূরে এগিয়েছ। তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের সরল ভক্তি, দেখে পুরুষদের শিক্ষা হোক।

[তারিণী পায়ের কাছে এক জোড়া বালা রেখে অনেকক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে রাখল

(গুরু হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে) গুরুভার বটে— বন্ধনটা বেশ একটু চাপ দিয়েছিল মনটাকে। থাকগে, এত দিনে হাতের বেড়ি তোমার খসল। লোহার বেড়ির চেয়ে অনেক কঠিন— ঠিক কিনা, মা?

তারিণী। খুব ঠিক, বাবা। মনে হচ্ছে, খানিকটা মাংস কেটে নিলে।

গুরু। মাংস নয়, মাংস নয়, মোহপাশ। গ্রন্থি এই সবে আল্‌গা হতে শুরু করল, তার পরে ক্রমে ক্রমে—

তারিণী। না বাবা, আর পারব না। মেয়ের বিয়ের জন্যে শাশুড়ির আমলের গয়নাগুলি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

গুরু। (থলির মধ্যে বালাজোড়া ফেলে দিয়ে) আচ্ছা আচ্ছা, এখনকার মতো এই পর্যন্তই থাক্। তোমরা বলো সবাই— সোনা ছাই ইত্যাদি।

[সকলের আবৃত্তি

আরে বলদেও, ক্যা খবর?

বলদেও। (পায়ের কাছে হাজার টাকার নোট রেখে) খবর আঁখসে দেখ্ লিজিয়ে হুজরৎ।

গুরু। ভালা ভালা, দিল তো খুশ হ্যায়?

বলদেও। পহেলা তো বহুৎ ঘবড়া গিয়া থা। রাত ভর মেরে জীবাত্মানেসে হাজারো দফে বাতায়া লিয়া কি, কুছ্ নেই, কুছ্ নেই, ইয়ে তো শ্রেফ কাগজ হ্যায়, হাওয়াসে চলা জাতা, আগ্‌সে জল্ জাতা, পানীমেসে গল্ জাতা, ইস্‌কো কিম্মৎ কৌড়িসে ভি কমতি হ্যায়। লিকেন আত্মারাম সারা বখৎ ঘড়বড় করতে থে। মেরে ঐসি বুদ্ধি লগি যে ইয়ে কাগজ তো গুরুজিকে পাঁও পর ডারনেকে লায়েক একদম নেই হ্যায়— ইস্‌সে দো এক রূপেয়া ভি অচ্ছি হ্যায়। পিছে ফজিরমে দো লোটা ভর ভাঙ ঘব পী লিয়া, তব সব দুরস্ত হো গয়া। মেরে দিল হাল্কা হো গয়া ইয়ে কাগজকা মাফিক।

গুরু। জীতা রহো বাবা, পরমাত্মা তুঝকো ভালা করে। বলো সবাই—

নোটগুলো সব ঝুটো, সব ঝুটো, সব ঝুটো—
ওরা সব খড়কুটো, খড়কুটো, খড়কুটো—
ছাই হয়ে উড়ে যাবে মুঠো মুঠো, মুঠো মুঠো, মুঠো মুঠো।

[সকলের আবৃত্তি

গুরু। আজ ফকিরকে দেখছি নে যে বড়ো।

বলদেও। এক ঔরৎ ফকিরচাঁদজিকো আপনি সাথ লেকে আয়ি হ্যায়। নয়া আদমি, হমারা মালুম দিয়া কি ভিতর আকে চিল্লায়েগি— ইস্‌বাস্তে দোনোকো বাহার খাড়া রখ্‌খা হ্যায়। হুকুম মিল্‌নেসে লে আয়গা।

গুরু। কী সর্বনাশ! ঔরৎ! আরে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, এখ্‌খনি নিয়ে আয়। এইখানে একটা ভালো আসন পেতে দে, মেয়েটা হাতছাড়া না হয়!

ফকিরের সঙ্গে পুষ্পর প্রবেশ

গুরু। এস এস, মা, এস। মুখ দেখেই বুঝছি, দৈববাণীর বাহন হয়ে এসেছ।

পুষ্প। ভুল বুঝছেন। আমি ছাই ফেলবার ভাঙা কুলো হয়েই এসেছি। এই আমার সঙ্গে যাকে দেখছেন, এত বড়ো বিশুদ্ধ ছাইয়ের গাদা কোম্পানির মুল্লুকে আর পাবেন না। কোনোদিন ওঁর মধ্যে পৈত্রিক সোনার আভাস হয়তো কিছু ছিল— গুরুর আশীর্বাদে চিহ্নমাত্রই নেই।

গুরু। এসব কথার অর্থ কী।

পুষ্প। অর্থ এই যে, এঁর বাপ এঁকে ত্যাগ করেছেন, ইনি ত্যাগ করতে যাচ্ছেন এঁর স্ত্রীকে। এক পয়সার সম্বল এঁর নেই। শুনেছি, আপনার এখানে সকলরকম আবর্জনারই স্থান আছে, তাই রইলেন ইনি আপনার শ্রীপাদপদ্মে।

ফকির। অ্যাঁ, এসব কথা কী বলছ, পুষ্পদি। ঐ তো, সোনার হারগাছা নিয়ে আসা গেল— গুরুচরণে রাখবে না ?

পুষ্প। রাখব বৈকি। (গুরুর হাতে দিয়ে) তৃপ্ত হলেন তো ?

গুরু। (হারখানা হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ ক'রে) আমার অতি যৎসামান্যেই তৃপ্তি। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং।

ফকির। ভুল করবেন না প্রভু, ওটা আমারই দান।

পুষ্প। ভুল ভাঙানো জরুরি দরকার, নইলে আসন্ন বিপদ। ওর বাবা বিশ্বেশ্বরবাবু পুলিসে খবর দিয়েছেন, তাঁর হার চুরি গেছে। থানাতল্লাসি করতে এখনি আসছে মথ্‌লুগঞ্জের বড়ো দারোগা দবিরুদ্দিন সাহেব।

গুরু। (দাঁড়িয়ে উঠে) কী সর্বনাশ !

পুষ্প। কোনো ভয় নেই, এখ্‌খনি সোনাগুলোকে ভস্ম করে ফেলুন, পুলিসের উপর সেটা প্রকাণ্ড একটা কানমলা হবে।

গুরু। (কাতরস্বরে) বলদেও !

বলদেও। (লাঠি বাগিয়ে) কুছ পরোয়া নেই, ভগবান। আপ তো পরমাত্মা হো, আপকো হুকুমসে হম লড়াই করেঙ্গে।

মথুর। গুরুজি, ওর ভরসায় থাকবেন না। ওর ভাঙের নেশা এখনো ভাঙে নি। লালপাগড়ি দেখলেই যাবে ছুটে। আপাতত আপনি দৌড় দিন। কী জানি, এই নোটখানা পরমাত্মার ভরসায় ওর কোন্ মনিবের বাক্স ভেঙে নিয়ে এসেছে !

গুরু। অ্যাঁ, বল কি মথুর। পালাব কোথায়। ওরা যে আমার বাসার ঠিকানা জানে। এখন এই ঝুলিটা তোমরা কে রাখবে।

সকলে। কেউ না, কেউ না।

তারিণী। আমার বালা জোড়া ফিরিয়ে দাও।

গুরু। এখ্‌খনি, এখ্‌খনি। আর বলদেও, তোমার নোটখানা তুমি নাও, বাবা।

বলদেও। অব্‌ভি তো নেই সকেঙ্গে। পুলিস চলা আনেসে পিছে লেউঙ্গা।

পুষ্প। আচ্ছা, আমারই হাতে ঝুলিটা দিন। পুলিসের কর্তার সঙ্গে পরিচয় আছে। যার যার জিনিস সবাইকে ফিরিয়ে দেব।

মথুর। ওরে বাস্ রে, প্যাাই রে প্যাাই। কারও রক্ষা নেই আজ।

গুরু। প্যাাই ! সর্বনাশ ! (ঊর্ধ্বশ্বাসে) চললুম আমি। মোটরটা আছে ?

একজন। আছে।

ফকির। (পায়ে ধ'রে) প্রভো, আমি কিন্তু ছাড়ছি নে তোমার সঙ্গ।

গুরু। দূর দূর দূর। ছাড়্, ছাড়্ বলছি। লক্ষীছাড়া! হতভাগা!

ফকির। তা, আমার কী দশা হবে! আমার কোথায় গতি!

গুরু। তোমার গতি গো-ভাগাড়ে।

[দ্রুত প্রস্থান

বিপিন। মা গো, ঐ ঝুলির মধ্যে আমার আছে মোহরটা।

নিতাই। আর, আমার আছে বাজুবন্দ।

পুষ্প। এই নাও তোমরা।

সকলে। তুমিই রক্ষা করলে মা, ধড়ে প্রাণ এল।

বলদেও। মাইজি, উয়ো নোট হমকো দে দীজিয়ে। আফিস্‌কে বখৎমে থোড়ি দের হ্যায়।

পুষ্প। এই নাও, ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবে তো?

বলদেও। জরুর। পরমাত্মাজি তো ফেরার হো গয়া, দুস্‌রা লেনেওয়ালা কোই হ্যায় নেই সওয়ায় মনিব ঔর ডাকু। মালুম থা কি নোট ভস্‌ম হো জায়গা, উস্‌কা পত্তা নহি মিলেগা, মেরা পুণ্য ঔর পুলিসকী ডাণ্ডা ফরক্ রহেগা। অভি দেখ্‌তা হুঁ কি হিসাবকি থোড়ি গলতি থী। হর হর, বোম্ বোম্।

[প্রস্থান

পুষ্প। ফকিরদা, মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কী। গুরুর পদধূলি তো আঠারো আনা মিলেছে। এখন ঘরে চলো।

ফকির। যাব না।

পুষ্প। কোথায় যাবে।

ফকির। রাস্তায়।

পুষ্প। আচ্ছা বেশ, ছান্দোগ্যটা তো নিয়ে আসতে হবে!

ফকির। সে আমার সঙ্গে আছে।

পুষ্প। কিন্তু, তোমার গুরু?

ফকির। রইলেন আমার অন্তরে।

পুষ্প। আর, ডিমের খোলাটা?

ফকির। সে ঝুলছে গামছায় বাঁধা বুকের কাছে।

[প্রস্থান

পুষ্প। (পিছন থেকে) সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।

হৈমর প্রবেশ

পুষ্প। বিশ্বাস করতে পারিস নে বুঝি? এই নে তোর হার।

হৈম। আর, অঙ্গুটি?

পুষ্প। এখনকার মতো চার পা তুলে সে বেড়া ডিঙিয়েছে।

হৈম। তার পর?

পুষ্প। লম্বা দড়ি আছে।

হৈম। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

পুষ্প। তুই হাউমাউ করিস নে তো। চতুষ্পদ একটু চরে বেড়াক-না!

হৈম। উনি ছান্দোগ্য নিয়ে যখন বেরলেন তখনি বুঝলুম, ফিরবেন না। মণ্ডুক মানে ব্যাঙ বুঝি, ভাই?

পুষ্প। হাঁ।

হৈম। উনি আজকাল বলতে আরম্ভ করেছেন, মানুষের আত্মা হচ্ছে ব্যাঙ। সেই পরম ব্যাঙ যখন অন্তরে কুড়ুর কুড়ুর করে ডাকে তখনি বোঝা যায়, সে পরমানন্দে আছে।

পুষ্প। তাই হোক-না, ওর আত্মা দেশে বিদেশে ডেকে বেড়াক, তোর আত্মা-ব্যাঙ এখন কিছুদিনের মতো ঘুমিয়ে নিক।

হৈম। মনটা যে হু হু করবে, তার চেয়ে ব্যাঙের ডাক যে ভালো।

পুষ্প। ভয় নেই, আনব তোর মাণ্ডূক্যকে ফিরিয়ে।

তৃতীয় দৃশ্য

ষষ্ঠীচরণ। পুষ্প

ষষ্ঠী। মা, শরণ নিলুম তোমার।

পুষ্প। খবর নিয়েছি পাড়ায়, তোমার নাতি মাখন পলাতক সাত বছর থেকে—সংসারের দুনলা বন্দুক লেগেছে তার বুকে, দুঃখ এখনো ভুলতে পারে নি। একটা বিয়ে করলে পুরুষের পা পড়ে না মাটিতে, তোলা থাকে স্ত্রীর মাথার উপরে; আর, দুটো বিয়ে করলেই দুজোড়া মল বাজতে থাকে ওদের পিঠে, শিরদাঁড়া যায় বেঁকে।

ষষ্ঠী। কী না জান তুমি, মা। নবগ্রাম থেকে আরম্ভ করে মণ্ডলগঞ্জ পর্যন্ত সব

কটা গাঁ যে তুমি জিতে নিয়েছ। বিধাতাপুরুষ নিষ্ঠুর, তাই তোমায় মোলাম করতে হয় তাঁর শাসন।

পুষ্প। না জ্যাঠামশায়, বাড়িয়ে বোলো না। আমি মজা দেখতে বেরিয়েছি— ছুটি পেয়েছি বই পড়ার গারদ থেকে। দেখতে এলুম কেমন ক'রে নিজের পায়ে বেড়ি আর নিজের গলায় ফাঁস পরাতে নিস্‌পিস্ করতে থাকে মানুষের হাত দুটো। এ না হলে ভবের খেলা জমত না। ভগবান বোধ হয় রসিক লোক, হাসতে ভালোবাসেন।

ষষ্ঠী। না মা, সবই অদৃষ্ট। হাতে হাতে দেখো-না! বড়ো বৌয়ের ছেলেপুলের দেখা নেই। ভাবলেম, পিতৃপুরুষ পিণ্ডি না পেয়ে শুকিয়ে মরবেন বৈতরণীতীরে। ধ'রে বেঁধে দিলেম মাখনের দ্বিতীয় বিয়ে, আর সবুর সইল না, দেখতে দেখতে পরে পরে দুই পক্ষেরই কল্যাণে চারটি মেয়ে তিনটি ছেলে দেখা দিল আমার ঘরে।

পুষ্প। এবারে পিতৃপুরুষের অজীর্ণ রোগের আশঙ্কা দেখছি।

ষষ্ঠী। মা, তোমার সব ভালো, কেবল একটা বড়ো খট্‌কা লাগে— মনে হয়, তুমি দেবতা ব্রাহ্মণ মানই না।

পুষ্প। কথাটা সত্যি।

ষষ্ঠী। কেন মা, ঐ খুঁৎটুকু কেন থেকে যায়।

পুষ্প। সংসারে দেবতাব্রাহ্মণের অবিচারের বিরুদ্ধেই যে লড়াই করতে হয়, ওদের মানলে জোর পেতুম না। সে কথা পরে হবে, আমি মাখনের খোঁজেই আছি।

ষষ্ঠী। জান তো মা, ও কিরকম হো হো করে বেড়াত— কেবল খেলাধুলো, কেবল ঠাট্টাতামাসা। ভয় হত, কোথায় কী করে বসে! তাই তো ওর গলায় একটা নোঙরের পর আর-একটা নোঙর ঝুলিয়ে দিলুম।

পুষ্প। নোঙর বেড়েই চলল, ভারে নৌকো তলিয়ে যাবার জো। আমি তোমাদের পাড়ায় এসেছি হৈমির খবর নেওয়ার জন্যে। শুনলুম, সে তোমার এখানেই আছে।

ষষ্ঠী। হাঁ মা, এতদিন আমি ছিলুম নামেই মামা। তার বিয়ের পর থেকে এই তাকে দেখলুম। বুক জুড়িয়ে গেল তার মধুর স্বভাবে। তারও স্বামী পালিয়েছে। হল কি বলো তো! কন্‌গ্রেসওয়ালারা এর কিছু করে উঠতে পারলে না?

পুষ্প। মহাত্মাজিকে বললে এখনি তিনি মেয়েদের লাগিয়ে দেবেন অসহযোগ আন্দোলনে। দেশে হাতাবেড়ির আওয়াজ একেবারে হবে বন্ধ। গলির মোড়ে খুদু ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা ফুলুরি খেয়ে বাবুদের আপিসে ছুটতে হবে— দুদিন বাদেই সিক্ লীভের দরখাস্ত।

ষষ্ঠী। ও সর্বনাশ!

পুষ্প। ভয় নেই, মেয়েদের হয়ে আমি মহাত্মাজিকে দরবার জানাব না। বরঞ্চ রবি ঠাকুরকে ধরব, যদি তিনি একটা প্রহসন লিখে দেন।

ষষ্ঠী। কিন্তু, রবি ঠাকুর কি আজকাল লিখতে পারে। আমার শ্যালার কাছে—

পুষ্প। আর বলতে হবে না। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু ভাবনা নেই, লেখন্দাজ ঢের জুটে গেছে। দ্বাদশ আদিত্য বললেই হয়।

ষষ্ঠী। বরঞ্চ লিখতেই যদি হয়, আমি তো মনে করি, আজকাল মেয়েরা যেরকম—

পুষ্প। অসহ্য, অসহ্য। আমা শেমিজ পরার পর থেকে ওদের লজ্জা শরম সব গেছে।

ষষ্ঠী। সেদিন কলকাতায় গিয়েছিলুম ; দেখি, মেয়েরা ট্র্যামে বাসে এমনি ভিড় করেছে—

পুষ্প। যে পুরুষ বেচারারা খালি গাড়ি পেলেও নড়তে চায় না। ও কথা যাক্‌গে— মাখনের জন্যে ভেবো না।

ষষ্ঠী। সেই ভালো, তোমার উপরেই ভার রইল।

[ষষ্ঠীর প্রস্থান

হৈমর প্রবেশ

হৈম। শুনলুম তুমি এসেছ, তাই তাড়াতাড়ি এলুম।

পুষ্প। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, তাই গান্ধারী চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ সাজলেন। তোমারও সেই দশা। স্বামী এল বেরিয়ে রাস্তায়, স্ত্রী এল বেরিয়ে বাবার বাড়িতে।

হৈম। মন টেঁকে না ভাই, কী করি! তুমি বলেছিলে, হারাধন ফিরিয়ে আনবে।

পুষ্প। একটু সবুর করো— ছিপ ফেলতে হয় সাবধানে ; একটা ধরতে যাই, দুটো এসে পড়ে টোপ গিলতে।

হৈম। আমার তো দুটোতে দরকার নেই।

পুষ্প। যেরকম দিন কাল পড়েছে, দুটো একটা বাড়তি হাতে রাখা ভালো। কে জানে কোন্‌টা কখন ফস্‌কে যায়।

হৈম। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দেখলুম কাগজে তোমার নাম দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

পুষ্প। হাঁ, সেটা আমারই কীর্তি।

হৈম। তাতে লিখেছে, প্রাইভেট সিনেমায় সেতুবন্ধ নাটকের জন্যে লোক চাই, হনুমানের পার্ট্ অভিনয় করবে। তোমার আবার সিনেমা কোথায়।

পুষ্প। এই তো চার দিকেই চলচ্ছবির নাট্যশালা, তোমাদের সবাইকে নিয়েই।

হৈম। তা যেন বুঝলুম, এর মধ্যে হনুমানের অভাব ঘটল কবে থেকে।

পুষ্প। দল পুরু আছে ঘরে ঘরে। একটা পাগলা পালিয়েছে লেজ তুলে, ডাক দিচ্ছি তাকে।

হৈম। সাড়া মিলেছে ?

পুষ্প। মিলেছে।

হৈম। তার পরে ?

পুষ্প। রহস্য এখন ভেদ করব না।

হৈম। যা খুশি কোরো, আমার প্রাণীটিকে বেশি দিন ছাড়া রেখো না। ঐ কে আসছে ভাই, দাড়িগোঁফঝোলা চেহারা— ওকে তাড়িয়ে দিতে বলে দিই।

পুষ্প। না না, তুমি বরঞ্চ যাও, আমি ওর সঙ্গে কাজ সেরে নিই।

[হৈমর প্রস্থান

সেই লোকের প্রবেশ

পুষ্প। তুমি কে ?

সেই লোক। সেটা প্রকাশের যোগ্য নয় গোড়া থেকেই, জন্মকাল থেকেই। আমি বিধাতার কুকীর্তি, হাতের কাজের যে নমুনা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর সুনাম হয় নি।

পুষ্প। মন্দ তো লাগছে না !

সেই লোক। অর্থাৎ মজা লাগছে। ঐ গুণেই বেঁচে গেছি। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলেই লোকের মজা লাগে। লোক হাসিয়েছি বিস্তর।

পুষ্প। কিন্তু, সব জায়গায় মজা লাগে নি।

সেই লোক। খবর পেয়েছ দেখছি। তা হলে আর লুকিয়ে কী হবে। নাম আমার শ্রীমাখনচন্দ্র। বুঝতেই পারছ, যাত্রার দলের সরকারি গোঁফদাড়ি পরে এসেছি কেন। এ পাড়ায় মুখ দেখাবার সাহস নেই, পিঠ দেখানোই অভ্যেস হয়ে গেছে।

পুষ্প। এলে যে বড়ো ?

মাখন। চলেছিলুম নাজিরপুরে ইলিষ মাছ ধরার দলে। ইস্টেশনে দেখি বিজ্ঞাপন,

হনুমানের দরকার। রইল পড়ে জেলেগিরি। জেলেরা ছাড়তে চায় না, আমাকে ভালোবাসে। আমি বললুম, ভাই, এদের বিজ্ঞাপনের পয়সা বেবাক লোকসান হবে আমি যদি না যাই— আর দ্বিতীয় মানুষ নেই যার এত বড়ো যোগ্যতা। এ তো আর ত্রেতাযুগ নয়।

পুষ্প। খাওয়াপরার কিছু টানাটানি পড়েছে বুঝি?

মাখন। নিতান্ত অসহ্য হয় নি। কেবল যখন ধনেশাক দিয়ে ভিমওয়ালা কই মাছের ঝোলের গন্ধস্মৃতি অন্তরাত্মার মধ্যে পাক খেয়ে ওঠে, তখন আমার শ্রীমতী বাঁয়া আর শ্রীমতী তবলার তেরেকেটে মেরেকেটে ভিরকুটি মিরকুটির তালে তালে দূর থেকে মন কেমন ধড়্ ফড়্ করতে থাকে।

পুষ্প। তাই বুঝি ধরা দিতে এসেছ?

মাখন। না না, মনটা এখনো তত দূর পর্যন্ত শক্ত হয় নি। শেষে বিজ্ঞাপনদাতার খবর নিতে এসে যখন দেখলুম, ঠিকানাটা এই আঙিনারই সীমানার মধ্যে তখন প্রথমটা ভাবলুম বিজ্ঞাপনের মান রক্ষা করব, দেব এক লম্ফ। কিন্তু, রইলুম কেবল মজার লোভে। পণ করলুম শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। দিদি আমার, কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কোনো সূত্রে বুঝি আমাকে চিনতে, নইলে অমন বিজ্ঞাপন তোমার মাথায় আসত না।

পুষ্প। তোমার আঁচিলওয়ালা নাকের খ্যাতি পাড়ায় লোকের মুখে মুখে। তোমার বিজ্ঞাপন তোমার নাকের উপর। বিশ্বকর্মার হাতে এ নাক দুবার তৈরি হতে পারে না— ছাঁচ তিনি মনের ক্ষোভে ভেঙে ফেলেছেন।

মাখন। এই নাকের জোরে একবার বেঁচে গিয়েছি, দিদি। মটুকগঞ্জে চুরি হল, সন্দেহ করে আমাকে ধরলে চৌকিদার। দারোগা বুদ্ধিমান; সে বললে, এ লোকটা চুরি করবে কোন্ সাহসে— নাক লুকোবে কোথায়। বুঝেছ দিদি? আমার এ নাকটাতে ভাঁড়ামির ব্যাবসা চলে, চোরের ব্যাবসা একেবারে চলে না।

পুষ্প। কিন্তু, তোমার হাতে যে কলার ছড়াটা দেখছি ওটা তো আমার চেনা, কোনো ফিকিরে তোমার বুড়ি-অন্নপূর্ণার ঘর থেকে সরিয়ে নিয়েছ।

মাখন। অনেক দিনের পেটের জ্বালায় ওদের ভাঁড়ারে চুরি পূর্বে থেকেই অভ্যেস আছে।

পুষ্প। এত বড়ো কাঁদি নিয়ে করবে কী। হনুমানের পালার তালিম দেবে?

মাখন। সে তো ছেলেবেলা থেকেই দিচ্ছি। পথের মধ্যে দেখলুম এক ব্রহ্মচারী বসে আছেন পাকুড়তলায়। আমার বদ অভ্যাস, হাসাতে চেষ্টা করলুম— ঠোঁটের

এক কোণও নড়াতে পারলুম না, মন্তর আউড়েই চলল। ভয় হল, বুঝি ব্রহ্মদত্যি হবে। কিন্তু, মুখ দেখে বুঝলুম উপোষ করতে হতভাগা তিথিবিচার করছে না। ওর পাঁজিতে তিনটে চারটে একাদশী একসঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বাবাজি, খাবে কিছু? কপালে চোখ তুলে বললে, গুরুর কৃপা যদি হয়। মাঝে মাঝে দেখি মাথার নীচে পুঁথি রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, ডাকের শব্দে ও গাছের পাখি একটাও বাকি নেই। নাকের সামনে রেখে আসব কলার ছড়াটা।

পুষ্প। লোকটার পরিচয় নিতে হবে তো।

মাখন। নিশ্চয় নিশ্চয়। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে, আমার চেয়ে মজা।

পুষ্প। ভালো হল। হনুমানের সঙ্গে অঙ্গদ চাই। ওকে তোমারই হাতে তৈরি করে নিতে হবে। শেওড়াফুলির হাট উজাড় করে কলার কাঁদি আনিয়ে নেব।

মাখন। শুধু কলার কাঁদির কর্ম নয়।

পুষ্প। তা নয় বটে। যে কারখানায় তুমি নিজে তৈরি সেখানকার দুই-চাকা-ওয়ালা যন্ত্রের তলায় ওকে ফেলা চাই।

মাখন। দয়াময়ী, জীবের প্রতি এত হিংসা ভালো নয়।

পুষ্প। ভয় নেই, আমি আছি, হঠাৎ অপঘাত ঘটতে দেব না। আপাতত কলার ছড়াটা ওকে দিয়ে এস।

মাখন। আমাদের দেশে মেয়েরা থাকতে সন্ন্যাসী না খেয়ে মরে না। কিন্তু, ও লোকটা ভুল করেছে— বৈরাগির ব্যাবসা ওর নয়, ওর চেহারায় জলুষ নেই। নিতান্ত নিজের স্ত্রী ছাড়া ওর খবরদারি করবার মানুষ মিলবে না।

পুষ্প। তোমার অমন চেহারা নিয়ে তুমি ছ বছর চালালে কী করে।

মাখন। ময়রার দোকানে মাছি তাড়িয়েছি, পেয়েছি বাসি লুচি তেলে-ভাজা, যার খদ্দের জোটে না। যাত্রার দলে ভিস্তি সেজেছি, জল খেতে দিয়েছেন অধিকারী মুড়কি আর পচা কলা। সুবিধে পেলেই মা মাসি পাতিয়ে মেয়েদের পাঁচালি শুনিয়ে দিয়েছি যখন পুরুষরা কাজে চলে গেছে—

ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এস বন—

ওরে রে লক্ষ্মণ এ কী কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।

মা-জননীদের দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বয়েছে— দু-চার দিনের সঞ্চয় নিয়ে এসেছি। আমাকে ভালোবাসে সবাই। জ্যাঠাইমা আমার যদি দুটো বিয়ে না দিত তা হলে চাই কি আমার নিজের স্ত্রীও হয়তো আমাকে ভালোবাসতে পারত। বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমারও কেমন অল্পেতেই মন গলে যায়। এই দেখো-না,

এখন তোমাকে মা-অঞ্জনা বলতে ইচ্ছে করছে।

পুষ্প। সেই ভালো, আমার নাতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, দিদির পদটা বড্ড বেশি ভারী হয়ে উঠল। আচ্ছা, জিগেস করি, তোমার মনটা কী বলছে।

মাখন। তবে মা, কথাটা খুলে বলি। অনেক দিন পরে এ পাড়ায় কাছাকাছি আসতেই প্রথম দিনেই আমার বিপদ বাধল ফোড়নের গন্ধে। সেদিন আমাদের রান্নাঘরে পাঁঠা চড়েছিল— সত্যি বলি, বড়ো বোয়ের মুখ খারাপ, কিন্তু রান্নায় ওর হাত ভালো। সেদিন বাতাস শুঁকে শুঁকে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছি সারাদিন। তার পর থেকে অর্ধভোজনের টানে এ পাড়া ছাড়া আমার অসাধ্য হল। বারবার মনে পড়ছে, কত দিনের কত গালমন্দ আর কত কাঁটাচচ্চড়ি। একদিন দিব্যি গেলেছিলুম, এ বাড়িতে কোনোদিন আর ঢুকব না। প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি কাল।

পুষ্প। কিসে ভাঙালো।

মাখন। ডালের বড়ার গন্ধে। দিনটা ছট্‌ফট্‌ করে কাটালুম। রাত্তিরে যখন সব নিশুতি, বাইরে থেকে ছিট্‌কিনি খুলে ঢুকলুম ঘরে। খুট করে শব্দ হতেই আমার ছোটোটি এক হাতে পিদিম এক হাতে লাঠি নিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। মুখে মেখে এসেছিলুম কালি, আমি হাঁ করে দাঁত খিঁচিয়ে হাঁউমাউখাঁউ করে উঠতেই পতন ও মূর্ছা। বড়ো বৌ একবার উঁকি মেরেই দিল দৌড়। আমি বসে বসে পেট ভরে আহার করে ধামাসুদ্ধ বড়া নিয়ে এলুম বেরিয়ে।

পুষ্প। কিছু প্রসাদ রেখে এলে না পতিব্রতাদের জন্যে ?

মাখন। অনেকখানি পায়ের ধুলো রেখে এসেছি, আর বড়াগুলো নিয়ে এসেছি দলবলকে খাইয়ে দিতে।

পুষ্প। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি বলবে ?

মাখন। দেখো মা, বিপদে না পড়লে আমি কখনো মিথ্যে কথা কই নে।

পুষ্প। লোকে বলে, তুমি কাশীতে গিয়ে আরও একটা বিয়ে করেছ।

মাখন। তা করেছি।

পুষ্প। পিঠ সুড়্‌সুড়্‌ করছিল ?

মাখন। না মা, দুটো বিয়ে কাকে বলে হাড়ে হাড়ে জেনেছি। ভারি ইচ্ছা হল, একটা বিয়ে কী রকম মরবার আগে জেনে নেব।

পুষ্প। জেনে নিয়েছ সেটা ?

মাখন। বেশি দিন নয়। ভাগ্যবতী কিনা, পুণ্যফলে মারা গেল সকাল-সকাল, স্বামী বর্তমানেই। ঘোমটা সবে খুলেছে মাত্র। কিন্তু ভালো ক'রে মুখ ফোটবার

তখনো সময় হয় নি। বেঁচে থাকলে কপালে কী ছিল বলা যায় না।

পুষ্প। কার কপালে ?

মাখন। শক্ত কথা।

চতুর্থ দৃশ্য

নিদ্রামগ্ন ফকির। মুখের কাছে একছড়া কলা। জেগে উঠে কলার ছড়া তুলে নেড়েচেড়ে দেখল

ফকির। আহা, গুরুদেবের কৃপা। (ছড়াটা মাথায় ঠেকিয়ে চোখ বুজে) শিবোহং শিবোহং শিবোহং। (একটা একটা ক'রে গোটা দশেক খেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে) আঃ!

মাখনের প্রবেশ

মাখন। কী দাদা, ভালো তো! আমার নাম শ্রীমাখনানন্দ।

ফকির। গুরুর চরণ ভরসা।

মাখন। গুরুই খুঁজে মরছি। সদ্‌গুরু মেলে না তো। দয়া হবে কি। নেবে কি অভাজনকে।

ফকির। ভয় নেই, সময় হোক আগে।

মাখন। (কান্নার সুরে) সময় আমার হবে না প্রভু, হবে না। দিন যে গেল! বড়ো পাপী আমি। আমার কী গতি হবে।

ফকির। গুরুপদে মন স্থির করো— শিবোহং।

মাখন। এই পদেই ঠেকল আমার তরী; যম তা হলে ভয়ে কাছে ঘেঁষবে না।

ফকির। তোমার নিষ্ঠা দেখে বড়ো সন্তুষ্ট হলুম।

মাখন। শুধু নিষ্ঠা নয় গুরু, এনেছি কিছু তালের বড়া। তালগাছটা সুদ্ধ উদ্ধার পাক।

ফকির। (ব্যগ্রভাবে আহার) আহা, সুস্বাদ বটে। ভক্তির দান কিনা।

মাখন। সার্থক হল আমার নিবেদন। বাড়ির এঁরারা খবর পেলে কী খুশিই হবেন! যাই, ওঁদের সংবাদ পাঠিয়ে দিইগে, ওঁরা আরও কিছু হাতে নিয়ে আসবেন।— প্রভু, গৃহাশ্রমে আর কি ফিরবেন না।

ফকির। আর কেন। গুরু বলেন, বৈরাগ্যং এবং ভয়ং।

মাখন। গৃহী আমি, ডাইনে বাঁয়ে মায়া-মাকড়সানি জড়িয়েছে আপাদমস্তক। ধনদৌলতের সোনার কেল্লাটা কত বড়ো ফাঁকি সেটা খুব করেই বুঝে নিয়েছি। বুঝেছি সেটা নিছক স্বপ্ন। ভগবান আমাকে অকিঞ্চন করে পথে পথে ঘোরাবেন এই তো আমার দিনরাত্রির সাধনা, কিন্তু আর তো পারি নে, একটা উপায় বাৎলিয়ে দাও।

ফকির। আছে উপায়।

মাখন। (পা জড়িয়ে) বলে দাও, বলে দাও, বঞ্চিত কোরো না।

ফকির। দিন-ভোর উপোষ ক'রে থেকে—

মাখন। উপোষ! সর্বনাশ! সেটা অভ্যেস নেই একেবারেই। আমার দুষ্ট গ্রহ দিনে চারবার করে আহার জুটিয়ে দিয়ে অন্তরটা একেবারে নিরেট করে দিয়েছেন। আর কোনো রাস্তা যদি—

ফকির। আচ্ছা, দুখানা রুটি—

মাখন। আরও একটু দয়া করেন যদি, দু'বাটি ক্ষীর!

ফকির। ভালো, তাই হবে।

মাখন। আহা, কী করুণা প্রভুর! তেমন করে পা যদি চেপে থাকতে পারি তা হলে পাঁঠাটাও—

ফকির। না না, ওটা থাক্।

মাখন। আচ্ছা, তবে থাক্, একটা দিন বই তো নয়। তা, কী করতে হবে বলুন। দেখুন, আমি মুখ্‌খু মানুষ, অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা মন্তর মুখ দিয়ে বেরবে না, কী বলতে কী বলব, শেষকালে অপরাধ হবে।

ফকির। ভয় নেই, তোমার জন্যে সহজ করেই দিচ্ছি। গুরুর মূর্তি স্মরণ করে সারারাত জপ করবে, সোনা তোমাকেই দিলুম, তোমাকেই দিলুম, যতক্ষণ না ধ্যানের মধ্যে দেখবে, সোনা আর নেই— কোথাও নেই।

মাখন। হবে হবে প্রভু, এই অধমেরও হবে। বলব, সোনা নেই, সোনা নেই; এ হাতে নেই, ও হাতে নেই; ট্যাঁকে নেই, থলিতে নেই; ব্যাঙ্কে নেই, বাক্সোয় নেই। ঠিক সুরে বাজবে মন্ত্র। আচ্ছা, গুরুজি, ওর সঙ্গে একটা অনুস্বার জুড়ে দিলে হয় না? নইলে নিতান্ত বাংলার মতো শোনাচ্ছে। অনুস্বার দিলে জোর পাওয়া যায়— সোনাং নেই, সোনাং নেই, কিছুং নেই, কিছুং নেই।

ফকির। মন্দ শোনাচ্ছে না।

মাখন। আচ্ছা, তবে অনুমতি হোক, পোলাওটা ঠাণ্ডা হয়ে এল!

[প্রস্থান

ফকিরের গান

শোন্ রে শোন্ অবোধ মন,—
শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর্ অন্বেষণ
ওরে ও ভোলা মন!

ষষ্ঠীচরণ ছুটে এসে

ষষ্ঠী। দেখি দেখি, এই তো দাদু আমার— আমার মাখন। (মুখে হাত বুলিয়ে) অমন চাঁদ মুখখানা দাড়ি গোঁফ দিয়ে একেবারে চাপা দিয়েছে। একে ভগবান আমার চোখে পরিয়েছে বুড়ো বয়সের ঠুলি, ভালো দেখতেই পাই নে, তার উপর এ কী কাণ্ড করেছিস মাখন!

ফকির। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

ষষ্ঠী। করেছিস কী দাদু, মন্তর প'ড়ে প'ড়ে অমন মিষ্টি গলায় কড়া পাড়িয়ে দিয়েছিস! সুর মোটা হয়ে গেছে!

ফকির। শিবোহং শিবোহং শিবোহং।

বামনদাস বাবুর প্রবেশ

বামনদাস। আরে আরে, আমাদের মাখন নাকি? খাঁটি তো? ও ষষ্ঠীদা, মানতেই হবে যোগবল— নাকের উপর থেকে আঁচিলটা একেবারে সাফ দিয়েছে উড়িয়ে। ভট্চায, দেখে যাও হে, নাকের উপর কী মন্তর লেগেছিল গো! একটু চিহ্ন রেখে যায় নি। ষষ্ঠীদা, ঐ নাক নিয়ে কত ঝাড়ফুঁক করেছিলে, একটু টলাতে পার নি। তপিস্তের মাহাত্মি বটে—

ষষ্ঠী। না ভাই, মাহাত্মি ভালো লাগছে না। তোরা যাকে বলতিস গণ্ডারী নাক, সে ছিল ভালো।

নিশিঠাকুর। ওর মুখমণ্ডল যে নিজেকে বেকবুল করছে, তার উপরে আবার মুখে কথা নেই। অমন সব বোলচাল, মুনি হয়ে সব ভুলেছে বুঝি!

ভজহরি। দেখি দেখি মাখ্না, মুখটা দেখি। (চিমটি কেটে, চামড়া টেনে) না হে, এ মুখোষ নয়, ধাঁদা লাগিয়ে দিলে।

নিতাই। কিহু, দেখ্ তো টেনে ওর দাড়িগোঁফ সত্যি কি না।

ফকির। উঃ উঃ!

চণ্ডী। (পিঠে কিল মেরে) কেমন লাগল।

ফকির। উঃ!

চণ্ডী। ঐ তো, সন্ন্যাসীর সুখদুঃখবোধ আছে তো! মাথায় হুঁকোর জল ঢালি তবে, মাথা ঠাণ্ডা হোক।

ষষ্ঠী। আহা, কেন ওকে বিরক্ত করছ ভাই? সাত বছর পরে ফিরে এল, সবাই মিলে আবার ওকে তাড়াবে দেখছি। মাখন, ও ভাই মাখন, আর দুখ্‌খু দিস্‌ নে— একটা কথা ক, নাহয় দুটো গাল দিলিই বা!

ফকির। আপনারা আমাকে মাখন বলে ডাকছেন কেন। পূর্ব-আশ্রমে আমার যে নাম থাক্‌, আমার গুরুদত্ত নাম চিদানন্দ স্বামী। [সকলের উচ্চহাস্য

চিনু। ওরে বাবা, ত্রাণকর্তা এলেন আমাদের। ভাখ্‌ মাখ্‌না, ন্যাকামি করিস নে। ভাবছিস, এমনি করে আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবি! সেটি হচ্ছে না; তোর দুই বৌয়ের হাতে দুই কান জিম্মে করে দেব, থাকবি কড়া পাহারায়।

ফকির। গুরো, হায় গুরো!

দুই স্ত্রীর প্রবেশ

১। ঐ যে গো, মুখ চোখ বদলিয়ে এসেছেন আমাদের কলির নারদ।

ফকির। মা, আমি তোমাদের অধম সন্তান, দয়া করো আমাকে।

সকলে। এই এই, করলে কী! প্রাণের ভয়ে মা বলে ফেললে?

১। ও পোড়াকপালে মিন্‌সে, তুই মা বলিস কাকে!

২। চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস, তোর মরণ হয় না!

ফকির। একটু ভালো করে আমাকে দেখে নিন।

১। তোমাকে দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন পড়েছে, তোমার বয়সের কি গাছ পাথর আছে। তোমায় যম ভুলেছে ব'লে কি আমরাও ভুলব।

২। (নাক মুচ্‌ড়িয়ে দিয়ে) সাক্ষীকে বিদায় করেছ নাকের ডগা থেকে। তাই ব'লে আমাদের ভোলাতে পারবে না— তোমার বিট্‌লেমি ঢের জানা আছে। ওমা, ওমা, ঐ দেখ্‌ লো ছুটকি— সেই তালের বড়ার ধামাটা।

১। তাই রাত্তিরে গিয়েছিলেন ভূত সেজে বড়া খেতে!

২। চক্কোত্তিমশায়, এই দেখে নাও— মিন্‌সে রান্নাঘরে ঢুকে এনেছে বড়াসুদ্ধ আমাদের ধামা চুরি ক'রে। [সকলের হাস্য

কানু মণ্ডল। সে কি হয়। যোগবল, ভাঁড়ার থেকে উড়িয়ে এনেছে।

ষষ্ঠী। ওগো বৌদিদিরা, কেন ওকে খোঁটা দিচ্ছ। ঘরের বড়া ঘরের মানুষই যদি নিয়ে এসে থাকে তাকে কি চুরি বলে।

১। ভালোমানুষের মতো যদি নিত তবে দোষ ছিল না— মা গো, সে কী দাঁত-খিঁচুনি। আমার তো দাঁতকপাটি লেগে গেল।

ষষ্ঠী। ভাই মাখন, এটা তো ভালো কর নি— গোপনে আমাকে জানালে না কেন। তালের বড়ার অভাব কী।

ফকির। গুরো!

২। (কলার ছড়ার বাকি অংশ তুলে ধ'রে) এই দেখো তোমরা। ভাঁড়ারে রেখেছিলুম ব্রাহ্মণভোজন করাব ব'লে। সকালে উঠে আর দেখতে পাই নে। দরজাও খোলা নেই, ভয়ে মরি। আমাদের এই মহাপুরুষের কীর্তি। কলা চুরি করে ধর্মকর্ম করেন!

ষষ্ঠীচরণ। (মহাক্রোধে) দেখো, এ আমি কিছুতেই সইব না। এই ডাইনি দুটোকে ঘর থেকে বিদায় করতে হবে, নইলে আমার মাখনকে টেঁকাতে পারব না। দেখছ তো মাখন? কেবল ভালোমানুষি করে দুই বৌকে কী রকম করে বিগ্‌ড়িয়ে দিয়েছ!

ফকির। সর্বনাশ! আপনারা সাংঘাতিক ভুল করছেন। আপনাদের সকলের পায়ে ধরি— আমাকে বাঁচান! হে গুরো, কী করলে তুমি।

ষষ্ঠী। না ভাই, বেকবুল যেয়ো না। ধামাটা তুমি ওদের ঘর থেকে এনেছিলে, কলার ছড়াটাও প্রায় নিকেশ করেছ। সেটাতে তোমার অপরাধ হয় নি— তবে লজ্জা পাচ্ছ কেন।

ফকির। দোহাই ধর্মের, দোহাই আপনাদের— আমি ধামাও আনি নি, কলার কাঁদিও আনি নি।

ষষ্ঠী। পষ্টই দেখা যাচ্ছে খেয়েছ তুমি। কেন এত জিদ করছ।

ফকির। খেয়েছি, কিন্তু—

বামনদাস। আবার কিন্তু কিসের!

ফকির। আমি আনি নি।

[সকলের হাস্য

পাঁচু। তুমি খাও তালের বড়া, দেয় এনে আর-এক মহাত্মা, এও তো মজা কম নয়। তাকে চেন না?

ফকির। আজ্ঞে না।

সিধু। সে চেনে না তোমাকে ?

ফকির। আজ্ঞে না।

নকুল। এ যে আরব্য উপন্যাস।

[সকলের হাস্য

ষষ্ঠী। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন ঘরে চলো।

ফকির। কার ঘরে যাব ?

১। মরি মরি, ঘর চেন না পোড়ারমুখো ! বলি, আমাদের দুটিকে চেন তো ?

ফকির। সত্যি কথা বলি, রাগ করবেন না, চিনি নে।

সকলে। ঐ লোকটার ভণ্ডামি তো সইবে না। জোর করে নিয়ে যাও ওকে ধ'রে, তালা বন্ধ করে রাখো।

ফকির। গুরো !

সকলে মিলে ঠেলাঠেলি। ওঠো, ওঠো বলছি।

সুধীর। বৌ দুটোকে এড়াতে চাও তার মানে বুঝি ; কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ে-গুলিকে ? তোমার চারটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, তাও ভুলেছ না কি।

ফকির। ও সর্বনাশ ! আমাকে মেরে ফেললেও এখান থেকে নড়ব না। (গাছের গুঁড়ি আঁকড়িয়ে ধ'রে) কিছুতেই না।

হরিশ উকিল। জান আমি কে ? পূর্ব-আশ্রমে জানতে। অনেক সাধুকে জেলে পাঠিয়েছি। আমি হরিশ উকিল। জান ? তোমার দুই স্ত্রী !

ফকির। এখানে এসে প্রথম জানলুম।

হরিশ। আর, তোমার চার মেয়ে তিন ছেলে।

ফকির। আপনারা জানেন, আমি কিছুই জানি নে।

হরিশ। এদের ভরণপোষণের ভার তুমি যদি না নাও, তা হলে মকদ্দমা চলবে বলে রাখলুম।

ফকির। বাপ রে ! মকদ্দমা ! পায়ে ধরি, একটু রাস্তা ছাড়ুন।

দুই স্ত্রী। যাবে কোথায়, কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুয়োরে ?

ফকির। গুরো ! (হতবুদ্ধি হয়ে বসে পড়ল)

হৈমবতীর প্রবেশ ও ফকিরকে প্রণাম

ফকির। (লাফিয়ে উঠে) এ কী, এ যে হৈমবতী ! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

১। ওলো, ওর সেই কাশীর বৌ, এখনো মরে নি বুঝি।

মাখনকে নিয়ে পুষ্পর প্রবেশ

মাখন। ধরা দিলেম— বেওজর। লাগাও হাতকড়ি। প্রমাণের দরকার নেই। একেবারে সিধে নাকের দিকে তাকান। আমি মাখনচন্দ্র। এই আমার দড়ি আর এই আমার কল্‌সি। মা অঞ্জনা, কিষ্কিন্ধ্যায় তো ঢোকালে। মাঝে মাঝে খবর নিয়ো। নইলে বিপদে পড়লে আবার লাফ মারব।

পুষ্প। ফকিরদা, তোমার মুক্তি কোথায় সে তো এখন বুঝেছ?

ফকির। খুব বুঝেছি— এ রাস্তা আর ছাড়ছি নে।

পুষ্প। বাছা মাখন, তোমার মস্ত সুবিধে আছে— তোমার ফুর্তি কেউ মারতে পারবে না। এ ছুটিও নয়।

দুই স্ত্রী। ছি ছি, আর একটু হলে তো সর্বনাশ হয়েছিল! (গড় হয়ে প্রণাম ক'রে) বাঁচালে এসে।

উপন্যাস ও গল্প

লিপিকা

লিপিকা

পায়ে চলার পথ

এই তো পায়ে চলার পথ।

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াঘাটের পাশে বটগাছতলায়। তার পরে ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে; তার পরে তিসির খেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্মদিঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁচেছে জানি নে।

এই পথে কত মানুষ কেউ বা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কেউ বা সঙ্গ নিয়েছে, কাউকে বা দূর থেকে দেখা গেল; কারো বা ঘোমটা আছে, কারো বা নেই; কেউ বা জল ভরতে চলেছে, কেউ বা জল নিয়ে ফিরে এল।

২

এখন দিন গিয়েছে, অন্ধকার হয়ে আসে।

একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার; এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।

নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়ালবাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে—সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, "এই যে!" এ পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।

আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম; দেখলুম, এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।

যত কাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটিমাত্র ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত করে এঁকেছে; সেই একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আর-এক সোনার সিংহদ্বারে।

৩

"ওগো পায়ে চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার ধূলিবন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখো না। আমি তোমার ধুলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে কানে বলো।"

পথ নিশীথের কালো পর্দার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে চুপ ক'রে থাকে।

"ওগো পায়ে চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা, এত ইচ্ছা, সে-সব গেল কোথায়।"

বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।

"ওগো পায়ে চলার পথ, তোমার বুকের উপর যে-সমস্ত চরণপাত একদিন পুষ্পবৃষ্টির মতো পড়েছিল আজ তারা কি কোথাও নেই।"

পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব!

মেঘলা দিনে

রোজই থাকে সমস্তদিন কাজ, আর চার দিকে লোকজন। রোজই মনে হয়, সেদিনকার কাজে, সেদিনকার আলাপে সেদিনকার সব কথা দিনের শেষে বুঝি একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়। ভিতরে কোন্ কথাটি যে বাকি রয়ে গেল তা বুঝে নেবার সময় পাওয়া যায় না।

আজ সকালবেলা মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভেরে উঠেছে। আজও সমস্ত দিনের কাজ আছে সামনে, আর লোক আছে চার দিকে। কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, ভিতরে যা-কিছু আছে বাইরে তা সমস্ত শেষ করে দেওয়া যায় না।

মানুষ সমুদ্র পার হল, পর্বত ডিঙিয়ে গেল, পাতালপুরীতে সিঁধ কেটে মণিমানিক চুরি করে আনলে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আর-একজনকে চুকিয়ে দিয়ে ফেলা, এ কিছুতেই পারলে না।

আজ মেঘলা দিনের সকালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে মরছে। ভিতরের মানুষ বলছে, "আমার চিরদিনের সেই আর-একজনটি কোথায়, যে আমার হৃদয়ের শ্রাবণমেঘকে ফতুর ক'রে তার সকল বৃষ্টি কেড়ে নেবে!"

আজ মেঘলা দিনের সকালে শুনতে পাচ্ছি, সেই ভিতরের কথাটা কেবলই বন্ধ দরজার শিকল নাড়ছে। ভাবছি, "কী করি। কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী সুরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে। কে আছে যার চোখের একটি ইশারায় আমার সব ছড়ানো ব্যথা এক মুহূর্তে এক আনন্দে গাঁথা হবে, এক আলোতে জ্বলে উঠবে। আমার কাছে ঠিক সুরটি লাগিয়ে চাইতে পারে যে আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সর্বনেশে ভিখারি রাস্তার কোন্ মোড়ে।"

আমার ভিতরমহলের ব্যথা আজ গেরুয়াবসন পরেছে। পথে বাহির হতে চায়, সকল কাজের বাহিরের পথে, যে পথ একটিমাত্র সরল তারের একতারার মতো, কোন্ মনের মানুষের চলায় চলায় বাজছে।

বাণী

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে, মাটির কাছে ধরা দেবে ব'লে। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

তাদের জন্য অল্প জায়গার জগৎ, অল্প মানুষের। ঐটুকুর মধ্যে আপনার সবটাকে ধরানো চাই— আপনার সব কথা, সব ব্যথা, সব ভাবনা। তাই তাদের মাথায় কাপড়, হাতে কাঁকন, আঙিনায় বেড়া। মেয়েরা হল সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী।

কিন্তু, কোন্ দেবতার কৌতুকহাস্যের মতো অপরিমিত চঞ্চলতা নিয়ে আমাদের পাড়ায় ঐ ছোটো মেয়েটির জন্ম। মা তাকে রেগে বলে "দস্যি", বাপ তাকে হেসে বলে "পাগলি"।

সে পলাতকা ঝরনার জল, শাসনের পাথর ডিঙিয়ে চলে। তার মনটি যেন বেণুবনের উপরডালের পাতা, কেবলই ঝির্ ঝির্ করে কাঁপছে।

২

আজ দেখি, সেই দুরন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে, বাদলশেষের ইন্দ্রধনুটি বললেই হয়। তার বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানাভেজা পাখির মতো।

ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখি নি। মনে হল, নদী যেন চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থমকে সরোবর হয়েছে।

৩

কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রখর; দিগন্তের মুখ বিবর্ণ; গাছের পাতাগুলো শুকনো, হলদে, হতাশ্বাস।

এমন সময় হঠাৎ কালো আলুথালু পাগলা মেঘ আকাশের কোণে কোণে তাঁবু ফেললে। সূর্যাস্তের একটা রক্তরশ্মি খাপের ভিতর থেকে তলোয়ারের মতো বেরিয়ে এল।

অর্ধেক রাত্রে দেখি, দরজাগুলো খড়্‌খড়্‌ শব্দে কাঁপছে। সমস্ত শহরের ঘুমটাকে ঝড়ের হাওয়া ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে।

উঠে দেখি, গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মতো দেখতে। আর, গির্জের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে।

সকালবেলায় জলের ধারা আরও ঘনিয়ে এল, রৌদ্র আর উঠল না।

৪

এই বাদলায় আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দার রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

তার বোন এসে তাকে বললে, "মা ডাকছে।" সে কেবল সবেগে মাথা নাড়ল, তার বেণী উঠল দুলে; কাগজের নৌকো নিয়ে তার ভাই তার হাত ধরে টানলে। সে হাত ছিনিয়ে নিলে। তবু তার ভাই খেলার জন্যে টানাটানি করতে লাগল। তাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।

৫

বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এল। মেয়েটি স্থির দাঁড়িয়ে।

আদিযুগে সৃষ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কণ্ঠে। লক্ষকোটি বছর পার হয়ে সেই স্মরণবিস্মরণের অতীত কথা আজ বাদলার কলস্বরে ঐ মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

কত বড়ো কাল, কত বড়ো জগৎ, পৃথিবীতে কত যুগের কত জীবলীলা! সেই সুদূর, সেই বিরাট, আজ এই দুরন্ত মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির কলশব্দে।

ও তাই বড়ো বড়ো চোখ মেলে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল, যেন অনন্তকালেরই প্রতিমা।

মেঘদূত

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কী বলেছিল।

সে বলেছিল, "সেই মানুষ আমার কাছে এল যে মানুষ আমার দূরের।"

আর, বাঁশি বলেছিল, "ধরলেও যাকে ধরা যায় না তাকে ধরেছি, পেলেও সকল পাওয়াকে যে ছাড়িয়ে যায় তাকে পাওয়া গেল।"

তার পরে রোজ বাঁশি বাজে না কেন।

কেননা, আধখানা কথা ভুলেছি। শুধু মনে রইল, সে কাছে ; কিন্তু সে যে দূরেও তা খেয়াল রইল না। প্রেমের যে আধখানায় মিলন সেইটেই দেখি, যে আধখানায় বিরহ সে চোখে পড়ে না, তাই দূরের চিরতৃপ্তিহীন দেখাটা আর দেখা যায় না ; কাছের পর্দা আড়াল করেছে।

দুই মানুষের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মস্ত চুপকে বাঁশির সুর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না।

সেই আমাদের মাঝের আকাশটি আঁধিতে ঢেকেছে, প্রতি দিনের কাজে কর্মে কথায় ভরে গিয়েছে, প্রতি দিনের ভয়ভাবনা-কৃপণতায়।

২

এক-একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে হাওয়া দেয় ; বিছানার 'পরে জেগে ব'সে বুক ব্যথিয়ে ওঠে ; মনে পড়ে, এই পাশের লোকটিকে তো হারিয়েছি।

এই বিরহ মিটবে কেমন করে, আমার অনন্তের সঙ্গে তার অনন্তের বিরহ।

দিনের শেষে কাজের থেকে ফিরে এসে যার সঙ্গে কথা বলি সে কে। সে তো সংসারের হাজার লোকের মধ্যে একজন ; তাকে তো জানা হয়েছে, চেনা হয়েছে, সে তো ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু, ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র। ওকে আবার নূতন করে খুঁজে পাই কোন্ কূলহারা কামনার ধারে।

ওর সঙ্গে আবার একবার কথা বলি সময়ের কোন্ ফাঁকে, বনমল্লিকার গন্ধে নিবিড় কোন্ কর্মহীন সন্ধ্যার অন্ধকারে।

৩

এমন সময়ে নববর্ষা ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে পূর্বদিগন্তে এসে উপস্থিত। উজ্জয়িনীর কবির কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল, প্রিয়ার কাছে দূত পাঠাই।

আমার গান চলুক উড়ে, পাশে থাকার সুদূর দুর্গম নির্বাসন পার হয়ে যাক।

কিন্তু, তা হলে তাকে যেতে হবে কালের উজান-পথ বেয়ে বাঁশির ব্যথায় ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে, সেই আমাদের যে দিনটি বিশ্বের চিরবর্ষা ও চিরবসন্তের সকল গন্ধে সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেতকীবনের দীর্ঘশ্বাসে আর শালমঞ্জরীর উতলা আত্মনিবেদনে।

নির্জন দিঘির ধারে নারিকেলবনের মর্মরমুখরিত বর্ষার আপন কথাটিকেই আমার কথা করে নিয়ে প্রিয়ার কানে পৌঁছিয়ে দিক, যেখানে সে তার এলোচুলে গ্রন্থি দিয়ে, আঁচল কোমরে বেঁধে সংসারের কাজে ব্যস্ত।

৪

বহু দূরের অসীম আকাশ আজ বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পড়ল। কানে কানে বললে, "আমি তোমারই।"

পৃথিবী বললে, "সে কেমন করে হবে। তুমি যে অসীম, আমি যে ছোটো।"

আকাশ বললে, "আমি তো চার দিকে আমার মেঘের সীমা টেনে দিয়েছি।"

পৃথিবী বললে, "তোমার যে কত জ্যোতিষ্কের সম্পদ, আমার তো আলোর সম্পদ নেই।"

আকাশ বললে, "আজ আমি আমার চন্দ্র সূর্য তারা সব হারিয়ে ফেলে এসেছি, আজ আমার একমাত্র তুমি আছ।"

পৃথিবী বললে, "আমার অশ্রুভরা হৃদয় হাওয়ায় হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে কাঁপে, তুমি যে অবিচলিত।"

আকাশ বললে, "আমার অশ্রুও আজ চঞ্চল হয়েছে, দেখতে কি পাও নি। আমার বক্ষ আজ শ্যামল হল তোমার ঐ শ্যামল হৃদয়টির মতো।"

সে এই ব'লে আকাশ-পৃথিবীর মাঝখানকার চিরবিরহটাকে চোখের জলের গান দিয়ে ভরিয়ে দিলে।

৫

সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের 'পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বচনীয় তাই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো

চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রঙটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।

যখন ঝিল্লীর ঝংকারে বেণুবনের অন্ধকার থরথর্ করছে, যখন বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল, তখন সে তার অতি কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক, ভিজে ঘাসের গন্ধে ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথরাত্রে।

বাঁশি

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী— শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা, প্রতি দিনের মাটির বুক বেয়ে চলেছে; অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারি নে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখদুঃখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর, মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কী করে। কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে শুনি, বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজছে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতি দিনের সুরের মিল কোথায়। গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা, অপমান, অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য— বাঁশির দৈববাণীতে এসব বার্তার আভাস কোথায়।

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই-সমস্ত চেনা কথার পর্দা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম; তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দুগাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ ব'লে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।

জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুখ করে চলেছে; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, "তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।"

ওদের হৃৎপিণ্ডের রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হল।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পুরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।

পুরোনো বাড়ি

অনেক কালের ধনী গরিব হয়ে গেছে, তাদেরই ঐ বাড়ি।

দিনে দিনে ওর উপরে দুঃসময়ের আঁচড় পড়ছে।

দেয়াল থেকে বালি খসে পড়ে, ভাঙা মেঝে নখ দিয়ে খুঁড়ে চড়ুইপাখি ধুলোয় পাখা ঝাপট দেয়, চণ্ডীমণ্ডপে পায়রাগুলো বাদলের ছিন্ন মেঘের মতো দল বাঁধল।

উত্তর দিকের এক পাল্লা দরজা কবে ভেঙে পড়েছে কেউ খবর নিলে না। বাকি দরজাটা, শোকাতুরা বিধবার মতো, বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়ে— কেউ তাকিয়ে দেখে না।

তিন মহল বাড়ি। কেবল পাঁচটি ঘরে মানুষের বাস, বাকি সব বন্ধ। যেন পঁচাশি বছরের বুড়ো, তার জীবনের সবখানি জুড়ে সেকালের কুলুপ-লাগানো স্মৃতি, কেবল একখানিতে একালের চলাচল।

বালি-খসা ইঁট-বের-করা বাড়িটা তালি-দেওয়া-কাঁথা-পরা উদাসীন পাগলার মতো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে; আপনাকেও দেখে না, অন্যকেও না।

২

একদিন ভোররাত্রে ঐ দিকে মেয়ের গলায় কান্না উঠল। শুনি, বাড়ির যেটি শেষ ছেলে, শখের যাত্রায় রাধিকা সেজে যার দিন চলত, সে আজ আঠারো বছরে মারা গেল।

কদিন মেয়েরা কাঁদল, তার পরে তাদের আর খবর নেই।

তার পরে সকল দরজাতেই তালা পড়ল।

কেবল উত্তর দিকের সেই একখানা অনাথা দরজা ভাঙেও না, বন্ধও হয় না; ব্যথিত হৃৎপিণ্ডের মতো বাতাসে ধড়াস ধড়াস করে আছাড় খায়।

৩

একদিন সেই বাড়িতে বিকেলে ছেলেদের গোলমাল শোনা গেল।

দেখি, বারান্দা থেকে লালপেড়ে শাড়ি ঝুলছে।

অনেক দিন পরে বাড়ির এক অংশে ভাড়াটে এসেছে। তার মাইনে অল্প, ছেলে-মেয়ে বিস্তর। শ্রান্ত মা বিরক্ত হয়ে তাদের মারে, তারা মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে।

একটা আধাবয়সী দাসী সমস্ত দিন খাটে, আর গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া করে; বলে 'চললুম', কিন্তু যায় না।

৪

বাড়ির এই ভাগটায় রোজ একটু-আধটু মেরামত চলছে।

ফাটা সাসির উপর কাগজ আঁটা হল; বারান্দায় রেলিঙের ফাঁকগুলোতে বাঁখারি বেঁধে দিলে; শোবার ঘরে ভাঙা জানলা ইঁট দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলে; দেয়ালে চুনকাম হল, কিন্তু কালো ছাপগুলোর আভাস ঢাকা পড়ল না।

ছাদে আলসের 'পরে গামলায় একটা রোগা পাতাবাহারের গাছ হঠাৎ দেখা দিয়ে আকাশের কাছে লজ্জা পেলে। তার পাশেই ভিত ভেদ করে অশথ গাছটি সিধে দাঁড়িয়ে; তার পাতাগুলো এদের দেখে যেন খিল্‌খিল্‌ করে হাসতে লাগল।

মস্ত ধনের মস্ত দারিদ্র্য। তাকে ছোটো হাতের ছোটো কৌশলে ঢাকা দিতে গিয়ে তার আবরু গেল।

কেবল উত্তর দিকের উজাড় ঘরটির দিকে কেউ তাকায় নি। তার সেই জোড়ভাঙা দরজা আজও কেবল বাতাসে আছড়ে পড়ছে, হতভাগার বুক-চাপড়ানির মতো।

গলি

আমাদের এই শানবাঁধানো গলি, বারে বারে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে একদিন কী যেন খুঁজতে বেরিয়েছিল। কিন্তু, সে যে দিকেই যায় ঠেকে যায়। এ দিকে বাড়ি, ও দিকে বাড়ি, সামনে বাড়ি।

উপরের দিকে যেটুকু নজর চলে তাতে সে একখানি আকাশের রেখা দেখতে পায়— ঠিক তার নিজেরই মতো সরু, তার নিজেরই মতো বাঁকা।

সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, "বলো তো দিদি, তুমি কোন্‌ নীল শহরের গলি।"

দুপুরবেলায় কেবল একটুখনের জন্যে সে সূর্যকে দেখে আর মনে মনে বলে, "কিচ্ছুই বোঝা গেল না।"

বর্ষামেঘের ছায়া দুইসার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে যেন গলির খাতা থেকে তার আলোটাকে পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েছে। বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, বর্ষা ডমরু বাজিয়ে যেন সাপ খেলাতে থাকে। পিছল হয়, পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাৎ নালার জল লাফিয়ে প'ড়ে চমকিয়ে দিতে থাকে।

গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, "ছিল খট্‌খটে শুকনো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু, কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত।"

ফাল্গুনে দক্ষিণের হাওয়াকে গলির মধ্যে লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে হয়; ধুলো আর ছেঁড়া কাগজগুলো এলোমেলো উড়তে থাকে। গলি হতবুদ্ধি হয়ে বলে, "এ কোন্ পাগলা দেবতার মাৎলামি।"

তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জনা এসে জমে— মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারির খোসা, মরা ইঁদুর, সে জানে এই-সব হচ্ছে বাস্তব। কোনোদিন ভুলেও ভাবে না, "এ সমস্ত কেন।"

অথচ, শরতের রোদ্‌দুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন পুজোর নহবত ভৈরবীতে বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, "এই শানবাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা কিছু আছে বা!"

এ দিকে বেলা বেড়ে যায়; ব্যস্ত গৃহিণীর আঁচলটার মতো বাড়িগুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্‌দুরখানা গলির ধারে খসে পড়ে; ঘড়িতে ন'টা বাজে; ঝি কোমরে ঝুড়ি করে বাজার নিয়ে আসে; রান্নার গন্ধে আর ধোঁয়ায় গলি ভরে যায়; যারা আপিসে যায় তারা ব্যস্ত হতে থাকে।

গলি তখন আবার ভাবে, "এই শানবাঁধা লাইনের মধ্যেই সব সত্য। আর, যাকে মনে ভাবছি মস্ত একটা কিছু সে মস্ত একটা স্বপ্ন।"

একটি চাউনি

গাড়িতে ওঠবার সময় একটুখানি মুখ ফিরিয়ে সে আমাকে তার শেষ চাউনিটি দিয়ে গেছে।

এই মস্ত সংসারে ঐটুকুকে আমি রাখি কোন্‌খানে।

দণ্ড পল মুহূর্ত অহরহ পা ফেলবে না, এমন একটু জায়গা আমি পাই কোথায়।

মেঘের সকল সোনার রঙ যে সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায় এই চাউনি কি সেই সন্ধ্যায় মিলিয়ে যাবে। নাগকেশরের সকল সোনালি রেণু যে বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় এও কি সেই বৃষ্টিতেই ধুয়ে যাবে।

সংসারের হাজার জিনিসের মাঝখানে ছড়িয়ে থাকলে এ থাকবে কেন— হাজার কথার আবর্জনায়, হাজার বেদনার স্তূপে।

তার ঐ এক চকিতের দান সংসারের আর-সমস্তকে ছাড়িয়ে আমারই হাতে এসে পৌঁচেছে। এ'কে আমি রাখব গানে গেঁথে, ছন্দে বেঁধে; আমি এ'কে রাখব সৌন্দর্যের অমরাবতীতে।

পৃথিবীতে রাজার প্রতাপ, ধনীর ঐশ্বর্য হয়েছে মরবারই জন্যে। কিন্তু, চোখের জলে কি সেই অমৃত নেই যাতে এক নিমেষের চাউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

গানের সুর বললে, "আচ্ছা, আমাকে দাও। আমি রাজার প্রতাপকে স্পর্শ করি নে, ধনীর ঐশ্বর্যকেও না, কিন্তু ঐ ছোটো জিনিসগুলিই আমার চিরদিনের ধন; ঐগুলি দিয়েই আমি অসীমের গলার হার গাঁথি।"

একটি দিন

মনে পড়ছে সেই দুপুরবেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হয়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম।

পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু করে সেলাই করতে লাগল। তার পরে সেলাই বন্ধ ক'রে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।

এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুরবেলা।

ইতিহাসে রাজাবাদশার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সস্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু, একটি দুপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুকরো দুর্লভ রত্নের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, দুটি লোক তার খবর জানে।

কৃতঘ্ন শোক

ভোরবেলায় সে বিদায় নিলে।

আমার মন আমাকে বোঝাতে বসল, "সবই মায়া।"

আমি রাগ করে বললেম, "এই তো টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স, ছাতে ফুলগাছের টব, খাটের উপর নাম-লেখা হাতপাখাখানি— সবই তো সত্য।"

মন বললে, "তবু ভেবে দেখো—"

আমি বললেম, "থামো তুমি। ঐ দেখো-না গল্পের বইখানি, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা, সবটা পড়া শেষ হয় নি; এও যদি মায়া হয়, সে এর চেয়েও বেশি মায়া হল কেন।"

মন চুপ করলে। বন্ধু এসে বললেন, "যা ভালো তা সত্য, তা কখনো যায় না; সমস্ত জগৎ তাকে রত্নের মতো বুকের হারে গেঁথে রাখে।"

আমি রাগ করে বললেম, "কী করে জানলে। দেহ কি ভালো নয়। সে দেহ গেল কোন্‌খানে।"

ছোটো ছেলে যেমন রাগ ক'রে মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগলেম। বললেম, "সংসার বিশ্বাসঘাতক।"

হঠাৎ চমকে উঠলেম। মনে হল কে বললে, "অকৃতজ্ঞ!"

জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভর্ৎসনা এল, "ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?"

সতেরো বছর

আমি তার সতেরো বছরের জানা।

কত আসাযাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি; তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান, কত ইশারা; তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের ভাঙা ঘুমে শুকতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভরসন্ধ্যায় চামেলিফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলুবারোয়াঁ; সতেরো বছর ধরে এই-সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে।

আর, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকত। ঐ নামে যে মানুষ সাড়া দিত সে তো একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া; কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ।

তার পরে আরও সতেরো বছর যায়। কিন্তু এর দিনগুলি, এর রাতগুলি, সেই নামের রাখিবন্ধনে আর তো এক হয়ে মেলে না, এরা ছড়িয়ে পড়ে।

তাই এরা রোজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমরা থাকব কোথায়। আমাদের ডেকে নিয়ে ঘিরে রাখবে কে।"

আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি নে, চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। আর, ওরা বাতাসে উড়ে চলে যায়। বলে, "আমরা খুঁজতে বেরোলেম।"

"কাকে।"

কাকে সে এরা জানে না। তাই কখনো যায় এ দিকে, কখনো যায় ও দিকে; সন্ধ্যাবেলাকার খাপছাড়া মেঘের মতো অন্ধকারে পাড়ি দেয়, আর দেখতে পাই নে।

প্রথম শোক

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, "আমাকে চিনতে পার না?"

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, "মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।"

সে বললে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।"

তার চোখের কোণে একটু ছল্‌ছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম, "সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ।"

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাসলে; বুঝলেম, সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজও তোমার কাছে রেখে দিয়েছ।"

সে বললে, "এই দেখো-না আমার গলার হার।"

দেখলেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি।

আমি বললেম, "আমার আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও তো ম্লান হয় নি।"

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, "মনে আছে? সেদিন বলেছিলে, তুমি সান্ত্বনা চাও না, তুমি শোককেই চাও।"

লজ্জিত হয়ে বললেম, "বলেছিলেম। কিন্তু, তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।"

সে বললে, "যে অন্তর্যামীর বর, তিনি তো ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।"

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, "এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি।"

সে বললে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"

প্রশ্ন

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি— গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ— একলা গলির উপরকার জানলার ধারে।

কী ভাবছে তা সে আপনি জানে না।

সকালের রৌদ্র সামনের বাড়ির নিম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে; কাঁচা-আম-ওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে; খোকা জিজ্ঞাসা করলে, "মা কোথায়।"

বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বললে, "স্বর্গে।"

২

সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠছে।

দুয়ারে লণ্ঠনের মিটমিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিকটিকি।

সামনে খোলা ছাদ, কখন খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।

চারি দিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারাওয়ালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে।

উলঙ্গ গায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করছে, "কোথায় স্বর্গের রাস্তা।"

আকাশে তার কোনো সাড়া নেই; কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

২

গল্প

ছেলেটির যেমনি কথা ফুটল অমনি সে বললে, "গল্প বলো।"

দিদিমা বলতে শুরু করলেন, "এক রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর, সদাগরের পুত্তুর—"

গুরুমশায় হেঁকে বললেন, "তিন-চারে বারো।"

কিন্তু তখন তার চেয়ে বড়ো হাঁক দিয়েছে রাক্ষসটা "হাঁউ মাঁউ খাঁউ"— নামতার হুংকার ছেলেটার কানে পৌঁছয় না।

যারা হিতৈষী তারা ছেলেকে ঘরে বন্ধ ক'রে গম্ভীর স্বরে বললে, "তিন-চারে বারো এটা হল সত্য; আর রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর, ওটা হল মিথ্যে, অতএব— "

ছেলেটির মন তখন সেই মানসচিত্রের সমুদ্র পেরিয়ে গেছে মানচিত্রে যার ঠিকানা মেলে না; তিন-চারে বারো তার পিছে পিছে পাড়ি দিতে যায়, কিন্তু সেখানে ধারাপাতের হালে পানি পায় না।

হিতৈষী মনে করে, নিছক দুষ্টমি, বেতের চোটে শোধন করা চাই।

দিদিমা গুরুমশায়ের গতিক দেখে চুপ। কিন্তু আপদ বিদায় হতে চায় না, এক যায় তো আর আসে। কথক এসে আসন জুড়ে বসলেন। তিনি শুরু করে দিলেন এক রাজপুত্রের বনবাসের কথা।

যখন রাক্ষসীর নাক কাটা চলছে তখন হিতৈষী বললেন, "ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ নেই; যার প্রমাণ পথে ঘাটে সে হচ্ছে, তিন-চারে বারো।"

ততক্ষণে হনুমান লাফ দিয়েছে আকাশে, অত ঊর্ধ্বে ইতিহাস তার সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারে না। পাঠশালা থেকে ইস্কুলে, ইস্কুল থেকে কলেজে ছেলের মনকে পুটপাকে শোধন করা চলতে লাগল। কিন্তু যতই চোলাই করা যাক, ঐ কথাটুকু কিছুতেই মরতে চায় না "গল্প বলো"।

২

এর থেকে দেখা যায়, শুধু শিশুবয়সে নয়, সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ্য জীব। তাই পৃথিবী জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে, যুগে যুগে, মুখে মুখে, লেখায় লেখায়, গল্প যা জমে উঠেছে তা মানুষের সকল সঞ্চয়কেই ছাড়িয়ে গেছে।

হিতৈষী একটা কথা ভালো করে ভেবে দেখে না, গল্পরচনার নেশাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সবশেষের নেশা : তাঁকে শোধন করতে না পারলে মানুষকে শোধন করার আশা করা যায় না।

একদিন তিনি তাঁর কারখানাঘরে আগুন থেকে জল, জল থেকে মাটি গড়তে লেগে গিয়েছিলেন। সৃষ্টি তখন গলদ্‌ঘর্ম, বাষ্পভারাকুল। ধাতুপাথরের পিণ্ডগুলো তখন থাকে থাকে গাঁথা হচ্ছে ; চার দিকে মাল মসলা ছড়ানো আর দমাদম পিটনি। সেদিন বিধাতাকে দেখলে কোনোমতে মনে করা যেতে পারত না যে, তাঁর মধ্যে কোথাও কিছু ছেলেমানুষি আছে। তখনকার কাণ্ডকারখানা যাকে বলে 'সারবান'।

তার পরে কখন শুরু হল প্রাণের পত্তন। জাগল ঘাস, উঠল গাছ, ছুটল পশু, উড়ল পাখি। কেউ বা মাটিতে বাঁধা থেকে আকাশে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল, কেউ বা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীময় আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল, কেউ বা জলের যবনিকাতলে নিঃশব্দ নৃত্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে ব্যস্ত, কেউ বা আকাশে ডানা মেলে সূর্যালোকের বেদীতলে গানের অর্ঘ্যরচনায় উৎসুক। এখন থেকেই ধরা পড়তে লাগল বিধাতার মনের চাঞ্চল্য।

এমন করে বহু যুগ কেটে যায়। হঠাৎ এক সময়ে কোন্ খেয়ালে সৃষ্টিকর্তার কারখানায় উনপঞ্চাশ পবনের তলব পড়ল। তাদের সবক'টাকে নিয়ে তিনি মানুষ গড়লেন। এত দিন পরে আরম্ভ হল তাঁর গল্পের পালা। বহুকাল কেটেছে তাঁর বিজ্ঞানে, কারুশিল্পে ; এইবার তাঁর শুরু হল সাহিত্য।

মানুষকে তিনি গল্পে গল্পে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। পশুপাখির জীবন হল আহার নিদ্রা সন্তানপালন ; মানুষের জীবন হল গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা ; সুখদুঃখ রাগবিরাগ ভালোমন্দের কত ঘাতপ্রতিঘাত। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, একের সঙ্গে দশের, সাধনার সঙ্গে স্বভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে কত আবর্তন। নদী যেমন জলস্রোতের ধারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পরস্পর দেখা হতেই প্রশ্ন এই, "কী হল হে, কী খবর, তার পরে ?" এই 'তার পরে'র সঙ্গে 'তার পরে' বোনা হয়ে পৃথিবী জুড়ে মানুষের গল্প গাঁথা হচ্ছে। তাকেই বলি জীবনের কাহিনী, তাকেই বলি মানুষের ইতিহাস।

বিধাতার-রচা ইতিহাস আর মানুষের-রচা কাহিনী, এই দুইয়ে মিলে মানুষের সংসার। মানুষের পক্ষে কেবল-যে অশোকের গল্প, আকবরের গল্পই সত্য তা নয় ; যে রাজপুত্র সাত-সমুদ্র-পারে সাত-রাজার-ধন মানিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য ; আর সেই ভক্তিবিমুগ্ধ হনুমানের সরল বীরত্বের কথাও সত্য যে হনুমান গন্ধমাদনকে

উৎপাটিত করে আনতে সংশয় বোধ করে না। এই মানুষের পক্ষে আরজেব যেমন সত্য দুর্যোধনও তেমনি সত্য। কোন্‌টার প্রমাণ বেশি, কোন্‌টার প্রমাণ কম, সে হিসাবে নয়; কেবল গল্প হিসাবে কোন্‌টা খাঁটি, সেইটেই তার পক্ষে সবচেয়ে সত্য।

মানুষ বিধাতার সাহিত্যলোকেই মানুষ; সুতরাং না সে বস্তুতে গড়া, না তত্ত্বে— অনেক চেষ্টা করে হিতৈষী কোনোমতেই এই কথা মানুষকে ভোলাতে পারলে না। অবশেষে হয়রান হয়ে হিতকথার সঙ্গে গল্পের সন্ধিস্থাপন করতে সে চেষ্টা করে, কিন্তু চিরকালের স্বভাবদোষে কিছুতে জোড়া মেলাতে পারে না। তখন গল্পও যায় কেটে, হিতকথাও পড়ে খ'সে, আবর্জনা জমে ওঠে।

মীনু

মীনু পশ্চিমে মানুষ হয়েছে। ছেলেবেলায় ইঁদারার ধারে তুঁতের গাছে লুকিয়ে ফল পাড়তে যেত; আর অড়রখেতে যে বুড়ো মালী ঘাস নিড়োত তার সঙ্গে ওর ছিল ভাব।

বড়ো হয়ে জৌনপুরে হল ওর বিয়ে। একটি ছেলে হয়ে মারা গেল, তার পরে ডাক্তার বললে, "এও বাঁচে কি না-বাঁচে।"

তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে এল।

ওর অল্প বয়েস। কাঁচা ফলটির মতো ওর কাঁচা প্রাণ পৃথিবীর বোঁটা শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব, তার 'পরেই ওর বড়ো টান।

আঙিনায় তার আট-দশ হাত জমি, সেইটুকুতে তার বাগান।

এই বাগানটি ছিল যেন তার কোলের ছেলে। তারই বেড়ার 'পরে যে ঝুমকোলতা লাগিয়েছিল। এইবার সেই লতায় কুঁড়ির আভাস দিতেই সে চলে এসেছে।

পাড়ার সমস্ত পোষা এবং না-পোষা কুকুরের অন্ন আর আদর ওরই বাড়িতে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যেটিকে সে ভালোবাসত তার নাক ছিল খাঁদা, তার নাম ছিল ভোঁতা।

তারই গলায় পরাবে বলে মীনু রঙিন পুঁতির মালা গাঁথতে বসেছিল। সেটা শেষ হল না। যার কুকুর সে বললে, "বউদিদি, এটিকে তুমি নিয়ে যাও।"

মীনুর স্বামী বললে, "বড়ো হাঙ্গাম, কাজ নেই।"

২

কলকাতার বাসায় দোতলার ঘরে মীনু শুয়ে থাকে। হিন্দুস্থানি দাই কাছে বসে কত কী বকে ; সে খানিক শোনে, খানিক শোনে না।

একদিন সারারাত মীনুর ঘুম ছিল না। ভোরের আঁধার একটু যেই ফিকে হল সে দেখতে পেলে, তার জানলার নিচেকার গোলকচাঁপার গাছটি ফুলে ভরে উঠেছে। তার একটু মৃদুগন্ধ মীনুর জানলার কাছটিতে এসে যেন জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেমন আছ।"

ওদের বাসা আর পাশের বাড়িটার অল্প একটুখানি ফাঁকের মধ্যে ঐ রৌদ্রের কাঙাল গাছটি, বিশ্বপ্রকৃতির এই হাবা ছেলে, কেমন করে এসে প'ড়ে যেন বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লান্ত মীনু বেলায় উঠত। উঠেই সেই গাছটির দিকে চেয়ে দেখত, সেদিনের মতো আর তো তেমন ফুল দেখা যায় না। দাইকে বলত, "আহা দাই, মাথা খা, এই গাছের তলাটি খুঁড়ে দিয়ে রোজ একটু জল দিস।"

এই গাছে কেন-যে কদিন ফুল দেখা যায় নি, একটু পরেই বোঝা গেল।

সকালের আলো তখন আধফোটা পদ্মের মতো সবে জাগছে, এমন সময় সাজি হাতে পূজারি ব্রাহ্মণ গাছটাকে ঝাঁকানি দিতে লাগল, যেন খাজনা আদায়ের জন্যে বর্গির পেয়াদা।

মীনু দাইকে বললে, "শীঘ্র ঐ ঠাকুরকে একবার ডেকে আন্।"

ব্রাহ্মণ আসতেই মীনু তাকে প্রণাম করে বললে, "ঠাকুর, ফুল নিচ্ছ কার জন্যে।"

ব্রাহ্মণ বললে, "দেবতার জন্যে।"

মীনু বললে, "দেবতা তো ঐ ফুল স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"তোমাকে!"

"হাঁ, আমাকে। তিনি যা দিয়েছেন সে তো ফিরিয়ে নেবেন ব'লে দেন নি।"

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভোরে আবার সে যখন গাছ নাড়া দিতে শুরু করলে তখন মীনু তার দাইকে বললে, "ও দাই, এ তো আমি চোখে দেখতে পারি নে। পাশের ঘরের জানলার কাছে আমার বিছানা করে দে।"

৩

পাশের ঘরের জানলার সামনে রায়চৌধুরীদের চৌতলা বাড়ি। মীনু তার স্বামীকে ডাকিয়ে এনে বললে, "ঐ দেখো, দেখো, ওদের কী সুন্দর ছেলেটি। ওকে একটিবার আমার কোলে এনে দাও-না।"

স্বামী বললে, "গরিবের ঘরে ছেলে পাঠাবে কেন।"

মীনু বললে, "শোনো একবার! ছোটো ছেলের বেলায় কি ধনী-গরিবের ভেদ আছে। সবার কোলেই ওদের রাজসিংহাসন।"

স্বামী ফিরে এসে খবর দিলে, "দরোয়ান বললে, বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।"

পরের দিন বিকেলে মীনু দাইকে ডেকে বললে, "ঐ চেয়ে দেখ্, বাগানে একলা বসে খেলছে। দৌড়ে যা, ওর হাতে এই সন্দেশটি দিয়ে আয়।"

সন্ধ্যাবেলায় স্বামী এসে বললে, "ওরা রাগ করেছে।"

"কেন, কী হয়েছে।"

"ওরা বলেছে, দাই যদি ওদের বাগানে যায় তো পুলিশে ধরিয়ে দেবে।"

এক মুহূর্তে মীনুর দুই চোখ জলে ভেসে গেল। সে বললে, "আমি দেখেছি, দেখেছি, ওর হাত থেকে ওরা আমার সন্দেশ ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে ওকে মারলে। এখানে আমি বাঁচব না। আমাকে নিয়ে যাও।"

নামের খেলা

প্রথম বয়সেই সে কবিতা লিখতে শুরু করে।

বহু যত্নে খাতায় সোনালি কালির কিনারা টেনে, তারই গায়ে লতা এঁকে, মাঝখানে লাল কালি দিয়ে কবিতাগুলি লিখে রাখত। আর, খুব সমারোহে মলাটের উপর লিখত, শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

একে একে লেখাগুলিকে কাগজে পাঠাতে লাগল। কোথাও ছাপা হল না।

মনে মনে সে স্থির করলে, যখন হাতে টাকা জমবে তখন নিজে কাগজ বের করবে।

বাপের মৃত্যুর পর গুরুজনেরা বার বার বললে, "একটা কোনো কাজের চেষ্টা করো, কেবল লেখা নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না।"

সে একটুখানি হাসলে আর লিখতে লাগল। একটি দুটি তিনটি বই সে পরে পরে ছাপালে।

এই নিয়ে খুব আন্দোলন হবে আশা করেছিল। হল না।

২

আন্দোলন হল একটি পাঠকের মনে। সে হচ্ছে তার ছোটো ভাগ্নেটি।

নতুন ক খ শিখে সে যে বই হাতে পায় চেঁচিয়ে পড়ে।

একদিন একখানা বই নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মামার কাছে ছুটে এল। বললে, "দেখো দেখো, মামা, এ যে তোমারই নাম।"

মামা একটুখানি হাসলে, আর আদর ক'রে খোকার গাল টিপে দিলে।

মামা তার বাক্স খুলে আর-একখানি বই বের করে বললে, "আচ্ছা, এটা পড়ো দেখি।"

ভাগ্নে একটি একটি অক্ষর বানান ক'রে ক'রে মামার নাম পড়ল। বাক্স থেকে আরও একটা বই বেরোল, সেটাতেও পড়ে দেখে মামার নাম।

পরে পরে যখন তিনটি বইয়ে মামার নাম দেখলে তখন সে আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে চাইল না। দুই হাত ফাঁক করে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার নাম আরও অনেক অনেক অনেক বইয়ে আছে— একশোটা, চব্বিশটা, সাতটা বইয়ে?"

মামা চোখ টিপে বললে, "ক্রমে দেখতে পাবি।"

ভাগ্নে বই তিনটে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ির বুড়ি ঝিকে দেখাতে নিয়ে গেল।

৩

ইতিমধ্যে মামা একখানা নাটক লিখেছে। ছত্রপতি শিবাজি তার নায়ক।

বন্ধুরা বললে, "এ নাটক নিশ্চয় থিয়েটারে চলবে।"

সে মনে মনে স্পষ্ট দেখতে লাগল, রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে।

আজ রবিবার। তার থিয়েটারবিলাসী বন্ধু থিয়েটারওয়ালাদের কাছে অভিমত আনতে গেছে। তাই সে পথ চেয়ে রইল।

রবিবারে তার ভাগ্নেরও ছুটি। আজ সকাল থেকে সে এক খেলা বের করেছে, অন্যমনস্ক হয়ে মামা তা লক্ষ্য করে নি।

ওদের ইস্কুলের পাশে ছাপাখানা আছে। সেখান থেকে ভাগ্নে নিজের নামের কয়েকটা সীসের অক্ষর জুটিয়ে এনেছে। তার কোনোটা ছোটো, কোনোটা বড়ো।

যে-কোনো বই পায় এই সীসের অক্ষরে কালি লাগিয়ে তাতে নিজের নাম ছাপাচ্ছে। মামাকে আশ্চর্য করে দিতে হবে।

৪

আশ্চর্য করে দিলে। মামা এক সময়ে বসবার ঘরে এসে দেখে, ছেলেটি ভারি ব্যস্ত।

"কী কানাই, কী করছিস।"

ভাগ্নে খুব আগ্রহ করেই দেখালে সে কী করছে। কেবল তিনটিমাত্র বই নয়, অন্তত পঁচিশখানা বইয়ে ছাপার অক্ষরে কানাইয়ের নাম।

এ কী কাণ্ড। পড়াশুনোর নাম নেই, ছোঁড়াটার কেবল খেলা। আর, এ কী রকম খেলা।

কানাইয়ের বহু দুঃখে জোটানো নামের অক্ষরগুলি হাত থেকে সে ছিনিয়ে নিলে।

কানাই শোকে চীৎকার করে কাঁদে, তার পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার পরে থেকে থেকে দমকায় দমকায় কেঁদে ওঠে— কিছুতেই সান্ত্বনা মানে না।

বুড়ি ঝি ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে, "কী হয়েছে, বাবা।"

কানাই বললে, "আমার নাম।"

মা এসে বললে, "কী রে কানাই, কী হয়েছে।"

কানাই রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "আমার নাম।"

ঝি লুকিয়ে তার হাতে আস্ত একটি ক্ষীরপুলি এনে দিলে; মাটিতে ফেলে দিয়ে সে বললে, "আমার নাম।"

মা এসে বললে, "কানাই, এই নে তোর সেই রেলগাড়িটা।"

কানাই রেলগাড়ি ঠেলে ফেলে বললে, "আমার নাম।"

৫

থিয়েটার থেকে বন্ধু এল।

মামা দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কী হল।"

বন্ধু বললে, "ওরা রাজি হল না।"

অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে মামা বললে, "আমার সর্বস্ব যায় সেও ভালো, আমি নিজে থিয়েটার খুলব।"

বন্ধু বললে, "আজ ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাবে না ?"

ও বললে, "না, আমার জরভাব।"

বিকেলে মা এসে বললে, "খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

ও বললে, "খিদে নেই।"

সন্ধের সময় স্ত্রী এসে বললে, "তোমার সেই নতুন লেখাটা শোনাবে না ?"

ও বললে, "মাথা ধরেছে।"

ভাগ্নে এসে বললে, "আমার নাম ফিরিয়ে দাও।"

মামা ঠাস্ করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলে।

ভুল স্বর্গ

লোকটি নেহাত বেকার ছিল।

তার কোনো কাজ ছিল না, কেবল শখ ছিল নানা রকমের।

ছোটো ছোটো কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোটো ছোটো ঝিনুক সাজাত। দূর থেকে দেখে মনে হত যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখির ঝাঁক; কিম্বা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, সেখানে গোরু চরছে; কিম্বা উঁচুনিচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বুঝি ঝরনা হবে, কিম্বা পায়ে-চলা পথ।

বাড়ির লোকের কাছে তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে পণ করত পাগলামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগলামি তাকে ছাড়ত না।

২

কোনো কোনো ছেলে আছে সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দেয়, অথচ পরীক্ষায় খামকা পাশ করে ফেলে। এর সেই দশা হল।

সমস্ত জীবনটা অকাজে গেল, অথচ মৃত্যুর পরে খবর পেলে যে, তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর।

কিন্তু, নিয়তি স্বর্গের পথেও মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। দূতগুলো মার্কা ভুল করে তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল।

এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই।

এখানে পুরুষরা বলছে, "হাঁফ ছাড়বার সময় কোথা।" মেয়েরা বলছে, "চললুম, ভাই, কাজ রয়েছে পড়ে।" সবাই বলে, "সময়ের মূল্য আছে।" কেউ বলে না,

"সময় অমূল্য।" "আর তো পারা যায় না" ব'লে সবাই আক্ষেপ করে, আর ভারি খুশি হয়। "খেটে খেটে হয়রান হলুম" এই নালিশটাই সেখানকার সংগীত।

এ বেচারা কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও খাপ খায় না। রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে যেখানেই আরাম ক'রে বসতে চায়, শুনতে পায় সেখানেই ফসলের খেত, বীজ পোঁতা হয়ে গেছে। কেবলই উঠে যেতে হয়, সরে যেতে হয়।

৩

ভারি এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে।

পথের উপর দিয়ে সে চলে যায় যেন সেতারের দ্রুত তালের গতের মতো।

তাড়াতাড়ি সে এলো খোঁপা বেঁধে নিয়েছে। তবু দু'চারটে দুরন্ত অলক কপালের উপর ঝুঁকে প'ড়ে তার চোখের কালো তারা দেখবে ব'লে উঁকি মারছে।

স্বর্গীয় বেকার মানুষটি এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, চঞ্চল ঝরনার ধারে তমালগাছটির মতো স্থির।

জানলা থেকে ভিক্ষুককে দেখে রাজকন্যার যেমন দয়া হয়, এ'কে দেখে মেয়েটির তেমনি দয়া হল।

"আহা, তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই?"

নিশ্বাস ছেড়ে বেকার বললে, "কাজ করব তার সময় নেই।"

মেয়েটি ওর কথা কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে, "আমার হাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও?"

বেকার বললে, "তোমার হাত থেকেই কাজ নেব ব'লে দাঁড়িয়ে আছি।"

"কী কাজ দেব।"

"তুমি যে ঘড়া কাঁখে করে জল তুলে নিয়ে যাও তারই একটি যদি আমাকে দিতে পার।"

"ঘড়া নিয়ে কী হবে। জল তুলবে?"

"না, আমি তার গায়ে চিত্র করব।"

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বললে, "আমার সময় নেই, আমি চললুম।"

কিন্তু, বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক পারবে কেন। রোজ ওদের উৎসতলায় দেখা হয় আর রোজ সেই একই কথা, "তোমার কাঁখের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র করব।"

হার মানতে হল, ঘড়া দিলে।

সেইটিকে ঘিরে ঘিরে বেকার আঁকতে লাগল কত রঙের পাক, কত রেখার ঘের।

আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়া তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এর মানে ?"

বেকার লোকটি বললে, "এর কোনো মানে নেই।"

ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।

সবার চোখের আড়ালে বসে সেটিকে সে নানা আলোতে নানা রকমে হেলিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। রাত্রে থেকে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জ্বেলে চুপ করে বসে সেই চিত্রটা দেখতে লাগল। তার বয়সে এই সে প্রথম এমন কিছু দেখেছে যার কোনো মানে নেই।

তার পরদিন যখন সে উৎসতলায় এল তখন তার দুটি পায়ের ব্যস্ততায় একটু যেন বাধা পড়েছে। পা দুটি যেন চলতে চলতে আন্‌মনা হয়ে ভাবছে— যা ভাবছে তার কোনো মানে নেই।

সেদিনও বেকার মানুষ এক পাশে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি বললে, "কী চাও।"

সে বললে, "তোমার হাত থেকে আরও কাজ চাই।"

"কী কাজ দেব।"

"যদি রাজি হও, রঙিন সুতো বুনে বুনে তোমার বেণী বাঁধবার দড়ি তৈরি করে দেব।"

"কী হবে।"

"কিছুই হবে না।"

নানা রঙের নানা-কাজ-করা দড়ি তৈরি হল। এখন থেকে আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাঁধতে মেয়ের অনেক সময় লাগে। কাজ পড়ে থাকে, বেলা বয়ে যায়।

৪

এ দিকে দেখতে দেখতে কেজো স্বর্গে কাজের মধ্যে বড়ো বড়ো ফাঁক পড়তে লাগল। কান্নায় আর গানে সেই ফাঁক ভরে উঠল।

স্বর্গীয় প্রবীণেরা বড়ো চিন্তিত হল। সভা ডাকলে। তারা বললে, "এখানকার ইতিহাসে কখনো এমন ঘটে নি।"

স্বর্গের দূত এসে অপরাধ স্বীকার করলে। সে বললে, "আমি ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেছি।"

ভুল লোকটিকে সভায় আনা হল। তার রঙিন পাগড়ি আর কোমরবন্ধের বাহার দেখেই সবাই বুঝলে, বিষম ভুল হয়েছে।

সভাপতি তাকে বললে, "তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে।"

সে তার রঙের ঝুলি আর তুলি কোমরে বেঁধে হাঁফ ছেড়ে বললে, "তবে চললুম।"

মেয়েটি এসে বললে, "আমিও যাব।"

প্রবীণ সভাপতি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখলে এমন-একটা কাণ্ড যার কোনো মানে নেই।

রাজপুত্তুর

রাজপুত্তুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

শহরে গ্রামে আর-সকলে হাটবাজার করে, ঘর করে, ঝগড়া করে; যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্তুর সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়।

কেন যায়।

কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, খাল বিলের জল খাল বিলের মধ্যেই শান্ত। কিন্তু, গিরিশিখরের জল গিরিশিখরে ধরে না, মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না। রাজপুত্তুরকে তার রাজ্যটুকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাখবে কে। তেপান্তর মাঠ দেখে সে ফেরে না, সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হয়ে যায়।

মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন ক'রে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, "আমরা সেই রাজপুত্তুর।"

তেপান্তর মাঠ যদি বা ফুরোয়, সামনে সমুদ্র। তারই মাঝখানে দ্বীপ, সেখানে দৈত্যপুরীতে রাজকন্যা বাঁধা আছে।

পৃথিবীতে আর-সকলে টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে, আর যে আমাদের রাজপুত্তুর সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে। তুফান উঠল, নৌকো মিলল না, তবু সে পথ খুঁজছে।

এইটেই হচ্ছে মানুষের সব-গোড়াকার রূপকথা আর সব-শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেছে দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোটো মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করছে, "বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।"

বাইরে বনের অন্ধকারে বৃষ্টি পড়ে, ঝিল্লি ডাকে, আর ছোটো ছেলেটি চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, "দৈত্যপুরীতে আমাকে পাড়ি দিতে হবে।"

২

সামনে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো। সেখানে রাজপুত্তুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু, যেমনি মাটিতে পা পড়া অমনি এ কী হল। এ কোন্ জাদুকরের জাদু।

এ যে শহর। ট্রাম চলেছে। আপিসমুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশি -ওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে।

আর, রাজপুত্তুরের এ কী বেশ। এ কী চাল। গায়ে বোতামখোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশানি করে বাসাখরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায়।

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপাফুলের মতো রঙ নয়, হাসিতে তার মানিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নববর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারই সঙ্গে।

মা-মরা মেয়ে বাপের আদরের ছিল। বাপ ছিল গরিব, অপাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না, মেয়ের বয়স গেল বেড়ে, সকলে নিন্দে করলে।

বাপ গেছে মরে, এখন মেয়ে এসেছে খুড়োর বাড়িতে।

পাত্রের সন্ধান মিলল। তার টাকাও বিস্তর, বয়সও বিস্তর, আর নাতিনাৎনির সংখ্যাও অল্প নয়। তার দাবরাবের সীমা ছিল না।

খুড়ো বললেন, মেয়ের কপাল ভালো।

এমন সময় গায়ে-হলুদের দিনে মেয়েটিকে দেখা গেল না, আর পাশের বাসার সেই ছেলেটিকে।

খবর এল, তারা লুকিয়ে বিবাহ করেছে। তাদের জাতের মিল ছিল না, ছিল কেবল মনের মিল। সকলেই নিন্দে করলে।

লক্ষপতি তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে সোনার সিংহাসন মানত করে বললেন, "এ ছেলেকে কে বাঁচায়।"

ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচক্ষণ সব উকিল প্রবীণ সব সাক্ষী দেবতার কৃপায় দিনকে রাত করে তুললে। সে বড়ো আশ্চর্য।

সেইদিন ইষ্টদেবতার কাছে জোড়া পাটা কাটা পড়ল, ঢাক ঢোল বাজল, সকলেই খুশি হল। বললে, "কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম এখনো জেগে আছেন।"

৩

তার পরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু, দীর্ঘ পথ আর শেষ হয় না। তেপান্তর মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সঙ্গীহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুনতে হল, "হাঁউমাউখাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।" মানুষকে খাবার জন্যে চারি দিকে এত লোভ।

রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শমে এসে সে থামল।

সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগে ছিলেন। তিনি যম।

সেই যমের সোনার কাঠি যেমনি ছোঁয়ানো অমনি এ কী কাণ্ড। শহর গেল মিলিয়ে, স্বপ্ন গেল ভেঙে।

মুহূর্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্তুর। তার কপালে অসীমকালের রাজটিকা। দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে।

যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়— সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করছে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ, সে রাজপুত্তুর।

সুয়োরানীর সাধ

সুয়োরানীর বুঝি মরণকাল এল।

তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, তার কিছুই ভালো লাগছে না। বদ্যি বড়ি নিয়ে এল। মধু দিয়ে মেড়ে বললে, "খাও।" সে ঠেলে ফেলে দিলে।

রাজার কানে খবর গেল। রাজা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে এল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কী হয়েছে, কী চাই।"

সে গুমরে উঠে বললে, "তোমরা সবাই যাও; একবার আমার স্যাঙাৎনিকে ডেকে দাও।"

স্যাঙাৎনি এল। রানী তার হাত ধরে বললে, "সই, বসো। কথা আছে।"

স্যাঙাৎনি বললে, "প্রকাশ করে বলো।"

সুয়োরানী বললে, "আমার সাতমহলা বাড়ির এক ধারে তিনটে মহল ছিল দুয়োরানীর। তার পরে হল দুটো, তার পরে হল একটা। তার পরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল।

তার পরে দুয়োরানীর কথা আমার মনেই রইল না।

তার পরে একদিন দোলযাত্রা। নাটমন্দিরে যাচ্ছি ময়ূরপংখি চ'ড়ে। আগে লোক, পিছে লশকর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ।

এমনসময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর, চাঁপাগাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে, দুয়োরের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা। আমার ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'আহা, ঘরখানি কার।' সে বললে, দুয়োরানীর।

তার পরে ঘরে ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় বসে আছি, ঘরে প্রদীপ জ্বালি নি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'এ ঘরে আমি থাকব না।'

রাজা বললে, 'আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। শঙ্খের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মতো সাদা, মুক্তোর ঝিনুক দিয়ে তার কিনারে এঁকে দেব পদ্মের মালা।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ গিয়েছে, কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহির-বাগানের একটি ধারে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলে। সে ঘর যেন তুলে-আনা বনফুল। যেমনি তৈরি হল অমনি যেন মুষড়ে গেল। বাস করতে গেলেম, কেবল লজ্জা পেলেম।

তার পরে একদিন স্নানযাত্রা।

নদীতে নাইতে গেছি। সঙ্গে একশো সাত জন সঙ্গিনী। জলের মধ্যে পাল্কি নামিয়ে দিলে, স্নান হল।

পথে ফিরে আসছি, পাল্কির দরজা একটু ফাঁক করে দেখি, ও কোন্ ঘরের বউ গা। যেন নির্মাল্যের ফুল। হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায় ক'রে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠছে।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'মেয়েটি কে, কোন্ দেবমন্দিরে তপস্যা করে।'

ছত্রধারিণী হেসে বললে, 'চিনতে পারলে না? ঐ তো দুয়োরানী।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ, রোজ সকালে নদীতে নেয়ে মাটির ঘড়ায় জল তুলে আনব বকুলতলার রাস্তা দিয়ে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

রাস্তায় রাস্তায় পাহারা বসল, লোকজন গেল সরে।

সাদা শাঁখা পরলেম আর লালপেড়ে শাড়ি। নদীতে স্নান সেরে ঘড়ায় করে জল তুলে আনলেম। দুয়োরের কাছে এসে মনের দুঃখে ঘড়া আছড়ে ভাঙলেম। যা ভেবেছিলেম তা হল না, শুধু লজ্জা পেলেম।

তার পরে সেদিন রাসযাত্রা।

মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁবু পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল, গান হল।

পরদিন সকালে হাতির উপর হাওদা চড়ল। পর্দার আড়ালে বসে ঘরে ফিরছি, এমন সময় দেখি, বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চূড়ায় তার বনফুলের মালা। হাতে তার ডালি; তাতে শালুক ফুল, তাতে বনের ফল, তাতে খেতের শাক।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'কোন্ ভাগ্যবতীর ছেলে পথ আলো করেছে।'

ছত্রধারিণী বললে, 'জান না? ঐ তো দুয়োরানীর ছেলে। ওর মার জন্যে নিয়ে চলেছে শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ, রোজ খাব শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক; আমার ছেলে নিজের হাতে তুলে আনবে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

সোনার পালঙ্কে বসে আছি, ছেলে ডালি নিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গে ঘাম, তার মুখে রাগ। ডালি পড়ে রইল, লজ্জা পেলেম।

তার পরে আমার কী হল কী জানি।

একলা বসে থাকি, মুখে কথা নেই। রাজা রোজ এসে আমাকে শুধোয়, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

সুয়োরানী হয়েও কী চাই সে কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারি নে। তাই তোমাকে ডেকেছি, স্যাঙাৎনি। আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে, 'ঐ দুয়োরানীর দুঃখ আমি চাই।' "

স্যাঙাৎনি গালে হাত দিয়ে বললে, "কেন বলো তো।"

সুয়োরানী বললে, "ওর ঐ বাঁশের বাঁশিতে সুর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।"

বিদূষক

কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী। চন্দনে, হাতির দাঁতে, আর সোনামানিকে হাতি বোঝাই হল।

দেশে ফেরবার পথে বলেশ্বরীর মন্দির বলির রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে রাজা পুজো দিলেন।

পুজো দিয়ে চলে আসছেন— গায়ে রক্তবস্ত্র, গলায় জবার মালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক; সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আর বিদূষক।

এক জায়গায় দেখলেন, পথের ধারে আমবাগানে ছেলেরা খেলা করছে।

রাজা তাঁর দুই সঙ্গীকে বললেন, "দেখে আসি, ওরা কী খেলছে।"

২

ছেলেরা দুই সারি পুতুল সাজিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে কার যুদ্ধ।"

তারা বললে, "কর্ণাটের সঙ্গে কাঞ্চীর।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার জিত, কার হার।"

ছেলেরা বুক ফুলিয়ে বললে, "কর্ণাটের জিত, কাঞ্চীর হার।"

মন্ত্রীর মুখ গম্ভীর হল, রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ, বিদূষক হা হা ক'রে হেসে উঠল।

৩

রাজা যখন তাঁর সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন, তখনো ছেলেরা খেলছে।

রাজা হুকুম করলেন, "এক-একটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বাঁধো, আর লাগাও বেত।"

গ্রাম থেকে তাদের মা-বাপ ছুটে এল। বললে, "ওরা অবোধ, ওরা খেলা করছিল, ওদের মাপ করো।"

রাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন, "এই গ্রামকে শিক্ষা দেবে, কাঞ্চীর রাজাকে কোনোদিন যেন ভুলতে না পারে।"

এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।

৪

সন্ধেবেলায় সেনাপতি রাজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করে বললে, "মহারাজ, শৃগাল কুকুর ছাড়া এ গ্রামে কারো মুখে শব্দ শুনতে পাবে না।"

মন্ত্রী বললে, "মহারাজের মান রক্ষা হল।"

পুরোহিত বললে, "বিশ্বেশ্বরী মহারাজের সহায়।"

বিদূষক বললে, "মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন।"

রাজা বললেন, "কেন।"

বিদূষক বললে, "আমি মারতেও পারি নে, কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।"

৩

ঘোড়া

সৃষ্টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে ব'লে, হেনকালে ব্রহ্মার মাথায় একটা ভাবোদয় হল।

ভাণ্ডারীকে ডেকে বললেন, "ওহে ভাণ্ডারী, আমার কারখানাঘরে কিছু কিছু পঞ্চভূতের জোগাড় করে আনো, আর-একটা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করব।"

ভাণ্ডারী হাত জোড় করে বললে, "পিতামহ, আপনি যখন উৎসাহ করে হাতি গড়লেন, তিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ ব্যাঘ্র গড়লেন, তখন হিসাবের দিকে আদৌ খেয়াল করলেন না। যতগুলো ভারী আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্ষিতি অপ্ তেজ তলায় এসে ঠেকেছে। থাকবার মধ্যে আছে মরুৎ ব্যোম, তা সে যত চাই।"

চতুর্মুখ কিছুক্ষণ ধরে চারজোড়া গোঁফে তা দিয়ে বললেন, "আচ্ছা ভালো, ভাণ্ডারে যা আছে তাই নিয়ে এসো, দেখা যাক।"

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি-অপ-তেজটাকে খুব হাতে রেখে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিঙ, না দিলেন নখ; আর দাঁত যা দিলেন তাতে চিবনো চলে, কামড়ানো চলে না। তেজের ভাণ্ড থেকে কিছু খরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কোনো কাজে লাগবার মতো হল কিন্তু তার লড়াইয়ের শখ রইল না। এই প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই একে দ্বিজ বলা চলে।

আর যাই হোক, সৃষ্টিকর্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় ষোলো-আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে ব'লে পণ ক'রে বসে। অন্য সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শখ। কিছু কাড়তে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলই পালাতে চায়— পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে 'না' হয়ে যাবে, এই তার মৎলব। জ্ঞানীরা বলেন, ধাতের মধ্যে মরুৎব্যোম যখন ক্ষিতি-অপ-তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন এইরকমই ঘটে।

ব্রহ্মা বড়ো খুশি হলেন। বাসার জন্যে তিনি অন্য জন্তুর কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর দৌড় দেখতে ভালোবাসেন ব'লে একে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মানুষ। কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছু জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে ছুটতে দেখে মনে মনে ভাবে, "এটাকে কোনো গতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাট করার বড়ো সুবিধে।"

ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আর কাঁধে মারে জুতোর শেল। তা ছাড়া আছে দলামলা।

মাঠে ছেড়ে রাখলে হাতছাড়া হবে, তাই ঘোড়াটার চারি দিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, কেউ কাড়ল না। কিন্তু, ঘোড়ার ছিল খোলা মাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে। প্রাণীটাকে মরুৎব্যোম মুক্তির দিকে অত্যন্ত উসকে দিলে, কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

যখন অসহ্য হল তখন ঘোড়া তার দেয়ালটার 'পরে লাথি চালাতে লাগল। তার পা যতটা জখম হল দেয়াল ততটা হল না; তবু, চুন বালি খ'সে দেয়ালের সৌন্দর্য নষ্ট হতে লাগল।

এতে মানুষের মনে বড়ো রাগ হল। বললে, "একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আট প্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে।"

মন পাবার জন্যে সইসগুলো এমনি উঠে পড়ে ডাণ্ডা চালালে যে, ওর আর লাথি চলল না। মানুষ তার পাড়াপড়শিকে ডেকে বললে, "আমার এই বাহনটির মতো এমন ভক্ত বাহন আর নেই।"

তারা তারিফ করে বললে, "তাই তো, একেবারে জলের মতো ঠাণ্ডা। তোমারই ধর্মের মতো ঠাণ্ডা।"

একে তো গোড়া থেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নখ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শূন্যে লাথি ছোঁড়াও বন্ধ। তাই মনটাকে খোলসা করবার জন্যে আকাশে মাথা তুলে সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগল। তাতে মানুষের ঘুম ভেঙে যায় আর পাড়াপড়শিরাও ভাবে, আওয়াজটা তো ঠিক ভক্তিগদ্‌গদ শোনাচ্ছে না। মুখ বন্ধ করবার অনেকরকম যন্ত্র বেরোল। কিন্তু, দম বন্ধ না করলে মুখ তো একেবারে

বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মুমূর্ষুর খাবির মতো মাঝে মাঝে বেরোতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বললেন, "নিশ্চয় তোমারই কীর্তি! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েছ।"

যম বললেন, "সৃষ্টিকর্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ। একবার মানুষের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখো।"

ব্রহ্মা দেখেন, অতি ছোটো জায়গা, চার দিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করছে।

হৃদয় তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বললেন, "আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মতো ওর নখদন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগবে না।"

মানুষ বললে, "ছি ছি, তাতে হিংস্রতার বড়ো প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু, যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগ্যই নয়। ওর হিতের জন্যেই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েছি। খাসা আস্তাবল।"

ব্রহ্মা জেদ করে বললেন, "ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।"

মানুষ বললে, "আচ্ছা, ছেড়ে দেব। কিন্তু, সাত দিনের মেয়াদে; তার পরে যদি বল, তোমার মাঠের চেয়ে আমার আস্তাবল ওর পক্ষে ভালো নয়, তা হলে নাকে খত দিতে রাজি আছি।"

মানুষ করলে কী, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে; কিন্তু, তার সামনের দুটো পায়ে কষে রশি বাঁধল। তখন ঘোড়া এমনি চলতে লাগল যে, ব্যাঙের চাল তার চেয়ে সুন্দর।

ব্রহ্মা থাকেন সুদূর স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখতে পান, তার হাঁটুর বাঁধন দেখতে পান না। তিনি নিজের কীর্তির এই ভাঁড়ের মতো চালচলন দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। বললেন, "ভুল করেছি তো।"

মানুষ হাত জোড় করে বললে, "এখন এটাকে নিয়ে করি কী। আপনার ব্রহ্মলোকে যদি মাঠ থাকে তো বরঞ্চ সেইখানে রওনা করে দিই।"

ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে বললেন, "যাও যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে।"

মানুষ বললে, "আদিদেব, মানুষের পক্ষে এ যে এক বিষম বোঝা।"

ব্রহ্মা বললেন, "সেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব।"

কর্তার ভূত

বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল, "তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।"

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। ভাবলে, "আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখবে কে।"

তা ব'লে মরণ তো এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বললেন, "ভাবনা কী। লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক্-না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।"

২

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল।

কেননা ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারো জন্যে মাথাব্যথাও নেই।

তবু স্বভাবদোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, "এই চোখ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাণুরা এই চলা চলত; ঘাসের মধ্যে, গাছের মধ্যে, আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।"

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভূতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এইজন্যে ভেবে পাওয়া যায় না, সেটাকে ফুটো করে কী উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে, বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাতে করে ভূতের রাজত্বে আর কিছুই না থাক্— অন্ন হোক, বস্ত্র হোক, স্বাস্থ্য হোক— শান্তি থাকে।

কত-যে শান্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা ওঝাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে।

৩

এই ভাবেই দিন চলত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারো মনে দ্বিধা জাগত না; চিরকালই গর্ব করতে পারত যে, এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোঁটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যা'ও করে না, ম্যা'ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে, যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি।

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।

৪

এ দিকে দিব্যি ঠাণ্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে 'খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো'।

সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা তো বলাই আছে।

কিন্তু, 'বর্গি এল দেশে'।

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে।

দেশে যত শিরোমণি চূড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "এমন হল কেন।"

তারা এক বাক্যে শিখা নেড়ে বললে, "এটা ভূতের দোষ নয়, ভুতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন।"

শুনে সকলেই বললে, "তা তো বটেই।" অত্যন্ত সান্ত্বনা বোধ করলে।

দোষ যারই থাক্, খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেঁকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, "খাজনা দাও।" আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, "খাজনা দাও।"

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে 'খাজনা দেব কিসে'।

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারো হুঁশ ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু, তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, "বেহুঁশ যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারাই অশুচি, অতএব হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ।"

শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

৫

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না 'খাজনা দেব কিসে'।

শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা ক'রে তার উত্তর আসে, "আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।"

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরও একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, "ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে।"

শুনে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আর মাসতুতো-পিসতুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, "কী সর্বনাশ। এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শুনি নি। তা হলে সনাতন ঘুমের কী হবে— সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের?"

প্রশ্নকারী বলে, "সে তো বুঝলুম, কিন্তু আধুনিকতম বুলবুলির ঝাঁক আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কী করা যায়।"

মাসিপিসি বলে, "বুলবুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।"

অর্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, "যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।"

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, "চুপ। এখনো ঘানি অচল হয় নি।"

শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

৬

মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, বুড়ো কর্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ, যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না, তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, "কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি।"

কর্তা বলেন, "ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।"

তারা বলে, "ভয় করে যে কর্তা।"

কর্তা বলেন, "সেইখানেই তো ভূত।"

তোতাকাহিনী

এক-যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, "এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাখিটাকে শিক্ষা দাও।"

২

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশবিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, "শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।" কেহ বলে, "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল।"

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, "অল্প পুঁথির কর্ম নয়।"

ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং

নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, "সাবাস। বিদ্যা আর ধরে না।"

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, "উন্নতি হইতেছে।"

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, "খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।"

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরী দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন!"

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।"

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি।"

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, "ঐ যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।"

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।"

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

৬

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দস্তুর-মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্ করে। এমন-কি, এক-একদিন দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, "এ কী বেয়াদবি।"

তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।"

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭

পাখিটা মরিল। কোন্‌কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, "পাখি মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়।"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম!"

"আর কি ওড়ে।"

"না।"

"আর কি গান গায়।"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।"

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

অস্পষ্ট

জানলার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় সামনের বাড়ির জীবনযাত্রা। রেখা আর ছেদ, দেখা আর না-দেখা দিয়ে সেই ছবি আঁকা।

একদিন পড়ার বই পড়ে রইল, বনমালীর চোখ গেল সেই দিকে।

সেদিন দেখে, সে বাড়ির ঘরকন্নার পুরোনো পটের উপর দুজন নতুন লোকের চেহারা। একজন বিধবা প্রবীণা, আর-একটি মেয়ের বয়স ষোলো হবে কি সতেরো।

সেই প্রবীণা জানলার ধারে বসে মেয়েটির চুল বেঁধে দিচ্ছে, আর মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়ছে।

আর-একদিন দেখা গেল, চুল বাঁধবার লোকটি নেই। মেয়েটি দিনান্তের শেষ আলোতে ঝুঁকে প'ড়ে বোধ হল যেন একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের ফ্রেম আঁচল দিয়ে মাজছে।

তার পর দেখা যায়, জানলার ছেদগুলির মধ্যে দিয়ে ওর প্রতি দিনের কাজের ধারা— কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল বাছা, জাঁতি হাতে সুপুরি কাটা, স্নানের পরে বাঁ হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভিজে চুল শুকোনো, বারান্দার রেলিঙের উপরে বালাপোষ রোদ্দুরে মেলে দেওয়া।

দুপুরবেলায় পুরুষেরা আপিসে; মেয়েরা কেউ বা ঘুমোয়, কেউ বা তাস খেলে; ছাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বক্‌বকম্‌ মিইয়ে আসে।

সেই সময়ে মেয়েটি ছাতের চিলেকোঠায় পা মেলে বই পড়ে; কোনোদিন বা বইয়ের উপর কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাঁধা চুল কপালের উপরে থমকে থাকে, আর আঙুল যেন চলতে চলতে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

একদিন বাধা পড়ল। সেদিন সে খানিকটা লিখছে চিঠি, খানিকটা খেলছে কলম নিয়ে, আর আলসের উপরে একটা কাক আধখাওয়া আমের আঁঠি ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

এমন সময়ে যেন পঞ্চমীর অন্যমনা চাঁদের কোণার পিছনে পা টিপে টিপে একটা মোটা মেঘ এসে দাঁড়ালো। মেয়েটি আধাবয়সি। তার মোটা হাতে মোটা কাঁকন। তার সামনের চুল ফাঁক, সেখানে সিঁথির জায়গায় মোটা সিঁদুর আঁকা।

বালিকার কোল থেকে তার না-শেষ-করা চিঠিখানা সে আচমকা ছিনিয়ে নিলে। বাজপাখি হঠাৎ পায়রার পিঠের উপর পড়ল।

ছাতে আর মেয়েটিকে দেখা যায় না। কখনো বা গভীর রাতে, কখনো বা সকালে বিকালে, ঐ বাড়ি থেকে এমন-সব আভাস আসে যার থেকে বোঝা যায়, সংসারটার তলা ফাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প বেরিয়ে আসবার জন্যে মাথা ঠুকছে।

এ দিকে জানলার ফাঁকে ফাঁকে চলছে ডাল বাছা আর পান সাজা; ক্ষণে ক্ষণে দুধের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেছে উঠোনে কলতলায়।

এমনি কিছুদিন যায়। সেদিন কার্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলা; ছাদের উপর আকাশপ্রদীপ জ্বলেছে, আস্তাবলের ধোঁয়া অজগর সাপের মতো পাক দিয়ে আকাশের নিশ্বাস বন্ধ করে দিলে।

বনমালী বাইরে থেকে ফিরে এসে যেমনি ঘরের জানলা খুলল অমনি তার চোখে পড়ল, সেই মেয়েটি ছাদের উপর হাত জোড় করে স্থির দাঁড়িয়ে। তখন গলির শেষ প্রান্তে মল্লিকদের ঠাকুরঘরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। অনেক ক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে বারবার সে প্রণাম করলে; তার পরে চলে গেল।

সেদিন বনমালী নীচে গিয়েই চিঠি লিখলে। লিখেই নিজে গিয়ে তখনি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একমনে কামনা করতে লাগল, সে চিঠি যেন না পৌঁছয়। সকালবেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন মুখ তুলে চাইতে পারলে না।

সেই দিনই বনমালী মধুপুরে চলে গেল; কোথায় গেল কাউকে বলে গেল না।

কলেজ খোলবার সময় সময় ফিরে এল। তখন সন্ধ্যাবেলা। সামনের বাড়ির আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার। ওরা সব গেল কোথায়।

বনমালী বলে উঠল, "যাক, ভালোই হয়েছে।"

ঘরে ঢুকে দেখে ডেস্কের উপরে একরাশ চিঠি। সব-নীচের চিঠির শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অক্ষরে, তাতে পাড়ার পোস্ট-আপিসের ছাপ।

চিঠিখানি হাতে করে সে বসে রইল। লেফাফা খুললে না। কেবল আলোর সামনে তুলে ধরে দেখলে। জানালার ভিতর দিয়ে জীবনযাত্রার যেমন অস্পষ্ট ছবি, আবরণের ভিতর দিয়ে তেমনি অস্পষ্ট অক্ষর।

একবার খুলতে গেল, তার পরে বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে দিলে; শপথ করে বললে, "এ চিঠি কোনোদিন খুলব না।"

পট

যে শহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্বপরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশী, পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যাবসা।

সে মনে ভাবে, "ধনী ছিলেম, ধন গিয়েছে, হয়েছে ভালো। দিনরাত দেবতার রূপ ভাবি, দেবতার প্রসাদে খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই মান কে কাড়তে পারে।"

এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজা আদর করে আনলে। সেদিন তাই নিয়ে শহরে খুব ধুম।

কেবল অভিরামের তুলি সেদিন চলল না।

নতুন রাজমন্ত্রী, এই তো সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে, যাকে অভিরামের বাপ মানুষ করে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস হল সিঁধকাঠি, তাই দিয়ে বুড়োর সর্বস্ব সে হরণ করলে। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।

যে ঘরে অভিরাম পট আঁকে সেই তার ঠাকুরঘর; সেখানে গিয়ে হাত জোড় করে বললে, "এই জন্যেই কি এতকাল রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমাকে স্মরণ করে এলেম। এত দিনে বর দিলে কি এই অপমান।"

২

এমন সময় রথের মেলা বসল।

সেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিনতে এল, সেই ভিড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক-লশকর।

সে একটি পট বেছে নিয়ে বললে, "আমি কিনব।"

অভিরাম তার নফরকে জিজ্ঞাসা করলে, "ছেলেটি কে।"

সে বললে, "আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।"

অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বললে, "বেচব না।"

শুনে ছেলের আবদার আরও বেড়ে উঠল। বাড়িতে এসে সে খায় না, মুখ ভার করে থাকে।

অভিরামকে মন্ত্রী থলিভরা মোহর পাঠিয়ে দিলে; মোহরভরা থলি মন্ত্রীর কাছে ফিরে এল।

মন্ত্রী মনে মনে বললে, "এত বড়ো স্পর্ধা!"

অভিরামের উপর যতই উৎপাত হতে লাগল ততই সে মনে মনে বললে, "এই আমার জিত।"

৩

প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইষ্টদেবতার একখানি করে ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোনো পূজা সে জানে না।

একদিন দেখলে, ছবি তার মনের মতো হয় না। কী যেন বদল হয়ে গেছে। কিছুতে তার ভালো লাগে না। তাকে যেন মনে মনে মারে।

দিনে দিনে সেই সূক্ষ্ম বদল স্থূল হয়ে উঠতে লাগল। একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বললে, "বুঝতে পেরেছি।"

আজ সে স্পষ্ট দেখলে, দিনে দিনে তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মতো হয়ে উঠছে।

তুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে, "মন্ত্রীরই জিত হল।"

সেইদিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বললে, "এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।"

মন্ত্রী বললে, "কত দাম।"

অভিরাম বললে, "আমার দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।"

মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলে না।

নতুন পুতুল

এই গুণী কেবল পুতুল তৈরি করত ; সে পুতুল রাজবাড়ির মেয়েদের খেলার জন্যে।

বছরে বছরে রাজবাড়ির আঙিনায় পুতুলের মেলা বসে। সেই মেলায় সকল কারিগরই এই গুণীকে প্রধান মান দিয়ে এসেছে।

যখন তার বয়স হল প্রায় চার কুড়ি, এমন সময় মেলায় এক নতুন কারিগর এল। তার নাম কিষণলাল, বয়স তার নবীন, নতুন তার কায়দা।

যে পুতুল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়ে না, কিছু রঙ দেয় কিছু বাকি রাখে। মনে হয়, পুতুলগুলো যেন ফুরোয় নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না।

নবীনের দল বললে, "লোকটা সাহস দেখিয়েছে।"

প্রবীণের দল বললে, "একে বলে সাহস ? এ তো স্পর্ধা।"

কিন্তু, নতুন কালের নতুন দাবি। এ কালের রাজকন্যারা বলে, "আমাদের এই পুতুল চাই।"

সাবেক কালের অনুচরেরা বলে, "আরে ছিঃ।"

শুনে তাদের জেদ বেড়ে যায়।

বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তার ঝাঁকাভরা পুতুল যেন খেয়ার অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মতো ও পারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এক বছর যায়, দু বছর যায়, বুড়োর নাম সবাই ভুলেই গেল। কিষণলাল হল রাজবাড়ির পুতুলহাটের সর্দার।

২

বুড়োর মন ভাঙল, বুড়োর দিনও চলে না। শেষকালে তার মেয়ে এসে তাকে বললে, "তুমি আমার বাড়িতে এসো।"

জামাই বললে, "খাও দাও, আরাম করো, আর সবজির খেত থেকে গোরু বাছুর খেদিয়ে রাখো।"

বুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকরনার কাজে। তার জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ, আর নৌকো বোঝাই করে শহরে নিয়ে যায়।

নতুন কাল এসেছে সে কথা বুড়ো বোঝে না, তেমনিই সে বোঝে না যে, তার নাৎনির বয়স হয়েছে ষোলো।

যেখানে গাছতলায় ব'সে বুড়ো খেত আগলায় আর ক্ষণে ক্ষণে ঘুমে ঢুলে পড়ে সেখানে নাৎনি গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে; বুড়োর বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত খুশি হয়ে ওঠে। সে বলে, "কী দাদি, কী চাই।"

নাৎনি বলে, "আমাকে পুতুল গড়িয়ে দাও, আমি খেলব।"

বুড়ো বলে, "আরে ভাই, আমার পুতুল তোর পছন্দ হবে কেন।"

নাৎনি বলে, "তোমার চেয়ে ভালো পুতুল কে গড়ে শুনি।"

বুড়ো বলে, "কেন, কিষণলাল।"

নাৎনি বলে, "ইস্! কিষণলালের সাধ্যি!"

দুজনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েছে। বারে বারে একই কথা।

তার পরে বুড়ো তার ঝুলি থেকে মালমশলা বের করে; চোখে মস্ত গোল চশমাটা আঁটে।

নাৎনিকে বলে, "কিন্তু দাদি, ভুট্টা যে কাকে খেয়ে যাবে।"

নাৎনি বলে, "দাদা, আমি কাক তাড়াব।"

বেলা বয়ে যায়; দূরে ইঁদারা থেকে বলদে জল টানে, তার শব্দ আসে; নাৎনি কাক তাড়ায়, বুড়ো বসে বসে পুতুল গড়ে।

৩

বুড়োর সকলের চেয়ে ভয় তার মেয়েকে। সেই গিন্নির শাসন বড়ো কড়া, তার সংসারে সবাই থাকে সাবধানে।

বুড়ো আজ একমনে পুতুল গড়তে বসেছে; হুঁশ হল না, পিছন থেকে তার মেয়ে ঘন ঘন হাত দুলিয়ে আসছে।

কাছে এসে যখন সে ডাক দিলে তখন চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে অবোধ ছেলের মতো তাকিয়ে রইল।

মেয়ে বললে, "দুধ দোওয়া পড়ে থাক্, আর তুমি সুভদ্রাকে নিয়ে বেলা বইয়ে দাও। অত বড়ো মেয়ে, ওর কি পুতুলখেলার বয়স।"

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সুভদ্রা খেলবে কেন। এ পুতুল রাজবাড়িতে বেচব। আমার দাদির যেদিন বর আসবে সেদিন তো ওর গলায় মোহরের মালা পরাতে হবে। আমি তাই টাকা জমাতে চাই।"

মেয়ে বিরক্ত হয়ে বললে, "রাজবাড়িতে এ পুতুল কিনবে কে।"

বুড়োর মাথা হেঁট হয়ে গেল। চুপ করে বসে রইল।

সুভদ্রা মাথা নেড়ে বললে, "দাদার পুতুল রাজবাড়িতে কেমন না কেনে দেখব।"

৪

দু দিন পরে সুভদ্রা এক কাহন সোনা এনে মাকে বললে, "এই নাও, আমার দাদার পুতুলের দাম।"

মা বললে, "কোথায় পেলি।"

মেয়ে বললে, "রাজপুরীতে গিয়ে বেচে এসেছি।"

বুড়ো হাসতে হাসতে বললে, "দাদি, তবু তো তোর দাদা এখন চোখে ভালো দেখে না, তার হাত কেঁপে যায়।"

মা খুশি হয়ে বললে, "এমন ষোলোটা মোহর হলেই তো সুভদ্রার গলার হার হবে।"

বুড়ো বললে, "তার আর ভাবনা কী।"

সুভদ্রা বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "দাদাভাই, আমার বরের জন্যে তো ভাবনা নেই।"

বুড়ো হাসতে লাগল, আর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে।

৫

বুড়োর যৌবন যেন ফিরে এল। সে গাছের তলায় বসে পুতুল গড়ে আর সুভদ্রা কাক তাড়ায়, আর দূরে ইঁদারায় বলদে ক্যাঁ-কোঁ করে জল টানে।

একে একে ষোলোটা মোহর গাঁথা হল, হার পূর্ণ হয়ে উঠল।

মা বললে, "এখন বর এলেই হয়।"

সুভদ্রা বুড়োর কানে কানে বললে, "দাদাভাই, বর ঠিক আছে।"

দাদা বললে, "বল্‌ তো দাদি, কোথায় পেলি বর।"

সুভদ্রা বললে, "যেদিন রাজপুরীতে গেলেম দ্বারী বললে, কী চাও। আমি বললেম, রাজকন্যাদের কাছে পুতুল বেচতে চাই। সে বললে, এ পুতুল এখনকার দিনে চলবে না। ব'লে আমাকে ফিরিয়ে দিলে। একজন মানুষ আমার কান্না দেখে বললে, দাও তো, ঐ পুতুলের একটু সাজ ফিরিয়ে দিই, বিক্রি হয়ে যাবে। সেই মানুষটিকে তুমি যদি পছন্দ কর দাদা, তা হলে আমি তার গলায় মালা দিই।"

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, "সে আছে কোথায়।"

নাৎনি বললে, "ঐ যে, বাইরে পিয়ালগাছের তলায়।"

বর এল ঘরের মধ্যে ; বুড়ো বললে, "এ যে কিষণলাল।"

কিষণলাল বুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "হাঁ, আমি কিষণলাল।"

বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, "ভাই, একদিন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে আমার হাতের পুতুলকে, আজ নিলে আমার প্রাণের পুতুলটিকে।"

নাৎনি বুড়োর গলা ধরে তার কানে কানে বললে, "দাদা, তোমাকে সুদ্ধ।"

উপসংহার

ভোজরাজের দেশে যে মেয়েটি ভোরবেলাতে দেবমন্দিরে গান গাইতে যায় সে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে।

আচার্য বলেন, "একদিন শেষরাত্রে আমার কানে একখানি সুর লাগল। তার পরে সেইদিন যখন সাজি নিয়ে পারুলবনে ফুল তুলতে গেছি তখন এই মেয়েটিকে ফুলগাছতলায় কুড়িয়ে পেলেম।"

সেই অবধি আচার্য মেয়েটিকে আপন তম্বুরাটির মতো কোলে নিয়ে মানুষ করেছে ; এর মুখে যখন কথা ফোটে নি এর গলায় তখন গান জাগল।

আজ আচার্যের কণ্ঠ ক্ষীণ, চোখে ভালো দেখেন না। মেয়েটি তাঁকে শিশুর মতো মানুষ করে।

কত যুবা দেশ বিদেশ থেকে এই মেয়েটির গান শুনতে আসে। তাই দেখে মাঝে মাঝে আচার্যের বুক কেঁপে ওঠে ; বলেন, "যে বোঁটা আলগা হয়ে আসে ফুলটি তাকে ছেড়ে যায়।"

মেয়েটি বলে, "তোমাকে ছেড়ে আমি এক পলক বাঁচি নে।"

আচার্য তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলেন, "যে গান আজ আমার কণ্ঠ ছেড়ে গেল সেই গান তোরই মধ্যে রূপ নিয়েছে। তুই যদি ছেড়ে যাস তা হলে আমার চিরজন্মের সাধনাকে আমি হারাব।"

২

ফাগুনপূর্ণিমায় আচার্যের প্রধান শিষ্য কুমারসেন গুরুর পায়ে একটি আমের মঞ্জরী রেখে প্রণাম করলে। বললে, "মাধবীর হৃদয় পেয়েছি, এখন প্রভুর যদি সম্মতি পাই তা হলে দুজনে মিলে আপনার চরণসেবা করি।"

আচার্যের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললেন, "আনো দেখি আমার তম্বুরা। আর, তোমরা দুইজনে রাজার মতো, রানীর মতো, আমার সামনে এসে বসো।"

তম্বুরা নিয়ে আচার্য গান গাইতে বসলেন। দুলহা-দুলহীর গান, সাহানার সুরে। বললেন, "আজ আমার জীবনের শেষ গান গাব।"

এক পদ গাইলেন। গান আর এগোয় না। বৃষ্টির ফোঁটায় ভেরে-ওঠা জুঁইফুলটির মতো হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে খসে পড়ে। শেষে তম্বুরাটি কুমারসেনের হাতে দিয়ে বললেন, "বৎস, এই লও আমার যন্ত্র।"

তার পরে মাধবীর হাতখানি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এই লও আমার প্রাণ।"

তার পরে বললেন, "আমার গানটি দুজনে মিলে শেষ করে দাও, আমি শুনি।"

মাধবী আর কুমার গান ধরলে— সে যেন আকাশ আর পূর্ণচাঁদের কণ্ঠ মিলিয়ে গাওয়া।

৩

এমন সময়ে দ্বারে এল রাজদূত, গান থেমে গেল।

আচার্য কাঁপতে কাঁপতে আসন থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজের কী আদেশ।"

দূত বললে, "তোমার মেয়ের ভাগ্য প্রসন্ন, মহারাজ তাকে ডেকেছেন।"

আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ইচ্ছা তাঁর।"

দূত বললে, "আজ রাত পোয়ালে রাজকন্যা কাম্বোজে পতিগৃহে যাত্রা করবেন, মাধবী তাঁর সঙ্গিনী হয়ে যাবে।"

রাত পোয়ালো, রাজকন্যা যাত্রা করলে।

২৬।১০

মহিষী মাধবীকে ডেকে বললে, "আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে যাতে প্রসন্ন থাকে সে ভার তোমার উপরে।"

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন রৌদ্র ঠিকরে পড়ল।

৪

রাজকন্যার ময়ূরপংখি আগে যায়, আর তার পিছে পিছে যায় মাধবীর পাল্কি। সে পাল্কি কিংখাবে ঢাকা, তার দুই পাশে পাহারা।

পথের ধারে ধুলোর উপরে ঝড়ে-ভাঙা অশ্বত্থডালের মতো পড়ে রইলেন আচার্য, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুমারসেন।

পাখিরা গান গাইছিল পলাশের ডালে; আমের বোলের গন্ধে বাতাস বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। পাছে রাজকন্যার মন প্রবাসে কোনোদিন ফাগুনসন্ধ্যায় হঠাৎ নিমেষের জন্য উতলা হয়, এই চিন্তায় রাজপুরীর লোকে নিশ্বাস ফেললে।

পুনরাবৃত্তি

সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন।

দেখতে পেলেন, প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে খেলা করছে একটি ছোটো ছেলে আর একটি ছোটো মেয়ে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী খেলছ।"

তারা বললে, "আমাদের আজকের খেলা রামসীতার বনবাস।"

রাজা সেখানে বসে গেলেন।

ছেলেটি বললে, "এই আমাদের দণ্ডকবন, এখানে কুটীর বাঁধছি।"

সে একরাশ ভাঙা ডালপালা খড় ঘাস জুটিয়ে এনেছে, ভারি ব্যস্ত।

আর, মেয়েটি শাক পাতা নিয়ে খেলার হাঁড়িতে বিনা আগুনে রাঁধছে; রাম খাবেন, তারই আয়োজনে সীতার এক দণ্ড সময় নেই।

রাজা বললেন, "আর তো সব দেখছি, কিন্তু রাক্ষস কোথায়।"

ছেলেটিকে মানতে হল, তাদের দণ্ডকবনে কিছু কিছু ত্রুটি আছে।

রাজা বললেন, "আচ্ছা, আমি হব রাক্ষস।"

ছেলেটি তাঁকে ভালো করে দেখলে। তার পরে বললে, "তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।"

রাজা বললেন, "আমি খুব ভালো হারতে পারি। পরীক্ষা করে দেখো।"

সেদিন রাক্ষসবধ এতই সুচারুরূপে হতে লাগল যে, ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন এক বেলাতে তাঁকে দশবারোটা রাক্ষসের মরণ একলা মরতে হল। মরতে মরতে হাঁপিয়ে উঠলেন।

ত্রেতাযুগে পঞ্চবটীতে যেমন পাখি ডেকেছিল সেদিন সেখানে ঠিক তেমনি করেই ডাকতে লাগল। ত্রেতাযুগে সবুজ পাতার পর্দায় পর্দায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন সুর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক সেই সুরই বাঁধলে।

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল।

মন্ত্রীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলে মেয়ে দুটি কার।"

মন্ত্রী বললে, "মেয়েটি আমারই, নাম রুচিরা। ছেলের নাম কৌশিক, ওর বাপ গরিব ব্রাহ্মণ, দেবপূজা করে দিন চলে।"

রাজা বললেন, "যখন সময় হবে এই ছেলেটির সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হয়, এই আমার ইচ্ছা।"

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস করলে না, মাথা হেঁট করে রইল।

২

দেশে সবচেয়ে যিনি বড়ো পণ্ডিত রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চবংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে রুচিরা।

কৌশিক যেদিন তাঁর পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসন্ন হল না। অন্য সকলেও লজ্জা পেলে। কিন্তু, রাজার ইচ্ছা।

সকলের চেয়ে সংকট রুচিরার। কেননা, ছেলেরা কানাকানি করে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয় সে পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে সে উত্তর করে না।

রুচির প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, রুচিরও সেই ছিল পণ।

মনে হল, সেটা খুব সহজেই ঘটবে, কারণ কৌশিক পড়ে বটে কিন্তু একমনে নয়। তার সাঁতার কাটতে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যন্ত্র বাজায়।

অধ্যাপক তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, "বিদ্যায় তোমার অনুরাগ নেই কেন।"

সে বলে, "আমার অনুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও নানা জিনিসে।"

অধ্যাপক বলেন, "সে-সব অনুরাগ ছাড়ো।"

সে বলে, "তা হলে বিদ্যার প্রতিও আমার অনুরাগ থাকবে না।"

৩

এমনি করে কিছু কাল যায়।

রাজা অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে।"

অধ্যাপক বললেন, "রুচিরা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কৌশিক ?"

অধ্যাপক বললেন, "সে যে কিছুই শিখেছে এমন বোধ হয় না।"

রাজা বললেন, "আমি কৌশিকের সঙ্গে রুচির বিবাহ ইচ্ছা করি।"

অধ্যাপক একটু হাসলেন; বললেন, "এ যেন গোধূলির সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব।"

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "তোমার কন্যার সঙ্গে কৌশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত নয়।"

মন্ত্রী বললে, "মহারাজ, আমার কন্যা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।"

রাজা বললেন, "স্ত্রীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়।"

মন্ত্রী বললে, "তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

রাজা বললেন, "সে কি মনে করে কৌশিক তার অযোগ্য।"

মন্ত্রী বললে, "হাঁ, সেই কথাই বটে।"

রাজা বললেন, "আমার সামনে দুজনের বিদ্যার পরীক্ষা হোক। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।"

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বললে, "এই পণে আমার কন্যার মত আছে।"

৪

বিচারসভা প্রস্তুত। রাজা সিংহাসনে ব'সে, কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে।

স্বয়ং অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে প্রণাম ও রুচিকে নমস্কার করলে। রুচি দৃক্‌পাত করলে না।

কোনোদিন পাঠশালার রীতিপালনের জন্যেও কৌশিক রুচির সঙ্গে তর্ক করে নি। অন্য ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে তাকে তর্কের অবকাশ দিত না। তাই আজ যখন তার

যুক্তির মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তীরের ফলায় আলোর মতো ঝিক্‌মিক্ করে উঠল তখন গুরু বিস্মিত হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। রুচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির রাখতে পারলে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

ক্রোধে অধ্যাপকের বাক্‌রোধ হল, আর রুচির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগল।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, "এখন, বিবাহের দিন স্থির করো।"

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে বললে, "ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আমি করব না।"

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, "জয়লব্ধ পুরস্কার গ্রহণ করবে না?"

কৌশিক বললে, "জয় আমারই থাক্, পুরস্কার অন্যের হোক।"

অধ্যাপক বললেন, "মহারাজ, আর এক বছর সময় দিন, তার পরে শেষ পরীক্ষা।"

সেই কথাই স্থির হল।

৫

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে গেল। কোনোদিন সকালে তাকে বনের ছায়ায়, কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা যায়।

এ দিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। কিন্তু, রুচির সমস্ত মন কোথায়।

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, "এখনও যদি সতর্ক না হও তবে দ্বিতীয়বার তোমাকে লজ্জা পেতে হবে।"

দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার জন্যেই যেন সে তপস্যা করতে লাগল। অপর্ণার তপস্যা যেমন অনশনের, রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের। ষড়্‌দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই রইল, এমন-কি কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

অধ্যাপক রাগ করে বললেন, "কপিল-কণাদের নামে শপথ করে বলছি, আর কখনো স্ত্রীলোক ছাত্র নেব না। বেদবেদান্তের পার পেয়েছি, স্ত্রীজাতির মন বুঝতে পারলেম না।"

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বললে, "ভবদত্তর বাড়ি থেকে কন্যার সম্বন্ধ এসেছে। কুলে শীলে ধনে মানে তারা অদ্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কন্যা কী বলে।"

মন্ত্রী বললে, "মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তার চোখের জল আজ কী রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

মন্ত্রী চুপ করে রইল।

৬

রাজা তাঁর বাগানে এসে বসলেন। মন্ত্রীকে বললেন, "তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

রুচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

রাজা বললেন, "বৎসে, সেই রামের বনবাসের খেলা মনে আছে?"

রুচিরা স্মিতমুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, "আজ সেই রামের বনবাস খেলা আর-একবার দেখতে আমার বড়ো সাধ।"

রুচিরা মুখের এক পাশে আঁচল টেনে চুপ করে রইল।

রাজা বললেন, "বনও আছে, রামও আছে, কিন্তু শুনছি বৎসে, এবার সীতার অভাব ঘটেছে। তুমি মনে করলেই সে অভাব পূরণ হয়।"

রুচিরা কোনো কথা না ব'লে রাজার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে।

রাজা বললেন, "কিন্তু, বৎসে, এবার আমি রাক্ষস সাজতে পারব না।"

রুচিরা স্নিগ্ধ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাজা বললেন, "এবার রাক্ষস সাজবে তোমাদের অধ্যাপক।"

সিদ্ধি

স্বর্গের অধিকারে মানুষ বাধা পাবে না, এই তার পণ। তাই, কঠিন সন্ধানে অমর হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়েছে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে ক'রে তার জন্যে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরনার জল।

ক্রমে তপস্যা এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁয় না, পাখিতে এসে ঠুকরে খেয়ে যায়।

আরও কিছু দিন গেল। তখন ঝরনার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়, মুখে ওঠে না।

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, "এখন আমি করব কী! আমার সেবা যে বৃথা হতে চলল।"

তার পর থেকে ফুল তুলে সে তপস্বীর পায়ের কাছে রেখে যায়, তপস্বী জানতেও পারে না।

মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে ধ'রে ছায়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু, তপস্বীর কাছে রোদও যা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়নি সেখানে জেগে বসে থাকে। তাপসের কোনো ভয়ের কারণ নেই, তবু সে পাহারা দেয়।

২

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখা হলে নবীন তপস্বী স্নেহ করে জিজ্ঞাসা করত, "কেমন আছ।"

কাঠকুড়নি বলত, "আমার ভালোই কী আর মন্দই কী। কিন্তু, তোমাকে দেখবার লোক কি কেউ নেই। তোমার মা, তোমার বোন?"

সে বলত, "আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কী। তারা কি আমায় চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।"

কাঠকুড়নি বলত, "প্রাণ থাকে না বলেই তো প্রাণের জন্যে এত দরদ।"

তাপস বলত, "আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচবার পথ। মানুষকে আমি অমর করব।"

এই বলে সে কত কী বলে যেত; তার নিজের সঙ্গে নিজের কথা, সে কথার মানে বুঝবে কে।

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্তু আকাশে নবমেঘের ডাকে ময়ূরীর যেমন হয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার পরে আরও কিছু দিন যায়। তপস্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে কোনো কথা বলে না।

তার পরে আরও কিছু দিন যায়। তপস্বীর চোখ বুজে এল, মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল, সে আর ঐ তাপসের মাঝখানে যেন তপস্যার লক্ষ যোজন ক্রোশের দূরত্ব। হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার হয়ে একটুখানি কাছে আসবার আশা নেই।

তা নাই বা রইল আশা। তবু ওর কান্না আসে; মনে মনে বলে, দিনে একবার

যদি বলেন 'কেমন আছ' তা হলে সেই কথাটুকুতে দিন কেটে যায়, এক বেলা যদি একটু ফল আর জল গ্রহণ করেন তা হলে অন্নজল ওর নিজের মুখে রোচে।

৩

এ দিকে ইন্দ্রলোকে খবর পৌঁছল, মানুষ মর্তকে লঙ্ঘন করে স্বর্গ পেতে চায়— এত বড়ো স্পর্ধা।

ইন্দ্র প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বললেন, "দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়েছিল বাহুবলে, তার সঙ্গে লড়াই চলেছিল; মানুষ স্বর্গ নিতে চায় দুঃখের বলে, তার কাছে কি হার মানতে হবে।"

মেনকাকে মহেন্দ্র বললেন, "যাও, তপস্যা ভঙ্গ করোগে।"

মেনকা বললেন, "সুররাজ, স্বর্গের অস্ত্রে মর্তের মানুষকে যদি পরাস্ত করেন তবে তাতে স্বর্গের পরাভব। মানবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই।"

ইন্দ্র বললেন, "সে কথা সত্য।"

৪

ফাল্গুনমাসে দক্ষিণহাওয়ার দোলা লাগতেই মর্মরিত মাধবীলতা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তেমনি ঐ কাঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দনবনের হাওয়া এসে লাগল, আর তার দেহমন একটা কোন্ উৎসুক মাধুর্যের উন্মেষে উন্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠল। তার মনের ভাবনাগুলি চাকছাড়া মৌমাছির মতো উড়তে লাগল, কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েছে।

ঠিক সেই সময়ে সাধনার একটা পালা শেষ হল। এইবার তাকে যেতে হবে নির্জন গিরিগুহায়। তাই সে চোখ মেলল।

সামনে দেখে সেই কাঠকুড়নি মেয়েটি খোঁপায় পরেছে একটি অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাপড়খানি কুসুম্ভফুলে রঙ করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন একটি জানা সুর যার পদগুলি মনে পড়ছে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা কেবল রেখায় টানা ছিল, চিত্রকর কোন্ খেয়ালে কখন এক সময়ে তাতে রঙ লাগিয়েছে।

তাপস আসন ছেড়ে উঠল। বললে, "আমি দূর দেশে যাব।"

কাঠকুড়নি জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, প্রভু।"

তপস্বী বললে, "তপস্যা সম্পূর্ণ করবার জন্যে।"

কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বললে, "দর্শনের পুণ্য হতে আমাকে কেন বঞ্চিত করবে।"

তপস্বী আবার আসনে বসল, অনেক ক্ষণ ভাবল, আর কিছু বলল না।

৫

তার অনুরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটির বুকের এক ধার থেকে আর-এক ধারে বারে বারে যেন বজ্রসূচি বিঁধতে লাগল।

সে ভাবলে, "আমি অতি সামান্য, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘটবে।"

সেই রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে ব'সে তার নিজেকে নিজের ভয় করতে লাগল।

তার পরদিন সকালে সে ফল এনে দাঁড়াল, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান করলে। সুখে তার মন ভরে উঠল।

কিন্তু তার পরেই নদীর ধারে শিরীষগাছের ছায়ায় তার চোখের জল আর থামতে চায় না। কী ভাবলে কী জানি।

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম করে বললে, "প্রভু, আশীর্বাদ চাই।"

তপস্বী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন।"

মেয়েটি বললে, "আমি বহুদূর দেশে যাব।"

তপস্বী বললে, "যাও, তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক।"

৬

একদিন তপস্যা পূর্ণ হল।

ইন্দ্র এসে বললেন, "স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেছ।"

তপস্বী বললে, "তা হলে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।"

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কী চাও।"

তপস্বী বললে, "এই বনের কাঠকুড়নিকে।"

প্রথম চিঠি

বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেছে প্রবাসে।

চলে যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়ল।

মন বললে, "ফিরি, দুটো কথা বলে আসি।"

কিন্তু, সেটুকু সময় ছিল না।

সে দূরে আসবে ব'লে একজনের দুটি চোখ বয়ে জল পড়ে, তার জীবনে এমন সে আর-কখনো দেখে নি।

পথে চলবার সময় তার কাছে পড়ন্ত রোদ্দুরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে তার মতো একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে, এই কথা মনে করে বিস্ময়ে তার বুক ভরে উঠল।

যেখানে সে কাজ করতে এসেছে সে পাহাড়। সেখানে দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মতো পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোটো ছোটো ঝরনা কাকে যেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায় লুকিয়েচুরিয়ে।

আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিরই আভাস দেখে, নববধূর গোপন ব্যাকুলতার ছবি।

২

আজ দেশ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেছে, "তুমি কবে ফিরে আসবে। এসো এসো, শীঘ্র এসো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

এই আসাযাওয়ার সংসারে তারও চলে যাওয়া আর তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল, এ কথা কে জানত। সেই দুটি আতুর চোখের চাউনির সামনে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখলে, আর তার মন বিস্ময়ে ভরে উঠল।

ভোরবেলায় উঠে চিঠিখানি নিয়ে দেবদারুর ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরোল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে আর কানে যেন সে শুনতে পায়, "তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।"

মনে মনে ভাবতে লাগল, "এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে।"

৩

এমন সময় সূর্য উঠল পূর্বদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে। দেবদারুর শিশিরভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠল।

হঠাৎ চারটি বিদেশিনী মেয়ে দুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে তার সামনে এসে পড়ল। কী জানি কী ছিল তার মুখে, কিম্বা তার সাজে, কিম্বা তার চালচলনে— বড়ো মেয়েদুটি কৌতুকে মুখ একটুখানি বাঁকিয়ে চলে গেল। ছোটো মেয়েদুটি হাসি চাপবার চেষ্টা করলে, চাপতে পারলে না; দুজনে দুজনকে ঠেলাঠেলি করে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ছুটে গেল।

কঠিন কৌতুকের হাসিতে ঝরনাগুলিরও সুর ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠল। প্রবাসী মাথা হেঁট করে চলে আর ভাবে, "আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি।"

সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল, একলা ঘরে বসে চিঠি-খানি খুলে পড়লে, "তুমি কবে ফিরে আসবে। এসো, এসো, শীঘ্র এসো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

রথযাত্রা

রথযাত্রার দিন কাছে।

তাই রানী রাজাকে বললে, "চলো, রথ দেখতে যাই।"

রাজা বললে, "আচ্ছা।"

ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বেরোল, হাতিশাল থেকে হাতি। ময়ূরপংখি যায় সারে সারে, আর বল্লম হাতে সারে সারে সিপাইসান্ত্রি। দাসদাসী দলে দলে পিছে পিছে চলল।

কেবল বাকি রইল একজন। রাজবাড়ির ঝাঁটার কাঠি কুড়িয়ে আনা তার কাজ।

সর্দার এসে দয়া করে তাকে বললে, "ওরে, তুই যাবি তো আয়।"

সে হাত জোড় করে বললে, "আমার যাওয়া ঘটবে না।"

রাজার কানে কথা উঠল সবাই সঙ্গে যায়, কেবল সেই দুঃখীটা যায় না।

রাজা দয়া করে মন্ত্রীকে বললে, "ওকেও ডেকে নিয়ো।"

রাস্তার ধারে তার বাড়ি। হাতি যখন সেইখানে পৌঁছল মন্ত্রী তাকে ডেকে বললে, "ওরে দুঃখী, ঠাকুর দেখবি চল্‌।"

সে হাত জোড় করে বলল, "কত চলব। ঠাকুরের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছই এমন সাধ্য কি আমার আছে।"

মন্ত্রী বললে, "ভয় কী রে তোর, রাজার সঙ্গে চলবি।"

সে বললে, "সর্বনাশ! রাজার পথ কি আমার পথ।"

মন্ত্রী বললে, "তবে তোর উপায়? তোর ভাগ্যে কি রথযাত্রা দেখা ঘটবে না।"

সে বললে, "ঘটবে বই কি। ঠাকুর তো রথে করেই আমার দুয়ারে আসেন।"

মন্ত্রী হেসে উঠল। বললে, "তোর দুয়ারে রথের চিহ্ন কই।"

দুঃখী বললে, "তাঁর রথের চিহ্ন পড়ে না।"

মন্ত্রী বললে, "কেন বল্ তো।"

দুঃখী বললে, "তিনি যে আসেন পুষ্পকরথে।"

মন্ত্রী বললে, "কই রে সেই রথ।"

দুঃখী দেখিয়ে দিলে, তার দুয়ারের দুই পাশে দুটি সূর্যমুখী ফুটে আছে।

সওগাত

পুজোর পরব কাছে। ভাণ্ডার নানা সামগ্রীতে ভরা। কত বেনারসি কাপড়, কত সোনার অলংকার; আর ভাণ্ড ভ'রে ক্ষীর দই, পাত্র ভ'রে মিষ্টান্ন।

মা সওগাত পাঠাচ্ছেন।

বড়োছেলে বিদেশে রাজসরকারে কাজ করে; মেজোছেলে সওদাগর, ঘরে থাকে না; আর-কয়টি ছেলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া ক'রে পৃথক পৃথক বাড়ি করেছে; কুটুম্বরা আছে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে।

কোলের ছেলেটি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সারা দিন ধরে দেখছে, ভারে ভারে সওগাত চলেছে, সারে সারে দাসদাসী, থালাগুলি রঙবেরঙের রুমালে ঢাকা।

দিন ফুরোল। সওগাত সব চলে গেল। দিনের শেষনৈবেদ্যের সোনার ডালি নিয়ে সূর্যাস্তের শেষ আভা নক্ষত্রলোকের পথে নিরুদ্দেশ হল।

ছেলে ঘরে ফিরে এসে মাকে বললে, "মা, সবাইকে তুই সওগাত দিলি, কেবল আমাকে না।"

মা হেসে বললেন, "সবাইকে সব দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তোর জন্যে কী বাকি রইল এই দেখ্।"

এই বলে তার কপালে চুম্বন করলেন।

ছেলে কাঁদোকাঁদো স্বরে বললে, "সওগাত পাব না ?"

"যখন দূরে যাবি তখন সওগাত পাবি।"

"আর, যখন কাছে থাকি তখন তোর হাতের জিনিস দিবি নে ?"

মা তাকে দু হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন ; বললেন, "এই তো আমার হাতের জিনিস।"

মুক্তি

বিরহিণী তার ফুলবাগানের এক ধারে বেদী সাজিয়ে তার উপর মূর্তি গড়তে বসল। তার মনের মধ্যে যে মানুষটি ছিল বাইরে তারই প্রতিরূপ প্রতিদিন একটু একটু করে গড়ে, আর চেয়ে চেয়ে দেখে, আর ভাবে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কিন্তু, যে রূপটি একদিন তার চিত্তপটে স্পষ্ট ছিল তার উপরে ক্রমে যেন ছায়া পড়ে আসছে। রাতের বেলাকার পদ্মের মতো স্মৃতির পাপড়িগুলি অল্প অল্প করে যেন মুদে এল।

মেয়েটি তার নিজের উপর রাগ করে, লজ্জা পায়। সাধনা তার কঠিন হল, ফল খায় আর জল খায়, আর তৃণশয্যায় পড়ে থাকে।

মূর্তিটি মনের ভিতর থেকে গড়তে গড়তে সে আর প্রতিমূর্তি রইল না। মনে হল, এ যেন কোনো বিশেষ মানুষের ছবি নয়। যতই বেশি চেষ্টা করে ততই বেশি তফাত হয়ে যায়।

মূর্তিকে তখন সে গয়না দিয়ে সাজাতে থাকে, একশো এক পদ্মের ডালি দিয়ে পুজো করে, সন্ধেবেলায় তার সামনে গন্ধতেলের প্রদীপ জ্বালে— সে প্রদীপ সোনার, সে তেলের অনেক দাম।

দিনে দিনে গয়না বেড়ে ওঠে, পুজোর সামগ্রীতেই বেদী ঢেকে যায়, মূর্তিকে দেখা যায় না।

২

এক ছেলে এসে তাকে বললে, "আমরা খেলব।"

"কোথায়।"

"ঐখানে, যেখানে তোমার পুতুল সাজিয়েছ।"

মেয়ে তাকে হাঁকিয়ে দেয় ; বলে, "এখানে কোনোদিন খেলা হবে না।"

আর-এক ছেলে এসে বলে, "আমরা ফুল তুলব।"

"কোথায়।"

"ঐযে, তোমার পুতুলের ঘরের শিয়রে যে চাঁপাগাছ আছে ঐ গাছ থেকে।"

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয় ; বলে, "এ ফুল কেউ ছুঁতে পাবে না।"

আর-এক ছেলে এসে বলে, "প্রদীপ ধরে আমাদের পথ দেখিয়ে দাও।"

"প্রদীপ কোথায়।"

"ঐ যেটা তোমার পুতুলের ঘরে জ্বাল।"

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয় ; বলে, "ও প্রদীপ ওখান থেকে সরাতে পারব না।"

৩

এক ছেলের দল যায়, আর-এক ছেলের দল আসে।

মেয়েটি শোনে তাদের কলরব, আর দেখে তাদের নৃত্য। ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অমনি চমকে ওঠে, লজ্জা পায়।

মেলার দিন কাছে এল।

পাড়ার বুড়ো এসে বললে, "বাছা, মেলা দেখতে যাবি নে ?"

মেয়ে বললে, "আমি কোথাও যাব না।"

সঙ্গিনী এসে বললে, "চল্‌, মেলা দেখবি চল্‌।"

মেয়ে বললে, "আমার সময় নেই।"

ছোটো ছেলেটি এসে বললে, "আমায় সঙ্গে নিয়ে মেলায় চলো-না।"

মেয়ে বললে, "যেতে পারব না, এইখানে যে আমার পুজো।"

৪

একদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যেও সে যেন শুনতে পেলে সমুদ্রগর্জনের মতো শব্দ। দলে দলে দেশবিদেশের লোক চলেছে— কেউ বা রথে, কেউ বা পায়ে হেঁটে ; কেউ বা বোঝা পিঠে নিয়ে, কেউ বা বোঝা ফেলে দিয়ে।

সকালে যখন সে জেগে উঠল তখন যাত্রীর গানে পাখির গান আর শোনা যায় না। ওর হঠাৎ মনে হল, 'আমাকেও যেতে হবে।'

অমনি মনে পড়ে গেল, 'আমার যে পুজো আছে, আমার তো যাবার জো নেই।'

তখনি ছুটে চলল তার বাগানের দিকে যেখানে মূর্তি সাজিয়ে রেখেছে।

গিয়ে দেখে, মূর্তি কোথায় ! বেদীর উপর দিয়ে পথ হয়ে গেছে। লোকের পরে লোক চলে, বিশ্রাম নেই।

"এইখানে যাকে বসিয়ে রেখেছিলেম সে কোথায়।"

কে তার মনের মধ্যে বলে উঠল, 'যারা চলেছে তাদেরই মধ্যে।'

এমন সময় ছোটো ছেলে এসে বললে, "আমাকে হাতে ধরে নিয়ে চলো।"

"কোথায়।"

ছেলে বললে, "মেলার মধ্যে তুমিও যাবে না?"

মেয়ে বললে, "হাঁ, আমিও যাব।"

যে বেদীর সামনে এসে সে বসে থাকত সেই বেদীর উপর হল তার পথ, আর মূর্তির মধ্যে যে ঢেকে গিয়েছিল সকল যাত্রীর মধ্যে তাকে পেলে।

পরীর পরিচয়

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশবিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে।

ঘটক বললে, "বাহ্লীকরাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন সাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।"

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দূত এসে বললে, "গান্ধাররাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়ছে, যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ।"

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ফিরে আসে না।

দূত এসে বললে, "কাম্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোরবেলাকার দিগন্তরেখাটির মতো বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোতে উজ্জ্বল।"

রাজপুত্র ভর্তৃহরির কাব্য পড়তে লাগল, পুঁথি থেকে চোখ তুলল না।

রাজা বললে, "এর কারণ? ডাকো দেখি মন্ত্রীর পুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বললে, "তুমি তো আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বলো, বিবাহে তার মন নেই কেন।"

মন্ত্রীর পুত্র বললে, "মহারাজ, যখন থেকে তোমার ছেলে পরীস্থানের কাহিনী শুনেছে সেই অবধি তার কামনা, সে পরী বিয়ে করবে।"

২

রাজার হুকুম হল, পরীস্থান কোথায় খবর চাই।

বড়ো বড়ো পণ্ডিত ডাকা হল, যেখানে যত পুঁথি আছে তারা সব খুলে দেখলে। মাথা নেড়ে বললে, পুঁথির কোনো পাতায় পরীস্থানের কোনো ইশারা মেলে না।

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়ল। তারা বললে, "সমুদ্র পার হয়ে কত দ্বীপেই ঘুরলেম— এলাদ্বীপে, মরীচদ্বীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েছি মলয়দ্বীপে চন্দন আনতে, মৃগনাভির সন্ধানে গিয়েছি কৈলাসে দেবদারুবনে। কোথাও পরীস্থানের কোনো ঠিকানা পাই নি।"

রাজা বললে, "ডাকো মন্ত্রীর পুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পরীস্থানের কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেছে।"

মন্ত্রীর পুত্র বললে, "সেই যে আছে নবীন পাগলা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়ে রাজপুত্র তারই কাছে পরীস্থানের গল্প শোনে।"

রাজা বললে, "আচ্ছা, ডাকো তাকে।"

নবীন পাগলা এক মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সামনে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পরীস্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে।"

সে বললে, "সেখানে তো আমার সদাই যাওয়া আসা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় সে জায়গা।"

পাগলা বললে, "তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক-সরোবরের ধারে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "সেইখানে পরী দেখা যায়?"

পাগলা বললে, "দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তাদের চেন কী উপায়ে।"

পাগলা বললে, "কখনো বা একটা সুর শুনে, কখনো বা একটা আলো দেখে।"

রাজা বিরক্ত হয়ে বললে, "এর আগাগোড়া সমস্তই পাগলামি, একে তাড়িয়ে দাও।"

৩

পাগলার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল।

ফাল্গুনমাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেছে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।

সবাই জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচ্ছ।"

সে কোনো জবাব করলে না।

গুহার ভিতর দিয়ে একটি ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেছে কাম্যকসরোবরে; গ্রামের লোক তাকে বলে উদাসঝোরা। সেই ঝরনাতলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।

এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচিপাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরাফুলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির সুর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বললে, "আজ পাব দেখা।"

৪

তখনি ঘোড়ায় চড়ে ঝরনাধারার তীর বেয়ে চলল, পৌঁছল কাম্যকসরোবরের ধারে। দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষফুল পরেছে, গোধূলিতে যেন প্রথম তারা।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বললে, "তোমার ঐ কানের শিরীষফুলটি আমাকে দেবে?"

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী। ঘাড় বেঁকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরও ঘন কালো হয়ে নেমে এল— ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললে, "এই নাও।"

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কোন্ পরী আমাকে সত্য করে বলো।"

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার পরেই আশ্বিনমেঘের আচমকা বৃষ্টির মতো তার হাসির উপর হাসি, সে আর থামতে চায় না।

রাজপুত্র মনে ভাবল, "স্বপ্ন বুঝি ফলল— এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।"

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে; বললে, "এসো।"

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠল, কুহু কুহু কুহু কুহু।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কী।"

সে বললে, "আমার নাম কাজরী।"

উদাসঝোরার ধারে দুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বললে, "এবার তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও।"

সে বললে, "আমরা বনের মেয়ে, আমরা তো ছদ্মবেশ জানি নে।"

রাজপুত্র বললে, "আমি যে তোমার পরীর মূর্তি দেখতে চাই।"

পরীর মূর্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাবলে, "এর হাসির সুর এই ঝরনার সুরের সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরনার পরী।"

৫

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে, "এসব কেন!"

রাজপুত্র বললে, "তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।"

তখন তার চোখ ছল্‌ছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘড়া পড়ে আছে সেই জলের ধারে ; মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্যে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে ; মনে পড়ল, তার বাপ আর ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েছে ; আর মনে পড়ল, তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে ব'লে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনছে, আর গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইছে।

সে বললে, "না, আমি যাব না।"

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল ; বাজল বাঁশি, কাঁসি, দামামা— ওর কথা শোনা গেল না।

চতুর্দোলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়িতে নামল, রাজমহিষী কপাল চাপড়ে বললে, "এ কেমনতরো পরী।"

রাজার মেয়ে বললে, "ছি, ছি, কী লজ্জা।"

মহিষীর দাসী বললে, "পরীর বেশটাই বা কী রকম।"

রাজপুত্র বললে, "চুপ করো, তোমাদের ঘরে পরী ছদ্মবেশে এসেছে।"

৬

দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে, কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কিনা। দেখে যে, কালো মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেছে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁত করে খোদা একটি

প্রতিমা। রাজপুত্র চুপ করে বসে ভাবে, "পরী কোথায় লুকিয়ে রইল, শেষরাতে অন্ধকারের আড়ালে উষার মতো।"

রাজপুত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একটু রাগও হল। কাজরী সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠতে যায় রাজপুত্র শক্ত করে তার হাত চেপে ধরে বললে, "আজ তোমাকে ছাড়ব না— নিজরূপ প্রকাশ করো, আমি দেখি।"

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরোল না। দেখতে দেখতে দুই চোখ জলে ভরে এল।

রাজপুত্র বললে, "তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে।"

সে বললে, "না, আর নয়।"

রাজপুত্র বললে, "তবে এইবার কার্তিকী পূর্ণিমায় পরীকে যেন সবাই দেখে।"

৭

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝগগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝরাতের সুরে ঝিমি ঝিমি তান লাগে।

রাজপুত্র বরসজ্জা প'রে হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে ঢুকল ; পরীবৌয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় সাদা আস্তরণ, তার উপর সাদা কুন্দফুল রাশ-করা ; আর উপরে জানলা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে।

আর, কাজরী ?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে। একে একে কুটুম্বে ঘর ভরে গেল।

পরী কই।

রাজপুত্র বললে, "চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।"

প্রাণমন

আমার জানলার সামনে রাঙা মাটির রাস্তা।

ওখান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে ; সাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় করে হাটে যায়, সন্ধ্যাবেলায় কলহাস্যে ঘরে ফেরে।

কিন্তু, মানুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই।

জীবনের যে ভাগটা অস্থির, নানা ভাবনায় উদ্‌বিগ্ন, নানা চেষ্টায় চঞ্চল, সেটা আজ ঢাকা পড়ে গেছে। শরীর আজ রুগ্‌ণ, মন আজ নিরাসক্ত।

ঢেউয়ের সমুদ্র বাহিরতলের সমুদ্র ; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভশয্যা ঢেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে ভুলিয়ে দেয়। ঢেউ যখন থামে তখন সমুদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করে।

তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ যখনি ছুটি পেল, তখনি সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।

পথ-চলা পথিক যত দিন ছিলুম তত দিন পথের ধারের ঐ বটগাছটার দিকে তাকাবার সময় পাই নি ; আজ পথ ছেড়ে জানলায় এসেছি, আজ ওর সঙ্গে মোকাবিলা শুরু হল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। যেন বলতে চায়, "বুঝতে পারছ না ?"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, "বুঝেছি, সব বুঝেছি ; তুমি অমন ব্যাকুল হোয়ো না।"

কিছু ক্ষণের জন্যে আবার শান্ত হয়ে যায়। আবার দেখি, ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে ; আবার সেই থর্‌থর্‌ ঝর্‌ঝর্‌ ঝল্‌মল্‌।

আবার ওকে ঠাণ্ডা করে বলি, "হাঁ হাঁ, ঐ কথাই বটে ; আমি তোমারই খেলার সাথি, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডূষে গণ্ডূষে তোমারই মতো সূর্যালোক পান করেছি, ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।"

তখন ওর ভিতর দিয়ে হঠাৎ হাওয়ার শব্দ শুনি ; ও বলতে থাকে, "হাঁ, হাঁ, হাঁ।"

যে ভাষা রক্তের মর্মরে আমার হৃৎপিণ্ডে বাজে, যা আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ আবর্তনধ্বনি, সেই ভাষা ওর পত্রমর্মরে আমার কাছে এসে পৌঁছয়। সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারি ভাষা।

তার মূল বাণীটি হচ্ছে, "আছি, আছি ; আমি আছি, আমরা আছি।"

সে ভারি খুশির কথা। সেই খুশিতে বিশ্বের অণু পরমাণু থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।

ঐ বটগাছের সঙ্গে আমার আজ সেই এক ভাষায় সেই এক খুশির কথা চলছে।

ও আমাকে বলছে, "আছ হে বটে ?"

আমি সাড়া দিয়ে বলছি, "আছি হে মিতা।"

এমনি করে 'আছি'তে 'আছি'তে এক তালে করতালি বাজছে।

২

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যখন আমার আলাপ শুরু হল তখন বসন্তে ওর পাতাগুলো কচি ছিল ; তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাতক আলো ঘাসের উপর এসে পৃথিবীর ছায়ার সঙ্গে গোপনে গলাগলি করত।

তার পরে আষাঢ়ের বর্ষা নামল ; ওরও পাতার রঙ মেঘের মতো গম্ভীর হয়ে এসেছে। আজ সেই পাতার রাশ প্রবীণের পাকা বুদ্ধির মতো নিবিড়, তার কোনো ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায় না। তখন গাছটি ছিল গরিবের মেয়েটির মতো ; আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী, যেন পর্যাপ্ত পরিতৃপ্তির চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকতমণির বিশনলী হার ঝল্‌মলিয়ে আমাকে বললে, "মাথার উপর অমনতরো ইঁটপাথর মুড়ি দিয়ে বসে আছ কেন। আমার মতো একেবারে ভরপুর বাইরে এসো-না।"

আমি বললেম, "মানুষকে যে ভিতর বাহির দুই বাঁচিয়ে চলতে হয়।"

গাছ নড়েচড়ে বলে উঠল, "বুঝতে পারলেম না।"

আমি বললেম, "আমাদের দুটো জগৎ, ভিতরের আর বাইরের।"

গাছ বললে, "সর্বনাশ ! ভিতরেরটা আছে কোথায়।"

"আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।"

"সেখানে কর কী।"

"সৃষ্টি করি।"

"সৃষ্টি আবার ঘেরের মধ্যে ! তোমার কথা বোঝবার জো নেই।"

আমি বললেম, "যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা প'ড়ে হয় নদী, তেমনি ঘেরের মধ্যে ধরা প'ড়েই তো সৃষ্টি। একই জিনিস ঘেরের মধ্যে আটকা প'ড়ে কোথাও হীরের টুকরো, কোথাও বটের গাছ।"

গাছ বললে, "তোমার ঘেরটা কী রকম শুনি।"

আমি বললেম, "সেইটি আমার মন। তার মধ্যে যা ধরা পড়ছে তাই নানা সৃষ্টি হয়ে উঠছে।"

গাছ বললে, "তোমার সেই বেড়াঘেরা সৃষ্টিটা আমাদের চন্দ্রসূর্যের পাশে কতটুকুই বা দেখায়।"

আমি বললেম, "চন্দ্রসূর্যকে দিয়ে তাকে তো মাপা যায় না, চন্দ্রসূর্য যে বাইরের জিনিস।"

"তা হলে মাপবে কী দিয়ে।"

"সুখ দিয়ে, বিশেষত দুঃখ দিয়ে।"

গাছ বললে, "এই পুবে হাওয়া আমার কানে কানে কথা কয়, আমার প্রাণে প্রাণে তার সাড়া জাগে। কিন্তু, তুমি যে কিসের কথা বললে আমি কিছুই বুঝলেম না।"

আমি বললেম, "বোঝাই কী করে। তোমার ঐ পুবে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধ'রে বীণার তারে যেমনি বেঁধে ফেলেছি, অমনি সেই হাওয়া এক সৃষ্টি থেকে একেবারে আর-এক সৃষ্টিতে এসে পৌঁছয়। এই সৃষ্টি কোন্ আকাশে যে স্থান পায়, কোন্ বিরাট চিত্তের স্মরণাকাশে, তা আমিও ঠিক জানি নে। মনে হয়, যেন বেদনার একটা আকাশ আছে। সে আকাশ মাপের আকাশ নয়।"

"আর, ওর কাল ?"

"ওর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল। তাই সে কাল সংখ্যার অতীত।"

"দুই আকাশ দুই কালের জীব তুমি, তুমি অদ্ভুত। তোমার ভিতরের কথা কিচ্ছুই বুঝলেম না।"

"নাই বা বুঝলে।"

"আমার বাইরের কথা তুমিই কি ঠিক বোঝ।"

"তোমার বাইরের কথা আমার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে তাকে যদি বোঝা বল তো সে বোঝা, যদি গান বল তো গান, কল্পনা বল তো কল্পনা।"

৩

গাছ তার সমস্ত ডালগুলো তুলে আমাকে বললে, "একটু থামো। তুমি বড়ো বেশি ভাব', আর বড়ো বেশি বক'।"

শুনে আমার মনে হল, এ কথা সত্যি। আমি বললেম, "চুপ করবার জন্যেই তোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাসদোষে চুপ ক'রে ক'রেও বকি; কেউ কেউ যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।"

কাগজটা পেন্সিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে। ওর চিকন পাতাগুলো ওস্তাদের আঙুলের মতো আলোকবীণায় দ্রুত তালে ঘা দিতে লাগল।

হঠাৎ আমার মন বলে উঠল, "এই তুমি যা দেখছ আর এই আমি যা ভাবছি, এঁর মাঝখানের যোগটা কোথায়।"

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললেম, "আবার তোমার প্রশ্ন? চুপ করো।"

চুপ করে রইলেম, একদৃষ্টে চেয়ে দেখলেম। বেলা কেটে গেল।

গাছ বললে, "কেমন, সব বুঝেছ?"

আমি বললেম, "বুঝেছি।"

৪

সেদিন তো চুপ করেই কাটল।

পরদিনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলে 'বুঝেছি', কী বুঝেছ বলো তো।"

আমি বললেম, "নিজের মধ্যে মানুষের প্রাণটা নানা ভাবনায় ঘোলা হয়ে গেছে। তাই, প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে, ঐ গাছের দিকে।"

"কী রকম দেখলে।"

"দেখলেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কী আনন্দ। নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছাঁটই ছেঁটেছে, কত রঙই লাগিয়েছে, কত গন্ধ, কত রস। তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বলছিলেম,— ওগো বনস্পতি, জন্মমাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে আনন্দধ্বনি করে উঠেছিল সেই ধ্বনি তোমার শাখায় শাখায়। সেই আদিযুগের সরল হাসিটি তোমার পাতায় পাতায় ঝলমল্ করছে। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চঞ্চল হল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে বন্দী হয়ে বসে ছিল; তুমি তাকে ডাক দিয়ে বলেছ, ওরে আয়-না রে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে; আর আমারই মতো নিয়ে আয় তোর রূপের তূলি, রঙের বাটি, রসের পেয়ালা।"

মন আমার খানিক ক্ষণ চুপ করে রইল। তার পরে কিছু বিমর্ষ হয়ে বললে, "তুমি ঐ প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি ক'রে থাক, আমি যেসব উপকরণ জড়ো করছি তার কথা এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বল না কেন।"

"তার কথা আর কইব কী। সে নিজেই নিজের টংকারে ঝংকারে হুংকারে ক্রেংকারে আকাশ কাঁপিয়ে রেখেছে। তার ভারে, তার জটিলতায়, তার জঞ্জালে পৃথিবীর বক্ষ ব্যথিত হয়ে উঠল। ভেবে পাই নে, এর অন্ত কোথায়। থাকের উপরে আর কত থাক উঠবে, গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে। এই প্রশ্নেরই জবাব ছিল ঐ গাছের পাতায়।"

"বটে? কী জবাব শুনি।"

"সে বলছে, প্রাণ যত ক্ষণ নেই তত ক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবা মাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপনি মিলে গিয়ে অখণ্ড সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সুন্দরকেই দেখো এই বনবিহারী। তারই বাঁশি তো বাজছে বটের ছায়ায়।"

৫

তখন কবেকার কোন্ ভোররাত্রি।

প্রাণ আপন সুপ্তিশয্যা ছাড়ল; সেই প্রথম পথে বাহির হল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মাঠে।

তখনও তার দেহে ক্লান্তি নেই, মনে চিন্তা নেই; তার রাজপুত্তুরের সাজে না লেগেছে ধুলো, না ধরেছে ছিদ্র।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অম্লান প্রাণটিকে দেখলেম এই আষাঢ়ের সকালে, ঐ বট-গাছটিতে। সে তার শাখা নেড়ে আমাকে বললে, "নমস্কার।"

আমি বললেম, "রাজপুত্তুর, মরুদৈত্যটার সঙ্গে লড়াই চলছে কেমন বলো তো।"

সে বললে, "বেশ চলছে, একবার চার দিকে তাকিয়ে দেখো-না।"

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পুবের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের সার; পশ্চিমে শালে তালে মহুয়ায়, আমে জামে খেজুরে, এমনি জটলা করেছে যে দিগন্ত দেখা যায় না।

আমি বললেম, "রাজপুত্তুর, ধন্য তুমি। তুমি কোমল, তুমি কিশোর, আর দৈত্যটা হল যেমন প্রবীণ তেমনি কঠোর; তুমি ছোটো, তোমার তূণ ছোটো, তোমার তীর ছোটো, আর ও হল বিপুল, ওর বর্ম মোটা, ওর গদা মস্ত। তবু তো দেখি, দিকে দিকে তোমার ধ্বজা উড়ল, দৈত্যটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেছ; পাথর মানছে হার, ধুলো দাসখত লিখে দিচ্ছে।"

বট বললে, "তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখলে।"

আমি বললেম, "তোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রূপে, তোমার কর্মকে দেখি বিশ্রামের বেশে, তোমার জয়কে দেখি নম্রতার মূর্তিতে। সেই জন্যেই তো তোমার ছায়ায় সাধক এসে বসেছে ঐ সহজ যুদ্ধজয়ের মন্ত্র আর ঐ সহজ অধিকারের সন্ধিটি শেখবার জন্যে। প্রাণ যে কেমন ক'রে কাজ করে, অরণ্যে অরণ্যে তারই পাঠশালা খুলেছ। তাই যারা ক্লান্ত তারা তোমার ছায়ায় আসে, যারা আর্ত তারা তোমার বাণী খোঁজে।

আমার স্তব শুনে বটের ভিতরকার প্রাণপুরুষ বুঝি খুশি হল ; সে বলে উঠল, "আমি বেরিয়েছি মরুদৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে ; কিন্তু আমার এক ছোটো ভাই আছে, সে যে কোন্ লড়াইয়ে কোথায় চলে গেল আমি তার আর নাগাল পাই নে। কিছু ক্ষণ আগে তারই কথা কি তুমি বলছিলে।"

"হ্যাঁ, তাকেই আমরা নাম দিয়েছি— মন।"

"সে আমার চেয়ে চঞ্চল। কিছুতে তার সন্তোষ নেই। সেই অশান্তটার খবর আমাকে দিতে পার?"

আমি বললেম, "কিছু কিছু পারি বই কি। তুমি লড়ছ বাঁচবার জন্যে, সে লড়ছে পাবার জন্যে, আরও দূরে আর-একটা লড়াই চলছে ছাড়বার জন্যে। তোমার লড়াই অসাড়ের সঙ্গে, তার লড়াই অভাবের সঙ্গে, আরও একটা লড়াই আছে সঞ্চয়ের সঙ্গে। লড়াই জটিল হয়ে উঠল, ব্যূহের মধ্যে যে প্রবেশ করছে ব্যূহ থেকে বেরোবার পথ সে খুঁজে পাচ্ছে না। হার জিত অনিশ্চিত ব'লে ধাঁদা লাগল। এই দ্বিধার মধ্যে তোমার ঐ সবুজ পতাকা যোদ্ধাদের আশ্বাস দিচ্ছে। বলছে, 'জয়, প্রাণের জয়।' গানের তান বেড়ে বেড়ে চলেছে, কোন্ সপ্তক থেকে কোন্ সপ্তকে চড়ল তার ঠিকানা নেই। এই স্বরসংকটের মধ্যে তোমার তম্বুরাটি সরল তারে বলছে, 'ভয় নেই, ভয় নেই।' বলছে, 'এই তো মূল সুর আমি বেঁধে রেখেছি, এই আদি প্রাণের সুর। সকল উন্মত্ত তানই এই সুরে সুন্দরের ধুয়োয় এসে মিলবে আনন্দের গানে। সকল পাওয়া, সকল দেওয়া ফুলের মতো ফুটবে, ফলের মতো ফলবে।' "

আগমনী

আয়োজন চলেইছে। তার মাঝে একটুও ফাঁক পাওয়া যায় না যে ভেবে দেখি, কিসের আয়োজন।

তবুও কাজের ভিড়ের মধ্যে মনকে এক-একবার ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, "কেউ আসবে বুঝি ?"

মন বলে, "রোসো। আমাকে জায়গা দখল করতে হবে, জিনিসপত্র জোগাতে হবে, ঘরবাড়ি গড়তে হবে, এখন আমাকে বাজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না।"

চুপচাপ করে আবার খাটতে বসি। ভাবি, জায়গা-দখল সারা হবে, জিনিসপত্র-সংগ্রহ শেষ হবে, ঘরবাড়ি-গড়া বাকি থাকবে না, তখন শেষ জবাব মিলবে।

জায়গা বেড়ে চলেছে, জিনিসপত্র কম হল না, ইমারতের সাতটা মহল সারা হল। আমি বললেম, "এইবার আমার কথার একটা জবাব দাও।"

মন বলে, "আরে রোসো, আমার সময় নেই।"

আমি বললেম, "কেন, আরও জায়গা চাই ? আরও ঘর ? আরও সরঞ্জাম ?"

মন বললে, "চাই বই কি।"

আমি বললেম, "এখনও যথেষ্ট হয় নি ?"

মন বললে, "এতটুকুতে ধরবে কেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "কী ধরবে। কাকে ধরবে।"

মন বললে, "সেসব কথা পরে হবে।"

তবু আমি প্রশ্ন করলেম, "সে বুঝি মস্ত বড়ো ?"

মন উত্তর করলে, "বড়ো বই কি।"

এত বড়ো ঘরেও তাকে কুলোবে না, এত মস্ত জায়গায়! আবার উঠেপড়ে লাগলেম। দিনে আহার নেই, রাত্রে নিদ্রা নেই। যে দেখলে সেই বাহবা দিলে; বললে, "কাজের লোক বটে।"

এক-একবার কেমন আমার সন্দেহ হতে লাগল, বুঝি মন বাঁদরটা আসল কথার জবাব জানে না। সেইজন্যেই কেবল কাজ চাপা দিয়ে জবাবটাকে সে ঢাকা দেয়। মাঝে মাঝে এক-একবার ইচ্ছা হয়, কাজ বন্ধ করে কান পেতে শুনি পথ দিয়ে কেউ আসছে কি না। ইচ্ছা হয়, আর ঘর না বাড়িয়ে ঘরে আলো জ্বালি, আর সাজ সরঞ্জাম না জুটিয়ে ফুল ফোটার বেলা থাকতে একটা মালা গেঁথে রাখি।

কিন্তু, ভরসা হয় না। কারণ, আমার প্রধান মন্ত্রী হল মন। সে দিনরাত তার দাঁড়িপাল্লা আর মাপকাঠি নিয়ে ওজন-দরে আর গজের মাপে সমস্ত জিনিস যাচাই করছে। সে কেবলই বলছে, "আরও না হলে চলবে না।"

"কেন চলবে না।"

"সে যে মস্ত বড়ো।"

"কে মস্ত বড়ো।"

বাস্, চুপ। আর কথা নেই।

যখন তাকে চেপে ধরি "অমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না, একটা জবাব দিতেই হবে" তখন সে রেগে উঠে বলে, "জবাব দিতেই হবে, এমন কী কথা। যার উদ্দেশ মেলে না, যার খবর পাই নে, যার মানে বোঝবার জো নেই, তুমি সেই কথা নিয়েই কেবল আমার কাজ কামাই করে দাও। আর, আমার এই দিকটাতে তাকাও দেখি। কত মামলা, কত লড়াই ; লাঠিসড়কি-পাইক-বরকন্দাজে পাড়া জুড়ে গেল ; মিস্ত্রিতে মজুরে ইঁটকাঠ-চুন-সুরকিতে কোথাও পা ফেলবার জো কী। সমস্তই স্পষ্ট ; এর মধ্যে আন্দাজ নেই, ইশারা নেই। তবে এ-সমস্ত পেরিয়েও আবার প্রশ্ন কেন।"

শুনে তখন ভাবি, মনটাই সেয়ানা, আমিই অবুঝ। আবার ঝুড়িতে করে ইঁট বয়ে আনি, চুনের সঙ্গে সুরকি মেশাতে থাকি।

২

এমনি করেই দিন যায়। আমার ভূমি দিগন্ত পেরিয়ে গেল, ইমারতের পাঁচ তলা সারা হয়ে ছ'তলার ছাদ পিটোনো চলছে। এমন সময়ে একদিন বাদলের মেঘ কেটে গেল ; কালো মেঘ হল সাদা ; কৈলাসের শিখর থেকে ভৈরোঁর তান নিয়ে ছুটির হাওয়া বইল, মানস-সরোবরের পদ্মগন্ধে দিনরাত্রির দণ্ডপ্রহরগুলোকে মৌমাছির মতো উতলা করে দিলে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সমস্ত আকাশ হেসে উঠেছে আমার ছয়তলা ঐ বাড়িটার উদ্ধত ভারাগুলোর দিকে চেয়ে।

আমি তো ব্যাকুল হয়ে পড়লেম ; যাকে দেখি তাকেই জিজ্ঞাসা করি, "ওগো, কোন্ হাওয়াখানা থেকে আজ নহবত বাজছে বলো তো।"

তারা বলে, "ছাড়ো, আমার কাজ আছে।"

একটা খ্যাপা পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, মাথায় কুন্দফুলের মালা জড়িয়ে চুপ করে বসে ছিল। সে বললে, "আগমনীর সুর এসে পৌঁছল।"

আমি যে কী বুঝলেম জানি নে ; বলে উঠলেম, "তবে আর দেরি নেই।"

সে হেসে বললে, "না, এল ব'লে।"

তখনি খাতাঞ্জিখানায় এসে মনকে বললেম, "এবার কাজ বন্ধ করো।"

মন বললে, "সে কী কথা। লোকে যে বলবে অকর্মণ্য।"

আমি বললেম, "বলুক গে।"

মন বললে, "তোমার হল কী। কিছু খবর পেয়েছ নাকি।"

আমি বললেম, "হাঁ, খবর এসেছে।"

"কী খবর।"

মুশকিল, স্পষ্ট ক'রে জবাব দিতে পারি নে। কিন্তু, খবর এসেছে। মানস-সরোবরের তীর থেকে আলোকের পথ বেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এসে পৌছল।

মন মাথা নেড়ে বললে, "মস্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারি সমারোহ? কিছু তো দেখি নে, শুনি নে।"

বলতে বলতে আকাশে কে যেন পরশমণি ছুঁইয়ে দিলে। সোনার আলোয় চার দিক ঝল্‌মল্‌ করে উঠল। কোথা থেকে একটা রব উঠে গেল, "দূত এসেছে।"

আমি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দূতের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলেম, "আসছেন নাকি।"

চার দিক থেকে জবাব এল, "হাঁ, আসছেন।"

মন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "কী করি! সবেমাত্র আমার ছয়তলা বাড়ির ছাদ পিটোনো চলছে; আর, সাজ সরঞ্জাম সব তো এসে পৌছল না।"

উত্তর শোনা গেল, "আরে ভাঙো ভাঙো, তোমার ছতলা বাড়ি ভাঙো।"

মন বললে, "কেন।"

উত্তর এল, "আজ আগমনী যে। তোমার ইমারতটা বুক ফুলিয়ে পথ আটকেছে।"

মন অবাক হয়ে রইল।

আবার শুনি, "ঝেঁটিয়ে ফেলো তোমার সাজ সরঞ্জাম।"

মন বললে, "কেন।"

"তোমার সরঞ্জাম যে ভিড় করে জায়গা জুড়েছে।"

যাক গে। কাজের দিনে ব'সে ব'সে ছতলা বাড়ি গাঁথলেম, ছুটির দিনে একে একে সব-ক'টা তলা ধূলিসাৎ করতে হল। কাজের দিনে সাজ সরঞ্জাম হাটে হাটে জড়ো করা গেল, ছুটির দিনে সমস্ত বিদায় করেছি।

কিন্তু, মস্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারি সমারোহ?

মন চার দিকে তাকিয়ে দেখলে।

কী দেখতে পেলে।

শরৎপ্রভাতের শুকতারা।

কেবল ঐটুকু ?

হাঁ, ঐটুকু। আর দেখতে পেলে শিউলিবনের শিউলিফুল।

কেবল ঐটুকু ?

হাঁ, ঐটুকু। আর দেখা দিল লেজ দুলিয়ে ভোরবেলাকার একটি দোয়েল পাখি।

আর কী।

আর, একটি শিশু, সে খিল্‌খিল্‌ ক'রে হাসতে হাসতে মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এল বাইরের আলোতে।

"তুমি যে বললে আগমনী, সে কি এরই জন্যে।"

"হাঁ, এরই জন্যেই তো প্রতিদিন আকাশে বাঁশি বাজে, ভোরের বেলায় আলো হয়।"

"এরই জন্যে এত জায়গা চাই ?"

"হাঁ গো, তোমার রাজার জন্যে সাতমহলা বাড়ি, তোমার প্রভুর জন্যে ঘরভরা সরঞ্জাম। আর, এদের জন্যে সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।"

"আর, মস্ত-বড়ো ?"

"মস্ত-বড়ো এইটুকুর মধ্যেই থাকেন।"

"ঐ শিশু তোমাকে কী বর দেবে।"

"ঐ তো বিধাতার বর নিয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবীর আশা নিয়ে, অভয় নিয়ে, আনন্দ নিয়ে। ওরই গোপন তূণে লুকোনো থাকে ব্রহ্মাস্ত্র, ওরই হৃদয়ের মধ্যে ঢাকা আছে শক্তিশেল।"

মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "হাঁ গো কবি, কিছু দেখতে পেলে, কিছু বুঝতে পারলে ?"

আমি বললেম, "সেই জন্যেই ছুটি নিয়েছি। এত দিন সময় ছিল না, তাই দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি।"

স্বর্গ-মর্ত

গান

মাটির প্রদীপখানি আছে
মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারই
আলো দেখবে ব'লে।
সেই আলোটি নিমেষহত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের
ভয়ের মতো দোলে।
সেই আলোটি নেবে জ্বলে
শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায়
ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী
আকাশ হতে আশিস আনি,
অমর শিখা আকুল হল
মর্ত শিখায় উঠতে জ্বলে।

ইন্দ্র। সুরগুরো, একদিন দৈত্যদের হাতে আমরা স্বর্গ হারিয়েছিলুম। তখন দেবে মানবে মিলে আমরা স্বর্গের জন্যে লড়াই করেছি, এবং স্বর্গকে উদ্ধার করেছি, কিন্তু এখন আমাদের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশি। সে কথা চিন্তা করে দেখবেন।

বৃহস্পতি। মহেন্দ্র, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। স্বর্গের কী বিপদ আশঙ্কা করছেন।

ইন্দ্র। স্বর্গ নেই।

বৃহস্পতি। নেই? সে কী কথা। তা হলে আমরা আছি কোথায়।

ইন্দ্র। আমরা আমাদের অভ্যাসের উপর আছি, স্বর্গ যে কখন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে, ছায়া হয়ে, লুপ্ত হয়ে গেছে, তা জানতেও পারি নি।

কার্তিকেয়। কেন দেবরাজ, স্বর্গের সমস্ত সমারোহ, সমস্ত অনুষ্ঠানই তো চলছে।

ইন্দ্র। অনুষ্ঠান ও সমারোহ বেড়ে উঠেছে, দিনশেষে সূর্যাস্তের সমারোহের মতো, তার পশ্চাতে অন্ধকার। তুমি তো জান দেবসেনাপতি, স্বর্গ এত মিথ্যা হয়েছে যে, সকলপ্রকার বিপদের ভয় পর্যন্ত তার চলে গেছে। দৈত্যেরা যে কত যুগযুগান্তর তাকে আক্রমণ করে নি তা মনে পড়ে না। আক্রমণ করবার যে কিছুই নেই। মাঝে মাঝে স্বর্গের যখন পরাভব হ'ত তখনও স্বর্গ ছিল, কিন্তু যখন থেকে—

কার্তিকেয়। আপনার কথা যেন কিছু কিছু বুঝতে পারছি।

বৃহস্পতি। স্বপ্ন থেকে জাগবা মাত্রই যেমন বোঝা যায়, স্বপ্ন দেখছিলুম, ইন্দ্রের কথা শুনেই তেমনি মনে হচ্ছে, একটা যেন মায়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তবু এখনও সম্পূর্ণ ঘোর ভাঙে নি।

কার্তিকেয়। আমার কী রকম বোধ হচ্ছে বলব? তূণের মধ্যে শর আছে, সেই শরের ভার বহন করছি, সেই শরের দিকেই মন বদ্ধ আছে, ভাবছি সমস্তই ঠিক আছে। এমন সময়ে কে যেন বললে, একবার তোমার চার দিকে তাকিয়ে দেখো। চেয়ে দেখি, শর আছে কিন্তু লক্ষ্য করবার কিছুই নেই। স্বর্গের লক্ষ্য চলে গেছে।

বৃহস্পতি। কেন এমন হল তার কারণ তো জানা চাই।

ইন্দ্র। যে মাটির থেকে রস টেনে স্বর্গ আপনার ফুল ফুটিয়েছিল সেই মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে।

বৃহস্পতি। মাটি আপনি কাকে বলছেন।

ইন্দ্র। পৃথিবীকে। মনে তো আছে, একদিন মানুষ স্বর্গে এসে দেবতার কাজে যোগ দিয়েছে এবং দেবতা পৃথিবীতে নেমে মানুষের যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। তখন স্বর্গ মর্ত উভয়েই সত্য হয়ে উঠেছিল, তাই সেই যুগকে সত্যযুগ বলত। সেই পৃথিবীর সঙ্গে যোগ না থাকলে স্বর্গ আপনার অমৃতে আপনি কি বাঁচতে পারে।

কার্তিকেয়। আর, পৃথিবীও যে যায়, দেবরাজ। মানুষ এমনি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে যে, সে আপনার শৌর্যকে আর বিশ্বাস করে না, কেবল বস্তুর উপরেই তার ভরসা। বস্তু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি পড়ে গেছে। স্বর্গের টান যে ছিন্ন হয়েছে, তাই আত্মা বস্তু ভেদ করে আলোকের দিকে উঠতে পারছে না।

বৃহস্পতি। এখন উদ্ধারের উপায় কী।

ইন্দ্র। পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের আবার যোগসাধন করতে হবে।

বৃহস্পতি। কিন্তু, দেবতারা যে পথ দিয়ে পৃথিবীতে যেতেন, অনেক দিন হল, সে পথের চিহ্ন লোপ হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলুম, ভালোই হয়েছে। ভেবেছিলুম, এইবার প্রমাণ হয়ে যাবে, স্বর্গ নিরপেক্ষ, নিরবলম্ব, আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ।

ইন্দ্র। একদিন সকলেরই সেই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রেমেই স্বর্গ বাঁচে, নইলে স্বর্গ শুকিয়ে যায়। অমৃতের অভিমানে সেই কথা ভুলেছিলুম বলেই পৃথিবীতে দেবতার যাবার পথের চিহ্ন লোপ পেয়েছিল।

কার্তিকেয়। দৈত্যদের পরাভবের পর থেকে আমরা আটঘাট বেঁধে স্বর্গকে সুরক্ষিত করে তুলেছি। তার পর থেকে স্বর্গের ঐশ্বর্য স্বর্গের মধ্যেই জমে আসছে; বাহিরে তার আর প্রয়োগ নেই, তার আর ক্ষয় নেই। যুগ যুগ হতে অব্যাঘাতে তার এতই উন্নতি হয়ে এসেছে যে, বাহিরের অন্য সমস্ত-কিছু থেকে স্বর্গ বহু দূরে চলে গেছে। স্বর্গ তাই আজ একলা।

ইন্দ্র। উন্নতিই হোক আর দুর্গতিই হোক, যাতেই চার দিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ আনে তাতেই ব্যর্থতা আনে। ক্ষুদ্র থেকে মহৎ যখন সুদূরে চলে যায় তখন তার মহত্ত্ব নিরর্থক হয়ে আপনাকে আপনি ভারগ্রস্ত করে মাত্র। স্বর্গের আলো আজ আপনার মাটির প্রদীপের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলেয়ার আলো হয়ে উঠেছে, লোকালয়ের আয়ত্তের অতীত হয়ে সে নিজেরও আয়ত্তের অতীত হয়েছে; নির্বাপণের শাস্তির চেয়ে তার এই শাস্তি গুরুতর। দেবলোক আপনাকে অতি বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে আপন শুচিতার উচ্চ প্রাচীরে নিজেকে বন্দী করেছে, সেই দুর্গম প্রাচীর ভেঙে গঙ্গার ধারার মতো মলিন মর্তের মধ্যে তাকে প্রবাহিত করে দিয়ে তবে তার বন্ধনমোচন হবে। তার সেই স্বাতন্ত্র্যের বেষ্টন বিদীর্ণ করবার জন্যেই আমার মন আজ এমন বিচলিত হয়ে উঠেছে। স্বর্গকে আমি ঘিরতে দেব না, বৃহস্পতি; মলিনের সঙ্গে, পতিতের সঙ্গে, অজ্ঞানীর সঙ্গে, দুঃখীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে।

বৃহস্পতি। তা হলে আপনি কী করতে চান।

ইন্দ্র। আমি পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। সেই যাবার পথটাই বন্ধ, সেই নিয়েই তো দুঃখ।

ইন্দ্র। দেবতার স্বরূপে সেখানে আর যেতে পারব না, মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করব। নক্ষত্র যেমন খ'সে প'ড়ে তার আকাশের আলো আকাশে নিবিয়ে দিয়ে, মাটি হয়ে মাটিকে আলিঙ্গন করে, আমি তেমনি করে পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। আপনার জন্মাবার উপযুক্ত বংশ পৃথিবীতে এখন কোথায়।

কার্তিকেয়। বৈশ্য এখন রাজা, ক্ষত্রিয় এখন বৈশ্যের সেবায় লড়াই করছে, ব্রাহ্মণ এখন বৈশ্যের দাস।

ইন্দ্র। কোথায় জন্মাব সে তো আমার ইচ্ছার উপরে নেই, যেখানে আমাকে আকর্ষণ করে নেবে সেইখানেই আমার স্থান হবে।

বৃহস্পতি। আপনি যে ইন্দ্র সেই স্মৃতি কেমন করে—

ইন্দ্র। সেই স্মৃতি লোপ করে দিয়ে তবেই আমি মর্তবাসী হয়ে মর্তের সাধনা করতে পারব।

কার্তিকেয়। এতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলেই ছিলুম, আজ আপনার কথায় হঠাৎ মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই তন্বী শ্যামা ধরণী সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের পথ ধরে স্বর্গের দিকে কী উৎসুক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে। সেই ভীরুর ভয় ভাঙিয়ে দিতে কী আনন্দ। সেই ব্যথিতার মনে আশার সঞ্চার করতে কী গৌরব। সেই চন্দ্রকান্তমণিকিরীটিনী নীলাম্বরী সুন্দরী কেমন করে ভুলে গিয়েছে যে সে রানী। তাকে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, সে দেবতার সাধনার ধন, সে স্বর্গের চিরদয়িতা।

ইন্দ্র। আমি সেখানে গিয়ে তার দক্ষিণসমীরণে এই কথাটি রেখে আসতে চাই যে, তারই বিরহে স্বর্গের অমৃতে স্বাদ চলে গেছে এবং নন্দনের পারিজাত ম্লান; তাকে বেষ্টন ক'রে ধ'রে যে সমুদ্র রয়েছে সেই তো স্বর্গের অশ্রু, তারই বিচ্ছেদক্রন্দনকেই তো সে মর্তে অনন্ত করে রেখেছে।

কার্তিকেয়। দেবরাজ, যদি অনুমতি করেন তা হলে আমরাও পৃথিবীতে যাই।

বৃহস্পতি। সেখানে মৃত্যুর অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে অমৃতের জ্যোতিকে একবার দেখে আসি।

কার্তিকেয়। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তাঁর মাটির ঘরটিতে যে নিত্যনূতন লীলা বিস্তার করেছেন আমরা তার রস থেকে কেন বঞ্চিত হব। আমি যে বুঝতে পারছি, আমাকে পৃথিবীর দরকার আছে; আমি নেই বলেই তো সেখানে মানুষ স্বার্থের জন্যে নির্লজ্জ হয়ে যুদ্ধ করছে, ধর্মের জন্যে নয়।

বৃহস্পতি। আর, আমি নেই বলেই তো মানুষ কেবল ব্যবহারের জন্যে জ্ঞানের সাধনা করছে, মুক্তির জন্যে নয়।

ইন্দ্র। তোমরা সেখানে যাবে, আমি তো তারই উপায় করতে চলেছি; সময় হলেই তোমরা পরিণত ফলের মতো আপন মাধুর্যভারে সহজেই মর্তে স্খলিত হয়ে পড়বে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

কার্তিকেয়। কখন টের পাব মহেন্দ্র, যে, আপনার সাধনা সার্থক হল।

বৃহস্পতি। সে কি আর চাপা থাকবে। যখন জয়শঙ্খধ্বনিতে স্বর্গলোক কেঁপে উঠবে তখনি বুঝব যে—

ইন্দ্র। না দেবগুরু, জয়ধ্বনি উঠবে না। স্বর্গের চোখে যখন করুণার অশ্রু গলে পড়বে তখনই জানবেন, পৃথিবীতে আমার জন্মলাভ সফল হল।

২৬।১২

কার্তিকেয়। তত দিন বোধ হয় জানতে পারব না, সেখানে ধুলার আবরণে আপনি কোথায় লুকিয়ে আছেন।

বৃহস্পতি। পৃথিবীর রসই তো হল এই লুকোচুরিতে। ঐশ্বর্য সেখানে দরিদ্রবেশে দেখা দেয়, শক্তি সেখানে অক্ষমের কোলে মানুষ হয়, বীর্য সেখানে পরাভবের মাটির তলায় আপন জয়স্তম্ভের ভিত্তি খনন করে। সম্ভব সেখানে অসম্ভবের মধ্যে বাসা করে থাকে। যা দেখা দেয়, পৃথিবীতে তাকে মানতে গিয়েই ভুল হয়; যা না দেখা দেয় তারই উপর চিরদিন ভরসা রাখতে হবে।

কার্তিকেয়। কিন্তু সুররাজ, আপনার ললাটের চিরোজ্জ্বল জ্যোতি আজ ম্লান হল কেন।

বৃহস্পতি। মর্তে যে যাবেন তার গৌরবের প্রভা আজ দীপ্যমান হয়ে উঠুক।

ইন্দ্র। দেবগুরু, জন্মের যে বেদনা সেই বেদনা এখনি আমাকে পীড়িত করছে। আজ আমি দুঃখেরই অভিসারে চলেছি, তারই আহ্বানে আমার মনকে টেনেছে। শিবের সঙ্গে সতীর যেমন বিচ্ছেদ হয়েছিল, স্বর্গের আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যথার তেমনি বিচ্ছেদ হয়েছে; সেই বিচ্ছেদের দুঃখ এত দিন পরে আজ আমার মনে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। আমি চললুম সেই ব্যথাকে বুকে তুলে নেবার জন্যে। প্রেমের অমৃতে সেই ব্যথাকে আমি সৌভাগ্যবতী করে তুলব। আমাকে বিদায় দাও।

কার্তিকেয়। মহেন্দ্র, আমাদের জন্যে পথ করে দাও, আমরা সেইখানেই গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলব। স্বর্গ আজ দুঃখের অভিযানে বাহির হোক।

বৃহস্পতি। আমরা পথের অপেক্ষাতেই রইলুম, দেবরাজ। স্বর্গ থেকে বাহির হবার পথ করে দাও, নইলে আমাদের মুক্তি নেই।

কার্তিকেয়। বাহির করো, দেবরাজ, স্বর্গের বন্ধন থেকে আমাদের বাহির করো— মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমাদের পথ রচনা করো।

বৃহস্পতি। তুমি স্বর্গরাজ, আজ তুমি স্বর্গের তপোভঙ্গ ক'রে জানিয়ে দাও যে, স্বর্গ পৃথিবীরই।

কার্তিকেয়। যারা স্বর্গকামনায় পৃথিবীকে ত্যাগ করবার সাধনা করেছে চিরদিন তুমি তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছ, আজ স্বয়ং স্বর্গকে সেই পথে নিয়ে যেতে হবে।

ইন্দ্র। সেই বাধার ভিতর দিয়ে মুক্তিতে যাবার পথ—

বৃহস্পতি। যে মুক্তি আপন আনন্দে চিরদিনই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে।

গান

পথিক হে, পথিক হে,

ঐ যে চলে, ঐ যে চলে

সঙ্গী তোমার দলে দলে।

অন্তমনে থাকি কোণে,

চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে,

হঠাৎ শুনি জলে স্থলে

পায়ের ধ্বনি আকাশতলে

পথিক হে, পথিক হে,

যেতে যেতে পথের থেকে,

আমায় তুমি যেয়ো ডেকে।

যুগে যুগে বারে বারে

এসেছিলে আমার দ্বারে,

হঠাৎ যে তাই জানিতে পাই

তোমার চলা হৃদয়তলে।

—

সংযোজন

কথিকা

এবার মনে হল, মানুষ অন্যায়ের আগুনে আপনার সমস্ত ভাবী কালটাকে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে, সেখানে বসন্ত কোনোদিন এসে আর নতুন পাতা ধরাতে পারবে না।

মানুষ অনেক দিন থেকে একখানি আসন তৈরি করছে। সেই আসনই তাকে খবর দেয় যে, তার দেবতা আসবেন, তিনি পথে বেরিয়েছেন।

যেদিন উন্মত্ত হয়ে সেই তার অনেক দিনের আসন সে ছিঁড়ে ফেলে সেদিন তার যজ্ঞস্থলীর ভগ্নবেদী বলে, "কিছুই আশা করবার নেই, কেউ আসবে না।"

তখন এত দিনের আয়োজন আবর্জনা হয়ে ওঠে। তখন চারি দিক থেকে শুনতে পাই, "জয়, পশুর জয়।"

তখন শুনি, "আজও যেমন কালও তেমনি। সময় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বলদের মতো, চিরদিন একই ঘানিতে একই আর্তস্বর তুলছে। তাকেই বলে সৃষ্টি। সৃষ্টি হচ্ছে অন্ধের কান্না।"

মন বললে, "তবে আর কেন। এবার গান বন্ধ করা যাক। যা আছে কেবলমাত্র তারই বোঝা নিয়ে ঝগড়া চলে, যা নেই তারই আশা নিয়েই গান।"

শিশুকাল থেকে যে পথের পানে চেয়ে বারে বারে মনে আগমনীর হাওয়া লেগেছে— যে পথ দিগন্তের দিকে কান পেতেছে দেখে বুঝেছিলুম, ও পার থেকে রথ বেরোল— সেই পথের দিকে আজ তাকালেম ; মনে হল, সেখানে না আছে আগন্তুকের সাড়া, না আছে কোনো ঘরের।

বীণা বললে, "দীর্ঘ পথে আমার সুরের সাথি যদি কেউ না থাকে তবে আমাকে পথের ধারে ফেলে দাও।"

তখন পথের ধারের দিকে চাইলুম। চমকে উঠে দেখি, ধুলোর মধ্যে একটি কাঁটাগাছ ; তাতে একটিমাত্র ফুল ফুটেছে।

আমি বলে উঠলুম, "হায় রে হায়, ঐ তো পায়ের চিহ্ন।"

তখন দেখি, দিগন্ত পৃথিবীর কানে কানে কথা কইছে; তখন দেখি, আকাশে আকাশে প্রতীক্ষা। তখন দেখি, চাঁদের আলোয় তালগাছের পাতায় পাতায় কাঁপন ধরেছে; বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দিঘির জলের সঙ্গে চাঁদের চোখে চোখে ইশারা।

পথ বললে, "ভয় নেই।"

আমার বীণা বললে, "সুর লাগাও।"

—

সে

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
করতলযুগলেষু

মেঘের ফুরোল কাজ এইবার।
সময় পেরিয়ে দিয়ে ঢেলেছিল জলধার,
সুদীর্ঘ কালের পরে নিল ছুটি।
উদাসী হাওয়ার সাথে জুটি
রচিছে যেন সে অন্যমনে
আকাশের কোণে কোণে
ছবির খেয়াল রাশি রাশি,
মিলিছে তাহার সাথে হেমন্তে কুয়াশা-ছোঁওয়া হাসি।
দেবপিতামহ হাসে স্বর্গের কর্মের হেরি হেলা,
ইন্দ্রের প্রাঙ্গণতলে দেবতার অর্থহীন খেলা।

আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।

যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝুলি।
লও যদি লও তুলি,
রাখ ফেল যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।

ফসল কাটার পরে
শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।
এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে-
যার কোনো দাম নেই,
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয় নি কখনো।

শান্তিনিকেতন
পৌষ ১৩৪৩

সে

বিধাতা লক্ষলক্ষ কোটিকোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন, তবু মানুষের আশা মেটে না; বলে, আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব। তাই দেবতার সজীব পুতুল-খেলার পাশাপাশি নিজের খেলা শুরু হল পুতুল নিয়ে, সেগুলো মানুষের আপন-গড়া মানুষ। তার পরে ছেলেরা বলে 'গল্প বলো'; তার মানে, ভাষায়-গড়া মানুষ বানাও। গড়ে উঠল কত রাজপুত্তুর, মন্ত্রীর পুত্তুর, সুয়োরানী, দুয়োরানী, মৎস্যনারীর উপাখ্যান, আরব্য উপন্যাস, রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো। পৃথিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল। বুড়োরাও আপিসের ছুটির দিনে বলে, মানুষ বানাও; হল আঠারো-পর্ব মহাভারত প্রস্তুত। আর, লেগে গিয়েছেন গল্প-বানিয়ের দল দেশে দেশে।

নাংনির ফরমাশে কিছু দিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে; নিছক খেলার মানুষ, সত্যমিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে তার বয়স ন বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলাই শুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমসলা এতই হাল্‌কা ওজনের যে, নির্বিচারে পুপুও দিল যোগ। আর-একটা লোককে রেখেছিলুম, তার কথা হবে পরে।

অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই ব'লে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ ক'রে দিলুম, এক যে আছে মানুষ। তার পরে লোকে যাকে বলে গপ্‌পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চ'ড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে, দাদা, খিদে পেয়েছে।

রাজপুত্তুরের গল্প অনেক শুনেছি; কখনোই তার খিদে পায় না। কিন্তু এর খিদে পেয়ে গেল গোড়াতেই, শুনে খুশি হলুম। খিদে-পাওয়া লোকের সঙ্গে ভাব করা সহজ। খুশি করবার জন্যে গলির মোড়ের থেকে বেশি দূর যেতে হয় না।

দেখলুম, লোকটার দিব্যি খাবার শখ। ফরমাশ করে মুড়োর ঘণ্ট, লাউচিংড়ি, কাঁটাচচ্চড়ি; বড়োবাজারের মালাই পেলে বাটিটা চেঁচেপুঁছে খায়। এক-একদিন শখ

যায় আইস্‌ক্রিমের। এমন ক'রে খায় সে দেখবার যোগ্য। মজুমদারদের জামাইবাবুর সঙ্গে অনেকটা মেলে।

একদিন ঝমাঝম্‌ বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তর দিকে বরাবর চলে গেছে রাঙা মাটির রাস্তা— দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উঁচুনিচু ঢেউ-খেলানো, মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনো খেজুর। দূরে দুটো-চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারই পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ্‌ ওৎ পেতে আছে, কখন এক লাফে মাঝ-আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা। বাটিতে রঙ গুলে তুলি বাগিয়ে এইসব এঁকে চলেছি।

দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুত্তুর নয়— সেই লোকটা। সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে, ময়লা ভিজে জামা গায়ে লেপ্‌টে গেছে, কোঁচার ডগায় কাদা, জুতোয় কাদার পিণ্ডি। আমি বললুম, এ কী!

সে বললে, যখন বেরিয়েছিলুম খট্‌খটে রোদ্দুর। আদ্ধেক পথে আসতে বৃষ্টি নামল। তোমার ঐ বিছানার চাদরটা যদি দাও তো কাপড় ছেড়ে গায়ে জড়িয়ে বসি।

হুকুম পাবার সবুর সইল না। চট্‌ ক'রে খাটের থেকে লক্ষ্মৌছিটের ঢাকাটা টেনে নিয়ে তাই দিয়ে মাথাটা মুছে কাপড় ছেড়ে সেটা গায়ে জড়িয়ে বসল। ভাগ্যিস কাশ্মীরি জামিয়ারটা পাতা ছিল না।

বললে, দাদা, তোমাকে একটা গান শোনাব।

কী করি, ছবি-আঁকা বন্ধ করতে হল।

সে শুরু করলে—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,
নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।

আমার মুখের ভাব দেখে তার কী সন্দেহ হল জানি নে; জিগেস করলে, কেমন লাগছে।

আমি বললুম, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে গলা সাধতে হবে লোকালয় থেকে দূরে ব'সে। তার পরে বুঝে নেবেন চিত্রগুপ্ত, যদি সইতে পারেন।

সে বললে, পুপেদিদিও হিন্দুস্থানি ওস্তাদের কাছে গান শেখে, সেইখানে আমাকে বসিয়ে দিলে কেমন হয়।

আমি বললুম, পুপেদিদিকে যদি রাজি করাতে পার তা হলে কথা নেই।

সে বললে, পুপেদিদিকে আমি বড়ো ভয় করি।

এই পর্যন্ত শুনে আমার শ্রোতা পুপেদিদি খুব হেসে উঠল। তাকে কেউ ভয় করে,

এতে সে ভারি খুশি। যেমন খুশি হয় জগতের দোর্দণ্ডপ্রতাপের দল।

দয়াময়ী আশ্বাস দিয়ে বললে, ভয় নেই, আমি তাকে কিছু বলব না।

আমি বললুম, তোমাকে ভয় কে না করে! দুবেলা দু বাটি ক'রে দুধ খাও— গায়ে কী রকম জোর! মনে আছে তো, তোমার হাতে লাঠি দেখে সেই বাঘটা লেজ গুটিয়ে একেবারে দুটুপিসির বিছানার নীচে গিয়ে লুকিয়েছিল।

বীরাঙ্গনা ভারি খুশি। মনে করিয়ে দিলে ভালুকটার কথা— সে পালাতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল নাবার ঘরের স্নানের জলের টবের মধ্যে।

সেই যে মানুষটার ইতিহাস গড়ে উঠেছিল আমার একলার হাতে এখন থেকে পুপেও তাতে যেখানে-সেখানে জোড়া দিতে লাগল। আমি যদি বা বলি, একদিন বেলা তিনটার সময় সে এসেছিল আমার কাছে দাড়ি কামাবার খুর চেয়ে নিতে, আর নিতে খালি বিস্কুটের টিন, পুপে খবর দেয়, সে ওর কাছ থেকে নিয়ে গেছে পশম বোনবার কুরুশ-কাটি।

সব গল্পেরই একটা আরম্ভ আছে, শেষ আছে, কিন্তু ঐ-যে 'এক যে আছে মানুষ' তার আর শেষ নেই। তার দিদির জ্বর হয়, ডাক্তার ডাকতে যায়। টমি কুকুর আছে, বেড়ালের নখের আঁচড় লেগে তার নাক যায় ছ'ড়ে। পিছন দিক থেকে গোরুর গাড়ির উপর চ'ড়ে বসেছিল, তাই নিয়ে গাড়োয়ানের সঙ্গে হয় বিষম বচসা। উঠোনে কলতলায় পিছলে প'ড়ে বামুন ঠাকরুনের মাটির ঘড়া দেয় ভেঙে। মোহন-বাগানের ফুটবল-ম্যাচ্ দেখতে গিয়েছিল, পকেট থেকে সাড়ে তিন আনা পয়সা কে নেয় তুলে; ফিরতি রাস্তায় ভীমনাগের দোকান থেকে সন্দেশ কেনা বাদ গেল। বন্ধু আছে কিনু চৌধুরী, তার ওখানে গিয়ে কুচো চিংড়ি ভাজা আর আলুর দম ফরমাশ করে। এমনি একটার পর একটা চলছে দিনের পর দিন। এর সঙ্গে পুপে জুড়েছে, কোনোদিন দুপুরবেলায় ওর ঘরে গিয়ে বলেছে মায়ের আলমারি থেকে পাকপ্রণালীর বইখানা খুঁজে বের করতে, বন্ধু সুধাকান্তবাবু শিখতে চায় মোচার ঘণ্ট তৈরি করা। আর-একদিন পুপের সুবাসিত নারিকেল তেল নিয়ে গেল চেয়ে, ভয় হয়েছে মাথায় টাক প'ড়ে আসছে দেখে। আর-একদিন দিনুদার ওখানে গান শুনতে গেল, দিনুদা তখন তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে।

এই-যে আমাদের এক যে আছে মানুষ, এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে কেবল আমরা দুজনেই জানি, আর-কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা। এক যে ছিল রাজা, তারও নাম নেই; রাজপুত্র, তারও নেই। আর রাজকন্যা, যার

চুল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, যার হাসিতে মানিক, চোখের জলে মুক্তো, তারও নাম কেউ জানে না। ওরা নামজাদা নয়, অথচ ঘরে ঘরে ওদের খ্যাতি।

এই-যে আমাদের মানুষটি, একে আমরা শুধু বলি 'সে'। বাইরের লোক কেউ নাম জিগেস করলে আমরা দুজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি ক'রে হাসি। পুপে বলে, আন্দাজ ক'রে বলো দেখি, প দিয়ে আরম্ভ। কেউ বলে প্রিয়নাথ, কেউ বলে পঞ্চানন, কেউ বলে পাঁচকড়ি, কেউ বলে পীতাম্বর, কেউ বলে পরেশ, কেউ বলে পীটার্স্‌, কেউ বলে প্রেস্কট, কেউ বলে পীরবক্স, কেউ বলে পীয়ার খাঁ।

এইখানে এসে কলম থামতেই একজন বললে, গল্প চলবে তো ?

কার গল্প। এ তো রাজপুত্তুর নয়, এ হল মানুষ, এ খায়-দায় ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও শখ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প। মনের মধ্যে যদি মানুষটাকে স্পষ্ট ক'রে গ'ড়ে তোল তা হলে দেখতে পাবে, এ যখন দোকানের রোয়াকে ব'সে রসগোল্লা খায় আর তার রস ঠোঙার ছিদ্র দিয়ে অজানিতে পড়তে থাকে তার ময়লা ধুতির উপর, সেটাই গল্প। যদি জিগেস কর 'তার পরে' তা হলে বলব, তার পরে ও ট্রামে চড়ে বসল, হঠাৎ জ্ঞান হল পয়সা নেই, টপ্‌ ক'রে লাফিয়ে পড়ল। তার পরে ? তার পরে এই রকমই আরও কত কী— বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।

ওদের মধ্যে একজন বললে, যা সৃষ্টিছাড়া, বড়োবাজারে বহুবাজারে, এমন-কি নিমতলাতেও যার গতি নেই, তা নিয়ে কি গল্প হয় না।

আমি বললুম, যদি হয় তা হলেই হয়, না হলে হয়ই না।

সে বললে, হোক তবে। হোক-না একেবারে যা ইচ্ছে তাই ; মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, মানে নেই, মোদ্দা নেই, এমন একটা-কিছু।

এটা হল স্পর্ধা। বিধাতার সৃষ্টি, নিয়মের রসারসি দিয়ে ক'ষে বাঁধা, যেটা হবার সেটা হবেই। এ তো সহ্য হয় না। একঘেয়ে বিধানের সৃষ্টিকর্তা পিতামহকে এমন ক্ষেত্রে ঠাট্টা ক'রে নেওয়া যাক যেখানে শাস্তির ভয় নেই। এ তো তাঁর নিজের এলেকা নয়।

আমাদের সে ছিল কোণে বসে। কানে কানে বললে, দাদা, লেগে যাও। আমার নাম দিয়ে যা-খুশি চালিয়ে দিতে পার, ফৌজদারি করব না।

সে মানুষটির পরিচয় দেওয়ার দরকার আছে।

পুপুদিদিমণিকে ধারা বেয়ে যে গল্প ব'লে যাচ্ছি সেই গল্পের মূল অবলম্বন হচ্ছে

একটি সর্বনামধারী সে, কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরি। সেইজন্যে একে নিয়ে যা-তা করা সম্ভব, কোনোখানে এসে কোনো প্রশ্নের হুঁচোট খাবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু অনাসৃষ্টির চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার জন্যে একজন শরীরধারী জোগাড় করতে হয়েছে। সাহিত্যের মামলায় কেস্‌টা যখনই বড়ো বেশি বেসামাল হয়ে পড়ে তখনই এ লোকটা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। কিছুই বাধে না। আমার মতো মোক্তারের ইশারা পেলেই সে অম্লানমুখে বলতে পারে যে, কাঁচড়াপাড়ার কুম্ভমেলায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে কুমীরে ধরেছিল তার টিকির ডগা। সেটা গেল তলিয়ে, বোঁটা-ছেঁড়া মানবদেহের বাকি অংশটুকু উঠে এসেছে ডাঙায়। আরও একটু চোখ টিপে দিলে সে নির্লজ্জ হয়ে বলতে পারে, মানোয়ারী জাহাজের ডুবুরি গোরা সাত মাস পাঁক ঘেঁটে গোটা পাঁচ-ছয় চুল ছাড়া বাকি টিকিটা উদ্ধার করে এনেছে, বকশিষ পেয়েছে এককালীন সোয়া তিন টাকা। পুপুদিদি তবু যদি বলে 'তার পরে' তা হলে তখনি শুরু করবে, নীলরতন ডাক্তারের পায়ে ধরে বললে, দোহাই ডাক্তারবাবু, ওষুধ দিয়ে টিকিটা জোড়া দিয়ে লাগিয়ে দাও, নইলে তেলোর কাছে প্রসাদী ফুল বাঁধতে পারছি নে। তিনি সন্ন্যাসী-দত্ত বজ্রজটী মলম লাগিয়ে দিতেই টিকিটা একেবারে মরিয়া হয়ে বেড়ে চলেছে, অফুরান একটা কেঁচোর মতো। পাগড়ি পরলে পাগড়িটা বেলুনের মতো ফেঁপে উঠতে থাকে, মাথার বালিশটার উপর চুড়ো তৈরি হতে থাকে দৈত্যপুরীর ব্যাঙের ছাতার মতো। বাঁধা মাইনে দিয়ে নাপিত রাখতে হল। প্রহরে প্রহরে তাকে দিয়ে ব্রহ্মতালু চাঁচিয়ে নিতে হচ্ছে।

তবু যদি শ্রোতার কৌতূহল না মেটে তা হলে সে করুণ মুখ ক'রে বলতে থাকে যে, মেডিক্যাল কলেজের সার্জন-জেনেরাল হাতের আস্তিন গুটিয়ে বসে ছিল; তার ভীষণ জেদ, মাথার ঐ জায়গাটাতে ইস্‌ক্রুপ দিয়ে ফুটো ক'রে সেইখানে রবারের ছিপি এঁটে গালা লাগিয়ে শিলমোহর ক'রে দেবে, ইহকাল-পরকালে ওখান দিয়ে আর টিকি গজাতে পারবে না। চিকিৎসাটা ইহকাল ডিঙিয়ে পরকালেই গিয়ে ঠেকবে, এই আশঙ্কায় ও কোনোমতেই রাজি হল না।

আমাদের এই 'সে' পদার্থটি ক্ষণজন্মা বটে; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে। মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা। আমার আজগবি গল্পের এত বড়ো উত্তর-সাধক ওস্তাদ বহু ভাগ্যে জুটেছে। গল্প-প্রশ্নের উত্তরপাড়ার এই যে মানুষ, মাঝে মাঝে একে পুপুদিদির কাছে এনে হাজির করি— দেখে তার বড়ো চোখ আরও বড়ো হয়ে ওঠে। খুশি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে খাইয়ে দেয়।— লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে, আর ভালোবাসে শিকদারপাড়া গলির চম্‌চম্‌। পুপুদিদি জিগেস

করে, তোমার বাড়ি কোথায়। ও বলে, কোন্‌নগরে, প্রশ্নচিহ্নের গলিতে।

নাম বলি নে কেন। নাম বললে ইনি যে কেবলমাত্র ইনিতেই এসে ঠেকবেন, এই ভয়। জগতে আমি আছি একজন মাত্র, তুমিও তাই, সেই তুমি আমি ছাড়া আর-সকলেই তো সে। আমার গল্পের সকল সে'র উনি জামিন।

একটা কথা ব'লে রাখি, নইলে অধর্ম হবে। ওকে মাঝে রেখে যে পালা জমানো হয়েছে তার থেকে যারা বিচার করে তারা ভুল করে; যারা তাকে চাক্ষুষ দেখেছে তারা জানে লোকটা সুপুরুষ চেহারা সুগম্ভীর। রাত্তিরে যেমন তারার আলোর ছড়াছড়ি, ওর গাম্ভীর্য তেমনি চাপা হাসিতে ভরা। ও পয়লা নম্বরের মানুষ, তাই কোনো ঠাট্টা মস্‌করায় ওকে জখম করতে পারে না। ওকে বোকার মতো সাজাতে আমার মজা লাগে, কেননা ও আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। অবুঝের ভান করলেও ওর মানহানি হয় না; সুবিধে হয়, পুপুর স্বভাবের সঙ্গে ওর মিল হয়ে যায়।

২

এর মধ্যে পুপেদিদি গেছে দার্জিলিঙে। সে রইল মাথাঘষা গলিতে একলা আমার জিম্মায়। তার ভালো লাগছে না। আমিও জ্বালাতন হয়েছি। বলে, আমাকে দার্জিলিং পাঠাও।

আমি বললুম, কেন।

সে বললে, পুরুষ মানুষ বেকার বসে আছি, আত্মীয়স্বজন ভারি নিন্দে করছে।

কী কাজ করবে, বলো।

পুপেদিদির খেলার রান্নার জন্যে খবরের কাগজ কুচিকুচি করে দেব।

এত মেহন্নত সইবে না। একটু চুপ করো দেখি। আমি এখন হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস লিখছি।

হুঁহাউ নামটা শোনাচ্ছে ভালো, দাদা। ওটা তোমার চেয়ে আমার কলমেই মানাত ঠিক। বিষয়টার একটু আমেজ দিতে পার কি।

ঠাট্টা নয়, বিষয়টা গম্ভীর, কলেজে পাঠ্য হবার আশা রাখি। একদল বৈজ্ঞানিক ঐ শূন্য দ্বীপে বস্‌তি বেঁধেছেন। খুব কঠিন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

একটুখানি বুঝিয়ে বলো— কী করছেন তাঁরা। হাল নিয়মে চাষবাস করছেন?

একেবারে উল্টো, চাষের সম্পর্ক নেই।

আহারের কী ব্যবস্থা।

একেবারেই বন্ধ।

প্রাণটা ?

সেই চিন্তাটাই সব চেয়ে তুচ্ছ। পাকযন্ত্রের বিরুদ্ধে ওঁদের সত্যাগ্রহ। বলছেন, ঐ জঠরযন্ত্রটার মতো প্যাঁচাও জিনিস আর নেই। যত রোগ, যত যুদ্ধবিগ্রহ, যত চুরি-ডাকাতির মূল কারণ তার নাড়ীতে নাড়ীতে।

দাদা, কথাটা সত্য হলেও হজম করা শক্ত।

তোমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু, ওঁরা হলেন বৈজ্ঞানিক। পাকযন্ত্রটা উপড়ে ফেলেছেন, পেট গেছে চুপ্‌সে, আহার বন্ধ, নস্য নিচ্ছেন কেবলই। নাক দিয়ে পোষ্টাই নিচ্ছেন হাওয়ায় শুষে। কিছু পৌঁচচ্ছে ভিতরে, কিছু হাঁচতে হাঁচতে বেরিয়ে যাচ্ছে। দুই কাজ একসঙ্গেই চলছে, দেহটা সাফও হচ্ছে, ভর্তিও হচ্ছে।

আশ্চর্য কৌশল। কলের জাঁতা বসিয়েছেন বুঝি ? হাঁস মুরগি পাঁটা ভেড়া আলু পটোল একসঙ্গে পিষে শুকিয়ে ভর্তি করছেন ডিবের মধ্যে ?

না। পাকযন্ত্র, কসাইখানা, দুটোই সংসার থেকে লোপ করা চাই। পেটের দায়, বিল-চোকানোর ল্যাঠা একসঙ্গে মেটাবেন। চিরকালের মতো জগতে শান্তিস্থাপনার উপায় চিন্তা করছেন।

নস্যটা তবে শস্য নিয়েও নয়, কেননা সেটাতেও কেনাবেচার মামলা।

বুঝিয়ে বলি। জীবলোকে উদ্ভিদের সবুজ অংশটাই প্রাণের গোড়াকার পদার্থ, সেটা তো জান ?

পাপমুখে কেমন করে বলব যে জানি, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা নিতান্ত যদি জেদ করেন তা হলে মেনে নেব।

দ্বৈপায়ন পণ্ডিতের দল ঘাসের থেকে সবুজ সার বের করে নিয়ে সূর্যের বেগ্‌নি-পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন। সকালবেলায় ডান নাকে ; মধ্যাহ্নে বাঁ নাকে ; সায়াহ্নে দুই নাকে একসঙ্গে, সেইটেই বড়ো ভোজ। ওঁদের সমবেত হাঁচির শব্দে চমকে উঠে পশুপক্ষীরা সাঁৎরিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেছে।

শোনাচ্ছে ভালো। অনেক দিন বেকার আছি দাদা, পাকযন্ত্রটা হন্যে হয়ে উঠেছে—তোমাদের ঐ নস্যটার দালালি করতে পারি যদি নিয়ুমার্কেটে, তা হলে—

অল্প একটু বাধা পড়েছে, সে কথা পরে বলব। তাঁদের আর-একটা মত আছে। তাঁরা বলেন, মানুষ দু পায়ে খাড়া হয়ে চলে ব'লে তাদের হৃদ্‌যন্ত্র পাকযন্ত্র ঝুলে ঝুলে মরছে ; অস্বাভাবিক অত্যাচার ঘটেছে লাখো লাখো বৎসর ধ'রে। তার জরিমানা

দিতে হচ্ছে আয়ুক্ষয় ক'রে। দোলায়মান হৃদয়টা নিয়ে মরছে নরনারী ; চতুষ্পদের কোনো বালাই নেই।

বুঝলুম, কিন্তু উপায় ?

ওঁরা বলছেন, প্রকৃতির মূল মৎলবটা শিশুদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। সেই দ্বীপের সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ে শিলালিপিতে অধ্যাপক খুদে রেখেছেন— সবাই
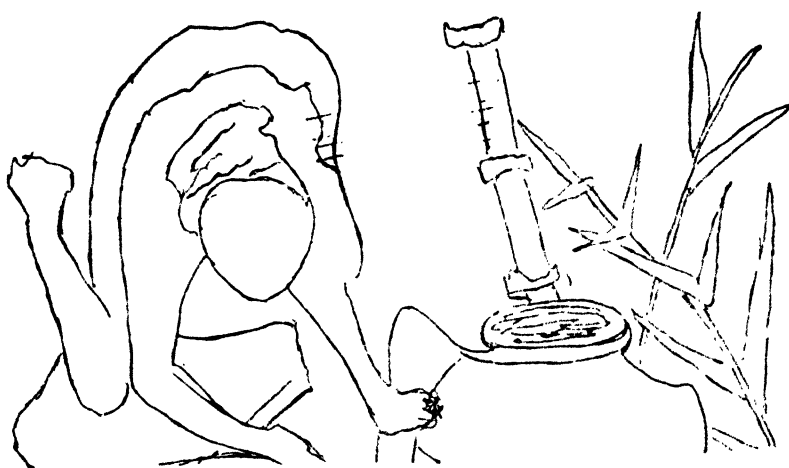
মিলে হামাগুড়ি দাও, ফিরে এসো চতুষ্পদী চালে, যদি দীর্ঘকাল ধরণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও।

সাবাস ! আরও কিছু বাকি আছে বোধ হয় ?

আছে। ওঁরা বলেন, কথা কওয়াটা মানুষের বানানো। ওটা প্রকৃতিদত্ত নয়। ওতে প্রতিদিন শ্বাসের ক্ষয় হতে থাকে, সেই শ্বাসক্ষয়েই আয়ুক্ষয়। স্বাভাবিক প্রতিভায় এ কথাটা গোড়াতেই আবিষ্কার করেছে বানর। ত্রেতাযুগের হনুমান আজও আছে বেঁচে। আজ ওঁরা নিরালায় বসে সেই বিশুদ্ধ আদিম বুদ্ধির অনুসরণ করছেন। মাটির দিকে মুখ ক'রে সবাই একেবারে চুপ। সমস্ত দ্বীপটাতে কেবল নাকের থেকে হাঁচির শব্দ বেরোয়, মুখের থেকে কোনো শব্দই নেই।

পরস্পর বোঝাপড়া চলে কী ক'রে।

অত্যাশ্চর্য ইশারার ভাষা উদ্ভাবিত।— কখনো ঢেঁকি-কোটার ভঙ্গীতে, কখনো হাতপাখা-চালানোর চালে, কখনো জোড়ো সুপুরি গাছের নকলে ডাইনে বাঁয়ে উপরে

নীচে ঘাড় ছুলিয়ে বাঁকিয়ে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে হেলিয়ে ঝাঁকিয়ে। এমন-কি, সেই ভাষার সঙ্গে ভুরু-বাঁকানি চোখ-টেপানি যোগ ক'রে ওঁদের কবিতার কাজও চলে। দেখা গেছে, তাতে দর্শকের চোখে জল আসে, নস্তির জায়গাটা বন্ধ হয়ে পড়ে।

কিছু টাকা আমাকে ধার দাও, দোহাই তোমার। ঐ হুঁহাউ দ্বীপেই যেতে হচ্ছে আমাকে। এত বড়ো নতুন মজাটা—

নতুন আর পুরোনো হতে পেল কই। হাঁচতে হাঁচতে বস্‌তিটা বেবাক ফাঁক হয়ে গেছে। পড়ে আছে জালা-জালা সবুজ নস্তি। ব্যবহার করবার যোগ্য নাক বাকি নেই একটাও।

এ তোমার আগাগোড়াই বানানো। বিজ্ঞানের ঠাট্টার পক্ষেও এটা বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। এই হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস বানিয়ে তুমি পুপেদিদিকে তাক লাগিয়ে দিতে চাও। ঠিক করেছিলে, তোমার এই অভাগা সে-নামওয়ালাকেই বৈজ্ঞানিক সাজিয়ে সারা দ্বীপময় হাঁচিয়ে হাঁচিয়ে মারবে। বর্ণনা করবে, আমি ঘাড়-নাড়ানাড়ির ঘটা ক'রে ঘটোৎকচ-বধ পাঁচালির আসর জমাচ্ছি কী ক'রে। হয়তো কোন্ হামাগুড়ি-ওয়ালি মনোহর-ঘাড়-নাড়ানির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে বসবে, ঘাড়নাড়া-মন্ত্রে কনে নাড়বে মাথা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, আর আমি নাড়ব ডান দিক থেকে [illegible] দিকে। সপ্তপদী-গমন হয়ে উঠবে চতুর্দশপদী। ওদের সেনেট-হলে ঘাড়নাড়া ভাষায় যখন ওরা সারে সারে পরীক্ষা দিতে বসেছে, তার মধ্যে আমাকেও বসাবে এক কোণে। আমার উপর তোমার দয়ামায়া নেই, দেবে ফেল করিয়ে। কিন্তু ওদের স্পোর্টিং ক্লাবে হামা-গুড়ি-রেসে আমাকেই পাওয়াবে ফাস্ট্‌ প্রাইজ। বলে দিচ্ছি, পুপেদিদিকে এমন করে হাসাতে পারবে মনেও কোরো না।

বেশি বোকো না। চাণক্যপণ্ডিত শ্রেণীবিশেষের আয়ুবৃদ্ধির জন্যে বলেছেন : তাবচ্চ বাঁচতে মূর্খ যাবৎ ন বক্‌বকায়তে।— তুমি তো সংস্কৃত কিছু শিখেছিলে ?

যতটা শিখেছিলেম ভুলেছি তার দেড়গুণ ওজনে। নয়া-চাণক্য জগতের হিতের জন্যে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাও তোমার জানা দরকার দাদা, ছন্দ মিলিয়েই লেখা : তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি যখন পণ্ডিত চুপায়তে।— চললুম। আমার শেষ পরামর্শ এই, বৈজ্ঞানিক রসিকতা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমানুষি করো যতটা পার।

এই কাহিনীটা পুপেদিদির কাছে একটুও পছন্দসই হয় নি। কপাল কুঁচকে বললে, এ কখনো হয় ? নস্তি নিয়ে পেট ভরে ?

আমি বললেম, গোড়াতে পেটটাকেই যে সরিয়ে দিয়েছে।

পুপুদিদি আশ্বস্ত হয়ে বললে, ওঃ, তাই বুঝি।

শেষ পর্যন্ত ওর গিয়ে ঠেকল কথা না বলাতে। ওর প্রশ্ন, কথা না ব'লে কি বাঁচা যায়।

আমি বললুম, ওদের সব চেয়ে বড়ো পণ্ডিত ভূর্জপাতায় লিখে লিখে দ্বীপময় প্রচার করেছেন, কথা বলেই মানুষ মরে। তিনি সংখ্যাগণনায় প্রমাণ করে দিয়েছেন, যারা কথা বলত সবাই মরেছে।

হঠাৎ পুপুদিদির বুদ্ধিতে প্রশ্ন উঠল, আচ্ছা, বোবারা ?

আমি বললেম, তারা কথা ব'লে মরে নি, তারা মরেছে কেউ বা পেটের অসুখে, কেউ বা কাশিসর্দিতে।

শুনে পুপুদিদির মনে হল, কথাটা যুক্তিসংগত।

আচ্ছা, দাদামশায়, তোমার কী মত।

আমি বললুম, কেউ বা মরে কথা ব'লে, কেউ বা মরে না ব'লে।

আচ্ছা, তুমি কী চাও।

আমি ভাবছি, হুঁহাউ দ্বীপে গিয়ে বাস করব, জম্বুদ্বীপে বকিয়ে মারল আমাকে, আর পেরে উঠছি নে।

৩

শিবাশোধনসমিতির একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে আমাদের সে। পুপুদিদির আসরে আজ সন্ধেবেলায় সেইটে পাঠ হবে।

রিপোর্ট

সন্ধেবেলায় মাঠে বসে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছি এমন সময় শেয়াল এসে বললে, দাদা, তুমি নিজের কাচ্চাবাচ্চাদের মানুষ করতে লেগেছ, আমি কী দোষ করেছি।

জিজ্ঞাসা করলেম, কী করতে হবে শুনি।

শেয়াল বললে, নাহয় হলুম পশু, তাই ব'লে কি উদ্ধার নেই। পণ করেছি, তোমার হাতে মানুষ হব।

শুনে মনে ভাবলুম, সৎকার্য বটে।

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার এমন মৎলব হল কেন।

সে বললে, যদি মানুষ হতে পারি তা হলে শেয়াল-সমাজে আমার নাম হবে,

আমাকে পুজো করবে ওরা।

আমি বললুম, বেশ কথা।

বন্ধুদের খবর দেওয়া গেল। তারা খুব খুশি। বললে, একটা কাজের মতো কাজ বটে। পৃথিবীর উপকার হবে। ক'জনে মিলে একটা সভা করলুম, তার নাম দেওয়া গেল শিবা-শোধন-সমিতি।

পাড়ায় আছে অনেক কালের একটা পোড়ো চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে রোজ রাত্তির নটার পরে শেয়াল মানুষ করার পুণ্যকর্মে লাগা গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, বৎস, তোমাকে জ্ঞাতিরা কী নামে ডাকে।

শেয়াল বললে, হোহো।

আমরা বললুম, ছি ছি, এ তো চলবে না। মানুষ হতে চাও তো প্রথমে নাম বদলাতে হবে, তার পরে রূপ। আজ থেকে তোমার নাম হল শিবুরাম।

সে বললে, আচ্ছা। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল, হোহো নামটা তার যেরকম মিষ্টি লাগে শিবুরাম তেমন লাগল না। উপায় নেই, মানুষ হতেই হবে।

প্রথম কাজ হল তাকে দু পায়ে দাঁড় করানো। অনেক দিন লাগল। বহু কষ্টে নড়্‌বড়্‌ করতে করতে চলে, থেকে থেকে পড়ে পড়ে যায়। ছ মাস গেল দেহটাকে কোনোমতে খাড়া রাখতে। থাবাগুলো ঢাকবার জন্য পরানো হল জুতো মোজা দস্তানা।

অবশেষে আমাদের সভাপতি গৌর গোঁসাই বললেন, শিবুরাম, এইবার আয়নায় তোমার দ্বিপদী ছন্দের মূর্তিটা দেখো দেখি, পছন্দ হয় কিনা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে শিবুরাম অনেক ক্ষণ ধরে দেখলে। শেষকালে বললে, গোঁসাইজি, এখনো তোমার সঙ্গে তো চেহারার মিল হচ্ছে না।

গোঁসাইজি বললেন, শিবু, সোজা হলেই কি হল। মানুষ হওয়া এত সোজা নয়। বলি, লেজটা যাবে কোথায়। ওটার মায়া কি ত্যাগ করতে পার।

শিবুরামের মুখ গেল শুকিয়ে। শেয়ালপাড়ায় দশ-বিশ গাঁয়ের মধ্যে ওর লেজ ছিল বিখ্যাত।

সাধারণ শেয়ালরা ওর নাম দিয়েছিল 'খাসা-লেজুড়ি'। যারা শেয়ালি-সংস্কৃত জানত তারা সেই ভাষায় ওকে বলত, 'সুলোমলাঙ্গুলী'। দু দিন গেল ওর ভাবতে, তিন রাত্রি ওর ঘুম হল না। শেষকালে বৃহস্পতিবারে এসে বললে, রাজি।

পাট্‌কিলে রঙের ঝাঁকড়া রোঁয়াওয়ালা লেজটা গেল কাটা, একেবারে গোড়া ঘেঁষে।
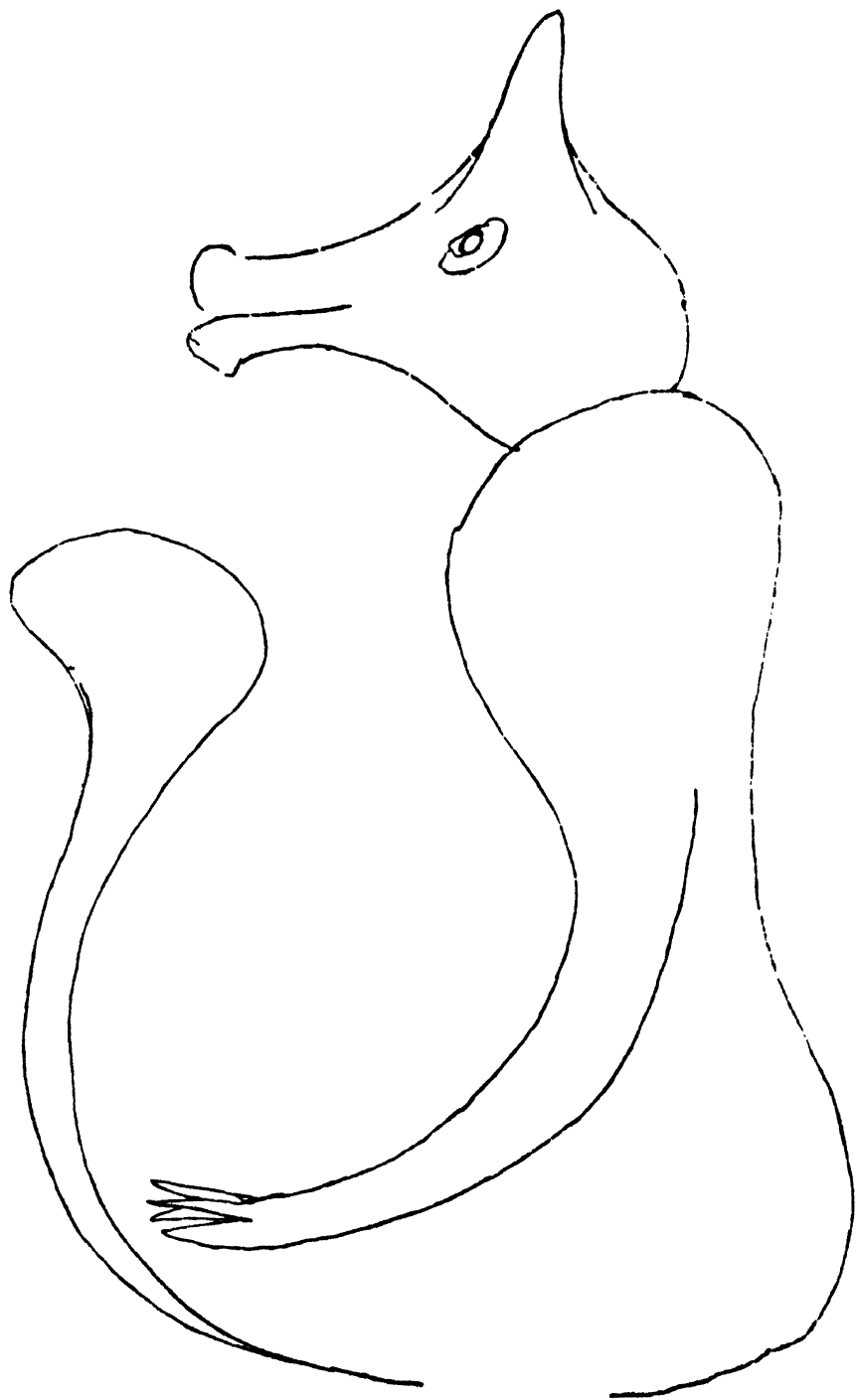
সভ্যেরা সকলে বলে উঠল, অহো, পশুর এ কী মুক্তি! লেজবন্ধনের মায়া ওর এত দিনে কেটে গেল! ধন্য!

শিবুরাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। চোখের জল সামলিয়ে নিয়ে সেও অতি করুণস্বরে বললে, ধন্য!

সেদিন ওর আহারে রুচি রইল না, সমস্ত রাত সেই কাটা লেজের স্বপ্ন দেখলে।

পরদিন শিবুরাম সভায় এসে হাজির। গোঁসাইজি বললেন, কেমন হে শিবু, দেহটা হাল্কা বোধ হচ্ছে তো?

শিবুরাম বললে, আজ্ঞে, খুবই হাল্কা। কিন্তু মন বলছে, লেজ গেল তবু মানুষের সঙ্গে বর্ণভেদ তো ঘুচল না।

গোঁসাই বললেন, রঙ মিলিয়ে সবর্ণ হতে চাও যদি, তবে রোঁয়া ঘুচিয়ে ফেলো।

তিনু নাপিত এল।

পাঁচ দিন লাগল খুর বুলিয়ে বুলিয়ে লোমগুলো চেঁচে ফেলতে। রূপ যেটা ফুটে উঠল তা দেখে সভ্যরা সবাই চুপ করে গেল।

শিবুরাম উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললে, মশায়, আপনারা কোনো কথা বলেন না কেন।

সভ্যরা বললে, আমরা নিজের কীর্তিতে অবাক।

শিবুরাম মনে শান্তি পেল। কাটা লেজ ও চাঁচা রোঁয়ার শোক ভুলে গেল।

সভ্যরা দুই চক্ষু বুজে বললেন, শিবুরাম, আর নয়। সভা বন্ধ হল। এখন—

শিবু বললে, এখন আমার কাজ হবে শেয়াল-সমাজকে অবাক করা।

এ দিকে শিবুরামের পিসি খেঁকিনি কেঁদে কেঁদে মরে। গাঁয়ের মোড়ল হুক্কুইকে গিয়ে বললে, মোড়ল মশায়, আজ এক বছরের উপর হয়ে গেল আমার হোঁহোঁকে দেখি নে কেন। বাঘ-ভাল্লুকের হাতে পড়ল না তো?

মোড়ল বললে, বাঘ-ভাল্লুককে ভয় কিসের? ভয় ঐ মানুষ জানোয়ারটাকে, হয়তো তাদের ফাঁদে পড়েছে।

খোঁজ পড়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে ভলন্টিয়ারের দল এল সেই চণ্ডীমণ্ডপের বাঁশবনে। ডাক দিলে, হুক্কা হুয়া।

শিবুরামের বুকের মধ্যে ধড়্‌ফড়্ করে উঠল, একবার গলা ছেড়ে ঐ একতানমন্ত্রে যোগ দিতে ইচ্ছা হল। বহু কষ্টে চেপে গেল।

দ্বিতীয় প্রহরে বাঁশবনে আবার ডাক উঠল, হুক্কা হুয়া। এবার শিবুরামের চাপা গলায় কান্নার মতো একটুখানি রব উঠল। তবু থেমে গেল।

তৃতীয় প্রহরে ওরা আবার যখন ডাক ছাড়লে শিবুরাম আর থাকতে পারলে না;

ডেকে উঠল, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া।

হুক্কুই বললে, ঐ তো হৌহৌয়ের গলা শুনি। একবার হাঁক দাও তো।

ডাক পড়ল, হৌহৌ!

সভাপতি বিছানা ছেড়ে এসে বললেন, শিবুরাম!

বাইরে থেকে আবার ডাক পড়ল, হৌহৌ!

গোঁসাইজি আবার সতর্ক করে দিলেন, শিবুরাম!

তৃতীয়বার ডাকে শিবুরাম ছুটে বেরিয়ে আসতেই শেয়ালরা দিল দৌড়। হুক্কুই, হৈয়ো, হুহু প্রভৃতি বড়ো বড়ো শেয়াল-বীর আপন আপন গর্তের ভিতর গিয়ে ঢুকল।

সমস্ত শেয়াল-সমাজ স্তম্ভিত।

তার পর ছ মাস গেল।

শেষ খবর পাওয়া গেছে। শিবুরাম সারারাত হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্ছে, আমার লেজ কই, আমার লেজ কই।

গোঁসাইয়ের শোবার ঘরের সামনের রোয়াকে ব'সে ঊর্ধ্ব দিকে মুখ তুলে প্রহরে প্রহরে কোকিয়ে উঠে বলে, আমার লেজ ফিরে দাও।

গোঁসাই দরজা খুলতে সাহস করে না— ভয় পায়, পাছে তাকে খ্যাপা শেয়ালে কামড়ায়।

শেয়ালকাঁটার বনে যেখানে শিবুরামের বাড়ি সেখানে ওর যাওয়া বন্ধ। জ্ঞাতিরা ওকে দূর থেকে দেখলে, হয় পালায় নয় খেঁকিয়ে কামড়াতে আসে। ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপেই থাকে, সেখানে একজোড়া প্যাঁচা ছাড়া আর অন্য প্রাণী নেই। খাঁদু, গোবর, বেঁচি, ঢেঁড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো ডানপিটে ছেলেরাও ভূতের ভয়ে সেখানকার জঙ্গল থেকে কবুমচা পাড়তে যায় না।

শেয়ালি ভাষায় শেয়াল একটা ছড়া লিখেছে, তার আরম্ভটা এইরকম—

ওরে লেজ, হারা লেজ, চক্ষে দেখি ধুঁয়া।
বক্ষ মোর গেল ফেটে হুক্কা হুয়া হুয়া॥

পুপে বলে উঠল, কী অন্যায়, ভারি অন্যায়। আচ্ছা, দাদামশায়, ওর মাসিও ওকে নেবে না ঘরে?

আমি বললুম, তুমি ভেবো না; ওর গায়ের রোঁয়াগুলো আবার উঠুক, তখন ওকে চিনতে পারবে।

কিন্তু, ওর লেজ ?

হয়তো লাঙুলাস্থ ঘৃত পাওয়া যেতে পারে কবিরাজমশায়ের ঘরে। আমি খোঁজ নেব।
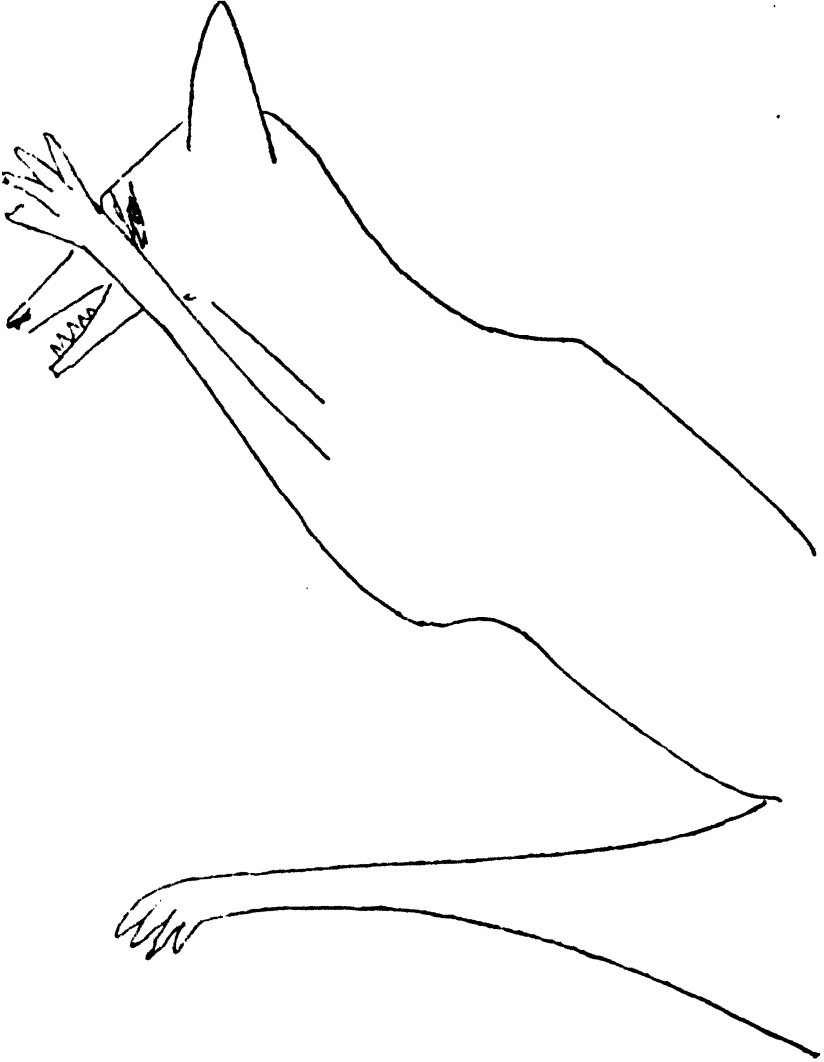
আমার লেজ কই! আমার লেজ কই!

সে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে, রাগ কোরো না দাদা, হক্‌ কথা বলব—তোমারও শোধনের দরকার হয়েছে।

বে-আদব কোথাকার, কিসের শোধন আমার।

তোমার ঐ বুড়োমির শোধন। বয়স তো কম হয় নি, তবু ছেলেমানুষিতে পাকা হতে পারলে না।

প্রমাণ পেলে কিসে।

এই-যে রিপোর্ট্‌টা পড়ে শোনালে, ওটা তো আগাগোড়া ব্যঙ্গ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি। দেখলে না পুপুদিদির মুখ কিরকম গম্ভীর? বোধ হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। ভাবছিল, রোঁয়া-চাঁচা শেয়ালটা এখনি এল বুঝি তার কাছে নালিশ করতে। বুদ্ধির মাত্রাটা একটু কমাতে যদি না পার তা হলে গল্প বলা ছেড়ে দাও।

ওটা কমানো আমার পক্ষে শক্ত। তুমি বুঝবে কী ক'রে; তোমাকে তো চেষ্টাই করতে হয় না, বিধাতা আছেন তোমার সহায়।

দাদা, রাগ করছ বটে, কিন্তু আমি বলে দিলুম, বুদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্ছে শুকিয়ে। মজা করছ মনে কর, কিন্তু তোমার ঠাট্টা গায়ে ঠেকলে ঝামার মতো লাগে। এর আগে তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি— হাসতে গিয়ে, হাসাতে গিয়ে পরকাল খুইয়ো না। লেজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপুদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল, দেখতে পাও নি বুঝি? বল তো আজই তাকে আমি একটুখানি হাসিয়ে দিই গে— বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই।

লেখা তৈরি আছে নাকি?

আছে। নাটকি চালের আলাপ। বললেই হবে, আমাদের পাড়ার উধো গোবরা আর পঞ্চুতে মিলে কথা হচ্ছে। ওদের সবাইকে দিদি চেনে।

আচ্ছা বেশ, দেখা যাক।

গেছো বাবা

উধো। কী রে, সন্ধান পেলি?

গোবরা। আরে ভাই, তোমার কথা শুনে আজ মাসখানেক ধরে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে হাড় মাটি হল, টিকিও দেখতে পেলুম না।

পঞ্চু। কার সন্ধান করছিস রে।

গোবরা। গেছো বাবার।

পঞ্চু। গেছো বাবা? সে আবার কে রে।

উধো। জানিস নে? বিশ্বসুদ্ধ লোক তাকে জানে।

পঞ্চু। তা, গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শুনি।

উধো। বাবা যে গাছে চড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্পতরু। তলায় দাঁড়িয়ে হাত পাতলেই যা চাইবি তাই পাবি রে।

পঞ্চু। খবর পেলি কার কাছ থেকে।

উধো। ধোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দারের কাছ থেকে। বাবা সেদিন ডুমুর গাছে চড়ে বসে পা দোলাচ্ছিল ; ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি

চিটেগুড়, তামাক তৈরী করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল টলে— চিটেগুড়ে তার মুখ চোখ গেল বুজে। বাবার দয়ার শরীর; বললে, ভেকু, তোর মনের কামনা কী খুলে বল্। ভেকুটা বোকা; বললে, বাবা একখানা ট্যানা দাও, মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একখানা গামছা। মুখ চোখ মুছে উপরে যখন তাকালো তখন আর কারও দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার। বাস্, তার পরে কেঁদে আকাশ ফাটালেও সাড়া মিলবে না।

পঞ্চু। হায় রে হায়, শাল নয়, দোশালা নয়, শুধু একখানা গামছা! ভেকুর আর বুদ্ধি কত হবে।

উধো। তা হোক, নেপু। ঐ গামছা নিয়েই তার দিব্যি চলে যাচ্ছে— দেখিস নি? রথতলার কাছে অত বড়ো আটচালা বানিয়েছে। গামছা হোক, বাবার গামছা তো।

পঞ্চু। কী করে হল। ভেল্‌কি নাকি।

উধো। হোঁদলপাড়ার মেলায় ভেকু সেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজারে হাজারে লোক এসে জুটল। বাবার নামে টাকাটা সিকেটা আলুটা মুলোটা চার দিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল। মেয়েরা কেউ বা এসে বলে, ও ভেকুদাদা, আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একটু ঠেকিয়ে দে, আজ তিনমাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। ওর নিয়ম হচ্ছে নৈবিদ্যি চাই পাঁচ সিকে, পাঁচটা সুপুরি, পাঁচ কুন্‌কে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি।

পঞ্চু। নৈবিদ্যি তো দিচ্ছে, ফল পাচ্ছে কিছু?

উধো। পাচ্ছে বৈ কি। গাজন পাল গামছা ভরে পনেরো দিন ধরে ধান ঢেলেছে; তার পরে ঐ গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বেঁধে, ঐ পাঁঠার ডাকে চার দিক থেকে লোক এসে জমল। কী বলব, ভাই, মাস এগারো পরেই গাজনের চাকরি জুটে গেল। আমাদের রাজবাড়ির কোতোয়ালের সিদ্ধি ঘোঁটে, তার দাড়ি চুম্‌রিয়ে দেয়।

পঞ্চু। সত্যি বলছিস?

উধো। সত্যি না তো কী। গাজন যে আমার মামাতো ভাইয়ের ভায়রা-ভাই হয়।

পঞ্চু। আচ্ছা ভাই উধো, গামছাটা তুই দেখেছিস?

উধো। দেখেছি বৈ কি। হটুগঞ্জের তাঁতে দেড়গজ ওসারের যে গামছা বুনুনি হয়, চাঁপার বরন জমি, লাল পাড়, একেবারে বেমালুম তাই।

পঞ্চু। বলিস কী। তা, সে গাছের উপর থেকে পড়ল কী করে।

উধো। ঐ তো মজা। বাবার দয়া!

পঞ্চু। চল্ ভাই, চল্, খোঁজ করতে বেরোই। কিন্তু, চিনব কী করে।

উধো। সেই তো মুশকিল। কেউ তো তাকে দেখে নি। আবার ছবি তো হ, ভেকু বেটার চোখ গেল চিটেগুড়ে বুজে।

পঞ্চু। তবে উপায়?

উধো। আমি তো হাটে ঘাটে যাকে দেখছি তাকেই জোড়হাত ক'রে জিগেস করছি, দয়া ক'রে জানাও, তুমিই কি গেছো বাবা। শুনে তারা তেড়ে মারতে আসে। একজন তো দিল আমার মাথায় হুঁকোর জল ঢেলে।

গোবরা। তা দিক গে। ছাড়া হবে না। খুঁজে বের করবই। যা থাকে কপালে।

পঞ্চু। ভেকু বলে, গাছে চড়লেই তবে বাবার চেহারা ধরা পড়ে, যখন নীচে থাকেন চেনবার জো নেই।

উধো। গাছে চড়িয়ে চড়িয়ে মানুষকে পরখ করব কী ক'রে, ভাই। আমি এক বুদ্ধি করেছি, আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভরে গেছে, যাকে দেখছি তাকেই বলছি, আমড়া পেড়ে নাও— গাছটা প্রায় খালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে।

পঞ্চু। আর দেরি নয় রে, চল্। কপালের জোর যদি থাকে তবে দর্শনলাভ হবেই। একবার গলা ছেড়ে ডাক দে-না, ভাই! গেছো বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পারুলবনে কোথাও যদি থাক লুকিয়ে, একবার অভাগাদের দর্শন দাও।

গোবরা। ওরে হয়েছে রে, দয়া হল বুঝি।

পঞ্চু। কই রে, কই।

গোবরা। ঐ-যে চালতা গাছে।

পঞ্চু। কী রে, চালতা গাছে কী। দেখছি নে তো কিছু।

গোবরা। ঐ-যে দুলছে।

পঞ্চু। কী দুলছে। ও তো লেজ রে।

উধো। তোর কেমন বুদ্ধি গোবরা, ও বাবার লেজ নয় রে, হনুমানের লেজ। দেখছিস নে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে?

গোবরা। ঘোর কলি যে! বাবা ঐ কপিরূপ ধরেছেন আমাদের ভোলাবার জন্যে।

পঞ্চু। ভুলছি নে, বাবা, কালামুখ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত পার মুখ ভ্যাঙাও, নড়ছি নে— তোমার ঐ শ্রীলেজের শরণ নিলুম।

গোবরা। ওরে, বাবা যে লম্বা লাফ দিয়ে পালাতে শুরু করল রে।

পঞ্চু। পালাবে কোথায়। আমাদের ভক্তির দৌড়ের সঙ্গে পারবে কেন।

গোবরা। ঐ বসেছে কয়েৎবেল গাছের ডগায়।

উধো। পঞ্চু, উঠে পড়্-না গাছে।

পঞ্চু। আরে, তুই ওঠ্-না।

উধো। আরে, তুই ওঠ্।

পঞ্চু। অত উচ্চে উঠতে পারব না, বাবা, কৃপা ক'রে নেমে এসো।

উধো। বাবা, তোমার ঐ শ্রীলেজ গলায় বেঁধে অন্তিমে যেন চক্ষু মুদতে পারি এই আশীর্বাদ করো।

[প্রস্থান

ওহে কমবুদ্ধি, হাসাতে পারলে ?

না। যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়। ভয় হচ্ছে, পুপেদিদি পাছে গেছো বাবার সন্ধান করতে আমাকে পাঠায়।

মুখ দেখে আমারও তাই বোধ হচ্ছে। গেছো বাবার 'পরে ওর টান পড়েছে। আচ্ছা, কাল পরীক্ষা ক'রে দেখব, বিশ্বাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কি না।

কিছুক্ষণ বাদে পুপু এসে বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, গেছো বাবার কাছে তুমি হলে কী চাইতে।

আমি বললেম, পুপুদিদির জন্যে এমন একটা কলম চাইতেম যা নিয়ে লিখতে বসলে অঙ্ক কষতে একটা ভুলও হত না।

পুপুদিদি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, আঃ, সে কী মজাই হত !

অঙ্কে দিদি এবার একশোর মধ্যে সাড়ে তেরো মার্কা পেয়েছে।

৪

স্বপ্ন দেখছি কি জেগে আছি বলতে পারি নে। জানি নে কত রাত। ঘর অন্ধকার, লণ্ঠনটা আছে বারান্দায়, দরজার বাইরে। একটা চামচিকে পোকার লোভে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, গয়ায়-পিণ্ডি-না-দেওয়া ভূতের মতো।

সে এসে হাঁক দিলে, দাদা, ঘুমচ্ছ নাকি।

বলেই ঘরে ঢুকে পড়ল। কালো কম্বলে সর্বাঙ্গ মোড়া।

জিগেস করলেম, এ কেমন সজ্জা তোমার।

বললে, আমার বরসজ্জা।

বরসজ্জা! বুঝিয়ে বলো।

কনে দেখতে যাচ্ছি।

জানি নে কেন, আমার যেন ঘুমে-ঘোলা বুদ্ধিতে ঠেকল যে, ঠিক হয়েছে, এই সজ্জাই উচিত। উৎসাহ দিয়ে বললুম, সেজেছ ভালো। তোমার ওরিজিন্যালিটি দেখে খুশি হলুম। একেবারে ক্লাসিকাল সাজ।

কী রকম।

ভূতনাথ যখন তাঁর তপস্বিনী কনেকে বর দিতে এলেন, তাঁর গায়ে ছিল হাতির চামড়া। তোমার এটা যেন ভালুকের চামড়া। নারদ দেখলে খুশি হতেন।

দাদা, সমজদার তুমি। এলেম এইজন্যেই তোমার কাছে এত রাত্তিরে।

কত রাত বলো দেখি।

দেড়টার বেশি হবে না।

কনে কি এখনি দেখা চাই।

হাঁ, এখনি।

শুনেই বলে উঠলেম, ভারি চমৎকার।

কী কারণে বলো তো।

কেন-যে এতদিন আইডিয়াটা মাথায় আসে নি তাই ভাবি। আপিসের বড়ো সাহেবের মুখ দেখা দিনের রোদ্দুরে, আর কনে দেখা মাঝরাত্তিরের অন্ধকারে।

দাদা, তোমার মুখের কথা যেন অমৃতসমান। একটা পৌরাণিক নজির দাও তো।

মহাদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মহাকালীর দিকে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে, এই কথাটা স্মরণ কোরো।

অহো, দাদা, তোমার কথায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সাব্লাইম যাকে বলে। তা হলে আর কথা নেই।

কনেটি কে এবং আছেন কোথায়।

আমার বৌদিদির ছোটো বোন, আছেন তাঁরই বাড়িতে।

চেহারায় তোমার বৌদিদির সঙ্গে কি মেলে।

মেলে বই কি, সহোদরা বটে।

তা হলে অন্ধকার রাতের দরকার আছে।

বৌদি স্বয়ং ব'লে দিয়েছেন, টর্চটা যেন সঙ্গে না আনি।

বৌদির ঠিকানাটা?

সাতাশ মাইল দূরে, চৌচাকলা গ্রামে, উনকুণ্ড পাড়ায়।

ভোজন আছে তো?

আছে বৈকি।

শুনে কোন্ মোহের ঘোরে যে মনটা পুলকিত হল বলতে পারি নে। লিভরের দোষে ভুগে আসছি বারো বছর, খাবার নাম শুনলেই পিত্তি যায় বিগড়ে।

জিগেস করলেম, খাওয়াটা কী রকম হবে শুনি।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, অতি উত্তম, অতি উত্তম, অতি উত্তম। বৌদি আমসত্ত দিয়ে উচ্ছেসিদ্ধ চমৎকার রাঁধে, আর কুলের আঁটি ঢেঁকিতে কুটে তার সঙ্গে দোক্তার জল মিশিয়ে চাটনি—

বলেই নাচ জুড়ে দিল বিলিতি চালে,— টিটিটম্‌টম্‌, টিটিটম্‌টম্‌, টিটিটম্‌টম্‌।

জীবনে কোনোদিন নাচি নি, হঠাৎ নাচ পেয়ে গেল— দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে নাচতে শুরু ক'রে দিলুম, টিটিটম্‌টম্‌। মনে হল আশ্চর্য আমার ক্ষমতা; যমুনা দিদি যদি দেখত তবে বলত, নাচ বটে।

শেষকালে হাঁপিয়ে উঠে ধপ্ ক'রে বসে পড়লুম। বললুম, আহারের ফর্দ যা দিলে একেবারে খাঁটি ভিটামিন। লিভরের পক্ষে অমৃত। কনে দেখতে যাবে তো কনের পরীক্ষা তো চাই।

এক দফা হয়ে গেছে আগেই।

কী রকম।

মনে করলুম, মিলন হবার আগে মিলের পরীক্ষা চাই। ঠিক কি না বলো।

ঠিক তো বটেই। পরীক্ষার প্রণালীটা কী।

জিগেস করা চাই 'শোলোক মেলাতে পার কি না'। দূত পাঠিয়েছিলুম 'রংমশাল'এর সহ-সম্পাদককে, তিনি আওড়ালেন—

সুন্দরী, তুমি কালো কুষ্টি।

বললেন, মিল ক'রে এর জবাব দিতে হবে, পুরো মাপের মিল।

কনেটি এক নিঃশেষে ব'লে দিলে—

কানা তুমি, নেই ভালো দৃষ্টি।

সহ-সম্পাদকের এটা অসহ হল, ব'লে দিলে—

ব্রহ্মা লম্বা হাতে
তোমাকে গড়েছে রাতে
যবে শেষ হল আলোবৃষ্টি।

লম্বা হাতে বলবার তাৎপর্য কী হল।

মেয়েটি ঢ্যাঙা আছে শুনেছি, তোমার চেয়ে ইঞ্চি দুই-তিন বড়ো হবে। তাই শুনেই তো আমার উৎসাহ।

বলো কী।

একখানা মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে পাওয়া যাবে আধখানা ফাউ।

এ কথাটা আমার মাথায় ওঠে নি।

যা হোক দাদা, সহ-সম্পাদকের কাছে হার মেনে ও হার-মানার একটা কবুলতি দিয়ে দিয়েছে।

কী রকম।

মাছের আঁশের হার গেঁথে ওর গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশঃসৌরভ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।

আমি লাফ দিয়ে ব'লে উঠলুম, ধন্য! এবার দেখছি এক অসাধারণের সঙ্গে আর-এক অসাধারণের মিলন হবে, জগতে এমন কদাচিৎ ঘটে। তা হলে আর কেন দিন ক্ষণ দেখা।

কিন্তু মেয়েটির পণ, ওকে যে হারাতে পারবে তাকেই ও বিয়ে করবে।

রূপে?

না, কথার মিলে। ঠিকমত যদি মেলাতে পারি তা হলে ও নিজেকে দেবে জলাঞ্জলি।

পারবে তো?

নিশ্চয়।

প্ল্যানটা কী শুনি।

বলব, চার লাইনে আমার চরিত্র বর্ণনা করো, স্তবে আমাকে খুশি ক'রে দাও। মিল হওয়া চাই ফর্স্ট্ ক্লাস।

কনে দেখার যদি পেটেন্ট্ নেওয়া চলত তুমি নিতে পারতে! বরের স্তব দিয়ে শুরু! অতি উত্তম। উমা তাতেই জিতেছিলেন।

প্রথম লাইনটা ওকে ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে আমার চরিত্রের থই পাবে না; আমার বর্ণনার ধুয়োটি হচ্ছে এই—

তুমি দেখি মানুষটা একেবারে অদ্ভুত।

পুরো বছরের মিল দাবি করলে মেয়েটি বোধ হয় মাথায় হাত দিয়ে পড়বে। ওকে হার মানতেই হবে। আচ্ছা দাদা, তুমিই দাও দেখি ওর পরের লাইনটা যোগ ক'রে।

আমি বললেম—

স্কন্ধে তোমার বুঝি চাপিয়াছে বদ ভূত।

এক্‌সেলেণ্ট্‌। কিন্তু আর দুটো লাইন না হলে শ্লোক তো ভর্তি হয় না। আমি বলছি, কনে তো কনে, কনের বাবার সাধ্যি হবে না ওর মিল বের করতে। দাদা, তোমার মাথায় কিছু আসছে? ভাষায় হোক্ অভাষায় হোক।

একেবারেই না।

তা হলে শোনো—

ছাত থেকে লাফ দাও, পাঁক দেখে ঝাঁপ দাও,
যখন তখন করো যদ্ভূত তদ্ভূত।

ও আবার কী! ওটা কোন্ দিশি বুলি।

দেবভাষা সংস্কৃত, কিম্ভূত শব্দের এক পর্যায়।

যদ্ভূত তদ্ভূত, মানেটা কী হল।

ওর মানে, যা খুশি তাই। ওটা বঙ্গভাষায়, যাকে হাল আমলের পণ্ডিতেরা বলেছে 'অবদান'।

লোকটার 'পরে আমার ভক্তি কূল ছাপিয়ে উঠল। মনে হল অসাধারণ প্রতিভা। ওর পিঠ থাবড়িয়ে বললুম, স্তম্ভিত করেছ আমাকে।

সে বললে, স্তম্ভিত হলে চলবে কেন। চলতে হবে। লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। ফস্ ক'রে ববকরণ পেরিয়ে যাবে কখন, এসে পড়বে তৈতিলকরণ, বৈকুম্ভযোগ, তার পরেই হর্ষণযোগ, বিষ্টিকরণ, শেষ রাত্তিরে অস্থকযোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্র— গোস্বামীমতে ব্যতীপাতযোগ বালবকরণ, পরিঘযোগে যখন গরকরণ এসে পড়বে তখন বিপদ হবে— ঘরকন্নার পক্ষে গরকরণের মতো এত বড়ো বাধা আর নেই। সিদ্ধিযোগ ব্রহ্মযোগ ইন্দ্রযোগ শিবযোগ এই হপ্তার মধ্যে একদিনও পাওয়া যাবে না, বরীয়ানযোগের অল্প একটু আশা আছে যখন পুনর্বসু নক্ষত্রের দৃষ্টি পড়বে।

কাজ নেই, কাজ নেই, এখ্‌খনি বেরিয়ে পড়া যাক। ডাক দাও পুতুলালকে, মোটরখানা আনুক। সে এতক্ষণে চরকা কাটতে বসেছে। চরকা কাটতে কাটতে তবে সে ঘুমতে পারে, মোটর চালিয়ে চালিয়ে তার এই দশা হয়েছে।

গাড়িতে চড়ে বসলুম।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঘোর অন্ধকার। পুকুরের ধারে আস্‌সেওড়ার ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতর থেকে খেঁকশিয়ালি উঠল ডেকে। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাকা, পুত্তুলাল চমকে উঠে গাড়িসুদ্ধ গিয়ে পড়ল একগলা জলের মধ্যে। এ দিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাঙ ঢুকে লাফালাফি করছে। আর, পুত্তুলালের সে কী চেঁচানি! আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, পুত্তুলাল, তোর পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে খুব কষে লাফাতে দে, বিনি পয়সায় অমন ভালো মালিশ আর পাবি নে।

গাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী।

ইস্টুপিডের কোনো সাড়াশব্দ নেই। স্পষ্টই বোঝা গেল, সে তখন বোলপুর স্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরমে চাদর মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে। ভারি রাগ হল। ইচ্ছে করল, তার নাকের মধ্যে ফাউণ্টেন পেনের সুড়্‌সুড়ি দিয়ে তাকে হাঁচিয়ে দিয়ে আসি গে। এ দিকে পাঁকের জলে আমার চুলগুলো গেছে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওর বৌদিদির ওখানে যাই কী ক'রে। গোলমাল শুনে পুকুরপাড়ে হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক ক'রে ডেকে উঠেছে। এক লাফ দিয়ে পড়লুম তাদের মধ্যে; একটাকে চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে চুলটা একরকম ঠিক করে নিলুম। পুত্তুলাল বললে, ঠিক বলেছ, দাদাবাবু। ব্যাঙের লাফে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। ঘুম আসছে।

যাওয়া গেল ওর বৌদিদির বাড়িতে। খিদের চোটে একেবারে ভুলে গেছি কনে দেখার কথা। বৌদিদিকে জিগেস করলেম, আমার সঙ্গে ছিল সে, তাকে দেখছি নে কেন।

তিন হাত দোপাট্টা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর থেকে মিহিসুরে বৌদিদি বললে, সে কনে খুঁজতে গেছে।

কোন্‌ চুলোয়।

মজা দিঘির ধারে বাঁশতলায়।

কত দূর হবে।

তিন পহরের পথ।

দূর বেশি নয় বটে। কিন্তু, খিদে পেয়েছে। তোমার সেই চাট্‌নি বের করো দিকি।

বৌদিদি নাকি সুরে বললে, হায় রে আমার পোড়া কপাল, এই গেল মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবারে ফাটা ফুটবল্‌ ভর্তি ক'রে সমস্তটা পাঠিয়ে দিয়েছি বুজুদিদির ওখানে— সে ওটা খেতে ভালোবাসে ছোলার ছাতুর সঙ্গে শর্ষেতেল আর লঙ্কা দিয়ে মেখে।

পান্নারাম

মুখ শুকিয়ে গেল ; বললুম, আমরা খাই কী।

বৌদিদি বললে, শুকনো কুঁচো চিংড়িমাছের মোরব্বা আছে টাট্‌কা চিটেগুড়ে জমানো। বাছারা খেয়ে নাও, নইলে পিত্তি পড়ে যাবে।

কিছু খেলেম, অনেকটাই রইল বাকি। পুত্তুলালকে জিগেস করলুম, খাবি ?

সে বললে, ভাঁড়টা দাও, বাড়ি গিয়ে আহ্নিক ক'রে খাব।

বাড়ি এলেম ফিরে। চটিজুতো ভিজে, গা-ময় কাদা।

বনমালীকে ডাক দিয়ে বললুম, বাঁদর, কী করছিলি।

সে হাউহাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে, বিছে কামড়েছিল, তাই ঘুমচ্ছিলুম।

ব'লেই সে চলে গেল ঘুমতে।

এমন সময় একটা গুণ্ডাগোছের মানুষ একেবারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত। মস্ত লম্বা, ঘাড় মোটা, মোটা পিপের মতো গর্দান, বনমালীর মতো রঙ কালো, ঝাঁকড়া চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, চোখ দুটো রাঙা, গায়ে ছিটের মেরজাই, কোমরে লাল রঙের ডোরাকাটা লুঙির উপর হলদে রঙের তিন-কোণা গামছা বাঁধা, হাতে পিতলের কাঁটামারা লম্বা একটা বাঁশের লাঠি, গলার আওয়াজ যেন গদাইবাবুদের মোটর গাড়িটার শিঙের মতো। হঠাৎ সে সাড়ে তিন মোন ওজনের গলায় ডেকে উঠল, বাবুমশায় !

চমকে উঠে কলমের খোঁচায় খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে গেল।

বললুম, কী হয়েছে, কে তুমি।

সে বললে, আমার নাম পাল্লারাম, দিদির বাড়ি থেকে এসেছি, জানতে চাই তোমাদের সে কোথায় গেল।

আমি বললুম, আমি কী জানি।

পাল্লারাম চোখ পাকিয়ে হাঁক দিয়ে বললে, জান না বটে ! ঐ যে তার তালি-দেওয়া আঁশ-বের-করা সবুজ রঙের এক পাটি পশমের মোজা কাদাসুদ্ধ শুকিয়ে গিয়ে মরা কাঠবেড়ালির কাটা লেজের মতো তোমার বইয়ের শেলফে ঝুলছে, ওটা ফেলে সে যাবে কোন্‌ প্রাণে।

আমি বললুম, লোকসান সইবে না, যেখানে থাকে ফিরে আসবেই। কিন্তু হয়েছে কী।

পাল্লারাম বললে, পরশুদিন সন্ধের সময় দিদি গিয়েছিল জঙ্গিলাটের বাড়ি। লাট-গিন্নির সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছে। ফিরে এসে দেখে, একটা ঘটি, একটা ছাতা, একজোড়া তাস, হারিকেন লণ্ঠন, আর একটা পাথুরে কয়লার ছালা নিয়ে কোথায় সে

চ'লে গেছে। দিদি বাগান থেকে একঝুড়ি বাঁশের কোঁড়া, লাউডগা আর বেতোশাক তুলে রেখেছিল; তাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিদি ভারি রাগ করছে।

আমি বললুম, তা আমি কী করব।

পান্নারাম বললে, তোমার এখানে কোথায় সে লুকিয়ে আছে, তাকে বের ক'রে দাও।

আমি বললুম, এখানে নেই, তুমি থানায় খবর দাও গে।

নিশ্চয় আছে।

আমি বললুম, ভালো মুশকিলে ফেললে দেখছি! বলছি সে নেই।

'নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে' বলতে বলতে পান্নারাম আমার টেবিলের উপর দমাদ্দম তার বাঁশের লাঠির মুণ্ডটা ঠুকতে লাগল। পাশের বাড়িতে একটা পাগল ছিল, সে শেয়াল ডাকের নকল ক'রে হাঁক দিল 'হুক্কাহুয়া'। পাড়ার সব কুকুর চেঁচিয়ে উঠল। বনমালী আমার জন্যে এক গ্লাস বেলের সরবত রেখে গিয়েছিল, সেটা উল্‌টিয়ে বোতল ভেঙে বেগ্‌নি রঙের কালির সঙ্গে মিশে রেশমের চাদর বেয়ে আমার জুতোর মধ্যে গিয়ে জমল। চীৎকার করতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী!

বনমালী ঘরে ঢুকেই পান্নারামের চেহারা দেখে 'বাপ রে' 'মা রে' ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড় দিলে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল; বললেম, সে গেছে কনের খোঁজ করতে।

কোথায়।

মজাদিঘির ধারে বাঁশতলায়।

লোকটা বললে, সেখানে যে আমারই বাড়ি।

তা হলে ঠিক হয়েছে। তোমার মেয়ে আছে?

আছে।

এইবার তোমার মেয়ের পাত্র জুটল।

জুটলো এখনো বলা যায় না। এই ডাণ্ডা নিয়ে ঘাড়ে ধরে তার বিয়ে দেব, তার পরে বুঝব কন্যাদায় ঘুচল।

তা হলে আর দেরি কোরো না। কনে দেখার পরেই বরকে দেখা হয়তো সহজ হবে না।

সে বললে, ঠিক কথা।

একটা ভাঙা বালতি ছিল ঘরের বাইরে। সেটা ফস্‌ ক'রে তুলে নিলে। জিগেস করলেম, ওটা নিয়ে কী হবে।

ও বললে, বড়ো রোদ্দুর, টুপির মতো ক'রে পরব।

ও তো গেল। তখন কাক ডাকছে, ট্র্যামের শব্দ শুরু হয়েছে। বিছানা থেকে ধড়্‌ফড়্ ক'রে উঠেই ডাক দিলেম বনমালীকে। জিগেস করলেম, ঘরে কে ঢুকেছিল।

ও চোখ রগড়ে বললে, দিদিমণির বেড়ালটা।

এই পর্যন্ত শুনে পুপেদিদি হতাশভাবে বললে, ও কী কথা দাদামশায়, তুমি যে বলছিলে, তুমি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে, তার পরে তোমার ঘরে এসেছিল পান্নারাম।

সামলে নিলুম। আর একটু হলেই বুদ্ধিমানের মতো বলতে যাচ্ছিলুম, আগাগোড়া স্বপ্ন। সব মাটি হত। এখন থেকে পান্নারামকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে যেমন ক'রে পারি। স্বপ্ন যখন বিধাতা ভাঙেন নালিশ খাটে না। আমরা ভাঙলে বড়ো নিষ্ঠুর হয়।

পুপুদিদি বললে, দাদামশায়, ওদের দুজনের বিয়ে হল কি না বললে না তো কিছু।

বুঝলুম, বিয়ে হওয়াটা জরুর দরকার। বললুম, বিয়ে না হয়ে কি রক্ষা আছে।

তার পরে তোমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে কি।

হয়েছে বৈ কি। তখন ভোর সাড়ে চারটে, রাস্তার গ্যাস নেবে নি। দেখলুম, নতুন বৌ তার বরকে ধরে নিয়ে চলেছে।

কোথায়।

নতুন বাজারে মানকচু কিনতে।

মানকচু!

হাঁ, বর আপত্তি করেছিল।

কেন।

বলেছিল, অত্যন্ত দরকার হলে বরঞ্চ কাঁঠাল কিনে আনতে পারি, মানকচু পারব না।

তার পরে কী হল।

আনতে হল মানকচু কাঁধে করে।

খুশি হল পুপু; বললে, খুব জব্দ!

শানকচু কিনবে

৫

সকালে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় সে এসে উপস্থিত।

জিগেস করলুম, কিছু বলবার আছে ?

ও বললে, আছে।

চট্ ক'রে বলে ফেলো, আমাকে এখনি বেরতে হবে।

কোথায়।

লাটসাহেবের বাড়ি।

লাটসাহেব তোমাকে ডাকেন নাকি।

না, ডাকেন না, ডাকলে ভালো করতেন।

ভালো কিসের।

জানতে পারতেন, ওঁরা যাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে থাকেন আমি তাদের চেয়েও খবর বানাতে ওস্তাদ। কোনো রায়বাহাদুর আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, সে কথা তুমি জান।

জানি, কিন্তু আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তা বলছ।

অসম্ভব গল্পেরই যে ফর্মাশ।

হোক-না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে-সে বানাতে পারে।

তোমার অসম্ভবের একটা নমুনা দাও।

আচ্ছা বলি শোনো—

স্মৃতিরত্নমশায় মোহনবাগানের গোল-কীপারি ক'রে ক্যাল্‌কাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে খিদে গেল না, উল্টো হল, পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অক্টর্লনি মন্যুমেণ্ট। নীচে থেকে চাটতে চাটতে চূড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে। বদরুদ্দিন মিঞা সেনেট-হলে বসে জুতো সেলাই করছিল, সে হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এল। বললে, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো জিনিসটাকে এঁটো করে দিলেন!

'তোবা তোবা' ব'লে তিনবার মন্যুমেণ্টের গায়ে থুথু ফেলে মিঞাসাহেব দৌড়ে গেল স্টেট্‌স্‌ম্যান-আপিসে খবর দিতে।

স্বস্তিরত্নমশায়ের হঠাৎ চৈতন্য হল, মুখটা তাঁর অশুদ্ধ হয়েছে। গেলেন ম্যুজিয়মের দরোয়ানের কাছে। বললেন, পাঁড়েজি, তুমিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ—একটা

অনুরোধ রাখতে হবে।

পাঁড়েজি দাড়ি চুম্রিয়ে নিয়ে সেলাম ক'রে বললে, কোমা ভু পোর্ভে ভু সি ভু প্লে।

পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা ক'রে বললেন, বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অশুদ্ধ, আমি মনুমেণ্ট চেটেছি।

পাঁড়েজি দেশালাই দিয়ে বর্মা চুরুট ধরালো। দু টান টেনে বললে, তা হলে এক্ষুনি খুলুন ওয়েব্‌স্টার ডিক্‌সনারি, দেখুন বিধান কী।

স্মৃতিরত্ন বললেন, তা হলে তো ভাটপাড়ায় যেতে হয়। সে পরে হবে, আপাতত তোমার ঐ পিতলে-বাঁধানো ডাণ্ডাখানা চাই।

পাঁড়ে বললে, কেন, কী করবেন, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছে বুঝি ?

স্মৃতিরত্ন বললেন, তুমি খবর পেলে কেমন ক'রে। সে তো পড়েছিল পরশু দিন। ছুটতে হল উল্টোডিঙিতে যকৃত-বিকৃতির বড়ো ডাক্তার ম্যাকার্টনি সাহেবের কাছে। তিনি নারকেলডাঙা থেকে সাবল আনিয়ে সাফ করে দিলেন।

পাঁড়েজি বললে, তবে ডাণ্ডায় তোমার কী প্রয়োজন।

পণ্ডিত মশায় বললেন, দাঁতন করতে হবে।

পাঁড়েজি বললে, ওঃ, তাই বলো, আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবে বুঝি, তা হলে আবার গঙ্গাজল দিয়ে শোধন করতে হত।

এই পর্যন্ত বলে গুড়্‌গুড়িটা কাছে নিয়ে দু টান টেনে সে বললে, দেখো দাদা, এই-রকম তোমার বানিয়ে বলবার ধরন। এ যেন আঙুল দিয়ে না লিখে গণেশের শুঁড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা। যেটাকে যেরকম জানি সেটাকে অন্যরকম করে দেওয়া। অত্যন্ত সহজ কাজ। যদি বল লাটসাহেব কলুর ব্যাবসা ধ'রে বাগবাজারে শুটকি মাছের দোকান খুলেছেন, তবে এমন সস্তা ঠাট্টায় যারা হাসে তাদের হাসির দাম কিসের।

চটেছ ব'লে বোধ হচ্ছে।

কারণ আছে। আমাকে নিয়ে পুপুদিদিকে সেদিন যাচ্ছে-তাই কতকগুলো বাজে কথা বলেছিলে। নিতান্ত ছেলেমানুষ বলেই দিদি হাঁ করে সব শুনেছিল। কিন্তু, অদ্ভুত কথা যদি বলতেই হয় তবে তার মধ্যে কারিগরি চাই তো।

সেটা ছিল না বুঝি ?

না, ছিল না। চুপ করে থাকতুম যদি আমাকে সুস্ক্ম না জড়াতে। যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাফের মুড়িঘণ্ট খাইয়েছ, শর্ষেবাঁটা দিয়ে তিমিমাছ-ভাজা আর পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁকের থেকে টাটকা ধরে আনা জলহস্তী, আর তার সঙ্গে তালের গুঁড়ির ডাঁটা-চচ্চড়ি, তা হলে আমি বলতুম, ওটা হল স্থূল। ওরকম লেখা সহজ।

আচ্ছা, তুমি হলে কী রকম লিখতে।

বলি, রাগ করবে না? দাদা, তোমার চেয়ে আমার কেরামতি যে বেশি তা নয়, কম বলেই সুবিধে। আমি হলে বলতুম—

তাসমানিয়াতে তাস খেলার নেমন্তন্ন ছিল, যাকে বলে দেখা-বিন্তি। সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিন্নির নাম ছিল শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুকুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পাম্‌কুনি দেবী, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিন্টিনাবুর মেরিউনাথু, তার গন্ধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানি নে; কাকগুলো জমির উপর ঠোঁট গুঁজে দিয়ে মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপটায় তিন ঘণ্টা ধরে। এ তো গেল তরকারি। আর, জালা জালা ভর্তি ছিল কাঙ্চুটোর সাঙ্চানি। সে দেশের পাকা পাকা আঁকৃসুটো ফলের ছোবড়া-চোঁয়ানো। এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইকৃটিকুটির ভিকৃটিমাই, ঝুড়িভর্তি। প্রথমে ওদের পোষা হাতি এসে পা দিয়ে সেগুলো দ'লে দিল ; তার পরে ওদের দেশের সব চেয়ে বড়ো জানোয়ার, মানুষে গোরুতে সিঙ্গিতে মিশোল, তাকে ওরা বলে গাণ্ডিসাণ্ডুং, তার কাঁটাওয়ালা জিব দিয়ে চেটে চেটে কতকটা নরম করে আনলে। তার পরে তিনশো লোকের পাতের সামনে দমাদ্দম হামানদিস্তার শব্দ উঠতে লাগল। ওরা বলে, এই ভীষণ শব্দ শুনলেই ওদের জিবে জল আসে ; দূর পাড়া থেকে শুনতে পেয়ে ভিখারি আসে দলে দলে। খেতে খেতে যাদের দাঁত ভেঙে যায় তারা সেই ভাঙা দাঁত দান করে যায় বাড়ির কর্তাকে। তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন জমা ক'রে রাখতে, উইল করে দিয়ে যান ছেলেদের। যার তবিলে যত দাঁত তার তত নাম। অনেকে লুকিয়ে অন্যের সঞ্চিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের ব'লে চালিয়ে দেয়। এই নিয়ে বড়ো বড়ো মকদ্দমা হয়ে গেছে। হাজারদাঁতিরা পঞ্চাশদাঁতির ঘরে

মেয়ে দেয় না। একজন সামান্য পনেরোদাঁতি ওদের কেট্‌কু নাড়ু খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আট্‌কিয়ে মারা গেল, হাজারদাঁতির পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়াই গেল না। তাকে লুকিয়ে ভাসিয়ে দিলে চৌচঙ্গি নদীর জলে। তাই নিয়ে নদীর দুই ধারের লোকেরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করেছিল, লড়েছিল প্রিভিকৌন্সিল পর্যন্ত।

আমি হাঁপিয়ে উঠে বললুম, থামো, থামো! কিন্তু জিগেস করি, তুমি যে কাহিনীটা আওড়ালে তার বিশেষ গুণটা কী।

ওর গুণটা এই, এটা ফুলের আঁঠির চাটনি নয়। যা কিছুই জানি নে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার শখ মেটালে কোনো নালিশের কারণ থাকে না। কিন্তু, এতেও যে আছে উঁচু দরের হাসি তা আমি বলি নে। বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি, তা হলেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে। নেহাত বাজারে-চল্‌তি ছেলে-ভোলাবার সস্তা অত্যুক্তি যদি তুমি বানাতে থাক তা হলে তোমার অপযশ হবে, এই আমি ব'লে রাখলুম।

আমি বললেম, আচ্ছা, এমন করে গল্প বলব যাতে পুপুদিদির বিশ্বাস ভাঙতে ওঝা ডাকতে হবে।

ভালো কথা, কিন্তু লাটসাহেবের বাড়িতে যাওয়া বলতে কী বোঝায়।

বোঝায়, তুমি বিদায় নিলেই ছুটি পাই। একবার বসলে উঠতে চাও না, তাই 'তুমি যাও' অনুরোধটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে বলতে হল।

বুঝেছি, আচ্ছা, তবে চললুম।

৬

সার্কাস দেখে আসার পর থেকে পুপুদিদির মনটা যেন বাঘের বাসা হয়ে উঠল। বাঘের সঙ্গে, বাঘের মাসির সঙ্গে সর্বদা তার আলাপ চলছে। আমরা কেউ যখন থাকি নে তখনই ওদের মজলিস জমে। আমার কাছে নাপিতের খবর নিচ্ছিল; আমি বললুম, নাপিতের কী দরকার।

পুপু জানালে, বাঘ ওকে অত্যন্ত ধরে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে ওর গোঁফ, ও কামাতে চায়।

আমি জিগেস করলেম, গোঁফ কামানোর কথা ওর মনে এল কী করে।

পুপু বললে, চা খেয়ে বাবার পেয়ালায় তলানি যেটুকু বাকি থাকে আমি বাঘকে খেতে দিই। সেদিন তাই খেতে এসে ও দেখতে পেয়েছিল পাঁচুবাবুকে ; ওর বিশ্বাস, গোঁফ কামালে ওর মুখখানা দেখাবে ঠিক পাঁচুবাবুরই মতো।

আমি বললুম, সেটা নিতান্ত অন্যায় ভাবে নি। কিন্তু, একটু মুশকিল আছে। কামানোর শুরুতেই নাপিতকে যদি শেষ করে দেয় তা হলে কামানো শেষ হবেই না।

শুনেই ফস্ ক'রে পুপের মাথায় বুদ্ধি এল ; ব'লে ফেললে, জান দাদামশায় ? বাঘরা

কখ্‌খনো নাপিতকে খায় না।

আমি বললুম, বল কী। কেন বলো দেখি।

খেলে ওদের পাপ হয়।

ওঃ, তা হলে কোনো ভয় নেই। এক কাজ করা যাবে, চৌরঙ্গিতে সাহেব-নাপিতের দোকানে নিয়ে যাওয়া যাবে।

পুপে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, হাঁ হাঁ, ভারি মজা হবে। সাহেবের মাংস নিশ্চয় খাবে না, ঘেন্না করবে।

খেলে গঙ্গাস্নান করতে হবে। খাওয়া-ছোঁওয়ায় বাঘের এত বাছবিচার আছে, তুমি জানলে কী করে, দিদি।

পুপু খুব সেয়ানার মতো মুখ টিপে হেসে বললে, আমি সব জানি।

আর, আমি বুঝি জানি নে?

কী জান, বলো তো।

ওরা কখনো চাষী কৈবর্তর মাংস খায় না; বিশেষত যারা গঙ্গার পশ্চিম-পারে থাকে। শাস্ত্রে বারণ।

আর, যারা পুব-পারে থাকে?

তারা যদি জেলে কৈবর্ত হয় তো সেটা অতি পবিত্র মাংস। সেটা খাবার নিয়ম বাঁ থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

বাঁ থাবা কেন।

ঐটে হচ্ছে শুদ্ধ রীতি। ওদের পণ্ডিতরা ডান থাবাকে নোংরা বলে। একটি কথা জেনে রাখো দিদি, নাপতিনীদের 'পরে ওদের ঘেন্না। নাপ্‌তিনীরা যে মেয়েদের পায়ে আল্‌তা লাগায়।

তা লাগালেই বা?

সাধু বাঘেরা বলে, আলতাটা রক্তের ভান, ওটা আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে বের করা রক্ত নয়, ওটা মিথ্যাচার। এরকম কপটাচরণকে ওরা অত্যন্ত নিন্দে করে। একবার একটা বাঘ ঢুকেছিল পাগড়িওয়ালার ঘরে, সেখানে ম্যাজেণ্টা গোলা ছিল গামলায়। রক্ত মনে ক'রে মহা খুশি হয়ে মুখ ডুবোলে তার মধ্যে। সে একেবারে পাকা রঙ। বাঘের দাড়ি গোঁফ, তার দুই গাল, লাল টক্‌টকে হয়ে উঠল। নিবিড় বনে যেখানে বাঘেদের পুরুতপাড়া মোষমারা গ্রামে, সেইখানে আসতেই ওদের আঁচাড়ি শিরোমণি ব'লে উঠল, এ কী কাণ্ড! তোমার সমস্ত মুখ লাল কেন। ও লজ্জায় প'ড়ে মিথ্যে করে বললে, গণ্ডার মেরে তার রক্ত খেয়ে এসেছি।

ধরা পড়ে গেল মিথ্যে। পণ্ডিতজি বললে, নখে তো রক্তের চিহ্ন দেখি নে; মুখ শুঁকে বললে, মুখে তো রক্তের গন্ধ নেই। সবাই বলে উঠল, ছি ছি! এ তো রক্তও নয়, পিত্তও নয়, মগজও নয়, মজ্জাও নয়— নিশ্চয় মানুষের পাড়ায় গিয়ে এমন একটা রক্ত খেয়েছে যা নিরামিষ রক্ত, যা অশুচি। পঞ্চায়েত বসে গেল। কামড়বিশারদ-মশায় হুঙ্কার দিয়ে বললে, প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। করতেই হল।

যদি না করত।

সর্বনাশ! ও যে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বাপ; বড়ো বড়ো খরনখিনীর গৌরীদানের বয়স হয়ে এসেছে। পেটের নীচে লেজ গুটিয়ে সাত গণ্ডা মোষ পণ দিতে চাইলেও বর জুটবে না। এর চেয়েও ভয়ংকর শাস্তি আছে।

কী রকম।

ম'লে শ্রাদ্ধ করবার জন্যে পুরুত পাওয়া যাবে না, শেষ কালে হয়তো বেত-জঙ্গল গাঁ থেকে নেকড়ে-বেঘো পুরুত আনতে হবে; সে ভারি লজ্জা, সাত পুরুষের মাথা হেঁট।

শ্রাদ্ধ নাই বা হল।

শোনো একবার। বাঘের ভূত যে না খেয়ে মরবে।

সে তো মরেইছে, আবার মরবে কী ক'রে।

সেই তো আরও বিপদ। না খেয়ে মরা ভালো, কিন্তু ম'রে না খেয়ে বেঁচে থাকা যে বিষম দুর্‌গ্রহ।

পুপুদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুরু কুঁচ্‌কিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হলে খেতে পায় কী ক'রে।

তারা বেঁচে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাত জন্ম অমনি চ'লে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ-চোঁ করতে থাকে।

সন্দেহ মীমাংসা হতেই পুপে জিগেস করলে, প্রায়শ্চিত্ত কিরকম হল।

আমি বললুম, হাঁকবিদ্যা-বাচস্পতি বিধান দিলে যে, বাঘাচণ্ডীতলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি থেকে শুরু করে অমাবস্যার আড়াই পহর রাত পর্যন্ত ওকে কেবল খ্যাক্‌শেয়ালির ঘাড়ের মাংস খেয়ে থাকতে হবে; তাও হয় ওর পিসতুতো বোন কিম্বা মাসতুতো শালার মেজো ছেলে ছাড়া আর কেউ শিকার করলে হবে না— আর, ওকে খেতে হবে পিছনের ডান দিকের থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে। এত বড়ো শাস্তির

হুকুম শুনেই বাঘের গা বমি-বমি করে এল ; চার পায়ে হাত জোড় করে হাউ-হাউ করতে লাগল।

কেন, কী এমন শাস্তি।

বল কী, খ্যাক্‌শিয়ালির মাংস! যত দূর অশুচি হতে হয়। বাঘটা দোহাই পেড়ে

বললে, আমাকে বরঞ্চ নেউলের লেজ খেতে বলো সেও রাজি, কিন্তু থ্যাক্‌শেয়ালির ঘাড়ের মাংস!

শেষকালে কি খেতে হল।

হল বই কি।

দাদামশায়, বাঘেরা তা হলে খুব ধার্মিক?

ধার্মিক না হলে কি এত নিয়ম বাঁচিয়ে চলে। সেইজন্তেই তো শেয়ালরা ওদের ভারি ভক্তি করে। বাঘের এঁটো প্রসাদ পেলে ওরা বর্তিয়ে যায়। মাঘের ত্রয়োদশীতে যদি মঙ্গলবার পড়ে তা হলে সেদিন ভোর রাত্তিরে ঠিক দেড় প্রহর থাকতে বুড়ো বাঘের পা চেটে আসা শেয়ালদের ভারি পুণ্যকর্ম। কত শেয়াল প্রাণ দিয়েছে এই পুণ্যের জন্তে।

পুপুর বিষম খটকা লাগল। বললে, বাঘরা এতই যদি ধার্মিক হবে তা হলে জীবহত্যে করে কাঁচা মাংস খায় কী করে।

সে বুঝি যে-সে মাংস। ও-যে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা।

কিরকম মন্ত্র।

ওদের সনাতন হালুম-মন্ত্র। সেই মন্ত্র প'ড়ে তবে ওরা হত্যা করে। তাকে কি হত্যা বলে।

যদি হালুম-মন্ত্র বলতে ভুলে যায়।

বাঘপুঙ্গব-পণ্ডিতের মতে তা হলে ওরা বিনা মন্ত্রে যে জীবকে মারে পরজন্মে সেই জীব হয়েই জন্মায়। ওদের ভারি ভয় পাছে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

কেন।

ওরা বলে, মানুষের সর্বাঙ্গ টাক-পড়া, কী কুশ্রী! তার পরে, সামান্য একটা লেজ, তাও নেই মানুষের দেহে। পিঠের মাছি তাড়াবার জন্তেই ওদের বিয়ে করতে হয়। আবার দেখো-না, ওরা খাড়া দাঁড়িয়ে সঙের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে— দেখে আমরা হেসে মরি। আধুনিক বাঘের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো জ্ঞানী শার্দৌল্যতত্ত্বরত্ন বলেন, জীবসৃষ্টির শেষের পালায় বিশ্বকর্মার মালমসলা যখন সমস্তই কাবার হয়ে গেল তখনই মানুষ গড়তে তাঁর হঠাৎ শখ হল। তাই বেচারাদের পায়ের তলার জন্তে থাবা দূরে থাক্‌ কয়েক-টুকরো খুরের জোগাড় করতে পারলেন না, জুতো প'রে তবে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করতে পারে— আর, গায়ের লজ্জা ঢাকে ওরা কাপড়ে জড়িয়ে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ওরাই হল লজ্জিত জীব। এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই।

বাঘেদের বুঝি ভারি অহংকার ?

ভয়ংকর। সেইজন্যেই তো ওরা এত ক'রে জাত বাঁচিয়ে চলে। জাতের দোহাই পেড়ে একটা বাঘের খাওয়া বন্ধ করেছিল একজন মানুষের মেয়ে ; তাই নিয়ে আমাদের সে একটা ছড়া বানিয়েছে।

তোমার মতো সে আবার ছড়া বানাতে পারে নাকি।

তার নিজের বিশ্বাস সে পারে, এই তর্ক নিয়ে তো পুলিস ডাকা যায় না।

আচ্ছা, শোনাও-না।

তবে শোনো।—

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে
আয়নাটা পড়েছে সমুখে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ-গাঁ ক'রে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে।

ঢেঁকিশালে পুঁটু ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।
ফুলিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে, চাই গ্লিসেরিন সোপ।

পুঁটু বলে, ও কথাটা কী যে
জন্মেও জানি নে তা নিজে।
ইংরেজি-টিংরেজি কিছু
শিখি নি তো, জাতে আমি নিচু।

বাঘ বলে, কথা বল ঝুঁটো,
নেই কি আমার চোখ দুটো।
গায়ে কিসে দাগ হল লোপ
না মাখিলে গ্লিসেরিন সোপ।

পুঁটু বলে, আমি কালো কুষ্টি,
কখনো মাখি নি ও জিনিসটি।
কথা শুনে পায় মোর হাসি,
নই মেম-সাহেবের মাসি।

বাঘ বলে, নেই তোর লজ্জা?
খাব তোর হাড় মাস মজ্জা।

পুঁটু বলে, ছি ছি ওরে বাপ,
মুখেও আনিলে হবে পাপ।
জান না কি আমি অস্পৃশ্য,
মহাত্মা গাঁধিজির শিষ্য।
আমার মাংস যদি পাও
জাত যাবে জান না কি তাও।
পায়ে ধরি করিয়ো না রাগ!—

ছুঁস নে ছুঁস নে, বলে বাঘ,
আরে ছি ছি, আরে রাম রাম,
বাঘ্‌নাপাড়ায় বদনাম
রটে যাবে; ঘরে মেয়ে ঠাসা,
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা
দেবী বাঘা-চণ্ডীর কোপে।
কাজ নেই গ্লিসেরিন সোপে।

জান, পুপুদিদি? আধুনিক বাঘেদের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড চলছে— যাকে বলে প্রগতি, প্রচেষ্টা। ওদের প্রগতিওয়ালা প্রচারকেরা বাঘ-সমাজে ব'লে বেড়াচ্ছে যে, অস্পৃশ্য ব'লে খাদ্য বিচার করা পবিত্র জন্তু-আত্মার প্রতি অবমাননা। ওরা বলছে, আজ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই খাব; বাঁ থাবা দিয়ে খাব, ডান থাবা দিয়ে খাব, পিছনের থাবা দিয়েও খাব; হালুম-মন্ত্র পড়েও খাব, না পড়েও খাব— এমন-কি, বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচ্‌ড়ে খাব, শনিবারেও আমরা কাম্‌ড়ে খাব। এত ঔদার্য। এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবোধ অত্যন্ত ফলাও। এমন-কি, এরা পশ্চিম-পারের চাষী কৈবর্তদেরও খেতে চায়, এতই এদের উদার মন। ঘোরতর

দলাদলি বেধে গেছে। প্রাচীনরা নব্য সম্প্রদায়কে নাম দিয়েছে চাষী-কৈবর্ত-খেগো, এই নিয়ে মহা হাসাহাসি পড়েছে।

পুপু বললে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কখনো বাঘের উপর কবিতা লিখেছ?

হার মানতে মন গেল না। বললুম, হাঁ লিখেছি।

শোনাও-না।

গম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করে গেলুম—

তোমার সৃষ্টিতে কভু শক্তিরে কর না অপমান,
হে বিধাতা— হিংসারেও করেছ প্রবল হস্তে দান
আশ্চর্য মহিমা এ কী। প্রখরনখর বিভীষিকা,
সৌন্দর্য দিয়েছ তারে, দেহধারী যেন বজ্রশিখা,
যেন ধূর্জটির ক্রোধ। তোমার সৃষ্টির ভাঙে বাঁধ
ঝঞ্ঝা উচ্ছৃঙ্খল, করে তোমার দয়ার প্রতিবাদ
বনের যে দস্যু সিংহ, ফেনজিহ্ব ক্ষুব্ধ সমুদ্রের
যে উদ্ধত ঊর্ধ্ব ফণা, ভূমিগর্ভে দানবযুদ্ধের
ডমরুনিঃস্বনী স্পর্ধা, গিরিবক্ষভেদী বহ্নিশিখা
যে আঁকে দিগন্তপটে আপন জ্বলন্ত জয়টিকা,
প্রলয়নর্তিনী বন্যা বিনাশের মদিরবিহ্বল
নির্লজ্জ নিষ্ঠুর— এই যত বিশ্ববিপ্লবীর দল
প্রচণ্ড সুন্দর। জীবলোকে যে দুর্দান্ত আনে ত্রাস
হীনতালাঞ্ছনে সে তো পায় না তোমার পরিহাস।

চুপ করে রইল পুপু। আমি বললুম, কী দিদি, ভালো লাগল না বুঝি।

ও কুণ্ঠিত হয়ে বললে, না না, ভালো লাগবে না কেন। কিন্তু, এর মধ্যে বাঘটা কোথায়।

আমি বললুম, যেমন সে থাকে ঝোপের মধ্যে, দেখা যায় না তবু আছে ভয়ংকর গোপনে।

পুপু বললে, অনেক দিন আগে গ্লিসেরিন-সোপ-খোজা বাঘের কথা আমাকে বলেছিলে। তার খবরটা কোথা থেকে পেলে সে।

আমার কথা ও করে চুরি, নিজের মুখে সেটা দেয় বসিয়ে।

কিন্তু—

'কিন্তু' না তো কী। লিখেছে ভালোই।

কিন্তু—

হাঁ, ঠিক কথা। আমি অমন করে লিখি নে, হয়তো লিখতে পারি নে। আমার মালটা ও চুরি করে, তার পরে যখন পালিস ক'রে দেয় তখন চেনা শক্ত হয়—এমন ঢের দেখেছি। ঠিক ঐরকম আর-একটি ছড়া বানিয়েছে।

শোনাও-না।

আচ্ছা, শোনো তবে।—

সুঁদরবনের কেঁদো বাঘ,
সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ।
যথাকালে ভোজনের
কম হলে ওজনের
হত তার ঘোরতর রাগ।

একদিন ডাক দিল গাঁ-গাঁ—
বলে, তোর গিন্নিকে জাগা।
শোন্ বটুরাম হ্যাড়া,
পাঁচ জোড়া চাই ভ্যাড়া,
এখনি ভোজের পাত লাগা।

বটু বলে, এ কেমন কথা,
শিখেছ কি এই ভদ্রতা।
এত রাতে হাঁকাহাঁকি
ভালো না, জান না তা কি,
আদবের এ যে অন্যথা।

মোর ঘর নেহাত জঘন্য,
মহাপশু, হেথায় কী জন্য।
ঘরেতে বাঘিনী মাসি
পথ চেয়ে উপবাসী,
তুমি খেলে মুখে দেবে অন্ন।

সেথা আছে গোসাপের ঠ্যাঙ।
আছে তো শুট্‌কে কোলা ব্যাঙ।
আছে বাসি খরগোষ,
গন্ধে পাইবে তোষ,
চলে যাও নেচে ড্যাঙ ড্যাঙ।

নইলে কাগজে প্যারাগ্রাফ
রটিবে, ঘটিবে পরিতাপ—
বাঘ বলে, রামো, রামো,
বাক্যবাগীশ থামো,
বকুনির চোটে ধরে হাঁপ।

তুমি হ্যাড়া, আস্ত পাগল,
বেরোও তো, খোলো তো আগল।
ভালো যদি চাও তবে
আমারে দেখাতে হবে
কোন্ ঘরে পুষেছ ছাগল।

বটু কহে, এ কী অকরণ,
ধরি তব চতুশ্চরণ—
জীববধ মহাপাপ,
তারো বেশি লাগে শাপ
পরধন করিলে হরণ।

বাঘ শুনে বলে, হরি হরি,
না খেয়ে আমিই যদি মরি,
জীবেরই নিধন তাহা—
সহমরণেতে আহা
মরিবে যে বাঘী সুন্দরী।

অতএব ছাগলটা চাই,
না হলে তুমিই আছ ভাই
এত বলি তোলে থাবা।
বটুরাম বলে, বাবা,
চলো ছাগলেরই ঘরে যাই।

দ্বার খুলে বলে, পড়ো ঢুকে,
ছাগল চিবিয়ে খাও সুখে।
বাঘ সে ঢুকিল যেই,
দ্বিতীয় কথাটি নেই,
বাহিরে শিকল দিল রুখে।

বাঘ বলে, এ তো বোঝা ভার,
তামাসার এ নহে আকার।
পাঁঠার দেখি নে টিকি,
লেজের সিকির সিকি
নেই তো, শুনি নে ভ্যাভ্যাকার।

ওরে হিংস্রক সয়তান,
জীবের বধিতে চাস্ প্রাণ!
ওরে ক্রুর, পেলে তোরে
থাবায় চাপিয়া ধ'রে
রক্ত শুষিয়া করি পান—

ঘরটাও ভীষণ ময়লা—
বটু বলে, মহেশ গয়লা
ও ঘরে থাকিত, আজ
থাকে তোর যমরাজ
আর থাকে পাথুরে কয়লা।

গোঁফ ফুলে ওঠে যেন ঝাঁটা,
বাঘ বলে, গেল কোথা পাঁঠা!

বটুরাম বলে নেচে,
এই পেটে তলিয়েছে,
খুঁজিলে পাবে না সারা গাঁটা।

ভালো লাগল?

তা, যাই বলো দাদামশায়, কিন্তু বাঘের ছড়া খুব ভালো লিখেছে।

আমি বললুম, তা হবে, হয়তো ভালোই লিখেছে। কিন্তু, ও ভালো লেখে কি আমি ভালো লিখি সে সম্বন্ধে শেষ অভিমতটা দেবার জন্যে অন্তত আরও দশটা বছর অপেক্ষা কোরো।

পুপু বললে, আমার বাঘ কিন্তু আমাকে খেতে আসে না।

সে তো তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার বাঘ কী করে।

রাত্তিরে যখন শুয়ে থাকি বাইরে থেকে ও জানলা আঁচড়ায়। খুলে দিলেই হাসে।

তা হতে পারে, ওরা খুব হাসিয়ে জাত। ইংরেজিতে যাকে বলে হিউমরাস্। কথায় কথায় দাঁত বের করে।

৭

পুপে এসে জিগেস করলে, দাদামশায়, তুমি যে বললে শনিবারে সে আসবে তোমার নেমন্তন্নে। কী হল।

সবই ঠিক হয়েছিল। হাজি মিঞা শিক্‌কাবাব বানিয়েছিল, তোফা হয়েছিল খেতে।

তার পরে?

তার পরে নিজে খেলুম তার বারো আনা আন্দাজ, আর পাড়ার কালু ছোঁড়াটাকে দিলুম বাকিটুকু। কালু বললে, দাদাবাবু, এ-যে আমাদের কাঁচকলার বড়ার চেয়ে ভালো।

সে কিছু খেল না?

জো কী।

সে এল না?

সাধ্য কী তার।

তবে সে আছে কোথায়।

কোথাও না।

ঘরে ?

না।

দেশে ?

না।

বিলেতে ?

না।

তুমি যে বলছিলে, আণ্ডামানে যাওয়া ওর একরকম ঠিক হয়ে আছে। গেল নাকি।

দরকার হল না।

তা হলে কী হল আমাকে বলছ না কেন।

ভয় পাবে কিম্বা দুঃখ পাবে, তাই বলি নে।

তা হোক, বলতে হবে।

আচ্ছা, তবে শোনো। সেদিন ক্লাস পড়াবার খাতিরে আমার পড়ে নেবার কথা ছিল 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন'। একসময় হঠাৎ দেখি, সেটা রয়েছে পড়ে, হাতে উঠে এসেছে 'পাঁচুপাকড়াশির পিস্‌শাশুড়ি'। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, রাত হবে তখন আড়াইটা। স্বপ্ন দেখছি, গরম তেল জ্বলে উঠে আমাদের কিনি বাম্‌নির মুখ বেবাক গিয়েছে পুড়ে; সাত দিন সাত রাত্তির হত্যে দিয়ে তারকেশ্বরের প্রসাদ পেয়েছে দু'কৌটো লাহিড়ি কোম্পানির মূন্‌লাইট স্নো; তাই মাখছে মুখে ঘ'ষে ঘ'ষে। আমি বুঝিয়ে বললুম, ওতে হবে না গো, মোষের বাচ্ছার গালের চামড়া কেটে নিয়ে মুখে জুড়তে হবে, নইলে রঙ মিলবে না। শুনেই আমার কাছে সওয়া তিন টাকা ধার নিয়ে সে ধর্মতলার বাজারে মোষ কিনতে দৌড়েছে। এমন সময় ঘরে একটা কী শব্দ শোনা গেল, কে যেন হাওয়ার তৈরি চটিজুতো হুস হুস ক'রে টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে উঠলেম, উস্‌কে দিলেম লণ্ঠনটা। ঘরে একটা-কিছু এসেছে দেখা গেল কিন্তু সে যে কে, সে যে কী, সে যে কেমন, বোঝা গেল না। বুক ধড়্‌ফড়্‌ করছে, তবু জোর গলা ক'রে হেঁকে বললুম, কে হে তুমি। পুলিস ডাকব নাকি।

অদ্ভুত হাঁড়িগলায় এই জীবটা বললে, কী দাদা, চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার পুপেদিদির সে। এখানে যে আমার নেমন্তন্ন ছিল।

আমি বললুম, বাজে কথা বলছ, এ কী চেহারা তোমার!

সে বললে, চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছ? মানে কী হল।

মানেটা বলি। পুপেদিদির ঘরে ভোজ, সকাল-সকাল নাইতে গেলেম। বেলা

তখন সবেমাত্র দেড়টা। তেলেনিপাড়ার ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে ক'ষে মুখ মাজ্‌ছিলুম ; মাজার চোটে আরামে এমনি ঘুম এল যে, ঢুলতে ঢুলতে ঝুপ্‌ ক'রে পড়লুম জলে ;

তার পরে কী হল জানি নে। উপরে এসেছি কি নীচে কি কোথায় আছি জানি নে, পষ্ট দেখা গেল আমি নেই।

নেই!

তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—

আরে আরে, গা ছুঁতে হবে না, বলে যাও।

চুলুকুনি ছিল গায়ে ; চুলকতে গিয়ে দেখি, না আছে নখ, না আছে চুল্‌কনি। ভয়ানক দুঃখ হল। হাউহাউ ক'রে কাঁদতে লাগলুম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে হাউহাউটা বিনা মূল্যে পেয়েছিলুম সে গেল কোথায়। যত চেঁচাই চেঁচানোও হয় না, কান্নাও শোনা যায় না। ইচ্ছে হল, মাথা ঠুকি বটগাছটাতে ; মাথাটার টিকি খুঁজে পাই নে কোথাও। সব চেয়ে দুঃখ— বারোটা বাজল, 'খিদে কই' 'খিদে কই' ব'লে পুকুরধারে পাক খেয়ে বেড়াই, খিদে-বাঁদরটার চিহ্ন মেলে না।

কী বক্‌ছ তুমি, একটু থামো।

ও দাদা, দোহাই তোমার, থামতে বোলো না। থামবার দুঃখ যে কী অ-থামা মানুষ সে তুমি কী বুঝবে। থামব না, আমি থামব না, কিছুতেই থামব না, যতক্ষণ পারি থামব না।

এই ব'লে ধুপ্‌ধাপ্‌ ধুপ্‌ধাপ্‌ ক'রে লাফাতে লাগল, শেষকালে ডিগবাজি খেলা শুরু করলে আমার কার্পেটের উপর, জলের মধ্যে শুশুকের মতো।

করছ কী তুমি।

দাদা, একেবারে বাদশাহি থামা থেমেছিলুম, আর কিছুতেই থামছি নে। মারধোর যদি কর সেও লাগবে ভালো। আস্ত কিলের যোগ্য পিঠ নেই যখন জানতে পারলুম, তখন সাতকড়ি পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে ক'রে বুক ফেটে যেতে চাইল, কিন্তু বুক নেই তো ফাটবে কী। কই-মাছের যদি এই দশা হত তা হলে বামুনঠাকুরের হাতে পায়ে ধরত তাকে একবার তপ্ত তেলে এপিঠ ওপিঠ ওল্‌টাতে পাল্‌টাতে। আহা, যে পিঠখানা হারিয়েছে সেই পিঠে পণ্ডিতমশায়ের কত কিলই খেয়েছি, ইট দিয়ে তৈরি খইয়ের মোয়াগুলোর মতো। আজ মনে হয়, উঃ— দাদা, একবার কিলিয়ে দাও খুব ক'রে দমাদম—

ব'লে আমার কাছে এসে পিঠ দিলে পেতে।

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, যাও যাও, সরে যাও।

ও বললে, কথাটা শেষ ক'রে নিই। একখানা গা খুঁজে খুঁজে বেড়ালুম গাঁয়ে গাঁয়ে। বেলা তখন তিন পহর। যতই রোদে বেড়াই কিছুতেই রোদে পুড়ে সারা হচ্ছি নে, এই দুঃখটা যখন অসহ্য এমন সময় দেখি, আমাদের পাতুখুড়ো মুচিখোলার বটগাছতলায় গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র। মনে হল, তার প্রাণপুরুষটা বিন্দু হয়ে ব্রহ্মতালুর চুড়োয় এসে জোনাক-পোকার মতো মিট্‌মিট্‌ করছে। বুঝলুম, হয়েছে সুযোগ। নাকের গর্ত দিয়ে আত্মারামকে ঠেসে চালিয়ে দিলুম তার দেহের মধ্যে, নতুন নাগ্‌রা জুতোর

ভিতরে যেমন ক'রে পা'টা ঠেসে গুঁজতে হয়। সে হাঁপিয়ে উঠে ভাঙা গলায় ব'লে উঠল, কে তুমি বাবা, ভিতরে জায়গা হবে না।

তখন তার গলাটা পেয়েছি দখলে ; বললুম, তোমার হবে না জায়গা, আমার হবে। বেরোও তুমি।

সে গোঁ গোঁ করতে করতে বললে, অনেকখানি বেরিয়েছি, একটু বাকি। ঠেলা মারো।

দিলুম ঠেলা, হুস্‌ ক'রে গেল বেরিয়ে।

এ দিকে পাতুখুড়োর গিন্নি এসে বললে, বলি, ও পোড়ারমুখো।

কান জুড়িয়ে গেল। বললুম, বলো বলো, আবার বলো, বড়ো মিষ্টি লাগছে, এমন ডাক যে আবার কোনোদিন শুনতে পাব এমন আশাই ছিল না।

বুড়ি ভাবলে ঠাট্টা করছি, ঝাঁটা আনতে গেল ঘরের মধ্যে। ভয় হল, পড়ে-পাওয়া দেহটা খোয়াই বুঝি। বাসায় এসে আয়নাতে মুখ দেখলুম, সমস্ত শরীর উঠল শিউরে। ইচ্ছে করল র‍্যাঁদা দিয়ে মুখটাকে ছুলে নিই।

গা-হারার গা এল, কিন্তু চেহারা-হারার চেহারাখানা সাত বাঁও জলের তলায়, তাকে ফিরে পাবার কী উপায়।

ঠিক এই সময়ে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর খিদেটাকে পাওয়া গেল। একেবারে জঠর জুড়ে। সব ক'টা নাড়ী চোঁ চোঁ করে উঠেছে এক সঙ্গে। চোখে দেখতে পাই নে পেটের জ্বালায়। যাকে পাই তাকে খাই গোছের অবস্থা। উঃ, কী আনন্দ।

মনে পড়ল, তোমার ঘরে পুপুদিদির নেমন্তন্ন। রেলভাড়ার পয়সা নেই। হেঁটে চলতে শুরু করলুম। চলার অসম্ভব মেহন্নতে কী যে আরাম সে আর কী বলব। স্ফূর্তিতে একেবারে গলদ্‌ঘর্ম। এক এক পা ফেলছি আর মনে মনে বলছি, থামছি নে, থামছি নে, চলছি তো চলছিই। এমন বেদম চলা জীবনে কখনো হয় নি। দাদা, পুরো একখানা গা নিয়ে বসে আছ কেদারায়, বুঝতেই পার না কষ্টতে যে কী মজা। এই কষ্টে বুঝতে পারা যায়, আছি বটে, খুব কষে আছি, ষোলো আনা পেরিয়ে গিয়ে আছি।

আমি বললুম, সব বুঝলুম, এখন কী করতে চাও বলো।

করবার দায় তোমারই, নেমন্তন্ন করেছিলে, খাওয়াতে হবে, সে কথা ভুললে চলবে না।

রাত এখন তিনটে সে কথা তুমিও ভুললে চলবে না।

তা হলে চললুম পুপুদিদির কাছে।

খবরদার!

দাদা, ভয় দেখাচ্ছ মিছে, মরার বাড়া গাল নেই। চললুম।

কিছুতেই না।

সে বললে, যাবই।

আমি বললুম, কেমন যাও দেখব।

সে বলতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই।

আমার টেবিলের উপর চ'ড়ে নাচতে নাচতে বললে, যাবই, যাবই, যাবই।

শেষকালে পাঁচালির সুর লাগিয়ে গাইতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই।

আর থাকতে পারলুম না। ধরলুম ওর লম্বা চুলের ঝুঁটি। টানাটানিতে গা থেকে, ঢিলে মোজার মতো, দেহটা সর্‌সর্‌ ক'রে খ'সে ধপ্‌ ক'রে পড়ে গেল।

সর্বনাশ! গাঁজাখোরের আত্মাপুরুষকে খবর দিই কী ক'রে। চেঁচিয়ে ব'লে উঠলুম, আরে আরে, শোনো শোনো, ঢুকে পড়ো এই গা'টার মধ্যে, নিয়ে যাও এটাকে।

কেউ কোথাও নেই। ভাবছি, আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেব।

পুপেদিদি এতখানি চোখ ক'রে বললে, সত্যি কি, দাদামশায়।

আমি বললুম, সত্যির চেয়ে অনেক বেশি— গল্প।

৮

আমি তখন এম. এ. ক্লাসের জন্যে এরিয়োপ্যাজিটিকার নোট লিখছি, মিলিয়ে দেখবার জন্যে বই পড়তে হচ্ছিল ইণ্টর্‌ন্যাশনল্‌ মেলিফ্লুয়স্‌ অ্যাব্রা-ক্যাডাব্রা, আর পাত কেটে পরিশিষ্ট দেখছিলুম থ্রী হণ্ড্রেড ইয়র্স্‌ অফ ইগো-ইণ্ডিটর্মিনেশন্‌ বইখানার।

লাইব্রেরি থেকে আনাতে দিয়েছি অনোম্যাটোপিইয়া অফ টিণ্টিন্যাব্যুলেশন্‌। এমন সময় হুড়্‌মুড়্‌ করে এসে ঢুকল আমাদের সে।

আমি বললুম, হয়েছে কী, স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে নাকি।

ও বললে, নিশ্চয় দিত যদি সে থাকত। কিন্তু, কী কাণ্ড বাধিয়েছ বলো দেখি।

কেন কী হল।

আমাকে নিয়ে এ পর্যন্ত বিস্তর আজগবি গল্প বানিয়েছ। ভাগ্যে আমার নামটা দাও নি, নইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দায় হত। দেখলুম পুপুদিদির মজা লাগছে,

তাই সহ্য করেছি সব। কিন্তু এবার যে উল্টো হল।

কেন কী হল বলোই-না।

তবে শোনো। পুপুদিদি কাল গিয়েছিল সিনেমায়। মোটরে উঠতে যাচ্ছে, আমি পিছন থেকে এসে বললুম, দিদিমণি, তোমার গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে যাও। তার পরে কী আর বলব দাদা, একেবারে হিস্টিরিয়া।

কিরকম।

হাতে চোখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠে দিদি বললে, যাও যাও, গাঁজাখোরের গা চুরি ক'রে আমার গাড়িতে উঠতে পাবে না। চার দিক থেকে লোক এল ছুটে, আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায় আর-কি। জীবনে অনেক নিন্দে শুনেছি, কিন্তু এরকম ওরিজিন্যাল নিন্দে শুনি নি কখনো। গাঁজাখোরের গা চুরি করা! আমার অতিবড়ো প্রাণের বন্ধুও এমন নিন্দে আমার নামে রটায় নি। বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা শোনা গেল। এ তোমারই কীর্তি।

আমারই তো বটে। কী করি বলো। তোমাকে নিয়ে আর কাঁহাতক গল্প বানাই। বয়স হয়ে গেছে, কলমটাকে যেন বাতে ধরল, পুপুদিদির ফরমাশ-মত অসম্ভব গল্প বলার হাল্কা চাল আর নেই কলমের। তাই এই শেষ গল্পটাতে তোমাকে একেবারে খতম করে দিয়েছি।

খতম হতে রাজি নই, দাদা। দোহাই তোমার, পুপুদিদির ভয় ভাঙিয়ে দাও। বুঝিয়ে বলো, ওটা গল্প।

বলেছিলুম, কিন্তু ভয় ভাঙতে চায় না। নাড়ীতে জড়িয়ে গেছে। উপায় না দেখে স্বয়ং সেই পাতু গেঁজেলকে আনলুম তার সামনে, উল্টো হল ফল। পাতুর গা'খানা প'রে যে তুমিই ঘুরে বেড়াচ্ছ তারই প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল।

তা হলে দাদা, গল্পটাকে উল্টিয়ে দাও, ধনুষ্টংকারে মরুক পাতু। গাঁজাখোরের গা'খানাকে নিমতলার ঘাটে পুড়িয়ে ফেলো। ঘটা ক'রে তার শ্রাদ্ধ করব, পুপুদিদিকে করব তাতে নেমন্তন্ন; খরচ যত পড়ে দেব নিজের পকেট থেকে। আমি হলুম দিদির গল্পের বহুরূপী, হঠাৎ এত বড়ো পদ থেকে আমাকে অপদস্থ করলে বাঁচব না।

আচ্ছা, গল্পের উল্টোরথে তোমাকে পুপুদিদির ঘরে আবার ফিরিয়ে আনব।

পরদিন সন্ধ্যার সময় সে এল, আমি শুরু করলুম গল্পটা।—

বললুম, পাতুর স্ত্রী স্বামীর স্বত্ব পাবার জন্যে তোমার নামে আদালতে নালিশ করেছে।

এইটুকু শুনেই সে ব'লে উঠল, এ চলবে না, দাদা। পাতুর স্ত্রীকে তুমি চক্ষে দেখ নি তো। মকদ্দমায় ঐ মহিলাটি যদি জেতে তা হলে যে আসামীপক্ষ আফিম খেয়ে মরবে।

ভয় কী, কথা দিচ্ছি, হার হোক, জিত হোক, টিঁকিয়ে রাখব তোমাকে।

আচ্ছা, ব'লে যাও।

হাত জোড় ক'রে তুমি হাকিমকে বললে, হজুর, ধর্মাবতার, সাত পুরুষে আমি ওর স্বামী নই।

উকিল চোখ রাঙিয়ে বললে, স্বামী নও, তার মানে কী।

তুমি বললে, তার মানে, এ পর্যন্ত আমি ওকে বিয়ে করি নি, দ্বিতীয় আর কোনো মানে আপাতত কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি নে।

রামসদয় মোক্তার খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, আলবত তুমি ওর স্বামী, মিথ্যে কথা বোলো না।

তুমি জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, জীবনে বিস্তর মিথ্যে বলেছি, কিন্তু ঐ বুড়িকে সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় বিয়ে করেছি, এত বড়ো দিগ্‌গজ মিথ্যে বানিয়ে বলবার তাকত আমার নেই। মনে করতে বুক কেঁপে ওঠে।

তখন ওরা সাক্ষী তলব করলে পঁয়ত্রিশজন গাঁজাখোরকে। একে একে তারা গাঁজাটেপা আঙুল তোমার মুখে বুলিয়ে বলে গেল, চেহারাটা একেবারে হুবহু পাতুর; এমন-কি, বাঁ কপালের আবটা পর্যন্ত। তবে কিনা—

মোক্তার তেরিয়া হয়ে উঠে বললে, 'তবে কিনা' আবার কিসের।

ওরা বললে, সেই রকমের পাতুই বটে, কিন্তু সেই পাতুই, হলপ ক'রে এমন কথা বলি কী ক'রে। ঠাক্‌রুনকে তো জানি, বন্ধু কম দুঃখ পায় নি, অনেক ঝাঁটা ক্ষয়ে গেছে ওর পিঠে। তার দাম বাঁচালে গাঁজার খরচে টানাটানি পড়ত না। তাই বলছি হজুর, আদালতে হলপ ক'রে ভদ্রলোকের সর্বনাশ করতে পারব না।

মোক্তার চোখ রাঙিয়ে বললে, তা হলে এ লোকটা কে বলো। দ্বিতীয় পাতু বানাবার শক্তি ভগবানেরও নেই।

গেঁজেলের সর্দার বললে, ঠিক বলেছ বাবা, এরকম ছিষ্টি দৈবাৎ হয়। ভগবান নাকে খত দিয়েছেন, এমন কাজ আর করবেন না। তবু তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, একটা কোনো সয়তান ভগবানের পাল্টা জবাব দিয়েছে। একেবারে ওস্তাদের হাতের নকল, পাকা জালিয়াতের কাজ। পাতুর দেহখানা শুকিয়ে শুকিয়ে ওর নাক চিম্‌সিয়ে বেঁকে

গিয়েছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের নাকটি পর্যন্ত যেন কেটে ওর মুখের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। ওর হাতের চামড়া নকল করতে বোধ করি হাজার চামচিকের ডানা খরচ করতে হয়েছে।

তুমি দেখলে মকদ্দমা আর টেঁকে না; সাহেবকে বললে, এক হপ্তা সময় দিন, খাঁটি পান্তু পক্ষীরাজকে হাজির ক'রে দেব এই আদালতে।

তখনি ছুটলে তেলিনিপাড়ার দিঘির ঘাটে। কপাল ভালো, ঠিক তক্ষুনি তোমার দেহটা উঠছে ভেসে। পাতুর দেহ ডাঙায় চিত ক'রে ফেলে পুরোনো খোলটা জুড়ে বসলে। মস্ত একটা হাঁপ ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে, ওরে পাতু!

তখনই ওর দেহটা উঠল খাড়া হয়ে। পাতু বললে, ভায়া, সঙ্গে সঙ্গেই ছিলুম। মনটা অস্থির ছিল গাঁজার মৌতাতে। ইচ্ছে করত, আত্মহত্যে করি, কিন্তু সে রাস্তাও তুমি জুড়ে বসেছিলে। বেঁচে যখন ছিলুম তখন বেঁচে থাকবার শখ ছিল ষোলো আনা; যেমনি মরেছি অমনি আর যে কোনোমতেই কোনো কালেই মরতে পারব না, এই দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠল। সামান্য একটা দড়ি নিয়ে গলায় ফাঁস লাগাব, এটুকু যোগ্যতাও রইল না।

তুমি বললে, যা হবার তা তো হল, এখন চলো আদালতে। জজসাহেবকে ব'লে তোমার গাঁজার বরাদ্দ করে দেব।

গেলে আদালতে। জজসাহেব পাতুকে ধমক দিয়ে বললে, এ বুড়ি তোমার স্ত্রী কি না সত্যি ক'রে বলো।

পাতু বললে, হুজুর, সত্যি ক'রে বলতে মন যায় না। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে মিথ্যে ব'লে পাপ করব কেন। নিশ্চয় জানি যে, পাপের সঙ্গে সঙ্গে উনিই পিছন পিছন ছুটবেন। উনিই আমার প্রথম পক্ষের পরিবার।

সাহেব জিগেস করলেন, আরও আছে না কি।

পাতু বললে, না থাকলে মান রক্ষা হয় না যে। কুলীনের ছেলে। নৈকষ্যকুলীন।

রবিবার দিনে পুপুদিদি পড়েছে গল্পটা। আমাকে জিগেস করলে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি যে লিখেছ একরাশ ইংরেজি বই নিয়ে কোন্ কলেজের জন্যে বই লিখছ। তোমার আবার কলেজ কোথায়, তা ছাড়া কখনো তো দেখি নি ঐরকমের বই খুলতে। তুমি তো লেখ কেবল ছড়া।

স্পষ্ট জবাব না দিয়ে একটুখানি হাসলুম।

আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কি সংস্কৃত জান।

দেখো পুপুদিদি, এরকম প্রশ্নগুলো বড়ো রূঢ়। মুখের সামনে জিগেস করতে নেই।

৯

সকালবেলায় পুপেদিদি উদ্‌বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, দাদামশায় সে'কে নিয়ে সব গল্প কি ফুরিয়ে গেল।

দাদামশায় খবরের কাগজ ফেলে রেখে চশমা কপালে তুলে বললে, গল্প ফুরোয় না, গল্প-বলিয়ের দিন ফুরোয়।

আচ্ছা, ও তো গা ফিরিয়ে পেলে, তার পরে কী হল বলো-না।

আবার ওকে গা খাটিয়ে মরতে হবে, গায়ে প'ড়ে নিতে হবে নানা দায়। কখনো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে। কখনো গালমন্দ গা পেতে নেবে, কখনো নেবে না। কখনো কাজে গা লাগবে, কখনো লাগবে না। ওর গা থাকা সত্ত্বেও কুঁড়েমি দেখে লোকে বলবে, কিছুতে ওর গা নেই। কখনো গা ঘুরবে, কখনো গা কেমন করবে, গা ঘুলিয়ে যাবে। কখনো গা ভার হবে, কখনো গা মাটি-মাটি করবে, গা ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করবে, গা সির্‌সির্‌ করবে, গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করতে থাকবে। সংসারটা কখনো হবে গা-সওয়া, কখনো হবে উল্টো। কারও কথায় গা জ্ব'লে যাবে, কারও কথায় গা যাবে জুড়িয়ে। বন্ধুবান্ধবের কথা শুনে গায়ে জ্বর আসবে। এত মুশকিল একখানা গা নিয়ে।

আচ্ছা, দাদামশায়, ও যখন আর-একজনের গা নিয়ে বেড়াত তখন মুশকিল হত কার। গা কেমন করলে ওর করত কি তার করত।

শক্ত কথা। আমি তো বলতে পারব না, ওকে জিগেস করলে ওরও মাথা ঘুরে যাবে।

দাদামশায়, গা নিয়ে এত হাঙ্গাম আমি কখনো ভাবিনি।

ঐ হাঙ্গামগুলো জোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গায়ের উপর সওয়ার হয়ে গল্প ছুটেছে চার দিকে। কোনো গা গল্পের গাধা, কোনো গা গল্পের রাজহস্তী।

তোমার গা কী, দাদামশায়।

বলব না। অহংকার করতে বারণ করে শাস্ত্রে।

দাদামশায়, সে'র গল্প তুমি থামিয়ে দিলে কেন।

বলি তা হলে। কুঁড়েমির স্বর্গ সকল স্বর্গের উপরে। সেখানে যে ইন্দ্র ব'সে অমৃত খাচ্ছেন হাজার চক্ষু আধখানা বুজে, তিনি হলেন গল্পের দেবতা। আমি তাঁর ভক্ত; কিন্তু তাঁর সভায় আজকাল ঢুকতেই পারি নে। আমার ভাগে গল্পের প্রসাদ অনেকদিন থেকে বন্ধ।

কেন।

পথ ভুল হয়ে গিয়েছিল।

কী করে।

অমরাবতীর যে সুরধুনীনদীর এক পারে ইন্দ্রলোক, তারই ভাঁটিতে আছে আর-এক স্বর্গ। কারখানাঘরের কালো ধোঁয়ার পতাকা উড়ছে সেখানকার আকাশে। সেটা হল কাজের স্বর্গ। সেখানে হাফ্‌প্যাণ্ট্‌-পরা দেবতা বিশ্বকর্মা। একদিন শরৎ-কালের সকালে পুজোর থালায় শিউলিফুল সাজিয়ে রাস্তায় চলেছি; ঘাড়ের উপর এসে পড়ল বাইক-চড়া এক পাণ্ডা। তার ঝুলিতে একতাড়া খাতা; বুকের পকেটে একটা লাল কালীর, একটা কালো কালীর ফাউণ্টেন্‌পেন। খবরের কাগজের কাটা টুকরোর বাণ্ডিল চায়না-কোটের দুই পকেট ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে; ডান হাতের কব্জিঘড়িতে স্ট্যাণ্ডার্ড্‌ টাইম, বাঁ হাতে কলকাতা টাইম; ব্যাগে ই. আই. আর., ই. বি. আর., এ. বি. আর., এন. ডব্লু. আর., বি. এন. আর., বি. বি. আর., এস. আই. আর. এর টাইম-টেবিল। বুকের পকেটে নোটবই ডায়রি-সুদ্ধ। ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়িয়ে পড়ি আর-কি। সে বললে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেছ কোন্‌ চুলোয়।

আমি বললুম, রাগ কোরো না, পাণ্ডাজি। মন্দিরে পুজো দিতে যাব, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি নে।

সে বললে, তোমরা বুঝি মেঘের-দিকে-হাঁ-ক'রে-তাকানো রাস্তা-খোঁজার দল! চলো, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমাকে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে এল বিশ্বকর্মাঠাকুরের মন্দিরে। হাঁ-না করবার সময় দিলে না। কিছু জিগেস করবার আগেই বললে, রাখো এইখানে থালা, পকেট থেকে বের করো পাঁচ-সিকে দক্ষিণে।

বোকার মতো পুজো দিলেম। তখনই হিসেব সে টুকে নিলে তার নোট্‌বইয়ে। কব্জিঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, হয়েছে কাজ, এখন বেরোও। সময় নেই।

পরদিন থেকেই দেখি ফল ফলেছে। ভোর তখন সাড়ে চারটে। ডাকাত পড়েছে ভেবে ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে ঘুম ভেঙে শুনি, অনাথতারিণী সভার সভ্যেরা বারো-তেরো বছরের পঁচিশটা ছেলে জুটিয়ে দরজায় এসে চীৎকারস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে—

যত পেটে ধরে তার চেয়ে ভর' পেটে,
টাকাপয়সায় পকেট পড়ছে ফেটে—
হিসেব খতিয়ে দেখলে বুঝতে পার'
অনাথজনের কত ধার তুমি ধার'।

তারো, গরিবেরে তারো,

তারো, তারো, তারো।

'তারো তারো' করতে করতে ভীষণ চাটি পড়তে লাগল খোলে। মনে মনে যত খতিয়ে দেখছি তহবিলে কত টাকা বাকি, চাটি ততই কানে তালা ধরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বাজল কাঁসর; 'তারো তারো তারো' ক'রে নাচ জুড়ে দিলে ছেলেগুলো। অসহ্য

হয়ে এল। দেরাজ খুলে থলিটা বের করলেম। সাত দিনের না-কামানো-দাড়ি-ওয়ালা ওদের সর্দার উৎসাহিত হয়ে চাদর পেতে ধরলে। থলি ঝাড়তে বেরোল এক টাকা, ন আনা, তিন পয়সা। মাসের দু দিন বাকি, দর্জির দেনার জন্যে টানাটানি করে ঐটুকু রেখেছিলেম।

গান ছেড়ে গাল শুরু করলে। বললে, অগাধ টাকা, চিরটা দিন পায়ের উপর পা দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে আছ ; ভুলেছ, যেদিন মরবে সেদিন তোমার মতো লক্ষপতির যে দর আর আমাদের ছেঁড়া-ট্যানা-পরা ভিখিরিরও সেই দর।

এ কথাগুলো পুরোনো ঠেকল, কিন্তু ঐ লক্ষপতি বিশেষণটাতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এই হল শুরু। তার পরে ইতিমধ্যে পঁচিশটা সভার সভ্য হয়েছি। বাংলাদেশে সরকারি সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আদি ভারতীয় সংগীতসভা, কচুরিপানা-ধ্বংসন সভা, মৃতসংকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইক্ষুছিবড়ের পণ্যপরিণতি সভা, খনাতে খনার লুপ্তভিটা-সংস্কার সভা, পিঁজরাপোলের উন্নতিসাধিনী সভা, ক্ষৌরব্যয়নিবারিণী-দাড়ি-গোঁফ-রক্ষণী সভা— ইত্যাদি সভার বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অনুরোধ আসছে, ধনুষ্টংকারতত্ত্ব বইখানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিতপাঠের অভিমত দিতে, ভুবনডাঙায় ভবভূতির জন্মস্থাননির্ণয় পুস্তিকার গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ পাঠাতে, রাওলপিণ্ডির ফরেস্ট্ অফিসারের কন্যার নামকরণ করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে, পাগলামির ওষুধ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।

দাদামশায়, মিছিমিছি তুমি এত বেশি বক যে তোমার সময় নেই বললে কেউ বিশ্বাস করে না। আজ তোমাকে বলতেই হবে, গা ফিরে পেয়ে কী করলে সে।

বিষম খুশি হয়ে চলে গেল দমদমে।

দমদমে কেন।

অনেক দিন পরে নিজের কান দুটো ফিরে পেয়ে স্বকর্ণে আওয়াজ শোনবার শখ ওর কিছুতে মিটতে চায় না। শ্যামবাজারের মোড়ে কান পেতে থাকে ট্র্যামের বাসের ঘড়্ঘড়ানিতে। টিটেগড়ের চটকলের দারোয়ানের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে, তার ঘরে বসে কলের গর্জন শুনে ওর চোখ বুজে আসে। ঠোঙায় করে রসগোল্লা আর আলুর দম নিয়ে বার্ন্ কোম্পানির কামারের দোকানে বসে খেতে যায়। বন্দুকের তাক অভ্যেস করতে গোরা ফৌজ গেছে দমদমে, ও তারই ধুম্ ধুম্ শব্দ শুনছিল আরামে, টার্গেটের ও পারে ব'সে। আনন্দে আর থাকতে পারলে না, টার্গেটের এ ধারে মুখ

বাড়িয়ে দেখতে এসেছে, লাগল একটা গুলি ওর মাথায়।— বাস্।

বাস্ কী, দাদামশায়।

বাস্ মানে সব গল্প গেল একদম ফুরিয়ে।

না, না, সে হতেই পারে না। আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ। এমন ক'রে তো সব গল্পই ফুরোতে পারে।

ফুরোয় তো বটেই।

না, সে হবে না কিছুতেই। তার পরে কী হল বলো।

বল কী— মরার পরেও?

হাঁ, মরার পরে।

তুমি গল্পের সাবিত্রী হয়ে উঠলে দেখছি।

না, অমন ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বলো কী হল।

আচ্ছা, বেশ। লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই। মরার বাড়াও গাল আছে, সেই কথাটা বলি তবে। ফৌজের ডাক্তার ছিল তাঁবুতে, মস্ত ডাক্তার সে। সে যখন খবর পেলে মানুষটা মগজে গুলি লেগে মরেছে, বিষম খুশি হয়ে লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল— হুর্‌রা।

খুশি হল কেন।

ও বললে, এইবার মগজ বদল করার পরীক্ষা হবে।

মগজ বদল হবে কী ক'রে।

বিজ্ঞানের বাহাদুরি। জু থেকে চেয়ে নিলে একটা বনমানুষ্। বের করলে তার মগজ। আর, সে'র মাথার খুলি খুলে ফেললে। তার মধ্যে বাঁদরের মগজ পুরে দিয়ে খড়ির পলেস্তারা দিয়ে মাথাটা বেঁধে রাখলে পনেরো দিন। খুলি জুড়ে গেল। বিছানা ছেড়ে সে যখন উঠল, তখন সে এক বিষম কাণ্ড। যাকে দেখে তার দিকে দাঁত খিঁচিয়ে কিচিমিচি করে ওঠে। নর্স্ দিলে দৌড়। ডাক্তারসাহেব বজ্রমুঠিতে ওর দুই হাত চেপে ধরে জোর গলায় বললেন, স্থির হয়ে বোসো এইখানে। ও হুকারটা বুঝলে, কিন্তু ভাষাটা বুঝলে না। ও চৌকিতে বসতে চায় না, ও লাফ দিয়ে উঠে বসতে চায় টেবিলের উপরে। কিন্তু, লাফ দিতে পারে না, ধপ্ ক'রে পড়ে যায় মেজের উপর। দরজাটা খোলা ছিল, বাইরে ছিল একটা অশথগাছ। সবার হাত এড়িয়ে ছুটল সেই গাছের দিকে। ভাবলে, এক লাফে চড়তে পারবে ডালে। বারবার লাফ দিতে থাকে অথচ ডালে পৌঁছতে পারে না, ধপ্ ক'রে পড়ে যায়। বুঝতেই পারে না, কেন পারছে না। রেগে রেগে ওঠে। ওর লম্ফ দেখে চার দিকে মেডিকেল

কলেজের ছেলেরা হো-হো ক'রে হাসতে থাকে। ও দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে তেড়ে যায়। একজন ফিরিঙ্গি ছেলে গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে কোলে রুমাল পেতে রুটি মাখন দিয়ে কলা দিয়ে আরামে খাচ্ছিল, ও হঠাৎ গিয়ে তার কলা ছিনিয়ে নিয়ে দিলে মুখে পুরে ; ছেলেটা রেগে ওকে মারতে যায়, বন্ধুদের হাসি কিছুতে থামতে চায় না।

মহা ভাবনা পড়ে গেল ওর জিম্মে নেবে কে। কেউ বললে পাঠাও জু'তে, কেউ বললে অনাথ-আশ্রমে। জু'র কর্তা বললে, এখানে মানুষ পোষা আমাদের বরাদ্দে নেই। অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ বললে, এখানে বাঁদর পোষা আমাদের নিয়মে কুলোবে না।

দাদামশায়, থামলে কেন।

দিদিমণি, জগতের সব-কিছুর সব-শেষে আছে থামা।

না, এ কিন্তু এখনও থামে নি। কলা ছিনিয়ে খাওয়া ও তো যে-সে পারে।

আচ্ছা, কাল হবে, আজ কাজ আছে।

কাল কী হবে বলো-না, অল্প একটুখানি।

জান তো ওর বিয়ের সম্বন্ধ আগেই হয়েছে ? ওর যে মগজ বদল হয়ে গেছে সে খবরটা কনের বাড়িতে পৌঁছয় নি। দিন স্থির, লগ্ন স্থির। বরের পিসে ওকে মস্ত দু ছড়া কলা খাইয়ে ঠাণ্ডা করে বিয়ের জায়গায় নিয়ে গেছেন। তার পরে বিয়ে-বাড়িতে যে কাণ্ডটা হল তা ভালো করে ফলিয়ে বললে তখন তুমিই বলবে, গল্পের মতো গল্প হয়েছে। এর পরে আর ওকে মেরে ফেলবার দরকার হবে না। সে মরার বাড় হবে।

সন্ধেবেলায় বসেছি ছাদে। দিব্যি দক্ষিণের হাওয়া দিচ্ছে। শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। পুপুদিদি একটি আকন্দের মালা গেঁথে এনেছে কাঁচপাত্রে, গল্প বলা শেষ হলে বক্‌শিষ মিলবে।

হেনকালে হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপস্থিত। বললে, আজ থেকে আমার গল্প-জোগানের কাজে আমি ইস্তফা দিলুম। আমাকে পাতু গেঁজেলের গা পরিয়েছিলে, সেও সহ্য করেছি। শেষকালে বাঁদরের মগজ পুরেছ আমার খুলির মধ্যে, এ সইবে না। এর পরে হয়তো আমাকে চামচিকে কি টিক্‌টিকি কি গুবরে পোকা বানিয়ে দেবে। তোমাদের অসাধ্য কিছুই নেই। আজ আপিসে গিয়ে কেদারা টেনে বসেছি। দেখি

ডেস্কের উপরে এক ছড়া মর্তমান কলা। সহজ অবস্থায় কলা আমি ভালোই বাসি, কিন্তু এখন থেকে আমাকে কলা খাওয়া ছেড়েই দিতে হবে। পুপুদিদি, এর পরে তোমার ঐ দাদামশায় আমাকে নিয়ে যদি ব্রহ্মদত্যি কিম্বা কন্ধকাটা বানান, তা হলে কাগজে না ছাপান যেন। ইতিমধ্যে কন্যাকর্তা এসেছিলেন আমার ঘরে। বিয়েতে আশি ভরি সোনা দেবার কথা পাকা ছিল ; একদম নেমে গেছে তেরো ভরিতে। ওরা বুঝেছে, আমার ভাগ্যে এর পরে কনে জোটা দায় হবে। এই তবে বিদায় নিলেম।

১০

সন্ধেবেলায় বসে আছি দক্ষিণদিকের চাতালে। সামনে কতকগুলো পুরোনো কালের প্রবীণ শিরীষগাছ আকাশের তারা আড়াল ক'রে জোনাকির আলো দিয়ে যেন একশোটা চোখ টিপে ইশারা করছে।

পুপেদি'কে বললেম, বুদ্ধি তোমার অত্যন্ত পেকে উঠছে, তাই মনে করছি আজ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব, একদিন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে।

দিদি হেসে উঠে বললে, ঐখানে তোমার জিত। তুমিও এক কালে ছেলেমানুষ ছিলে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে নেই।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, বোধ হয় আজকের দিনে কারও হাতেই নেই। আমিও শিশু ছিলুম, তার একমাত্র সাক্ষী আছে ঐ আকাশের তারা। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমার একদিনকার ছেলেমানুষির কথা বলব। তোমার ভালো লাগবে কি না জানি নে, আমার মিষ্টি লাগবে।

আচ্ছা, ব'লে যাও।

বোধ হচ্ছে, ফাল্গুন মাস পড়েছে। তার আগেই ক'দিন ধরে রামায়ণের গল্প শুনেছিলে সেই চিক্‌চিকে-টাক-ওয়ালা কিশোরী চট্টোর কাছে। আমি সকাল বেলায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছি, তুমি এতখানি চোখ ক'রে এসে উপস্থিত। আমি বললেম, হয়েছে কী।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আমাকে হরণ ক'রে নিয়েছে।

কী সর্বনাশ। কে এমন কাজ করলে।

এ প্রশ্নর উত্তরটা তখনও তোমার মাথায় তৈরি হয় নি। বলতে পারতে রাবণ, কিন্তু কথাটা সত্য হত না ব'লে তোমার সংকোচ ছিল। কেননা, আগের সন্ধেবেলাতেই

রাবণ যুদ্ধে মারা গিয়েছে, তার একটা মুণ্ডুও বাকি ছিল না। উপায় না দেখে একটু থম্‌কে গিয়ে তুমি বললে, সে আমাকে বলতে বারণ করেছে।

তবেই তো বিপদ বাধালে। তোমাকে এখন উদ্ধার করা যায় কী ক'রে। কোন্‌ দিক দিয়ে নিয়ে গেল।

সে একটা নতুন দেশ।

খান্দেশ নয় তো?

না।

বুন্দেলখণ্ড নয়?

না।

কী রকমের দেশ।

নদী আছে, পাহাড় আছে, বড়ো বড়ো গাছ আছে। খানিকটা আলো, খানিকটা অন্ধকার।

সে তো অনেক দেশেই আছে। রাক্ষস-গোছের কিছু দেখতে পেয়েছিলে? জিব-বের-করা কাঁটাওয়ালা?

হাঁ হাঁ, সে একবার জিব মেলেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

বড়ো তো ফাঁকি দিলে, নইলে ধরতুম তার ঝুঁটি। যাই হোক, একটা কিছুতে করে তো তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল। রথে?

না।

ঘোড়ায়?

না।

হাতিতে?

ফস্‌ ক'রে ব'লে ফেললে, খরগোষে। ঐ জন্তুটার কথা খুব মনে জাগছে; জন্মদিনে পেয়েছিলে একজোড়া বাবার কাছ থেকে।

আমি বললেম, তবেই তো চোর কে তা জানা গেল।

টিপিটিপি হেসে তুমি বললে, কে বলো তো।

এ নিঃসন্দেহ চাঁদামামার কাজ।

কী ক'রে জানলে।

তারও যে অনেক কালের বাতিক খরগোষ পোষা।

কোথায় পেয়েছিল খরগোষ।

তোমার বাবা দেয় নি।

তবে কে দিয়েছিল।

ও চুরি করেছিল ব্রহ্মার চিড়িয়াখানায় ঢুকে।

ছিঃ।

ছিঃই তো। তাই ওর গায়ে কলঙ্ক লেগেছে, দাগা দিয়েছেন ব্রহ্মা।

বেশ হয়েছে।

কিন্তু শিক্ষা হল কই। আবার তো তোমাকে চুরি করলে। বোধ হয় তোমার

হাত দিয়ে ওর খরগোষকে ফুলকপির পাতা খাওয়াবে।

খুশি হলে শুনে। আমার বুদ্ধির পরখ করবার জন্যে বললে, আচ্ছা, বলো দেখি, খরগোষ কী ক'রে আমাকে পিঠে ক'রে নিলে।

নিশ্চয় তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

ঘুমলে কি মানুষ হাল্কা হয়ে যায়।

হয় বই-কি। তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড় নি?

হাঁ, উড়েছি তো।

তবে আর শক্তটা কী। খরগোষ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলা ব্যাঙের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাঙ-দৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

ব্যাঙ। ছী ছি ছি! শুনলেও গা কেমন করে।

না, ভয় নেই— ব্যাঙের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে। একটা কথা জিগেস করি, পথের ব্যাঙ্গমাদাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি কি।

হাঁ, হয়েছিল বই-কি।

কিরকম।

ঝাউগাছের উপর থেকে নীচে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। বললে, পুপেদিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায়। শুনে খরগোষ এমন দৌড় দৌড়ল যে ব্যাঙ্গমাদাদা পারল না তাকে ধরতে।— আচ্ছা, তার পরে?

কার পরে।

খরগোষ তো নিয়ে গেল, তার পরে কী হল বলো-না।

আমি কী বলব। তোমাকেই তো বলতে হবে।

বাঃ, আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কেমন করে জানব।

সেই তো মুশকিল হয়েছে। ঠিকানাই পাচ্ছি নে কোথায় তোমাকে নিয়ে গেল। উদ্ধার করতে যাই কোন্ রাস্তায়। একটা কথা জিগেস করি, যখন রাস্তা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছিলে কি।

হাঁ হাঁ, পাচ্ছিলুম ঢঙ ঢঙ ঢঙ।

তা হলে রাস্তাটা সোজা গেছে ঘণ্টাকর্ণদের পাড়া দিয়ে।

ঘণ্টাকর্ণ! তারা কিরকম।

তাদের দুটো কান দুটো ঘণ্টা। আর, দুটো লেজে দুটো হাতুড়ি। লেজের ঝাপটা দিয়ে একবার এ কানে বাজায় ঢঙ, একবার ও কানে বাজায় ঢঙ। দু জাতের ঘণ্টাকর্ণ আছে, একটা আছে হিংস্র, কাঁসরের মতো খন্‌খন্‌ আওয়াজ দেয়; আর-একটার গম্‌গম্‌ গম্ভীর শব্দ।

তুমি কখনো তার শব্দ শুনতে পাও, দাদামশায়?

পাই বই-কি। এই, কাল রাত্তিরেই বই পড়তে পড়তে হঠাৎ শুনলেম ঘণ্টাকর্ণ চলেছেন ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। বারোটা বাজালেন যখন তখন আর থাকতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি বই ফেলে দিয়ে চমকে উঠে দৌড় দিলুম বিছানায়, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে চোখ বুজে রইলুম পড়ে।
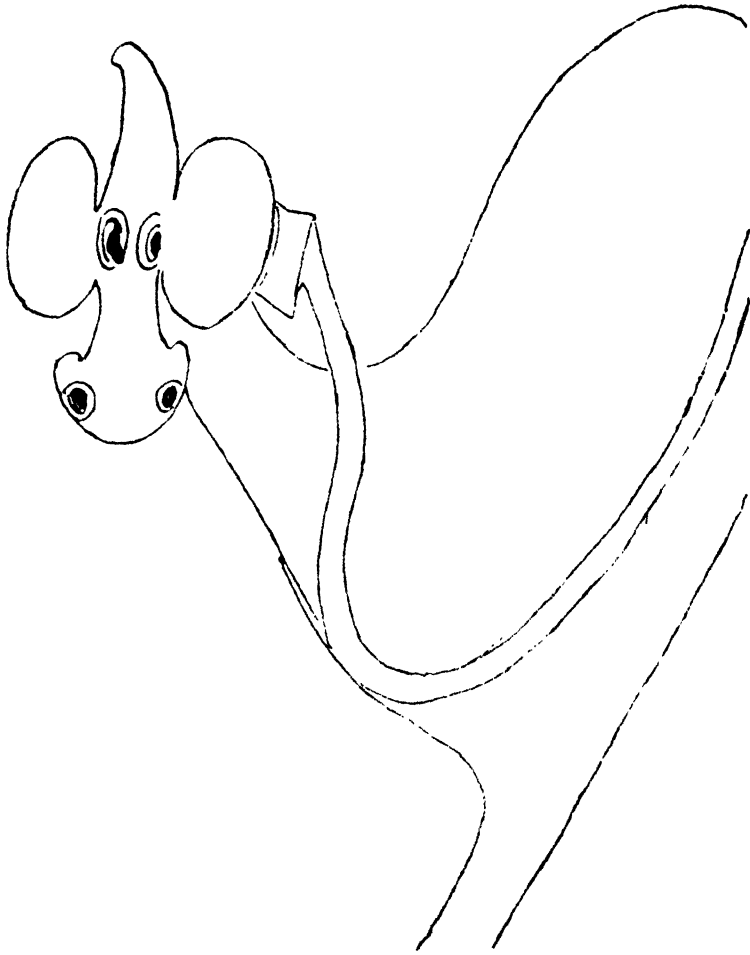
খরগোষের সঙ্গে ঘণ্টাকর্ণের ভাব আছে ?

খুব ভাব। খরগোষটা তারই আওয়াজের দিকে কান পেতে চলতে থাকে সপ্তর্ষিপাড়ার ছায়াপথ দিয়ে।

তার পরে ?

তার পরে যখন একটা বাজে, দুটো বাজে, তিনটে বাজে, চারটে বাজে, পাঁচটা বাজে, তখন রাস্তা শেষ হয়ে যায়।

তার পরে ?

তার পরে পৌঁছয় তন্দ্রা-তেপান্তরের ও পারে আলোর দেশে। আর দেখা যায় না।

আমি কি পৌঁচেছি সেই দেশে।

নিশ্চয় পৌঁচেছ।

এখন তা হলে আমি খরগোষের পিঠে নেই ?

থাকলে যে তার পিঠ ভেঙে যেত।

ওঃ, ভুলে গেছি, এখন যে আমি ভারী হয়েছি। তার পরে ?

তার পরে তোমাকে উদ্ধার করা চাই তো।

নিশ্চয় চাই। কেমন করে করবে।

সেই কথাটাই তো ভাবছি। রাজপুত্তুরের শরণ নিতে হল দেখছি।

কোথায় পাবে।

ঐ-যে তোমাদের সুকুমার।

শুনে এক মুহূর্তে তোমার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু কঠিন সুরেই বললে, তুমি তাকে খুব ভালোবাস। তোমার কাছে সে পড়া বলে নিতে আসে। তাই তো সে আমাকে অঙ্কে এগিয়ে যায়।

এগিয়ে যাবার অন্য স্বাভাবিক কারণও আছে। সে কথাটার আলোচনা করলুম না। বললুম, তা, তাকে ভালোবাসি আর না বাসি, সেই আছে এক রাজপুত্তুর।

কেমন করে জানলে।

আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে তবে সে ঐ পদটা পাকা করে নিয়েছে।

তুমি বেশ একটু ভুরু কুঁচকে বললে, তোমারই সঙ্গে ওর যত বোঝাপড়া !

কী করি বলো, কোনোমতে ও মানতে চায় না— ওর চেয়ে আমি বয়সে খুব বেশি বড়ো।

ওকে তুমি বল রাজপুত্তুর ! ওকে আমি জটায়ুপাখি বলেও মনে করি নে। ভারি তো !

একটু শান্ত হও, এখন ঘোর বিপদে পড়া গেছে ! তুমি কোথায় তার তো ঠিকানাই নেই। তা, এবারকার মতো কাজ উদ্ধার করে দিক, আমরা নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। এর পরে ওকে সেতুবন্ধনের কাঠবিড়ালি বানিয়ে দেব।

উদ্ধার করতে ও রাজি হবে কেন। ওর এক্‌জামিনের পড়া আছে।

রাজি হবার বারো-আনা আশা আছে। এই পরশু শনিবারে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম। বেলা তিনটে। সেই রোদ্দুরে মাকে ফাঁকি দিয়ে ও দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছে

বাড়ির ছাদে। আমি বললুম, ব্যাপার কী।

ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা উপরে তুলে বললে, আমি রাজপুত্তুর।

তলোয়ার কোথায়।

দেয়ালির রাত্রে ওদের ছাদে আধপোড়া তুবড়িবাজির একটা কাঠি পড়েছিল, কোমরে সেইটেকে ফিতে দিয়ে বেঁধেছে! আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি বললুম, তলোয়ার বটে। কিন্তু, ঘোড়া চাই তো?

বললে, আস্তাবলে আছে।

ব'লে ছাদের কোণ থেকে ওর জ্যাঠামশায়ের বহুকেলে বেহায়া একটা ছেঁড়া ছাতা টেনে নিয়ে এল। দুই পায়ের মধ্যে তাকে চেপে ধরে হাট্‌হাট্‌ আওয়াজ করতে করতে ছাদময় একবার দৌড় করিয়ে আনলে। আমি বললুম, ঘোড়া বটে!

এর পক্ষীরাজের চেহারা দেখতে চাও?

চাই বই-কি।

ছাতাটা ফস্‌ করে খুলে দিলে। ছাতার পেটের মধ্যে ঘোড়ার খাবার দানা ছিল, সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল ছাদে।

আমি বললুম, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এ জন্মে পক্ষীরাজ দেখব, কোনোদিন এমন আশাই করি নি।

এইবার আমি উড়ছি, দাদা। চোখ বুজে থাকো, তা হলে বুঝতে পারবে, আমি ঐ মেঘের কাছে গিয়ে ঠেকেছি। একেবারে অন্ধকার!

চোখ বোজবার দরকার করে না আমার। স্পষ্টই জানতে পারছি, তুমি খুব উড়ছ, পক্ষীরাজের ডানা মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

আচ্ছা, দাদামশায়, আমার ঘোড়াটার একটা নাম দিয়ে দাও তো।

আমি বললুম, ছত্রপতি।

নামটা পছন্দ হল। রাজপুত্তুর ছাতার পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে বললে, ছত্রপতি!

নিজেই ঘোড়ার হয়ে তার জবাব দিলে, আজ্ঞে!

আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি ভাবছ, আমি বললুম। আজ্ঞে, তা নয়, ঘোড়া বললে।

সে কথাও কি আমাকে বলতে হবে। আমি কি এত কালা।

রাজপুত্তুর বললে, ছত্রপতি, আর ভালো লাগছে না চুপচাপ পড়ে থাকতে।

তারই মুখ থেকে উত্তর পাওয়া গেল, কী হুকুম বলো।

তেপান্তরের মাঠ পেরোনো চাই।

রাজি আছি।

আমি তো আর থাকতে পারি নে, কাজ আছে ; রসে ভঙ্গ দিয়ে বলতে হল, রাজপুত্তুর, কিন্তু তোমার মাস্টার যে বসে আছে। দেখে এলুম, তার মেজাজটা চটা।
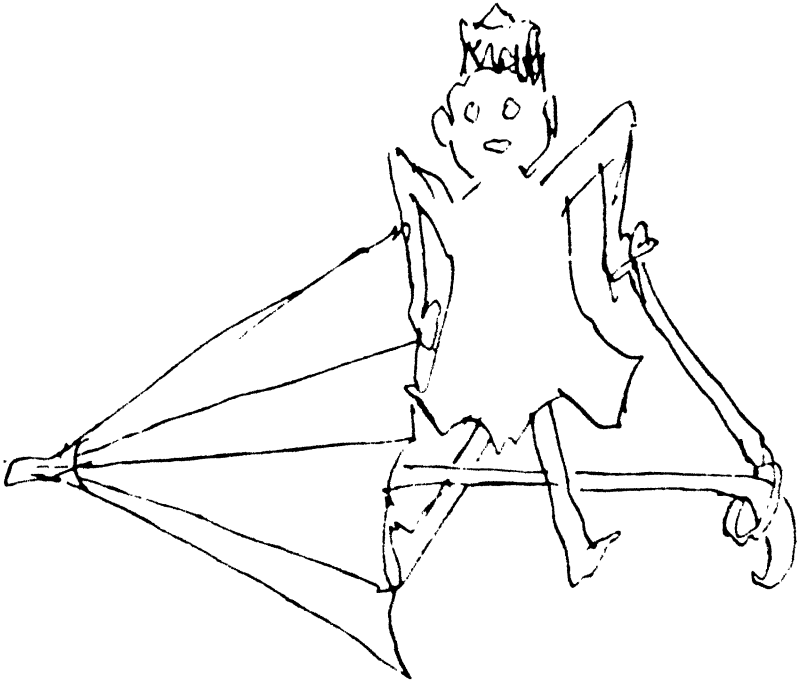
শুনে রাজপুত্তুরের মনটা ছট্‌ফট্‌ করে উঠল। ছাতাটাকে থাব্‌ড়া মেরে বললে, এখখনি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পার না কি।

বেচারা ঘোড়ার হয়ে আমাকেই বলতে হল, রাত্তির না হলে ও তো উড়তে পারে না। দিনের বেলায় ও ন্যাকামি ক'রে ছাতা সাজে ; তুমি ঘুমোলেই ও ডানা মেলবে। এখনকার মতো পড়তে যাও, নইলে বিপদ বাধবে।

সুকুমার মাস্টরের কাছে পড়তে গেল। যাবার সময় আমাকে বললে, কিন্তু সব কথা এখনো শেষ হয় নি।

আমি বললুম, কথা কি কখনোই শেষ হতে পারে। শেষ হলে মজা কিসের।

পাঁচটার সময় পড়া শেষ হয়ে যাবে। দাদু, তখন তুমি এসো।

আমি বললুম, থর্ড্‌নম্বর রীডরের পরে মুখ বদলাবার জন্যে পয়লা নম্বরের গল্প চাই। নিশ্চয় আসব।

১১

মাস্টরমশায়কে দেখলুম গলির মোড়ে, ট্রামের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যখন গেলুম সুকুমারদের বাড়ির ছাদে, তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সামনের তেতালা বাড়িটাতে পড়ন্তি বেলাকার রোদ্দুর আড়াল করেছে। গিয়ে দেখি, চিলে কোঠার সামনে সুকুমার চুপ করে বসে। ছাদের কোণটাতে বিশ্রাম করছে তার ছত্রপতি। পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠে এলুম, তখনো আমার পায়ের শব্দ ওর কানে পৌঁছল না। খানিক বাদে ডাক দিলুম, রাজপুত্তুর।

ওর যেন স্বপ্ন গেল ভেঙে, চমকে উঠল।

জিগেস করলুম, বসে কী ভাবছ ভাই।

ও বললে, শুকসারীর কথা শুনছি।

শুকসারীর দেখা পেলে কোথায়।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে বন। ডালে ডালে ফুল ছড়াছড়ি— হলদে, লাল, নীল, যেন সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। তারই ভিতর থেকে শুকসারীর গলা শোনা যাচ্ছে।

তাদের দেখতে পাচ্ছ তো ?

হাঁ, পাচ্ছি। খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা ঢাকা।

তা, কী বলছে ওরা।

এইবার মুশকিলে পড়ল আমাদের রাজপুত্তুর। খানিকটা আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে, তুমিই বলো-না, দাদু, ওরা কী বলছে।

ঐ তো পষ্ট শোনা যাচ্ছে, ওরা তর্ক করছে।

কিসের তর্ক।

শুক বলছে, আমি এবার উড়ব। সারী বলছে, কোথায় উড়বে। শুক বলছে, যেখানে কোথাও ব'লে কিছুই নেই, কেবল ওড়াই আছে ; তুমিও চলো আমার সঙ্গে। সারী বললে, আমি ভালোবাসি এই বনকে ; এখানে ডালে জড়িয়ে উঠেছে ঝুমকো লতা, এখানে ফল আছে বটের, এখানে শিমুলের ফুল যখন ফোটে তখন কাকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ভালো লাগে তার মধু খেতে ; এখানে রাত্তিরে জোনাকিতে ছেয়ে যায় ঐ কাম্‌রাঙার ঝোপ, আর বাদলায় বৃষ্টি যখন ঝরতে থাকে তখন দুলতে থাকে নারকেলের ডাল ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ ক'রে— আর, তোমার আকাশে কীই বা আছে। শুক

বললে, আমার আকাশে আছে সকাল, আছে সন্ধে, আছে মাঝরাত্রের তারা, আছে দক্ষিনে হাওয়ার যাওয়া আসা, আর আছে কিছুই না—কিছুই না—কিছুই না।

সুকুমার জিগেস করলে, কিছুই-না থাকে কী ক'রে, দাদু।

সেই কথাই তো এইমাত্র সারী জিগেস করলে শুককে।

শুক কী বলছে।

শুক বলছে, আকাশের সব চেয়ে অমূল্যধন ঐ কিছুই-না। ঐ কিছুই-না আমাকে ডাক দেয় ভোরের বেলায়। ওরই জন্যে আমার মন কেমন করে যখন বনের মধ্যে বাসা বাঁধি। ঐ কিছুই-না কেবল খেলা করে রঙের খেলা নীল আঙিনায়; মাঘের শেষে আমের বোলের নিমন্ত্রণ-চিঠিগুলি ঐ কিছুই-না'র ওড়না বেয়ে হুহু করে উড়ে আসে, মৌমাছিরা খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

উৎসাহে সুকুমার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল; বললে, আমার পক্ষীরাজকে ঐ কিছুই-না'র রাস্তা দিয়েই তো চালাতে হবে।

নিশ্চয়ই। পুপুদিদির হরণব্যাপারটা আগাগোড়াই ঐ কিছুই-না'র তেপান্তরে।

সুকুমার হাত মুঠো ক'রে বললে, সেইখান দিয়েই আমি তাকে ফিরিয়ে আনব, নিশ্চয় আনব।

বুঝতে পারছ তো, পুপুদিদি?—রাজপুত্তর তৈরিই আছে, তোমাকে উদ্ধার করতে দেরি হবে না। এতক্ষণে ছাদের উপরে তার ঘোড়াটা একবার পাখা খুলছে, আবার বন্ধ করছে।

তুমি খুব ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে, দরকার নেই।

বল কী, এত বড়ো বিপদ থেকে তোমার উদ্ধার হল না, আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকব?

হয়ে গেছে উদ্ধার।

কখন হল।

শুনলে না? একটু আগেই ঘণ্টাকর্ণ এসে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কখন ঘটল এটা।

ঐ-যে, ঢঙ ঢঙ ক'রে দিলে নটা বাজিয়ে।

কোন্ জাতের ঘণ্টাকর্ণ।

হিংস্র জাতের। এখন ইস্কুলে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। বিচ্ছিরি লেগেছে আওয়াজটা।

গল্পটা অকালে গেল ভেঙে। দুসরা রাজপুত্তুর খুঁজে বের করা উচিত ছিল। এ তো অঙ্কের হরণ পূরণ নয়—ওরকম ক্লাস-পেরোনো ছেলে তেপান্তর পেরোবার স্পর্ধা করবে, এ তুমি কিছুতেই সইতে পারলে না। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম,

লাখখানেক ঝিঁঝিঁ-পোকা আমদানি করব আমাদের পানাপুকুরের ধারের স্যাঁওড়াবন থেকে। তারা চাঁদামামার নিদমহলের পশ্চিম দিকের খিড়কির দরজা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে সবাই মিলে তোমার বিছানার চাদরটাতে দিত টান সুড়্সুড়্ ক'রে। তার উপরে তোমাকে নামিয়ে আনত। তাদের ঝিঁঝিঁ ঝিঁঝিঁ শব্দে চাঁদনি-চকে ঝিমিয়ে পড়ত চাঁদের পাহারাওয়ালা। সমস্ত রাস্তায় বায়না দিয়ে রেখেছিলুম জোনাকির আলোধারীর দলকে। বাঁশতলার বাঁকা গলি দিয়ে তোমাকে নিয়ে চলত, খস্ খস্ শব্দ করত ঝরে-পড়া শুক্‌নো পাতাগুলো। ঝর্ ঝর্ করতে থাকত নারকেলের ডাল। গন্ধে-ভুর-ভুর সর্ষেখেতের আল বেয়ে যখন এসে পড়তে তিরপুনির ঘাটে তখন ধামা-ভরা বিন্নিধানের খই নিয়ে ডাক দিতুম গঙ্গামায়ের শুঁড়তোলা মকরকে, তোমাকে চড়িয়ে দিতেম তার পিঠে। ডাইনে বাঁয়ে তার লেজের ঠেলায় জল উঠত কল্‌কলিয়ে। তিন পহর রাতে শেয়ালগুলো ডাঙায় দাঁড়িয়ে জিগেস করত, ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া! আমি বলতুম, চুপ রও, কুছ নেই হুয়া। এই যাত্রাপথে পেঁচা আর বাদুড়ের সঙ্গেও কিছু আপোষে বন্দোবস্তের কথা ছিল। তাদের কাজে লাগাতুম। ভোর সাড়ে চারটের সময় শুকতারা নেমে পড়ত পশ্চিম-আকাশে, পূর্ব-আকাশে আলোর রেখায় দেখা দিত সকালবেলার তর্জনীতে সোনার আংটি থেকে ঠিক্‌রে-পড়া সংকেত। সদ্য-জেগে-ওঠা কাক তেঁতুলের ডালে বসে অস্থির হয়ে প্রশ্ন করত, কা-কা? আমি যেমনি বলতুম 'কিচ্ছু না', অমনি দেখতে দেখতে সব যেত মিলিয়ে— তুমি জেগে উঠতে তোমার বিছানায়।

পুপুদিদি একটুখানি হেসে বললে, এই-যে আমার ছেলেমানুষির কাহিনীটি শোনা গেল— এটি এত ইনিয়ে-বিনিয়ে ব'লে তোমার কী আনন্দ হল। আমার হিংসুকে স্বভাব ছিল, এইটে জানাবার জন্যে তোমার এতই উৎসাহ! আর, আমাদের বিলিতি-আমড়া গাছের পাকা আমড়াগুলো পেড়ে নিয়ে সুকুমারদাকে লুকিয়ে দিয়ে আসতুম, আমড়া সে ভালোবাসত ব'লে; চুরির অপবাদটা হত আমার, আর ভোগ করত সে— সে কথাটা চেপে গেছ। সুকুমারদা নাহয় অঙ্কই ভালো কষত, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে একদিন সে 'অবধান' কথাটার মানে ভেবে পাচ্ছিল না, আমি স্লেটে লিখে আড় করে ধরে তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলুম— এ কথাগুলো বুঝি তোমার গল্পের মধ্যে পড়ে না?

আমি বললুম, আমার খুশির কারণ এ নয় যে, মনের জ্বালায় তুমি সুকুমারদার যৌবরাজ্য মানতে চাও নি। তার উপরে তোমার হিংসের কারণ ছিল আমার উপর

তোমার অনুরাগবশত— আমার আনন্দের স্মৃতি রয়েছে ঐখানেই।

আচ্ছা, তোমার অহংকার নিয়ে তুমি থাকো। একটা কথা তোমাকে জিগেস করি, সেই-যে তোমার নামহারা বানানো মানুষটি যাকে বলতে সে, তার হল কী।

আমি বললেম, তার বয়স বেড়ে গেছে।

ভালোই তো।

সে এখন চিন্তা করে, মাথায় তার দুঃসমস্যার ভিমরুলে চাক বেঁধেছে, তর্কে তার সঙ্গে পারবার জো নেই।

দেখছি আমারই প্যার্‍যালাল লাইনেই চলেছে।

তা হতে পারে, কিন্তু গল্পের এলেকা ছাড়িয়ে গেছে। থেকে থেকে সে হাত মুঠো ক'রে ঝেঁকে ঝেঁকে ব'লে উঠছে, শক্ত হতে হবে।

বলুক-না। শক্ত ছাঁদেই গল্প জমুক-না। চুমুক দিয়ে খাওয়া নেই হল, চিবিয়ে খাওয়া চলবে তো। হয়তো আমার পছন্দ হবে।

পাছে আক্কেল দাঁতের অভাবে তাকে কায়দা করতে না পার, এই ভয়ে অনেকদিন তাকে চুপ করিয়ে রেখেছি।

ইস! তোমার ভাবনা দেখে হাসি পায়। তুমি ঠাউরে রেখেছ, আমার যথেষ্ট বয়স হয় নি।

সর্বনাশ! এতবড়ো নিন্দে অতিবড়ো শত্রুও করতে পারবে না।

তা হলে ডাকো-না তাকে তোমার আসরে, তার বর্তমান মেজাজটা বুঝে নিই।

তাই সই।

১২

ঝগড়ুকে বললেম, কোথায় আছে সেই বাঁদরটা। সেখানে পাণ্ড বোলাও উস্‌কো।

এল সে তার কাঁটাওয়ালা মোটা গোলাপের গুঁড়ির লাঠিখানা ঠক্‌ঠক্ করতে করতে। মালকোঁচা-মারা ধুতি, চাদরখানা জড়ানো কোমরে, হাঁটু পর্যন্ত কালো পশমের মোটা মোজা, লাল ডোরা-কাটা জামার উপর হাতাহীন বিলিতি ওয়েস্ট্‌কোট সবুজ বনাতের, সাদা রোঁয়াওয়ালা রাশিয়ান টুপি মাথায়— পুরোনো মালের দোকান থেকে কেনা— বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে ন্যাকড়া জড়ানো— কোনো একটা সম্ভ

অপঘাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কড়া চামড়ার জুতোর মস্‌মসানি শোনা যায় গলির মোড় থেকে। ঘন ভুরুদুটোর নীচে চোখদুটো যেন মস্থে-থেমে-যাওয়া দুটো বুলেটের মতো।

বললে, হয়েছে কী। শুকনো মটর চিবোচ্ছিলুম দাঁত শক্ত করবার জন্যে, ছাড়ল না তোমার ঝগড়ু। বললে, বাবুর চোখদুটো ভীষণ লাল হয়েছে, বোধ হয় ডাক্তার ডাকতে হবে। শুনেই তাড়াতাড়ি গয়লাবাড়ি থেকে এক-ভাঁড় ঘোল এনেছি; মোচার খোলায় করে ফোঁটা ফোঁটা ঢালতে থাকো, সাফ হয়ে যাবে চোখ।

আমি বললুম, যতক্ষণ তুমি আছ আমার ত্রিসীমানায়, আমার চোখের লাল কিছুতেই ঘুচবে না। ভোরবেলাতেই তোমাদের পাড়ার যত মাতব্বর আমার দরজায় ধন্না দিয়ে পড়েছে।

বিচলিত হবার কী কারণ।

তুমি থাকতে দোসরা কারণের দরকার নেই। খবর পাওয়া গেল, তোমার চেলা কংসারি মুন্সি, যার মুখ দেখলে অযাত্রা, তোমার ছাদে বসে একখানা রামশিঙে তুলে ধরে ফুঁক দিচ্ছে; আর গাঁজার লোভ দেখিয়ে জড়ো করেছ যত ফাটা-গলার ফৌজ, তারা প্রাণপণে চেঁচানি অভ্যেস করছে। ভদ্রলোকেরা বলছে, হয় তারা ছাড়বে পাড়া নয় তোমাকে ছাড়াবে।

মহা উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে সে চীৎকারস্বরে বললে, প্রমাণ হয়েছে!

কিসের প্রমাণ।

বেসুরের দুঃসহ জোর। একেবারে ডাইনামাইট। বদ্‌সুরের ভিতর থেকে ছাড়া পেয়েছে দুর্জয় বেগ, উড়ে গিয়েছে পাড়ার ঘুম, দৌড় দিয়েছে পাড়ার শান্তি, পালাই-পালাই রব উঠেছে চার দিকে। প্রচণ্ড আসুরিক শক্তি। এর ধাক্কা একদিন টের পেয়েছিলেন স্বর্গের ভালো-মানুষরা। বসে বসে আধ চোখ বুজে অমৃত খাচ্ছিলেন। গন্ধর্ব ওস্তাদেরা তম্বুরা ঘাড়ে অতি নিখুঁত স্বরে তান লাগাচ্ছিলেন পরজ-বসন্তে, আর নূপুরঝংকারিণী অপ্সরীরা নিপুণ তালে তেহাই দিয়ে নৃত্য জমিয়েছিলেন। এ দিকে মৃত্যুবরণ নীল অন্ধকারে তিন যুগ ধ'রে অসুরের দল রসাতল-কোঠায় তিমিমাছের লেজের ঝাপ্‌টার বেলয়ে বেসুর সাধনা করছিল। অবশেষে একদিন শনিতে কলিতে মিলে দিলে সিগ্নাল, এসে পড়ল বেসুর-সংগতের কালাপাহাড়ের দল সুরওয়ালাদের সমে-নাড়া-দেওয়া ঘাড়ে হুংকার ক্রেংকার ঝন্‌ঝন্‌কার ধ্রুম্‌কার দুড়ুম্‌কার গড়্‌-গড়্‌গড়ংকার শব্দে। তীব্র বেসুরের তেলেবেগুনি জলনে পিতামহ-পিতামহ ডাক ছেড়ে তাঁরা লুকোলেন ব্রহ্মাণীর অন্দরমহলে। তোমাকে বলব কী আর, তোমার তো জানা আছে সকল শাস্ত্রই।

জানা যে নেই আজ তা বোঝা গেল তোমার কথা শুনে।

দাদা, তোমাদের বই-পড়া বিদ্যে, আসল খবর কানে পৌঁছয় না। আমি ঘুরে বেড়াই শ্মশানে মশানে, গূঢ়তত্ত্ব পাই সাধকদের কাছ থেকে। আমার উৎকটদন্তী গুরুর মুখকন্দর থেকে বেসুরতত্ত্ব অল্প কিছু জেনেছিলুম, তাঁর পায়ে অনেকদিন ভেরেণ্ডার বিরেচক তৈল মর্দন ক'রে।

বেসুরতত্ত্ব আয়ত্ত করতে তোমার বিলম্ব হয় নি সেটা বুঝতে পারছি। অধিকারভেদ মানি আমি।

দাদা, ঐ তো আমার গর্বের কথা। পুরুষ হয়ে জন্মালেই পুরুষ হয় না, পরুষতার প্রতিভা থাকা চাই। একদিন আমার গুরুর অতি অপূর্ব বিশ্রীমুখ থেকে—

গুরুমুখকে আমরা বলে থাকি শ্রীমুখ, তুমি বললে বিশ্রীমুখ!

গুরুর আদেশ। তিনি বলেন, শ্রীমুখটা নিতান্ত মেয়েলি, বিশ্রী মুখেই পুরুষের গৌরব। ওর জোরটা আকর্ষণের নয়, বিপ্রকর্ষণের। মান কি না।

মানতে যে হতভাগ্য বাধ্য হয় সে মানে বই-কি।

মধুর রসে তোমার মৌতাত পাকা হয়ে গেছে দাদা, কঠোর সত্য মুখে রোচে না, ভাঙতে হবে তোমাদের দুর্বলতা— মিঠে সুরে যার নাম দিয়েছ সুরুচি, বিশ্রীকে সহ করবার শক্তি নেই যার।

দুর্বলতা ভাঙা সবলতা ভাঙার চেয়ে অনেক শক্ত।— বিশ্রীতত্ত্বের গুরুবাক্য

শোনাতে চাচ্ছিলে, শুনিয়ে দাও।

একেবারে আদিপর্ব থেকে শুরু আরম্ভ করলেন ব্যাখ্যান। বললেন, মানবসৃষ্টির শুরুতে চতুর্মুখ তাঁর সামনের দিকের দাড়ি-কামানো দুটো মুখ থেকে মিহি সুর বের করলেন। কোমল রেখাব থেকে মধুর ধারার মসৃণ মিড়ের উপর দিয়ে পিছলে গড়িয়ে এল কোমল নিখাদ পর্যন্ত। সেই সুকুমার স্বরলহরী প্রত্যুষের অরুণবর্ণ মেঘের থেকে প্রতিফলিত হয়ে অত্যন্ত আরামের দোলা লাগালো অতিশয় মিঠে হাওয়ায়। তারই মৃদু হিল্লোলে দোলায়িত নৃত্যচ্ছন্দে রূপ নিয়ে দেখা দিল নারী। স্বর্গে শাঁখ বাজাতে লাগলেন বরুণদেবের ঘরনী।

বরুণদেবের ঘরনী কেন।

তিনি যে জলদেবী। নারী জাতটা বিশুদ্ধ জলীয়; তার কাঠিন্য নেই, চাঞ্চল্য আছে, চঞ্চল করেও। ভূব্যবস্থার গোড়াতেই জলরাশি। সেই জলে পানকৌড়ির পিঠে চ'ড়ে যত সব নারী ভেসে বেড়াতে লাগল সারিগান গাইতে গাইতে।

অতি চমৎকার। কিন্তু, তখন পানকৌড়ির সৃষ্টি হয়েছে না কি।

হয়েছে বই-কি। পাখিদের গলাতেই প্রথম সুর বাঁধা চলছিল। দুর্বলতার সঙ্গেই মাধুর্যের অনবচ্ছিন্ন যোগ, এই তত্ত্বটির প্রথম পরীক্ষা হল ঐ দুর্বল জীবগুলির ডানায় এবং কণ্ঠে। একটা কথা বলি, রাগ করবে না তো?

না রাগতে চেষ্টা করব।

যুগান্তরে পিতামহ যখন মানবসমাজে দুর্বলতাকেই মহিমান্বিত করবার কাজে কবিসৃষ্টি করেছিলেন, তখন সেই সৃষ্টির ছাঁচ পেয়েছিলেন এই পাখির থেকেই। সেদিন একটা সাহিত্যসম্মিলন গোছের ব্যাপার হল তাঁর সভামণ্ডপে; সভাপতিরূপে কবিদের আহ্বান ক'রে বলে দিলেন, তোমরা মনে মনে উড়তে থাকো শূন্যে, আর ছন্দে ছন্দে গান করো বিনা কারণে, যা-কিছু কঠিন তা তরল হয়ে যাক, যা-কিছু বলিষ্ঠ তা এলিয়ে পড়ে যাক আর্দ্র হয়ে।— কবিসম্রাট, আজ পর্যন্ত তুমি তাঁর কথা রক্ষা করে চলেছ।

চলতেই হবে যতদিন না ছাঁচ বদল হয়।

আধুনিক যুগ শুকিয়ে শক্ত হয়ে আসছে, মোমের ছাঁচ আর মিলবেই না। এখন সে দিন নেই যখন নারীদেবতার জলের বাসাটি দোল খেত পদ্মে, যখন মনোহর দুর্বলতায় পৃথিবী ছিল অতলে নিমগ্ন।

সৃষ্টি ঐ মোলায়েমের ছন্দে এসেই থামল না কেন।

গোটা কয়েক যুগ যেতে না যেতেই ধরণীদেবী আর্ত বাক্যে আবেদনপত্র পাঠালেন চতুর্মুখের দরবারে। বললেন, ললনাদের এই লকারবহুল লালিত্য আর তো সহ্য হয়

না। স্বয়ং নারীরাই করুণ কল্লোলে ঘোষণা করতে লাগল, ভালো লাগছে না। ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রশ্ন এল, কী ভালো লাগছে না। সুকুমারীরা বললে, বলতে পারি নে।— কী চাই।— কী চাই তারও সন্ধান পাচ্ছি নে।

ওদের মধ্যে পাড়াকুঁদুলিরও কি অভিব্যক্তি হয় নি। আগাগোড়াই কি সুবচনীর পালা।

কোঁদলের উপযুক্ত উপলক্ষ্যটি না থাকাতেই বাক্যবাণের টঙ্কার নিমগ্ন রইল অতলে, ঝাঁটার কাঠির অঙ্কুর স্থান পেল না অকূলে।

এত বড়ো দুঃখের সংবাদে চতুর্মুখ লজ্জিত হলেন বোধ করি?

লজ্জা ব'লে লজ্জা! চার মুণ্ড হেঁট হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন রাজহংসের কোটি-যোজন-জোড়া ডানাদুটোর 'পরে পুরো একটা ব্রহ্মযুগ। এ দিকে আদিকালের লোকবিশ্রুত সাধ্বী পরম-পানকৌড়িনী, শুভ্রতায় যিনি ব্রহ্মার পরমহংসের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধনায় হাজার বার ক'রে জলে ডুব দিয়ে দিয়ে চক্ষুঘর্ষণে পালকগুলোকে উটাসার ক'রে ফেলছিলেন, তিনি পর্যন্ত ব'লে উঠলেন, নির্মলতাই যেখানে নিরতিশয় সেখানে শুচিতার সবপ্রধান সুখটাই বাদ পড়ে, যথা, পরকে খোঁটা দেওয়া; শুক্লসত্ত্ব হবার মজাটাই থাকে না। প্রার্থনা করলেন, হে দেব, মলিনতা চাই, ভুরিপরিমাণে, অনতিবিলম্বে এবং প্রবল বেগে। বিধি তখন অস্থির হয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, ভুল হয়েছে, সংশোধন করতে হবে। বাস্ রে কী গলা। মনে হল মহাদেবের মহাবৃষভটার ঘাড়ে এসে পড়েছে মহাদেবীর মহাসিংহটা— অতিলৌকিক সিংহনাদে আর বৃষগর্জনে মিলে দ্যুলোকের নীলমণিমণ্ডিত ভিতটাতে দিলে ফাটল ধরিয়ে। মজার আশায় বিষ্ণুলোক থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন নারদ। তাঁর ঢেঁকির পিঠ থাবড়িয়ে বললেন, বাবা ঢেঁকি, শুনে রাখো ভাবীলোকের বিশ্ব-বেসুরের আদিমন্ত্র, যথাকালে ঘর ভাঙবার কাজে লাগবে। ক্ষুব্ধ ব্রহ্মার চার গলার ঐক্যতান আওয়াজের সঙ্গে যোগ দিলে দিঙ্‌নাগেরা শুঁড় তুলে, শব্দের ধাক্কায় দিগঙ্গনাদের বেণীবন্ধ খুলে গিয়ে আকাশ আগাগোড়া ঠাসা হয়ে গেল এলোচুলে— বোধ হল কালো-পাল-তোলা ব্যোমতরী ছুটল কালপুরুষের শ্মশানঘাটে।

হাজার হোক, সৃষ্টিকর্তা পুরুষ তো বটে।

পৌরুষ চাপা রইল না। তাঁর পিছনের দাড়িওয়ালা দুই মুখের চার নাসাফলক উঠল ফুলে, হাঁপিয়ে-ওঠা বিরাট হাপরের মতো। চার নাসারন্ধ্র থেকে একসঙ্গে ঝড় ছুটল আকাশের চার দিককে তাড়না ক'রে। ব্রহ্মাণ্ডে সেই প্রথম ছাড়া পেল দুর্জয়শক্তিমান বেসুরপ্রবাহ— গোঁ-গোঁ গাঁ-গাঁ হুড়্‌মুড়্ দুদ্দাড়্ গড়্‌গড়্ ঘড়্‌ঘড়্ ঘড়াঙ।

গন্ধর্বেরা কাঁধে তম্বুরা নিয়ে দলে দলে দৌড় দিল ইন্দ্রলোকের খিড়কির আঙিনায়, যেখানে শচীদেবী স্নানান্তে মন্দারকুঞ্জচ্ছায়ায় পারিজাতকেশরের ধূপধূমে চুল শুকোতে যান। ধরণীদেবী ভয়ে কম্পান্বিতা ; ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে ভাবতে লাগলেন, ভুল করেছি বা। সেই বেসুরো ঝড়ের উল্টোপাল্টা ধাক্কায় কামানের মুখের তপ্ত গোলার মতো ধক্‌ধক্ শব্দে বেরিয়ে পড়তে লাগল পুরুষ।— কী দাদা, চুপচাপ যে। কথাগুলো মনে লাগছে তো ?

লাগছে বই-কি। একেবারে দুম্‌দাম্ শব্দে লাগছে।

সৃষ্টির সর্বপ্রধান পর্বে বেসুরেরই রাজত্ব, এ কথাটা বুঝতে পেরেছ তো ?

বুঝিয়ে দাও-না।

তরল জলের কোমল একাধিপত্যকে ঢুঁ মেরে, গুঁতো মেরে, লাথি মেরে, কিল মেরে, ঘুষো মেরে, ধাক্কা মেরে, উঠে পড়তে লাগল ডাঙা তার পাথুরে নেড়া মুণ্ডুগুলো তুলে। ভূলোকের ইতিহাসে এইটেকেই সব চেয়ে বড়ো পর্ব ব'লে মান কি না।

মানি বই-কি।

এত কাল পরে বিধাতার পৌরুষ প্রকাশ পেল ডাঙায় ; পুরুষের স্বাক্ষর পড়ল সৃষ্টির শক্ত জমিতে। গোড়াতেই কী বীভৎস পালোয়ানি। কখনো আগুনে পোড়ানো, কখনো বরফে জমানো, কখনো ভূমিকম্পের জবর্দস্তির যোগে মাটিকে হাঁ করিয়ে কবিরাজি বড়ির মতো পাহাড়গুলোকে গিলিয়ে খাওয়ানো— এর মধ্যে মেয়েলি কিছু নেই, সে কথা মান কি না।

মানি বই-কি।

জলে ওঠে কলধ্বনি, হাওয়ায় বাঁশি বাজে সোঁ-সোঁ— কিন্তু বিচলিত ডাঙা যখন ডাক পাড়তে থাকে তখন ভরতের সংগীতশাস্ত্রটাকে পিণ্ডি পাকিয়ে দেয়। তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, কথাটা ভালো লাগছে না। কী ভাবছ বলেই ফেলো-না।

আমি ভাবছি, আর্ট্ মাত্রেরই একটা পুরাগত বনেদ আছে যাকে বলে ট্র্যাডিশন। তোমার বেসুরধ্বনির আর্ট্‌কে বনেদি ব'লে প্রমাণ করতে পার কি।

খুব পারি। তোমাদের সুরের মূল ট্র্যাডিশন মেয়ে-দেবতার বাদ্যযন্ত্রে। যদি বেসুরের উদ্ভব খুঁজতে চাও তবে সিধে চলে যাও পৌরাণিক মেয়েমহল পেরিয়ে পুরুষ দেবতা জটাধারীর দরজায়। কৈলাসে বীণাযন্ত্র বে-আইনি, উর্বশী সেখানে নাচের বায়না নেয় নি। যিনি সেখানে ভীষণ বেতালে তাণ্ডবনৃত্য করেন তাঁর নন্দীভৃঙ্গী ফুঁকতে থাকে শিঙে, তিনি বাজান বব‍ম্‌বম গালবাদ্য, আর কড়াকড় কড়াকড় ডমরু। ধ্বংসে পড়তে থাকে কৈলাসের পিণ্ড পিণ্ড পাথর। মহাবেসুরের আদি-উৎপত্তিটা স্পষ্ট হয়েছে তো ?

হয়েছে।

মনে রেখো সুরের হার, বেসুরের জিত, এই নিয়েই পালা রচনা হয়েছে পুরাণে দক্ষযজ্ঞের। একদা যজ্ঞসভায় জমা হয়েছিলেন দেবতারা— দুই কানে কুণ্ডল, দুই বাহুতে অঙ্গদ, গলায় মণিমাল্য। কী বাহার! ঋষিমুনিদের দেহ থেকে আলো পড়ছিল ঠিক্‌রিয়ে। কণ্ঠ থেকে উঠছিল অনিন্দ্যসুন্দর স্বরে সুমধুর সামগান, ত্রিভুবনের শরীর রোমাঞ্চিত। হঠাৎ দুড়্‌দাড়্‌ ক'রে এসে পড়ল বিশ্রীবিরূপের বেসুরি দল, শুচিসুন্দরের সৌকুমার্য মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড। কুশ্রীর কাছে সুশ্রীর হার, বেসুরের কাছে সুরের— পুরাণে এ কথা কীর্তিত হয়েছে কী আনন্দে, কী অট্টহাস্যে, অন্নদামঙ্গলের পাতা ওল্‌টালেই তা টের পাবে। এই তো দেখছ বেসুরের শাস্ত্রসম্মত ট্র্যাডিশন। ঐ-যে তুন্দিলতনু গজানন সর্বাগ্রে পেয়ে থাকেন পুজো, এটাই তো চোখ-ভোলানো দুর্বল ললিতকলার বিরুদ্ধে স্থূলতম প্রোটেস্‌ট্। বর্তমান যুগে ঐ গণেশের শুঁড়ই তো চিম্‌নি-মূর্তি ধরে পাশ্চাত্য পণ্যযজ্ঞশালায় বৃংহিতধ্বনি করছে। গণনায়কের এই কুৎসিত বেসুরের জোরেই কি ওরা সিদ্ধিলাভ করছে না। চিন্তা করে দেখো।

দেখব।

যখন করবে তখন এ কথাটাও ভেবে দেখো, বেসুরের অজেয় মাহাত্ম্য কঠিন ডাঙাতেই। সিংহ বল', ব্যাঘ্র বল', বলদ বল', যাদের সঙ্গে সগর্বে বীরপুরুষদের তুলনা করা হয় তারা কোনো কালে ওস্তাদজির কাছে গলা সাধে নি। এ কথায় তোমার সন্দেহ আছে কি।

তিলমাত্র না।

এমন-কি, ডাঙার অধম পশু যে গর্দভ, যত দুর্বল সে হোক-না, বীণাপাণির আসরে সে সাক্রেদি করতে যায় নি, এ কথা তার শত্রু মিত্র এক বাক্যে স্বীকার করবে।

তা করবে।

ঘোড়া তো পোষমানা জীব— লাথি মারবার যোগ্য খুর থাকা সত্ত্বেও নির্বিবাদে চাবুক খেয়ে মরে— তার উচিত ছিল, আস্তাবলে খাড়া দাঁড়িয়ে ঝিঁঝিঁটখাম্বাজ আলাপ করা। তার চিঁহিঁ হিঁহিঁ শব্দে সে রাশি রাশি সফেন চন্দ্রবিন্দুবর্ষণ করে বটে, তবু বেসুরো অনুনাসিকে সে ডাঙার সম্মান রক্ষা করতে ভোলে না। আর গজরাজ, তাঁর কথা বলাই বাহুল্য। পশুপতির কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত এই-সমস্ত স্থলচর জীবের মধ্যে কি একটাও কোকিলকণ্ঠ বের করতে পার। ঐ-যে তোমার বুল্‌ডগ্‌ ফ্রেডি চীৎকারে ঘুমছাড়া করে পাড়া, ওর গলায় দয়া ক'রে বা মজা ক'রে বিধাতা যদি দেন শ্যামা-দোয়েলের শিষ, ও তা হলে নিজের মধুর কণ্ঠের অসহ্য ধিক্কারে তোমার চল্‌তি মোটরের

তলায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এ আমি বাজি রাখতে পারি। আচ্ছা, সত্যি করে বলো, কালিঘাটের পাঁঠা যদি কর্কশ ভ্যাভ্যা না করে রামকেলি ভাঁজতে থাকে, তা হলে তুমি তাকে জগন্মাতার পবিত্র মন্দির থেকে দূর-দূর করে খেদিয়ে দেবে না কি।

নিশ্চয় দেব।

তা হলে বুঝতে পারছ আমরা যে সুমহৎ ব্রত নিয়েছি তার সার্থকতা। আমরা শক্ত ডাণ্ডার শাক্ত সন্তান, বেসুরমন্ত্রে দীক্ষিত। আধমরা দেশের চিকিৎসায় প্রয়োগ করতে চাই চরম মুষ্টিযোগ। জাগরণ চাই, বল চাই। জাগরণ শুরু হয়েছে পাড়ায়; প্রতিবেশীদের বলিষ্ঠতা দুম্‌দাম্‌ শব্দে দুর্দাম হচ্ছে, পৃষ্ঠদেশে তার প্রমাণ পাচ্ছে আমার চেলারা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোতোয়ালরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, টনক নড়েছে শাসন-কর্তাদের।

তোমার গুরু বলছেন কী।

তিনি মহানন্দে মগ্ন। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, বেসুরের নবযুগ এসেছে সমস্ত জগতে। সভ্য জাতরা আজ বলছে, বেসুরটাতেই বাস্তব, ওতেই পুঞ্জীভূত পৌরুষ, সুরের মেয়েমানুষিই দুর্বল করেছে সভ্যতা। ওদের শাসনকর্তা বলছে, জোর চাই, খৃস্টানি চাই নে। রাষ্ট্রবিধিতে বেসুর চড়ে যাচ্ছে পর্দায় পর্দায়। সেটা কি তোমার চোখে পড়ে নি, দাদা।

চোখে পড়বার দরকার কী, ভাই। পিঠে পড়ছে দমাদ্দম।

এ দিকে বেতালপঞ্চবিংশতিই চাপল সাহিত্যের ঘাড়ে। আনন্দ করো, বাংলাও ওদের পাছু ধরেছে।

সে তো দেখছি। পাছু ধরতে বাংলা কোনোদিন পিছপাও নয়।

এ দিকে গুরুর আদেশে বেসুরমন্ত্র সাধন করবার জন্যে আমরা চৈচৈসংঘ স্থাপন করেছি। দলে একজন কবি জুটেছে। তার চেহারা দেখে আশা হয়েছিল নবযুগ মূর্তিমান। রচনা দেখে ভুল ভাঙল, দেখি তোমারই চেলা। হাজার বার করে বলছি, ছন্দের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলো গদাঘাতে। বলছি, অর্থমনর্থং ভাবয়নিত্যম্। বুঝিয়ে দিলেম, কথার মানেটাকে সম্মান করায় কেবল দাসবুদ্ধির গাঁঠপড়া মনটাই ধরা পড়ে। ফল হচ্ছে না। বেচারার দোষ নেই— গলদঘর্ম হয়ে ওঠে, তবু ভদ্রলোকি কাব্যের ছাঁদ ঘোচাতে পারে না। ওকে রেখেছি পরীক্ষাধীনে। প্রথম নমুনা যেটা সমিতির কাছে দাখিল করেছে সেটা শুনিয়ে দিই। সুর দিয়ে শোনাতে পারব না।

সেই জন্যেই তোমাকে ঘরে ঢুকতে দিতে সাহস হয়।

তবে অবধান করো—

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
হৈহৈপাড়া ছেড়ে দূর দিয়ে যাইয়ে।
হেথা সা রে গা-মা পা'য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ,
শুদ্ধ কোমলগুলো বেবাক অশুদ্ধ—
অভেদ রাগিণীরাগে ভগিনী ও ভাইয়ে।
তার-ছেঁড়া তম্বুরা, তাল-কাটা বাজিয়ে—
দিনরাত বেধে যায় কাজিয়ে।
ঝাঁপতালে দাদ্‌রায় চৌতালে ধামারে
এলোমেলো ঘা মারে—
তেরে কেটে মেরে কেটে ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁইয়ে।

সভাসুদ্ধ একবাক্যে ব'লে উঠলুম, এ চলবে না। এখনো জাতের মায়া ছাড়তে পারে নি— শুচিবায়ুগ্রস্ত, নাড়ী দুর্বল। আমরা বেছন্দ চাই বেপরোয়া। কবির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া গেল। বললুম, আরও একবার কোমর বেঁধে লাগো, বাঙালি ছেলেদের কানে জোরের কথা হাতুড়ি পিটিয়ে চালিয়ে দাও, মনে রেখো পিটুনির চোটে ঠেলা মেরে জোর চালানো আজ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত— বাঙালি শুধু কি ঘুমিয়ে রয়। দেখলুম, লোকটার অন্তঃকরণ পাক খেয়ে উঠেছে। বলে উঠল, নয় নয়, কখনোই নয়। কলমটাকে কামড়ে ধ'রে ছুটে গিয়ে বসল টেবিলে। করজোড়ে গণেশকে বললে, তোমার কলাবধূকে পাঠিয়ে দাও অন্তঃপুরে সিদ্ধিদাতা। লাগাও তোমার শুঁড়ের আছাড় আমার মগজে, ভূমিকম্প লাগুক আমার মাতৃভাষায়, জোরের তপ্তপঙ্ক উৎসারিত হোক কলমের মুখে, দুঃশ্রাব্যের চোটে বাঙালির ছেলেকে দিক জাগিয়ে। কবি মিনিট পনেরো পরে বেরিয়ে চীৎকার স্বরে আবৃত্তি শুরু করলে। মুখ চোখ লাল, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, দশা পাবার দশা।—

মার্ মার্ মার্ রবে মার্ গাঁট্টা,
মারহাট্টা, ওরে মারহাট্টা।
ছুটে আয় দুদ্দাড়,
ভাঙ্ মাথা, ভাঙ্ হাড়,
কোথা তোর বাসা আছে হাড়কাট্টা।

আন্ ঘুষো, আন্ কিল,
আন্ ঢেলা, আন্ ঢিল,
নাক মুখ থেঁতো ক'রে দিক ঠাট্টা।
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম
দুম্‌দাম ধুমাধুম,
ভেঙে চুরে চুর্‌মার হোক খাট্টা।
ঘুম যাক, মারো কষে মাল্‌সাট্টা।
বাঁশিওলা চুপ রাও,
টান মেরে উপ্‌ড়াও
ধরা হতে ললিতলবঙ্গলতা।
বেল জুঁই চম্পক
দূরে দিক ঝম্পক,
উপবনে জমা হোক জঙ্গলতা।

আমি অস্থির হয়ে দুই হাত তুলে বললুম, থামো থামো, আর নয়। জয়দেবের ভূত এখনো কাঁধে বসে ছন্দের সার্কাস করছে, কানের দখল ছাড়ে নি। গয়াধামে ঐ লেখাটার যদি পিণ্ডি দিতে চাও তবে ওর উপরে হানো মুষল, ওটাকে ছিন্নকুটে নাস্তানাবুদ ক'রে তার উপরে কুটকি বৃষ্টি করো। কবি হাত জোড় ক'রে বললে, আমি পারব না, তুমি হাত লাগাও। আমি বললুম, ঐ-যে মারহাট্টা শব্দটা তোমার মাথায় এসেছে, ঐটেতেই তোমার ভবিষ্যতের আশা। 'চলন্তিকা' থেকে কথাটাকে ছিঁড়ে ফেলেছ, অর্থের শিকড়টা রয়ে গেল মাটির নীচে। শুধু ডাঁটা ধরে খাড়া রয়েছে ধ্বনির মারমূর্তি। এইবার সমস্তটাকে ছন্নছাড়া করে দিই— দেখো, কী মূর্তি বেরোয়—

হৈ রে হৈ মারহাট্টা
গালপাট্টা
আঁটসাট্টা।
* * *
হাড়কাট্টা ক্যা কোঁ কাঁচ্,
গড়্‌গড়্ গড়্‌গড়্।......
হুড়্‌দুড়্‌ম্ দুদ্দাড়্
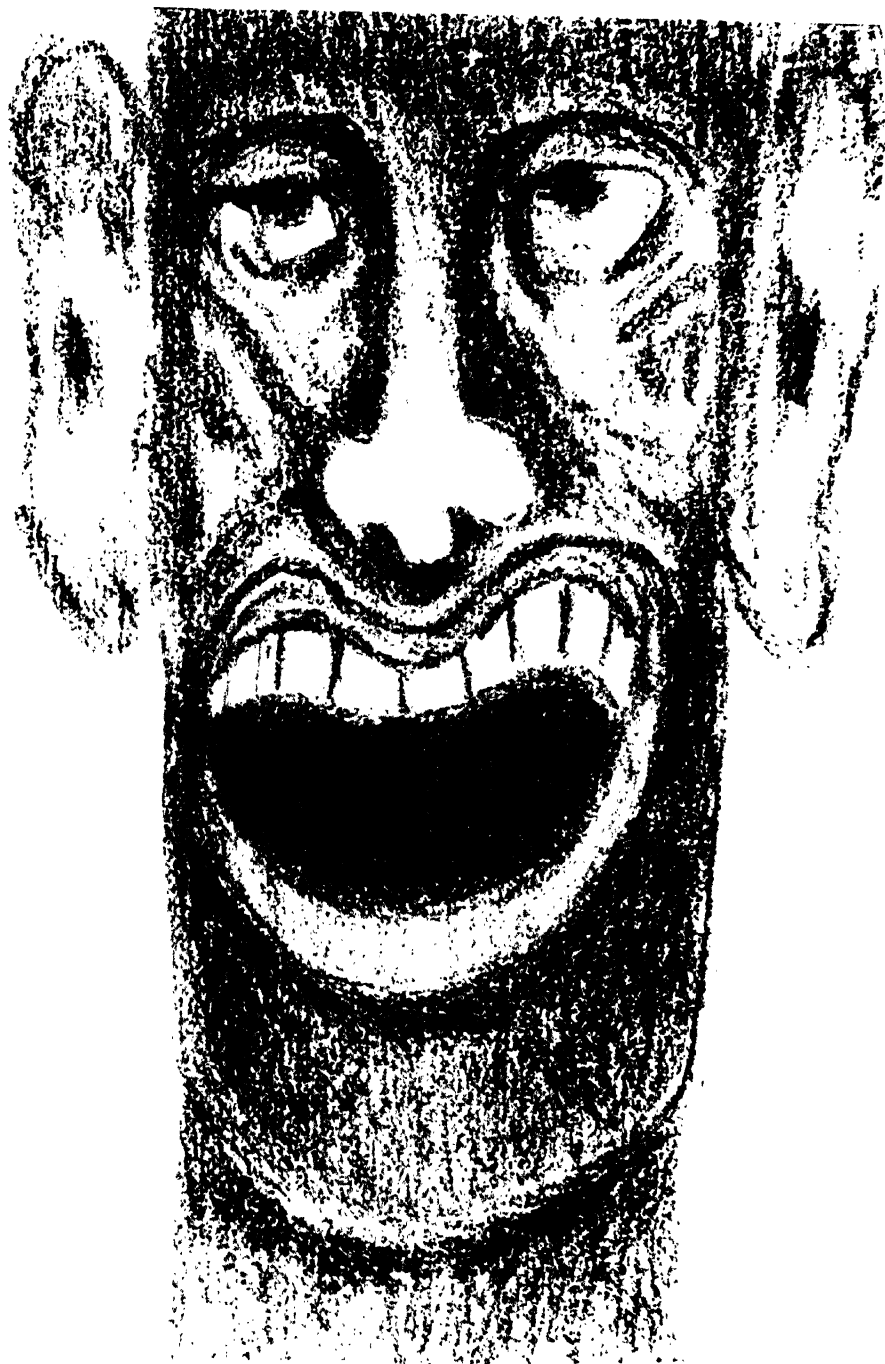
হৈ রে হৈ মারহাট্টা

শায় । অধ্যায় ১৩

ডাণ্ডা

ধপাং

ঠাণ্ডা

কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার

*　*　*

মড়্‌মড়্‌ মড়্‌মড়্‌

দুড়ুম······

হুড়্‌মুড়্‌ হুড়্‌মুড়্‌

দেউকিনন্দন

ঝঞ্ঝন পাণ্ডে

কুন্দন গাড়োয়ান

বাঁকে বিহারী

তড়্‌বড়্‌ তড়্‌বড়্‌ তড়্‌বড়্‌ তড়্‌বড়্‌

খট্‌খট্‌ দম্‌দম্‌

ধড়াধ্বড়

ধড়্‌ফড়্‌ ধড়্‌ফড়্‌

হো হো হু হু হা হা—

ট ঠ ড ঢ ড় ঢ় হঃ—

ইনফর্ণো হেডিস্‌ লিম্বো।

দাদা, তোমার নকল করি নি এই সার্টিফিকেট আমাকে দিতে হবে।

খুশি হয়ে দেব।

নবযুগের মহাকাব্য তোমাকে লিখতে হবে দাদা।

যদি পারি। বিষয়টা কী।

বেসুর-ছিড়িম্বের দিগ্বিজয়।

পুপুদিদিকে জিগেস করলুম, কেমন লাগল।

পুপু বললে, ধাঁধা লাগল।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, সুরাসুরের যুদ্ধে অসুরের জয়টা কেন আমার তেমন খারাপ লাগল না, তাই ভাবছি। বিশ্রী গোঁয়ারটার দিকেই রায় দিতে চাচ্ছে মন।

তার কারণ, তুমি স্ত্রীজাতীয়। অত্যাচারের মোহ কাটে নি। মার খেয়ে আনন্দ পাও, মারবার শক্তিটাকে প্রত্যক্ষ দেখে।

অত্যাচারের আক্রমণ পছন্দসই তা বলতে পারি নে— কিন্তু বীভৎসমূর্তিতে যে পৌরুষ ঘুষি উঁচিয়ে দাঁড়ায় তাকে মনে হয় সারাইস।

আমার মতটা বলি। দুঃশাসনের আস্ফালনটা পৌরুষ নয়, একেবারে উল্টো। আজ পর্যন্ত পুরুষই সৃষ্টি করেছে সুন্দর, লড়াই করেছে বেসুরের সঙ্গে। অসুর সেই পরিমাণেই জোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আজ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি।

১৩

পুপুদিদির মনে হল, আমি ওর মর্যাদাহানি করেছি। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। কেদারায় হেলান দিয়ে ও বসল আমার কাছে। অন্য দিকে মুখ করে বললে, তুমি আমাকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কেবল ছেলেমানুষি করছ, এতে তোমার কী সুখ।

আজকাল ওর কথা শুনে হাসতে সাহস হয় না। ভালোমানুষের মতো মুখ করেই বললুম, তোমার বয়সে পাকা বুদ্ধির প্রমাণ দিতেই তোমাদের আগ্রহ, আমার বয়সে ভাবতে ভালো লাগে যে মজ্জাটা এখনো আছে কাঁচা। সুযোগ পেলে মশগুল হয়ে ছেলেমানুষি করি বানিয়ে, হয়তো মানানসই হয় না।

তাই ব'লে আগাগোড়াই যদি ছেলেমানুষি কর, তা হলে সত্যিকার ছেলেমানুষিই হয় না। ছেলে বয়সের ভিতরে ভিতরে বড়ো বয়সের মিশল থাকে।

দিদি, এটা একটা কথার মতো কথা বলেছ। শিশুর কোমল দেহেও শক্ত হাড়ের গোড়াপত্তন থাকে। এ কথাটা আমি ভুলেছিলুম না কি।

তোমার বকুনি শুনে মনে হয়, যখন আমি ছোটো ছিলুম তখনকার দিনে এমন কিছুই ছিল না যা ব্যঙ্গ করবার নয় অথচ মজা করবার!

একটা উদাহরণ দেখাও।

মনে করো, আমাদের মাস্টারমশায়। তিনি অদ্ভুত ছিলেন, কিন্তু খাঁটি অদ্ভুত। তাই তাঁকে এত ভালো লাগত।

আচ্ছা, তাঁর কথাটা একটু ধরিয়ে দাও-না।

আজও তাঁর মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্লাসে বসতেন যেন আলগোছে, বইগুলো ছিল কণ্ঠস্থ। উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ ব'লে যেতেন, কথাগুলো যেন সদ্য ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। আমরা ক্লাসে উপস্থিত থাকব, মন দিয়ে পড়া শুনব, সে গরজটা সম্পূর্ণ আমাদেরই ব'লে তিনি মনে করতেন।

তিনি তোমাদের মুখ চেনবার সুযোগ পান নি বোধ হয়।

চেষ্টাও করেন নি। একদিন ছুটির দরবার নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি শশব্যস্ত হয়ে চৌকি ছেড়ে উঠে পড়লেন; মনে করলেন, আমি বুঝি যাকে বলে একজন রীতিমত মহিলা।

অমনতরো অভাবনীয় ভুল করা তাঁর অভ্যস্ত ছিল।

ছিল বই-কি। তোমার দাড়ি দেখে কোনোদিন তোমাকে নবাব খাঞ্জেখাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ব'লে ভুল করেন নি তো? না, ঠাট্টা নয়, তিনি তো তোমার বন্ধু ছিলেন, বলো-না তাঁর কথা।

তাঁর শত্রু কেউ ছিল না, কিন্তু সমজদার বন্ধু ছিলুম একমাত্র আমি। লোকে যখন তাঁর খ্যাপামির কথা রটাত তিনি আশ্চর্য হয়ে যেতেন। একদিন আমাকে এসে বললেন, সবাই বলছে, আমি ক্লাস পড়াই কিন্তু ক্লাসের দিকে তাকাই নে।

আমি বললুম, তোমার সাভাংরা তোমার বিদ্যের দোষ ধরতে পারে না, তোমার বুদ্ধির দোষ ধরে। তারা বলে, তোমার পড়ানোর ভুল হয় না কিন্তু পড়াচ্ছ যে সেইটেই ভুলে যাও।

পড়াচ্ছি যদি না ভুলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক মাস্টারিই করে যেতুম। পড়ানোটা নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে মনটা আইঢাই করে না।

জলচর জলে সাঁতার দিলে টের পাওয়া যায় না, স্থলচর দিলে সেটা খুবই মালুম হয়। তুমি অধ্যাপন-সরোবরের গভীর জলের মাছ।

আমি যদি ছাত্রদের দিকেই তাকাই তবে ক্লাসের দিকে মন দেব কী ক'রে।

তোমার সেই ক্লাসটা আছে কোথায়।

কোথাও না, সেইজন্যেই তো বাধা পাই নে। ছাত্ররাই যদি আমার চোখ জুড়ে বসে তা হলে ক্লাসের আত্মাপুরুষটা আড়ালে পড়ে যে।

'পড়ো বাবা আত্মারাম' এই বুঝি তোমার বুলি?

পড়াচ্ছি কই। আমার আত্মারামকেই টহল দেওয়াচ্ছি।

তোমার প্রণালীটা কিরকম।

গঙ্গাধারার ব'হে যাবার প্রণালী যেরকম। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও মরু, কোথাও ফসল, কোথাও শ্মশান, কোথাও শহর। এই নিয়ে গঙ্গামায়ীকে পদে পদে বিচার করতে যদি হত তা হলে আজ পর্যন্ত সগরসন্তানদের উদ্ধার হত না। যাদের যতটা হবার তাই হয়, বিধাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে মেঘের মতো শূন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা খেতে, ফসল ফলে খেত-অনুসারে। অসম্ভবকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করে সময় নষ্ট করি নে ব'লে হেড্‌মাস্টার হন ক্ষাপা। ঐ হেড্‌মাস্টারটিকেও অত্যন্ত সত্য ব'লে গণ্য করলে অত্যন্ত ভুল করা হয়।

পুপু বললে, ছাত্রীদের অনেকে মনে মনে খুঁৎখুঁৎ করত। তাদের লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন, এখানে যে মাস্টারটা আছে তাকে নেই ক'রে দিয়েছি, তোমাদের নিজের মনকেই বেড়ে ওঠবার জায়গা করে দেবার জন্যেই। আর-একদিন তিনি বলেছিলেন, মাস্টারিতে আমি হচ্ছি ক্লাসিক, আর সিধুবাবু রোমান্টিক। বল, বাঙলা, মাস্টারমশায়ের কথাটা আমরা কিছুই বুঝতে পারি নি।

মানে হচ্ছে, মাস্টার সমগ্র ক্লাসকেই দিতেন উপরে তুলে, আর সিধু ছাত্রদের একে একে নিজের কাঁধে চড়িয়ে গড়গাড়ি পার করত। বুঝেছ?

না, বোঝবার দরকার নেই। তুমি তাঁর কথা বলে যাও, মজা লাগে শুনতে।

আমারও লাগে, কেননা লোকটাকে বুঝতে লাগে দেরি। একদিন চীন-দার্শনিকের দোহাই দিয়ে মাস্টার আমাকে বললে, যে রাজ্যে রাজত্বটা নেই সেই রাজ্যই সকল রাজ্যের সেরা।

পুপে সগর্বে বললে, আমাদের ক্লাস সেরা ক্লাস ছিল সন্দেহ নেই।

আমি বললুম, তার কারণ, প্রমাণ সত্ত্বেও তোমার কম বুদ্ধির লক্ষণ মাস্টার লক্ষ্য করতেন না।

পুপে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, এটাকে কি গাল বলব না ঠাট্টা।

আমি বললুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে তোমার চুলটা টেনে দিই, এ ঠাট্টা সেই স্নিগ্ধ জাতের। এতে ক্যাসাস ব্যালাই অর্থাৎ 'অস্ত্র যুদ্ধ স্বয়ং মায়া'র ঘোষণা নেই।

পুপে বললে, মাস্টারমশায়ের ব্যবস্থা ছিল মজার রকমের। তিনি বলতেন,

তোমাদের নিজের খবর নিজেই রাখবে; তোমাদের খবরদারি করবার কাজ আমার নয়। প্রতিদিনের পড়ার ফল নিজেরাই রাখতুম; মার্কা দেবার নিয়ম জানা ছিল।

তার ফল কী হল।

মার্কা বরঞ্চ কম করেই দিতুম।

কখনো কি ঠকাতে না।

বাইরের কেউ মার্কা দেবার থাকলে তাকে ঠকাবার লোভ হতে পারত। নিজেকে ঠকানো বোকামি। বিশেষত তিনি তো দেখতেন না।

তার পরে?

তার পরে প্রত্যেক তিন মাস অন্তর নিজেরাই হিসেব ক'রে জানতুম উঠছি কি নাবছি।

তোমাদের কি সত্যযুগের হাইস্কুল, অত্যন্ত হাই? ফাঁকি দেবার লোকই বুঝি ছিল না?

মাস্টারমশায় ছিলেন অবিচলিত। তিনি বলতেন, সংসারে একদল লোক ফাঁকি দেবেই। কিন্তু, নিজের দায় যাদের নিজের হাতে, ওরই মধ্যে তারাই কম ফাঁকি দেয়। আমাদের শাস্তিও ছিল ঐ জাতের। বাইরে থেকে না। একদিন হাজিরি নাম-ডাক উপলক্ষ্যে প্রিয়সখার পর্সেণ্টেজ বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ফেলেছিলুম। তিনি বললেন, অশুচি হয়েছ, প্রায়শ্চিত্ত কোরো। তিনি জানতেও চাইতেন না করেছি কি না।

প্রায়শ্চিত্ত কি করেছিলে।

নিশ্চয়ই করেছিলুম।

অর্থাৎ, তোমার পাউডরের কৌটোটা ঐ প্রিয়সখীকে দান করেছিলে?

আমি কখখনো পাউডর মাখি নে।

বলতে চাও, তোমার ঐ মুখের রঙ তোমার খাস নিজেরই?

আর যাই হোক তোমার কাছ থেকে ধার নিই নি, মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

ছি, আমাকে নিয়ে তোমার দৃষ্টিতে যদি ভেদবুদ্ধি দেখা দেয় তা হলে জাতে দোষারোপ ঘটে। আমরা যে সবর্ণ— বর্ণভেদের জো কী। হাতের কাছে কবি থাকলে বলতেন, তোমার গায়ের রঙ ফুটে বেরিয়েছে ব্রহ্মার হাসি থেকে।

আর তোমার রঙ তাঁর ঠাট্টার হাসি থেকে।

এ'কেই বলে অন্যোন্যস্তুতি, ম্যুচুয়ল অ্যাড্‌মিরেশন। পিতামহের দুই জাতের হাসি

আছে—একটা দন্ত্য, একটা মূর্ধন্য। আমাতে লেগেছে মূর্ধন্য হাসি, ইংরেজিতে তাকে বলে উইট।

দাদামশায়, নিজের গুণগান তোমার মুখে কখনো বাধে না।

সেইটেই আমার প্রধান গুণ। আপনাকে যারা জানে আমি সেই অসামান্যের দলে।

মুখ খুলে গেছে, কিন্তু আর নয়, এবার থামো। মাস্টারমশায়ের কথা হচ্ছিল, এখন উঠে পড়ল তোমার নিজের কথা।

তাতে দোষ হয়েছে কী। বিষয়টা তো উপাদেয়, যাকে বলে ইণ্টারেস্টিঙ।

বিষয়টা সর্বদাই রয়েছে সামনে। তাকে তো স্মরণ করবার দরকার হয় না। তাকে যে ভোলাই শক্ত।

আচ্ছা, তা হলে মাস্টারের একটা বিশেষ পরিচয় দিই তোমাকে। এটা টুকে রাখবার যোগ্য। একদিন সন্ধেবেলায় মাস্টার জনকয়েক লোককে নেমন্তন্ন করেছিল। খবরটা তার মনে আছে কি না জানবার জন্যে সকাল-সকাল গেলুম তার বাড়িতে। সেবক কানাইয়ের সঙ্গে তার যে আলোচনাটা চলছিল, বলি সে কথাটা। কানাই বললে, জগদ্ধাত্রীপুজোর বাজারে গলদা চিংড়ির দাম চড়ে গেছে, তাই এনেছি ডিমওয়ালা কাঁকড়া।

মাস্টার ঈষৎ চিন্তিত হয়ে বলে, কাঁকড়া কী হবে।

ও বললে, লাউ দিয়ে ঝোল, সে তোফা হবে।

আমি বললুম, মাস্টার, গল্‌দা চিংড়ির উপর তোমার লোভ ছিল ?

মাস্টার বললে, ছিল বই-কি।

তা হলে তো লোভ সম্বরণ করতে হবে।

তা কেন। লোভটা প্রস্তুত হয়েই আছে, তাকে শাণ্ট্‌ ক'রে চালিয়ে দেব কাঁকড়ার লাইনে।

দেখছি, তোমাকে বিস্তর শাণ্ট্‌ করতে হয়।

মাস্টার বললে, কাঁকড়ার ঝোল তো খেয়েছি অনেকবার, সম্পূর্ণ মন দিই নি। এবার যখন দেখলুম কানাইয়ের জিভে জল এসেছে, তখন তার সিক্ত রসনার নির্দেশে খাবার সময় মনটা ঝুঁকে পড়বে কাঁকড়ার দিকে, রসটা পাব বেশি ক'রে। কাঁকড়ার ঝোলটাকে ও যেন লাল পেন্‌সিলে আণ্ডর্‌লাইন ক'রে দিলে ; ওটাকে ভালো করে মুখস্থ করবার পক্ষে সুবিধে হল আমার।

মাস্টার জিগেস করলে, আঁঠি-বাঁধা ওটা কী এনেছিস।

কানাই বললে, সজনের ডাঁটা।

মাস্টার সগর্বে আমার দিকে চেয়ে বললে, এই দেখো মজা। ও বাজারে যাবার সময় আমার মনে ছিল লাউডগা। ও বাজার থেকে ফিরে এল, আমি পেয়ে গেলুম সজনের ডাঁটা। হুকুম না করবার এই সুবিধে।

আমি বললুম, সজনের ডাঁটা না এনে ও যদি আনত চিচিঙ্গে?

মাস্টার জবাব দিলেন, তা হলে ক্ষণকালের জন্যে ভাবনা করতে হত। নাম জিনিসটার প্রভাব আছে। চিচিঙ্গে শব্দটা লোভজনক নয়। কিন্তু, কানাই যদি ওটা বিশেষ ক'রে বাছাই করে আনত, তা হলে সংস্কার কাটাবার একটা উপলক্ষ হত। জীবনে সব-প্রথমে ভেবে দেখবার সুযোগ হত 'দেখাই যাক-না'; হয়তো আবিষ্কার করতুম, ওটা মন্দ চলে না। চিচিঙ্গে পদার্থটার বিরুদ্ধে অন্ধ বিরাগ দূর হয়ে উপভোগ্যের সীমানা বেড়ে যেত। এমনি করেই কাব্যে কবিরা তো নিজের রুচিতে আমাদের রুচির প্রসার বাড়িয়ে দিচ্ছে। সৃষ্টিকে আণ্ডরলাইন করাই তাদের কাজ।

তোমার রুচির প্রসার বাড়াবার কাজে কানাইয়ের আরও এমন হাত আছে?

আছে বই-কি। ও না থাকলে পিড়িং শাকে আমি কোনোদিন মনোযোগই দিতুম না। শব্দটা আমাকে মারত ধাক্কা। সংসারে সংস্কারমুক্তিই তো অধিকারপ্রাপ্তি।

সেই মহৎ কাজে আছে তোমার কানাই।

তা মানতে হবে, ভাই। ওর ইচ্ছার যোগে আমার ইচ্ছার সংকীর্ণতা ঘুচে যায় প্রতিদিন। আমি একলা থাকলে এমনটা ঘটত না।

বুঝলুম, কিন্তু কানাইয়ের ইচ্ছার সীমানাটা—

বাড়িয়েছি বই-কি। পূর্ববঙ্গের লোক, কলাইয়ের ডালের নাম শুনতে পারত না। আজকাল হিঙ দিয়ে কলাইয়ের ডাল ও খাচ্ছে বেশ।

এমন সময়ে কানাইয়ের পুনঃপ্রবেশ। বললে, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আজ দইটা আনি নি। কবরেজমশায় বলেন, রাত্রে দইটা বারণ।

দইয়ের দাম চড়ে গেছে বললে বিরুক্তি হয়, এইজন্যে কবরেজমশায়কে পাড়তে হল। সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে, অল্প একটু আদার রস মিশিয়ে পাৎলা চা বানিয়ে দেব, শীতের রাত্রে উপকার দেবে।

আমি জিগেস করলেম, কী বল হে মাস্টার, আদা দিয়ে চা সবাইকে খাওয়াবে না কি।

সবাইকার কথা বলব কী করে। যারা খাবে তারা খাবে। হতে পারে উপকার। যারা খাবে না তাদের অপকার হবে না।

আমি বললুম, মাস্টার, চীন-দার্শনিকের উপদেশমতে তোমার গেরস্থালিতে মনিব নেই বুঝি?

না।

তা হলে চাকরই বা আছে কেন।

মনিব না থাকলেই চাকর স্বতই থাকে না।

তোমার এখানে চাকরে মনিবে বেমালুম মিশিয়ে গিয়ে একটা যৌগিক পদার্থ খাড়া হয়েছে বুঝি?

মাস্টার হেসে বললে, অক্সিজেন হাইড্রোজেনের দাহ মেজাজ ঘুচে গিয়ে দোঁহে মিলে একেবারে জল।

আমি বললুম, যদি বিয়ে করতে ভায়া, পাড়া ছেড়ে চীনের দর্শন দৌড় দিত। থেকেও থাকবে না, গিন্নি এমন নির্বিশেষ পদার্থ নয়। মুখের উপর ঘোমটা টেনেও তোমার সংসারে সে হত অতিশয় স্পষ্ট। তার রাজ্যে রাজত্বটা তার কটাক্ষে পেত দোলা; সর্বদা ধাক্কা লাগাত, কখনো পিঠে, কখনো বুকে।

মাস্টার বললে, তা হলে কর্তা রিটর্ন্ টিকিট না কিনেই দৌড় মারত ভেরাগাজি-খাঁয়ে, গিন্নিত্ব অন্তর্ধান করত ইস্টার্ন্ বেঙ্গল রেলের রাস্তা বেয়ে বাপের বাড়িতে।

মাস্টার মাঝে মাঝে হাসির কথা বলে, কিন্তু হাসে না।

পুপুদিদি বললে, আমাদের মাস্টারমশায়কে নিয়ে যদি গল্পের পালা বাঁধতে হয় কিরকম ক'রে বাঁধ।

তা হলে দশ লক্ষ বছর বাদ দিই।

তার মানে, আজগুবি গল্প বানাতে, অথচ আজকের দিনের বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীর শঙ্কা থাকত না।

কোনো সাহিত্যওয়ালা কখনো সাক্ষীর ভয় করে না। আসল কথা, আমার গল্পটা ফুটে উঠতে যুগান্তরের দরকার করবে। কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলি— পৃথিবী-সৃষ্টির গোড়াকার মালমসলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটা মোটা ভারী ভারী জিনিস। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের বে-আব্রুতা ছিল বহু যুগ ধ'রে। অবশেষে নরম মাটি পৃথিবীকে শ্যামল আস্তরণে ঢাকা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার যেন লজ্জা

রক্ষা করলে। তখন জীবজন্তু আসরে নামল স্তূপাকার হাড়মাংসের বোঝাই নিয়ে; মোটা মোটা বর্ম প'রে তারা দুশো পাঁচশো যোন অসভ্য লেজ টেনে টেনে বেড়াতে লাগল। তারা ছিল দর্শনধারী জীব। কিন্তু সেই মাংসবাহীর দল সৃষ্টিকর্তার পছন্দসই হল না। আবার চলল বহু যুগ ধরে নিষ্ঠুর পরীক্ষা। শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ। লেজের বাহুল্য গেল ঘুচে, হাড়মাংস হল পরিমিত, কড়া চামড়াটা নরম হয়ে এল ত্বকে। না রইল শিঙ, না রইল ক্ষুর, না রইল নখের জোর, চার পা এসে ঠেকল দুটিমাত্র পায়ে। বোঝা গেল, বিধাতা তাঁর হাতিয়ার চালাচ্ছেন সৃষ্টির যুগটাকে ক্রমশ সূক্ষ্ম করে আনবার জন্যে। স্থূলে সূক্ষ্মে জড়িয়ে আছে মানুষ। মনের সঙ্গে মাংসের চলেছে ঠেলাঠেলি, মারামারি। বিধাতা পুনশ্চ মাথা নাড়ছেন, উঁহু, হল না। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এটাও টিঁকবে না; এ আপনিই আপনাকে নিকেশ করে দেবে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে। যাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে। মাংস পড়বে ঝরে, মন উঠবে একেশ্বর হয়ে। সেই বিশুদ্ধ মনের যুগে তোমার মাস্টারমশায় বসেছেন শরীররিক্ত ক্লাসে। মনে করে দেখো, তাঁর শিক্ষা দেবার প্রণালী হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে মেলাতে থাকা মনের উপর মন বিছিয়ে, বাইরের বাধা নেই বললেই হয়।

স্থূল বুদ্ধির বাধাও নেই?

সেটা না থাকলে বুদ্ধি মাত্রই হয়ে পড়ে বেকার। ভালো-মন্দ বোকা-বুদ্ধিমানের ভেদ আছেই। চরিত্র আছে নানা রকমের। ভাবের বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য আছে। এখন তিনিই ভালো মাস্টার যিনি সেই অনেকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, শিক্ষা এখন অন্তরে অন্তরে।

দাদামশায়, ইস্কুলটা কোথায় আছে সেটা ঠিক মনে আনতে পারছি নে।

পৃথিবীতে তিনটে বাসা আছে— এক সমুদ্রতলে, আর-এক ভূতলে, আর আছে আকাশে যেখানে সূক্ষ্ম হাওয়া আর সূক্ষ্মতর আলো। এইখানটা আজ আছে খালি আগামী যুগের জন্যে।

তা হলে তোমার ক্লাস চলেছে সেই হাওয়ায় সেই আলোয়। কিন্তু, ছাত্রদের চেহারাটা কিরকম।

বুঝিয়ে বলা শক্ত, তাদের আকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আকারের আধার নেই।

তা হলে বোধ হচ্ছে নানা রঙের আলোয় তারা গড়া।

সেইটেই সম্ভব। তোমাদের বিজ্ঞান-মাস্টার তো সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বজগতে সূক্ষ্ম আলোর কণাই বহুরূপী হয়ে স্থূল রূপের ভান করছে। সেদিন আলো আপন আদিম সূক্ষ্মরূপেই প্রকাশ পাবে। ক্লাসে তোমরা সবাই আলো করে বসবে।

সেদিন ওটিন-স্নো-ওয়ালারা একেবারে দেউলে হয়ে গেছে।

দেউলে কেন, আলো হয়ে গেছে।

দেউলে হয়ে যাওয়ার মানেই তো আলো হয়ে যাওয়া।

আমি কোন্ রঙের আলো হব, দাদামশায়।

সোনার রঙের।

আর তুমি ?

আমি একেবারে বিশুদ্ধ রেডিয়ম।

সেদিন আলোয় আলোয় লড়াই হবে না তো ? ইলেক্‌ট্রন নিয়ে হবে না কি কাড়াকাড়ি।

ভাবনা ধরিয়ে দিলে। লীগ অফ লাইট্‌স্‌এর দরকার হবে বোধ হচ্ছে। ইলেক্‌ট্রন নিয়ে টানাটানির গুজব এখনি শুনতে পাচ্ছি।

ভালোই তো দাদামশায়। বীররসের কবিতা তোমার ভাষায় উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণিত হবে। ঐ যাঃ, ভাষা থাকবে তো ?

শব্দের ভাষা নিছক ভাবের ভাষায় গিয়ে পৌঁছবে, ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হবে না।

আচ্ছা, গান ?

গান হবে রঙের সংগত। বড়ো সহজ হবে না। তান যখন ঠিকরে পড়তে থাকবে, ঝলক মারবে আকাশের দিকে দিকে। তখনকার তানসেনরা দিগন্তে অরোরা বোরিয়ালিস বানিয়ে দেবে।

আর, তোমার গদ্যকাব্য কী হবে বলো তো।

তাতে লোহার ইলেক্‌ট্রনও মিশবে, আবার সোনারও।

সেদিনকার দিদিমা পছন্দ করবে না।

আমার ভরসা আছে সেদিনকার আধুনিক নাৎনিরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

তা হলে সেই আলোর যুগে তোমার নাৎনি হয়েই জন্মাব। এবারকার মতো দেহ-ধারিণীর 'পরে ধৈর্য রক্ষা কোরো। এখন চললুম সিনেমায়।

কিসের পালা।

বৈদেহীর বনবাস।

১৪

পরদিন সকালবেলায় প্রাতরাশে আমার নির্দেশমত পুপেদিদি নিয়ে এল পাথরের পাত্রে ছোলাভিজে এবং গুড়। বর্তমান যুগে পুরাকালীন গৌড়ীয় খাদ্যবিধির রেনেসাঁস-প্রবর্তনে লেগেছি। দিদিমণি জিগেস করলে, চা হবে কি।

আমি বললুম, না, খেজুর-রস।

দিদি বললে, আজ তোমার মুখখানা অমন দেখছি কেন। কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখেছ না কি।

আমি বললুম, স্বপ্নের ছায়া তো মনের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছেই— স্বপ্নও মিলিয়ে যায়, ছায়ারও চিহ্ন থাকে না। আজ তোমার ছেলেমানুষির একটা কথা বারবার মনে পড়ছে, ইচ্ছে করছে বলি।

বলো-না।

সেদিন লেখা বন্ধ ক'রে বারান্দায় বসে ছিলুম। তুমি ছিলে, সুকুমারও ছিল। সন্ধে হয়ে এল, রাস্তার বাতি জ্বালিয়ে গেল, আমি বসে বসে সত্যযুগের কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিলুম।

বানিয়ে বলছিলে! তার মানে ওটাকে অসত্যযুগ ক'রে তুলছিলে।

ওকে অসত্য বলে না। যে রশ্মি বেগ্‌নির সীমা পেরিয়ে গেছে তাকে দেখা যায় না ব'লেই সে মিথ্যে নয়, সেও আলো। ইতিহাসের সেই বেগ্‌নি-পেরোনো আলোতেই মানুষের সত্যযুগের সৃষ্টি। তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলব না, সে আল্‌ট্রা-ঐতিহাসিক।

আর তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে না। কী বলছিলে বলো।

আমি তোমাদের বলছিলুম, সত্যযুগে মানুষ বই প'ড়ে শিখত না, খবর শুনে জানত না, তাদের জানা ছিল হয়ে-উঠে জানা।

কী মানে হল বুঝতে পারছি নে।

একটু মন দিয়ে শোনো বলি। বোধ হয় তোমার বিশ্বাস তুমি আমাকে জান?

দৃঢ় বিশ্বাস।

জান, কিন্তু সে জানায় সাড়ে-পনেরো আনাই বাদ পড়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই তুমি যদি ভিতরে ভিতরে আমি হয়ে যেতে পারতে তা হলেই তোমার জানাটা সম্পূর্ণ সত্য হ'ত।

তা হলে তুমি বলতে চাও আমরা কিছুই জানি নে?

জানিই নে তো। সবাই মিলে ধরে নিয়েছি যে জানি, সেই আপোষে ধরে নেওয়ার উপরেই আমাদের কারবার।

কারবার তো ভালোই চলছে।

চলছে, কিন্তু এ সত্যযুগের চলা নয়। সেই কথাই তোমাদের বলছিলুম— সত্যযুগে মানুষ দেখার জানা জানত না, ছোঁওয়ার জানা জানত না, জানত একেবারে হওয়ার জানা।

মেয়েদের মন প্রত্যক্ষকে আঁকড়ে থাকে; ভেবেছিলেম আমার কথাটা অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকবে পুপুর কাছে, ভালোই লাগবে না। দেখলুম একটু ঔৎসুক্য হয়েছে। বললে, বেশ মজা।

একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেই বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, আজকাল তো সায়ান্স অনেক বুজ্‌রুগি করছে; মরা মানুষের গান শোনাচ্ছে, দূরের মানুষের চেহারা দেখাচ্ছে, আবার শুনছি সিসেকে সোনা করছে— তেমনি একদিন হয়তো এমন একটা বিদ্যুতের খেলা খেলাবে যে ইচ্ছে করলে একজন আর-একজনের মধ্যে মিলে যেতে পারবে।

অসম্ভব নয়। কিন্তু, তুমি তা হলে কী করবে। কিছুই লুকোতে পারবে না।

সর্বনাশ! সব মানুষেরই যে লুকোবার আছে অনেক।

লুকোনো আছে ব'লেই লুকোবার আছে। যদি কারও কিছুই লুকোনো না থাকত তা হলে দেখা-বিন্তি খেলার মতো সবার সব জেনেই লোকব্যবহার হ'ত।

কিন্তু, লজ্জার কথা যে অনেক আছে।

লজ্জার কথা সকলেরই প্রকাশ হলে লজ্জার ধার চলে যেত।

আচ্ছা, আমার কথা কী বলতে যাচ্ছিলে তুমি।

সেদিন আমি তোমাকে জিগেস করেছিলুম, তুমি যদি সত্যযুগে জন্মাতে তবে আপনাকে কী হয়ে দেখতে তোমার ইচ্ছে হত। তুমি ফস্ ক'রে বলে ফেললে, কাবুলি বেড়াল।

পুপে মস্ত ক্ষাপা হয়ে বলে উঠল, কখ্‌খনো না। তুমি বানিয়ে বলছ।

আমার সত্যযুগটা আমার বানানো হতে পারে কিন্তু তোমার মুখের কথাটা তোমারই। ওটা ফস্ করে আমি-হেন বাচালও বানাতে পারতুম না।

এর থেকে তুমি কি মনে করেছিলে আমি খুব বোকা।

এই মনে করেছিলুম যে, কাবুলি বেড়ালের উপর অত্যন্ত লোভ করেছিলে অথচ কাবুলি বেড়াল পাবার পথ তোমার ছিল না, তোমার বাবা বেড়াল জন্তটাকে দেখতে

পারতেন না। আমার মতে সত্যযুগে বেড়াল কিনতেও হ'ত না, পেতেও হ'ত না, ইচ্ছে করলেই বেড়াল হতে পারা যেত।

মানুষ ছিলুম, বেড়াল হলুম— এতে কী সুবিধেটা হল। তার চেয়ে যে বেড়াল কেনাও ভালো, না কিনতে পারলে না পাওয়া ভালো।

ঐ দেখো, সত্যযুগের মহিমাটা মনে ধারণা করতে পারছ না। সত্যযুগের পুপে আপনার সীমানা বাড়িয়ে দিত বেড়ালের মধ্যে। সীমানা লোপ করত না। তুমি তুমিও থাকতে, বেড়ালও হতে।

তোমার এ-সব কথার কোনো মানে নেই।

সত্যযুগের ভাষায় মানে আছে। সেদিন তো তোমাদের অধ্যাপক প্রমথবাবুর কাছে শুনেছিলে, আলোকের অণুপরমাণু বৃষ্টির মতো কণাবর্ষণও বটে আবার নদীর মতো তরঙ্গধারাও বটে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি, হয় এটা নয় ওটা; কিন্তু বিজ্ঞানের বুদ্ধিতে একই কালে দুটোকেই মেনে নেয়। তেমনি একই কালে তুমি পুপুও বটে, বেড়ালও বটে— এটা সত্যযুগের কথা।

দাদামশায়, যতই তোমার বয়স এগিয়ে চলছে ততই তোমার কথাগুলো অবোধ্য হয়ে উঠছে, তোমার কবিতারই মতো।

অবশেষে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যাব তারই পূর্বলক্ষণ।

সেদিনকার কথাটা কি ঐ কাবুলি বেড়ালের পরে আর এগোল না।

এগিয়েছিল। সুকুমার এক কোণে বসে ছিল, সে স্বপ্নে কথা বলার মতো ব'লে উঠল, আমার ইচ্ছে করে শালগাছ হয়ে দেখতে।

সুকুমারকে উপহসিত করবার সুযোগ পেলে তুমি খুশি হতে। ও শালগাছ হতে চায় শুনে তুমি তো হেসে অস্থির। ও চমকে উঠল লজ্জায়। কাজেই ও বেচারির পক্ষ নিয়ে আমি বললেম— দক্ষিণের হাওয়া দিল কোথা থেকে, গাছটার ডাল ছেয়ে গেল ফুলে, ওর মজ্জার ভিতর দিয়ে কী মায়ামন্ত্রের অদৃশ্য প্রবাহ বয়ে যায় যাতে ঐ রূপের গন্ধের ভোজবাজি চলতে থাকে। ভিতরের থেকে সেই আবেগটা জানতে ইচ্ছা করে বই-কি! গাছ না হতে পারলে বসন্তে গাছের সেই অপরিমিত রোমাঞ্চ অনুভব করব কী ক'রে।

আমার কথা শুনে সুকুমার উৎসাহিত হয়ে উঠল; বললে, আমার শোবার ঘরের জানলা থেকে যে শালগাছটা দেখা যায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার মাথাটা আমি দেখতে পাই; মনে হয়, ও স্বপ্ন দেখছে।

শালগাছ স্বপ্ন দেখছে শুনে বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলে, কী বোকার মতো কথা। বাধা দিয়ে ব'লে উঠলুম, শালগাছের সমস্ত জীবনটাই স্বপ্ন। ও স্বপ্নে চলে এসেছে বীজের থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে গাছে। পাতাগুলোই তো ওর স্বপ্নে-কওয়া কথা।

সুকুমারকে বললুম, সেদিন যখন সকালবেলায় ঘন মেঘ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিল আমি দেখলুম, তুমি উত্তরের বারান্দায় রেলিঙ ধ'রে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে। কী ভাবছিলে বলো দেখি।

সুকুমার বললে, জানি নে তো কী ভাবছিলুম।

আমি বললুম, সেই না-জানা ভাবনায় ভ'রে গিয়েছিল তোমার সমস্ত মন মেঘে-ভরা আকাশের মতো। সেইরকম গাছগুলো যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওদের মধ্যে যেন একটা না-জানা ভাব আছে। সেই ভাবনাই বর্ষায় মেঘের ছায়ায় নিবিড় হয়, শীতের সকালের রৌদ্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই না-জানা ভাবনার ভাষায় কচি পাতায় ওদের ডালে ডালে বকুনি জাগে, গান ওঠে ফুলের মঞ্জুরিতে।

আজও মনে পড়ে সুকুমারের চোখ দুটো কিরকম এতখানি হয়ে উঠল। সে বললে, আমি যদি গাছ হতে পারতুম তা হলে সেই বকুনি সির্‌সির্ করে আমার সমস্ত গা বেয়ে উঠত আকাশের মেঘের দিকে।

তুমি দেখলে সুকুমার আসরটা দখল করে নিচ্ছে। ওকে নেপথ্যে সরিয়ে তুমি এলে সামনে। কথা পাড়লে, আচ্ছা, দাদামশায়, এখন যদি সত্যযুগ আসে তুমি কী হতে চাও।

তোমার বিশ্বাস ছিল, আমি ম্যাস্টোডন কিম্বা মেগাথেরিয়ম হতে চাইব— কেননা, জীব-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রাণীদের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে এর কিছুদিন আগেই আলোচনা করেছি। তখন তরুণ পৃথিবীর হাড় ছিল কাঁচা, পাকা রকম ক'রে জমাট হয়ে ওঠে নি তার মহাদেশ, গাছপালাগুলোর চেহারা ছিল বিশ্বকর্তার প্রথম তুলির টানের। সেইদিনকার আদিম অরণ্যে সেইদিনকার অনিশ্চিত শীতগ্রীষ্মের অধিকারে এই-সব ভীমকায় জন্তুগুলোর জীবযাত্রা চলছে কিরকম করে তা স্পষ্টরূপে কল্পনা করতে পারছে না আজকের দিনের মানুষ, এই কথাটা তোমার শোনা ছিল আমার মুখে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম অভিযানের সেই মহাকাব্য-যুগটাকে স্পষ্ট ক'রে জানবার ব্যাকুলতা তুমি আমার কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলে। তাই আমি যদি হঠাৎ ব'লে উঠতুম 'সেকালের রোঁয়াওয়ালা চার-দাঁত-ওয়ালা হাতি হওয়া আমার ইচ্ছে', তা হলে তুমি খুশি হতে। তোমার কাবুলি বেড়াল হওয়ার থেকে এই ইচ্ছে বেশি দূরে পড়ত না, আমাকে তোমার দলে পেতে। হয়তো আমার মুখে

ঐ ইচ্ছেটাই ব্যক্ত হ'ত। কিন্তু, সুকুমারের কথাটা আমার মনকে টেনে নিয়েছিল অন্য দিকে।

পুপে বলে উঠল, জানি, জানি, সুকুমারদা'র সঙ্গেই তোমার মনের মিল ছিল বেশি।

আমি বললুম, তার একমাত্র কারণ, ও ছিল ছেলে, আমিও ছেলে হয়েই জন্মেছিলুম একদিন। ওর ভাবনার ছাঁচ ছিল আমারই শিশু ভাবনার ছাঁচে। তুমি সেদিন তোমার খেলার হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে ভাবী গৃহস্থালির যে স্বপ্নলোক বানিয়ে তুলে খুশি হতে সেটা দেখতে পেতুম একটু তফাত থেকে। তুমি তোমার খেলার খোকাকে কোলে ক'রে যখন নাচাতে, তার স্নেহের রসটা ষোলো আনা পাবার সাধ্য আমার ছিল না।

পুপু বললে, আচ্ছা, সে কথা থাক্‌, সেদিন তুমি কী হতে ইচ্ছে করছিলে বলো।

আমি হতে চেয়েছিলুম একখানা দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সকালবেলার প্রথম প্রহর, মাঘের শেষে হাওয়া হয়েছে উতলা, পুরোনো অশথগাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ছেলেমানুষের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব, উঁচুনিচু ডাঙায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে দলবাঁধা গাছ। সমস্তটার পিছনে খোলা আকাশ; সেই আকাশে একটা সুদূরতা, মনে হচ্ছে যেন অনেক দূরের ও-পার থেকে একটা ঘণ্টার ধ্বনি ক্ষীণতম হয়ে গেছে বাতাসে, যেন রোদ্‌দুরে মিশিয়ে দিয়েছে তার কথাটাকে : বেলা যায়।

তোমার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল, একখানা গাছ হওয়ার চেয়ে নদী বন আকাশ নিয়ে একখানা সমগ্র ভূদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কল্পনা তোমার কাছে অনেক বেশি সৃষ্টিছাড়া বোধ হল।

সুকুমার বললে, গাছপালা নদী সবটার উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে করতে আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে।

যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে। আপনাকে ভুলে গিয়ে আর-কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।

সুকুমার বললে, তুমি যেটা বললে ওটা কি ছবিতে এঁকেছ।

হাঁ, এঁকেছি।

আমিও একটা আঁকব।

সুকুমারের স্পর্ধার কথা শুনে তুমি বলে উঠলে, পারবে না কি তুমি আঁকতে।

আমি বললুম, ঠিক পারবে। আঁকা হয়ে গেলে ভাই, তোমারটা আমি নেব, আমারটা তোমাকে দেব।

সেদিন এই পর্যন্ত হল আমাদের আলাপ।

এইবার আমাদের সেদিনকার আসরের শেষ কথাটা ব'লে নিই। তুমি চলে গেলে তোমার পায়রাকে ধান খাওয়াতে। সুকুমার তখনো বসে বসে কী ভাবতে লাগল। আমি তাকে বললুম, তুমি কী ভাবছ বলব?

সুকুমার বললে, বলো দেখি।

তুমি ভেবে দেখছ, আরও কী হয়ে যেতে পারলে ভালো হয়— হয়তো প্রথম-মেঘ-করা আষাঢ়ের বৃষ্টি-ভেজা আকাশ, হয়তো পুজোর ছুটিতে ঘরমুখো পাল-তোলা পান্সিনৌকোখানি। এই উপলক্ষ্যে আমি তোমাকে আমার জীবনের একটা কথা বলি। তুমি জান ধীরুকে আমি কত ভালোবাসতুম। হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর পেলুম তার টাইফয়েড, সেই বিকেলেই চলে গেলুম মুন্সিগঞ্জে তাদের বাড়িতে। সাত দিন, সাত রাত কাটল। সেদিন ছিল অত্যন্ত গরম, রৌদ্র প্রখর। দূরে একটা কুকুর করুণ সুরে আর্তনাদ করে উঠছিল; শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। বিকেলে রোদ পড়ে আসছে, পশ্চিম দিক থেকে ডুমুরগাছের ছায়া পড়েছে বারান্দার উপরে। পাড়ার গয়লানি এসে জিগেস করলে, তোমাদের খোকাবাবু কেমন আছে গা। আমি বললুম, মাথার কষ্ট, গা-জ্বালা আজ কমেছে। যারা সেবা করছিল তারা আজ কেউ কেউ ছুটি নেবার অবকাশ পেলে। দুজন ডাক্তার রুগি দেখে বেরিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে কী পরামর্শ করলে; বুঝলেম, আশার লক্ষণ নয়। চুপ করে বসে রইলুম; মনে হল, কী হবে শুনে। সায়াহ্নের ছায়া ঘনিয়ে এল। দেখা গেল সামনের মহানিমগাছের মাথার উপরে সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দূরের রাস্তায় পাট-বোঝাই গোরুর গাড়ির শব্দ আর শোনা যায় না। সমস্ত আকাশটা যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছে। কী জানি কেন মনে মনে বলছি, পশ্চিম-আকাশ থেকে ঐ আসছে রাত্রিরূপিণী শান্তি, স্নিগ্ধ, কালো, স্তব্ধ। প্রতিদিনই তো আসে কিন্তু আজ এল বিশেষ একটি মূর্তি নিয়ে, স্পর্শ নিয়ে। চোখ বুজে সেই ধীরে-চলে-আসা রাত্রির আবির্ভাব আমার সমস্ত অঙ্গকে মনকে যেন আবৃত করে দিলে। মনে মনে বললুম, ওগো শান্তি, ওগো রাত্রি, তুমি আমার দিদি, আমার অনাদি কালের দিদি। দিন-অবসানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টেনে নাও তোমার বুকের কাছে আমার ধীরুভাইকে; তার সকল জ্বালা যাক জুড়িয়ে একেবারে।— দুই পহর পেরিয়ে গেল; একটা কান্নার ধ্বনি উঠল রোগীর শিয়রের কাছ থেকে; নিস্তব্ধ

রাস্তা বেয়ে গেল চলে ডাক্তারের গাড়ি তার ঘরে ফিরে। সেদিন আমার সমস্ত-মন-ভরা একটি রাত্রির রূপ দেখেছি ; আমি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলুম, পৃথিবী যেমন তার স্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে দেয় নিশীথের ধ্যানাবরণে।

কী জানি সুকুমারের কী মনে হল ; সে অধীর হয়ে বলে উঠল, আমাকে কিন্তু তোমার ঐ দিদি অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অমন চুপিচুপি নিয়ে যাবে না। পুজোর ছুটির দিনে যেদিন সকালে দশটা বাজবে, কাউকে ইস্কুলে যেতে হবে না, ছেলেরা সবাই যেদিন গেছে রথতলার মাঠে ব্যাট্‌বল খেলতে, সেইদিন আমি খেলার মতো করেই হঠাৎ মিলিয়ে যাব আকাশে ছুটির দিনের রোদ্‌দুরে।

শুনে আমি চুপ করে রইলুম ; কিছু বললুম না।

পুপেদিদি বললে, কাল থেকে সুকুমারদা'র কথা তুমি প্রায়ই বলছ। তার মধ্যে আমার উপরে একটুখানি খোঁচা থাকে। তুমি কি মনে কর তোমার ভালোবাসার অংশ নিয়ে সুকুমারদা'র সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার যে ঝগড়া ছিল সেটা এখনও আছে।

হয়তো একটুখানি আছে বা। সেইটেকে একেবারে ক্ষইয়ে দেব বলেই বারবার তার কথা তুলি। আরও একটুখানি কারণ আছে।

কী কারণ বলোই-না।

কিছুদিন আগে সুকুমারের বাবা ডাক্তার নিতাই এসেছিলেন আমার কাছে বিদায় নিতে।

কেন, বিদায় নিতে কেন।

তোমাকে বলব মনে করেছিলুম, বলা হয় নি। আজ বলি। নিতাই চাইলে সুকুমার আইন পড়ে, সুকুমার চাইলে সে ছবি আঁকা শেখে নন্দলালবাবুর কাছে। নিতাই বললে, ছবি আঁকা বিদ্যেয় আঙুল চলে, পেট চলে না।

সুকুমার বললে, আমার ছবির খিদে যত পেটের খিদে তত বেশি নয়।

নিতাই কিছু কড়া করে বললে, সে কথাটা তোমার প্রমাণ ক'রে দেবার দরকার হয় নি, পেট সহজেই চলে যাচ্ছে।

কথাটা বিশ্রী লাগল তার মনে, কিন্তু হেসে বললে, কথাটা সত্যি— এর প্রমাণ দেওয়া উচিত।

বাবা ভাবলে, এইবার ছেলে আইন পড়তে বসবে। সুকুমারের বরিশালের মাতামহ খেপা গোছের মানুষ ; সুকুমারের স্বভাবটা তাঁরই ছাঁচের, চেহারারও সাদৃশ্য আছে। দুজনের 'পরে দুজনের ভালোবাসা পরম বন্ধুর মতো। পরামর্শ হল দুজনে মিলে ; সুকুমার টাকা পেল কিছু, কখন চলে গেল বিলেতে কেউ জানে না। বাবাকে চিঠি লিখে গেল, আপনি চান না আমি ছবি আঁকা শিখি, শিখব না। আপনি চান অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করব, তাই করতে চললুম। যখন সমাপ্ত হবে প্রণাম করতে আসব, আশীর্বাদ করবেন।

কোন্ বিদ্যে শিখতে গেল কাউকে বলে নি। একটা ডায়ারি পাওয়া গেল তার ডেস্কে। তার থেকে বোঝা গেল, সে য়ুরোপে গেছে উড়ো জাহাজের মাঝিগিরি শিখতে। তার শেষ দিকটা কপি করে এনেছি। ও লিখছে—

মনে আছে, একদিন আমার ছত্রপতি পক্ষীরাজে চড়ে পুপুদিদিকে চন্দ্রলোক থেকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছিলুম আমাদের ছাদের এক ধার থেকে আর-এক ধারে। এবার চলেছি কলের পক্ষীরাজকে বাগ মানাতে। য়ুরোপে চন্দ্রলোকে যাবার আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই। একদিন আমি তার দাদামশায়ের দেখাদেখি যে ছবি এঁকেছিলুম, দেখে পুপুদিদি হেসেছিল। সেই দিন থেকে দশ বছর ধরে ছবি আঁকা অভ্যাস করেছি, কাউকে দেখাই নি। এখনকার আঁকা দুখানা ছবি রেখে গেলুম পুপের দাদামশায়ের জন্যে। একটা ছবি জল-স্থল-আকাশের একতান সংগত নিয়ে, আর-একটা আমার বরিশালের দাদামশায়ের। পুপের দাদামশায় ছবি দুটো দেখিয়ে পুপেদিদির সেদিনকার হাসি যদি ফিরিয়ে নিতে পারেন তো ভালোই, নইলে যেন ছিঁড়ে ফেলেন। আমার এবারকার যাত্রায় চন্দ্রলোকের মাঝপথেই পক্ষীরাজের পাখা ভাঙা অসম্ভব নয়। যদি ভাঙে তবে এক নিমেষে সত্যলোকে পৌঁছব, সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে একেবারে মিলে যাব পৃথিবীর সঙ্গে। যদি বেঁচে থাকি, আকাশের খেয়া-পারাপারে যদি নৈপুণ্য ঘটে, তা হলে একদিন পুপুদিদিকে নিয়ে শূন্যপথে পাড়ি দিয়ে আসব, মনে এই ইচ্ছে রইল। সত্যযুগে বোধ হয় ইচ্ছে আর ঘটনা একই ছিল। চেষ্টা করব ধ্যানযোগে ইচ্ছেকেই ঘটনা ব'লে ধরে নিতে। ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্বসৃষ্টির কোন্ কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।

পুপুদিদি ব্যাকুল হয়ে উঠে জিগেস করলে, সুকুমারদা'র এখনকার খবর কী।

আমি বললুম, সেইটেই পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তার বাবা বিলেতে সন্ধান করতে চলেছেন।

বিবর্ণ হয়ে গেল দিদির মুখ। আস্তে আস্তে উঠে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে।

আমি জানি, সুকুমারের আঁকা সেই ছেলেমানুষি পুপুদিদি আপন ডেস্কে লুকিয়ে রেখেছে।

আমি চশমাটা মুছে ফেলে চলে গেলুম সুকুমারদের বাড়ির ছাদে। সেই ভাঙা ছাতাটা সেখানে নেই, নেই সেই আতসবাজির আধপোড়া কাঠি।

গল্পসল্প

রবীন্দ্রনাথ ও দৌহিত্রী নন্দিতা

নন্দিতাকে

শেষ পারানির খেয়ায় তুমি
দিনশেষের নেয়ে
অনেক জানার থেকে এলে
নূতন-জানা মেয়ে।
ফেরাবে মুখ যাবে যখন
ঘাটের পারে আনি,
হয়তো হাতে দিয়ে যাবে
রাতের প্রদীপখানি।

১২ মার্চ ১৯৪১

আমারে পড়েছে আজ ডাক,
কথা কিছু বলতেই হবে।
বিশ্রাম করা পড়ে থাক্,
পার যদি মন দাও তবে।
ফিস্‌ফিস্ কর যদি ব'সে
খস্‌খস্ মেজেতে পা ঘ'ষে—
অভ্যাস হয়ে গেছে এ ব্যাঘাত যত,
যেন কিছু হয় নাই থাকি এইমতো।
গম্ভীর হয়ে করি প্রফেটের ভান ;
শুনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমান।

আমাদের কাল থেকে ভাই,
এ কালটা আছে বহু দূরে—
মোটা মোটা কথাগুলো তাই
ব'লে থাকি খুব মোটা সুরে
পিছনেতে লাগে নাকো কেউ
বৃদ্ধের প্রতি সম্মানে,
মারতে আসে না ছুটে কেউ
কথা যদি নাও লয় কানে।
বিধাতা পরিয়ে দিল আজ
নারদমুনির এই সাজ।
তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার ;
এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার।

তবে শোনো— মন্দ সে মন্দই,
হোক-না সে গুপিনাথ, হোক-না সে নন্দই।
আর শোনো— ভালো যে সে ভালো,
চোখ তার কটা হোক, হোক বা সে কালো।
অল্প যা বললেম দেখো তাই ভেবে,
পাছে ভুলে যাও তাই নোট লিখে নেবে।
যদি বল, পুরাতন এই কথাগুলো—
আমিও যে পুরাতন সেটা নাহি ভুলো।

৮ মার্চ ১৯৪০

২৬।২০

গল্পসল্প

বিজ্ঞানী

দাদামশায়, নীলমণিবাবুকে তোমার এত কেন ভালো লাগে আমি তো বুঝতে পারি নে।

এই প্রশ্নটা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত প্রশ্ন, এর ঠিক উত্তর কজন লোকে দিতে পারে।

তোমার হেঁয়ালি রাখো। অমন এলোমেলো আলুথালু অগোছালো লোককে মেয়েরা দেখতে পারে না।

ওটা তো হল সার্টিফিকেট, অর্থাৎ লোকটা খাঁটি পুরুষমানুষ।

জান না তুমি, উনি কথায় কথায় কী রকম হুলুস্থুল বাধিয়ে তোলেন। হাতের কাছে যেটা আছে সেটা ওঁর হাতেই ঠেকে না। সেটা উনি খুঁজে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়।

ভক্তি হচ্ছে তো লোকটার উপরে।

কেন শুনি।

হাতের কাছের জিনিসটাই যে সবচেয়ে দূরের সে কজন লোক জানে, অথচ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।

যেমন তুমি।

আমাকে তুমি খুঁজে পাও নি বুঝি?

খুঁজে পেলে যে রস মারা যেত, যত খুঁজছি তত অবাক হচ্ছি।

আবার তোমার হেঁয়ালি।

উপায় নেই। দিদি, আমার কাছে আজও তুমি সহজ নও, নিত্যি নূতন।

কুসমি দাদামশায়ের গলা জড়িয়ে বললে, দাদামশায় এটা কিন্তু শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, ও কথা থাক্। নীলুবাবুর বাড়িতে কাল কী রকম হুলুস্থুল বেধেছিল সে খবরটা বিধুমামার কাছে শোনো-না।

কী গো মামা, কী হয়েছিল শুনি।

অদ্ভুত— বিধুমামা বললেন, পাড়ায় রব উঠল নীলুবাবুর কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না ; খোঁজ পড়ে গেল মশারির চালে পর্যন্ত। ডেকে পাঠালে পাড়ার মাধুবাবুকে।

বললে, ওহে মাধু, আমার কলমটা ?

মাধুবাবু বললেন, জানলে খবর দিতুম।

ধোবাকে ডাক পড়ল, ডাক পড়ল হারু নাপিতকে। বাড়িসুদ্ধ সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন তার ভাগ্নে এসে বললে, কলম যে তোমার কানেই আছে গোঁজা।

যখন কোনো সন্দেহ রইল না তখন ভাগ্নের গালে এক চড় মেরে বললে, বোকা কোথাকার, যে কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না সেটাই খুঁজছি।

রান্নাঘর থেকে স্ত্রী এল বেরিয়ে ; বললে, বাড়ি মাথায় করেছ যে।

নীলু বললে, যে কলমটা চাই ঠিক সেই কলমটা খুঁজে পাচ্ছি না।

বউদি বললে, যেটা পেয়েছ সেই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেও, যেটা পাও নি সেটা কোথাও পাবে না।

নীলু বললে, অন্তত সেটা পাওয়া যেতে পারে কুণ্ডুদের দোকানে।

বউদি বললে, না গো, দোকানে সে মাল মেলে না।

নীলু বললে, তা হলে সেটা চুরি গিয়েছে।

তোমার সব জিনিসই তো চুরি গিয়েছে, যখন চোখে পাও না দেখতে। এখন চুপচাপ ক'রে এই কলম নিয়েই লেখো, আমাকেও কাজ করতে দাও। পাড়াসুদ্ধ অস্থির করে তুলেছ।

সামান্য একটা কলম পাব না কেন শুনি।

বিনি পয়সায় মেলে না ব'লে।

দেব টাকা— ওরে ভুতো।

আজ্ঞে—

টাকার থলিটা যে খুঁজে পাচ্ছি না।

ভুতো বললে, সেটা যে ছিল আপনার জামার পকেটে।

তাই নাকি।

পকেট খুঁজে দেখলে থলি আছে, থলিতে টাকা নেই। টাকা কোথায় গেল।

খুঁজতে বেরোল টাকা। ডেকে পাঠালে ধোবাকে।

আমার পকেটের থলি থেকে টাকা গেল কোথায়।

ধোবা বললে, আমি কী জানি। ও জামা আমি কাচি নি।

ডাকল ওসমান দর্জিকে।

আমার থলি থেকে টাকা গেল কোথায়।

ওসমান রেগে উঠে বললে, আছে আপনার লোহার সিন্দুকে।

জামাইবাড়ি থেকে স্ত্রী ফিরে এসে বললে, হয়েছে কী।

নীলমণি বললে, বাড়িতে ডাকাত পুষেছি। পকেট থেকে টাকা নিয়ে গেছে।

স্ত্রী বললে, হায় রে কপাল— সেদিন যে বাড়িওয়ালাকে বাড়িভাড়া শোধ করে দিলে ৩৫৲ টাকা।

তাই নাকি। বাড়িওয়ালা যে বাড়ি ছাড়বার জন্য আমাকে নোটিশ পাঠিয়েছিল।

তুমি ভাড়া শোধ করে দিয়েছিলে তার পরেই।

সে কী কথা। আমি যে বাদুড়বাগানে নিমচাঁদ হালদারের কাছে গিয়ে তার বাড়ি ভাড়া নিয়েছি।

স্ত্রী বললে, বাদুড়বাগান, সে আবার কোন্ চুলোয়।

নীলমণি বললে, রোসো, ভেবে দেখি। সে যে কোন্ গলিতে কোন্ নম্বরে তা তো মনে পড়ছে না। কিন্তু লোকটির সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গেছে— দেড় বছরের জন্য ভাড়া নিতে হবে।

স্ত্রী বললে, বেশ করেছ, এখন দুটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কে।

নীলমণি বললে, সেটা তো ভাবনার কথা নয়। আমি ভাবছি, কোন্ নম্বর, কোন্ গলি। আমার নোট্‌বুকে বাদুড়বাগানের বাসা লেখা আছে। কিন্তু, মনে পড়ছে না, গলিটার নম্বর লেখা আছে কি না।

তা, তোমার নোটবইটা বের করো-না।

মুশকিল হয়েছে যে, তিন দিন ধরে নোটবইটা খুঁজে পাচ্ছি না।

ভাগ্নে বললে, মামা, মনে নেই? সেটা যে তুমি দিদিকে দিয়েছিলে স্কুলের কপি লিখতে।

তোর দিদি কোথায় গেল।

তিনি তো গেছেন এলাহাবাদে মেসোমশায়ের বাড়িতে।

মুশকিলে ফেললি দেখছি। এখন কোথায় খুঁজে পাই, কোন্ গলি, কোন্ নম্বর।

এমন সময়ে এসে পড়ল নিমচাঁদ হালদারের কেরানি। সে বললে, বাদুড়বাগানের বাড়ির ভাড়া চাইতে এসেছি।

কোন্ বাড়ি।

সেই যে ১৩ নম্বর শিবু সমাদ্দারের গলি।

বাঁচা গেল, বাঁচা গেল। শুনছ, গিন্নি? ১৩ নম্বর শিবু সমাদ্দারের গলি। আর ভাবনা নেই।

শুনে আমার মাথামুণ্ডু হবে কী।

একটা ঠিকানা পাওয়া গেল।

সে তো পাওয়া গেল। এখন দুটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কেমন করে।

সে কথা পরে হবে। কিন্তু, বাড়ির নম্বর ১৩, গলির নাম শিবু সমাদ্দারের গলি।

কেরানির হাত ধরে বললে, ভায়া, বাঁচালে আমাকে। তোমার নাম কী বলো, আমি নোটবইয়ে লিখে রাখি।

পকেট চাপড়ে বললে, ঐ যা। নোটবই আছে এলাহাবাদে। মুখস্থ করে রাখব— ১৩ নম্বর, শিবু সমাদ্দারের গলি।

কুসমি বললে, এই কলম হারানো ব্যাপারটা তো সামান্য কথা। যেদিন ওঁর একপাটি চটিজুতো পাওয়া যাচ্ছিল না, সেদিন নীলমণিবাবুর ঘরে কী ধুন্ধুমারই বেধে গিয়েছিল। ওঁর স্ত্রী পণ করলেন, তিনি বাপের বাড়ি চলে যাবেন। চাকর-বাকররা একজোট হয়ে বললে, যদি একপাটি চটিজুতো নিয়ে তাদের সন্দেহ করা হয় তবে তারা কাজে ইস্তফা দেবে— তার উপরে সে চটিতে তিন তালি দেওয়া।

আমি বললুম, খবরটা আমারও কানে এসেছিল; দেখলেম ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গেলুম নীলুর বাড়িতে। বললুম, ভায়া, তোমার চটি হারিয়েছে?

সে বললে, দাদা, হারায় নি, চুরি গিয়েছে, আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

প্রমাণের কথা তুলতেই আমি ভয় পেয়ে গেলুম। লোকটা বৈজ্ঞানিক; একটা দুটো তিনটে ক'রে যখন প্রমাণ বের করতে থাকবে আমার নাওয়া-খাওয়া যাবে ঘুচে। আমাকে বলতে হল, নিশ্চয় চুরি গিয়েছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য চোরের আড্ডা কোথায় যে একপাটি চটি চুরি করে বেড়ায়, আমার জানতে ইচ্ছে করে।

নীলু বললে, ওইটেই হচ্ছে তর্কের বিষয়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, চামড়ার বাজার চড়ে গিয়েছে।

আমি দেখলুম, এর উপরে আর কথা চলবে না। বললুম, নীলুভাই, তুমি আসল কথাটি ধরতে পেরেছ। আজকালকার দিনে সবই বাজার নিয়ে। তাই আমি দেখেছি, মল্লিকদের দেউড়িতে পাঁচ-সাত দিন অন্তর মুচি আসে দরোয়ানজির নাগরা

জুতোয় সুকতলা বসাবার ভান ক'রে। তার দৃষ্টি রাস্তার লোকদের পায়ের দিকে।

তখনকার মতো তাকে আমি ঠাণ্ডা করেছিলুম। তার পরে সেই চটি বেরোল বিছানার নীচে থেকে। নীলুর পেয়ারের কুকুর সেটা নিয়ে আনন্দে ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে। নীলুর সবচেয়ে দুঃখ হল এই চটির সন্ধান পেয়ে, তার প্রমাণ গেল মারা।

কুসমি বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, মানুষ এতবড়ো বোকা হয় কী ক'রে।

আমি বললুম, অমন কথা বোলো না দিদি, অঙ্কশাস্ত্রে ও পণ্ডিত। অঙ্ক ক'ষে ক'ষে ওর বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম হয়েছে যে, সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না।

কুসমি নাক তুলে বললে, ওঁর অঙ্ক নিয়ে কী করছেন উনি।

আমি বললুম, আবিষ্কার। চটি কেন হারায় সেটা উনি সব সময়ে খুঁজে পান না, কিন্তু চাঁদের গ্রহণ লাগায় সিকি সেকেণ্ড্ দেরি কেন হয়, এ তাঁর অঙ্কের ডগায় ধরা পড়বেই। আজকাল তিনি প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন যে, জগতে গ্রহ তারা কোনো জিনিসই ঘুরছে না, তারা কেবলই লাফাচ্ছে। এ জগতে কোটি কোটি উচ্চিংড়ে ছাড়া পেয়েছে। এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে ওর খাতায়। আমি আর কথা কই নে, পাছে সেগুলো বের করতে থাকেন।

কুসমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে, ওঁর কি সবই অনাসৃষ্টি। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে উচ্চিংড়ের লাফ মেপে মেপে অঙ্ক কষছেন! এ না হলে ওঁর এমন দশা হবে কেন।

আমি বললুম, ওর ঘরকন্না ঘুরতে ঘুরতে চলবে না, তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে চলবে।

কুসমি বললে, এতক্ষণে বুঝলুম, এ লোকটার কলমই বা হারায় কেন, একপাটি চটিই বা পাওয়া যায় না কেন, আর তুমিই বা কেন ওঁকে এত ভালোবাস। যত পাগলের উপরে তোমার ভালোবাসা, আর তারাই তোমার চার দিকে এসে জোটে।

দেখো দিদি, সবশেষে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তুমি ভাবছ, নীলু লক্ষ্মীছাড়াকে নিয়ে তোমার বউদি রেগেই আছেন। গোপনে তোমাকে জানাচ্ছি— একেবারে তার উল্টো। ওর এই এলোমেলো আলুথালু ভাব দেখেই তিনি মুগ্ধ। আমারও সেই দশা।

*

* *

পাঁচটা না বাজতেই ভুলুরাম শর্মা সে
টেরিটিবাজারে গেল মনিবের ফরমাশে।
মরেছে অতুল মামা, আজি তারি শ্রাদ্ধের
জোগাড় করতে হবে নানাবিধ খাদ্যের।
বাবু বলে, ভুলো না হে, আরো চাই দরমা।
ভোলা কি সহজ কথা, বলে ভুলু শর্মা।
কাঁকরোল কিনে বসে কাঁচকলা কিনতে।
শাঁকআলু কচু কিনা পারে না সে চিনতে।
বকুনি খেয়েছে যেই মাছওলা মিন্সের,
তাড়াতাড়ি কিনে বসে কামরাঙা তিন সের।
বাবু বলে, কামরাঙা এতগুলো হবে কী।
ভুলু বলে, কানে আমি শুনি নাই তবে কি।
দেখলেম কিনছে যে ও পাড়ার সরকার,
বুঝলেম নিশ্চয় আছে এর দরকার।
কানে গুঁজে নিয়ে তার হিসাবের লেখনী
বাবু বলে, ফিরে দিয়ে এসো তুমি এখনি।
মনিবের হুকুমটা শুনল সে হাঁ ক'রে,
ফিরে দিতে চ'লে গেল কিছু দেরি না ক'রে।
বললে সে, দোকানিকে যা করেছি জব্দ—
ফলগুলো ফিরে নিতে করে নি টুঁ শব্দ।
বাবু কয় 'টাকা কই' টান দিয়ে তামাকে।
ভুলু বলে, সে কথাটা বল নি তো আমাকে।
এসেছি উজাড় ক'রে বাজারের ঝুড়িটা—
দোকানির মাসি ছিল, হেসে খুন বুড়িটা।

রাজার বাড়ি

কুসমি জিগেস করলে, দাদামশায়, ইরুমাসির বোধ হয় খুব বুদ্ধি ছিল।

ছিল বই-কি, তোর চেয়ে বেশি ছিল।

থমকে গেল কুসমি। অল্প একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ওঃ, তাই বুঝি তোমাকে এত ক'রে বশ করেছিলেন ?

তুই যে উল্টো কথা বললি, বুদ্ধি দিয়ে কেউ কাউকে বশ করে ?

তবে ?

করে অবুদ্ধি দিয়ে। সকলেরই মধ্যে এক জায়গায় বাসা ক'রে থাকে একটা বোকা, সেইখানে ভালো ক'রে বোকামি চালাতে পারলে মানুষকে বশ করা সহজ হয়। তাই তো ভালোবাসাকে বলে মন ভোলানো।

কেমন ক'রে করতে হয় বলো-না।

কিচ্ছু জানি নে, কী যে হয় সেই কথাই জানি, তাই তো বলতে যাচ্ছিলুম।

আচ্ছা, বলো।

আমার একটা কাঁচামি আছে, আমি সব-তাতেই অবাক হয়ে যাই ; ইরু ঐখানেই পেয়ে বসেছিল। সে আমাকে কথায় কথায় কেবল তাক লাগিয়ে দিত।

কিন্তু, ইরুমাসি তো তোমার চেয়ে ছোটো ছিলেন।

অন্তত বছর-খানেক ছোটো। কিন্তু আমি তার বয়সের নাগাল পেতুম না ; এমন করে আমাকে চালাতো, যেন আমার দুধে-দাঁত ওঠে নি। তার কাছে আমি হাঁ করেই থাকতুম।

ভারি মজা।

মজা বই-কি। তার কোনো-এক সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে ছট্‌ফটিয়ে তুলেছিল। কোনো ঠিকানা পাই নি। একমাত্র সেই জানত রাজার বাড়ির সন্ধান। আমি পড়তুম থার্ড্ নম্বর রীডার ; মাস্টার মশায়কে জিগ্‌গেস করেছি, মাস্টার মশায় হেসে আমার কান ধ'রে টেনে দিয়েছেন।

জিগ্‌গেস করেছি ইরুকে, রাজবাড়িটা কোথায় বলো-না।

সে চোখ দুটো এতখানি ক'রে বলত, এই বাড়িতেই।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতুম হাঁ ক'রে; বলতুম, এই বাড়িতেই!— কোন্‌খানে আমাকে দেখিয়ে দাও-না।

সে বলত, মন্তর না জানলে দেখবে কী করে।

আমি বলতুম, মন্তর আমাকে ব'লে দাও-না। আমি তোমাকে আমার কাঁচা-আম-কাটা ঝিনুকটা দেব।

সে বলত, মন্তর বলে দিতে মানা আছে।

আমি জিগ্‌গেস করতুম, ব'লে দিলে কী হয়।

সে কেবল বলত, ও বাবা!

কী যে হয় জানাই হল না।— তার ভঙ্গী দেখে গা শিউরে উঠত। ঠিক করেছিলুম, একদিন যখন ইরু রাজবাড়িতে যাবে আমি যাব লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছনে পিছনে। কিন্তু সে যেত রাজবাড়িতে আমি যখন যেতুম ইস্কুলে। একদিন জিগ্‌গেস করেছিলুম, অন্য সময়ে গেলে কী হয়। আবার সেই 'ও বাবা'। পীড়াপীড়ি করতে সাহসে কুলোত না।

আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে ইরু খুব একটা-কিছু মনে করত। হয়তো একদিন ইস্কুল থেকে আসতেই সে ব'লে উঠেছে, উঃ, সে কী পেল্লায় কাণ্ড।

ব্যস্ত হয়ে জিগেস করেছি, কী কাণ্ড।

সে বলেছে, বলব না।

ভালোই করত— কানে শুনতুম কী একটা কাণ্ড, মনে বরাবর রয়ে যেত পেল্লায় কাণ্ড।

ইরু গিয়েছে হন্তদন্তর মাঠে, যখন আমি ঘুমোতুম। সেখানে পক্ষীরাজ ঘোড়া চ'রে বেড়ায়, মানুষকে কাছে পেলেই সে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘের মধ্যে।

আমি হাততালি দিয়ে ব'লে উঠতুম, সে তো বেশ মজা।

সে বলত, মজা বই-কি! ও বাবা!

কী বিপদ ঘটতে পারত শোনা হয় নি, চুপ করে গেছি মুখের ভঙ্গী দেখে। ইরু দেখেছে পরীদের ঘরকন্না— সে বেশি দূরে নয়। আমাদের পুকুরের পুব পাড়িতে যে চীনেবট আছে তারই মোটা মোটা শিকড়গুলোর অন্ধকার ফাঁকে ফাঁকে। তাদের ফুল তুলে দিয়ে সে বশ করেছিল। তারা ফুলের মধু ছাড়া আর কিছু খায় না। ইরুর পরী-বাড়ি যাবার একমাত্র সময় ছিল দক্ষিণের বারান্দায় যখন নীলকমল মাস্টারের কাছে আমাদের পড়া করতে বসতে হত।

ইরুকে জিগ্‌গেস করতুম, অন্য সময়ে গেলে কী হয়।

ইরু বলত, পরীরা প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়।

আরও অনেক কিছু ছিল তার অবাক্-করা ঝুলিতে। কিন্তু, সবচেয়ে চমক লাগাতো সেই না-দেখা রাজবাড়িটা। সে যে একেবারে আমাদের বাড়িতেই, হয়তো আমার শোবার ঘরের পাশেই। কিন্তু, মন্তর জানি নে যে। ছুটির দিনে দুপুর বেলায় ইরুর সঙ্গে গেছি আমতলায়, কাঁচা আম পেড়ে দিয়েছি, দিয়েছি তাকে আমার বহুমূল্য ঘষা ঝিনুক। সে খোসা ছাড়িয়ে শুল্‌পো শাক দিয়ে বসে বসে খেয়েছে কাঁচা আম, কিন্তু মন্তরের কথা পাড়লেই বলে উঠেছে, ও বাবা!

তার পরে মন্তর গেল কোথায়, ইরু গেল শ্বশুরবাড়িতে, আমারও রাজবাড়ি খোঁজ করবার বয়স গেল পেরিয়ে— ঐ বাড়িটা রয়ে গেল গর-ঠিকানা। দূরের রাজবাড়ি অনেক দেখেছি, কিন্তু ঘরের কাছের রাজবাড়ি— ও বাবা!

*

* *

খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে, মুখটা শুকোনো।
মা বলে, দেখ্, ঐ আকাশে আছে লুকোনো।
খোকা শুধোয়, ঘরের থেকে গেল কী ক'রে।
মা বলে যে, ঐ তো মেঘের থলিটা ভ'রে
নিয়ে গেছে ইন্দ্রলোকের শাসন-ছেঁড়া ছেলে।
খোকা বলে, কখন এল, কখন খবর পেলে।
মা বললে, ওরা এল যখন সবাই মিলি
চৌধুরিদের আমবাগানে লুকিয়ে গিয়েছিলি,
যখন ওদের ফলগুলো সব করলি বেবাক নষ্ট।
মেঘলা দিনে আলো তখন ছিল নাকো পষ্ট—
গাছের ছায়ার চাদর দিয়ে এসেছে মুখ ঢেকে,
কেউ আমরা জানি নে তো কজন তারা কে কে।
কুকুরটাও ঘুমোচ্ছিল লেজেতে মুখ গুঁজে,
সেই সুযোগে চুপিচুপি গিয়েছে ঘর খুঁজে।
আমরা ভাবি, বাতাস বুঝি লাগল বাঁশের ডালে,
কাঠবেড়ালি ছুটছে বুঝি আটচালাটার চালে।

তখন দিঘির বাঁধ ছাপিয়ে ছুটছে মাঠে জল,
মাছ ধরতে হো হো রবে জুটছে মেয়ের দল।
তালের আগা ঝড়ের তাড়ায় শূন্যে মাথা কোটে,
মেঘের ডাকে জানলাগুলো খড়্‌খড়িয়ে ওঠে।
ভেবেছিলুম, শান্ত হয়ে পড়ছ ক্লাসে তুমি,
জানি নে তো কখন এমন শিখেছ দুষ্টুমি।
খোকা বলে, ঐ যে তোমার ইন্দ্রলোকের ছেলে—
তাদের কেন এমনতরো দুষ্টুমিতে পেলে।
ওরা যখন নেমে আসে আমবাগানের 'পরে—
ডাল ভাঙে আর ফল ছেঁড়ে আর কী কাণ্ডটাই করে।
আসল কথা, বাদল যেদিন বনে লাগায় দোল,
ডালে-পালায় লতায়-পাতায় বাধায় গণ্ডগোল—
সেদিন ওরা পড়াশুনোয় মন দিতে কি পারে,
সেদিন ছুটির মাতন লাগায় অভ্রনদীর ধারে।
তার পরে সব শান্ত হলে ফেরে আপন দেশে,
মা তাহাদের বকুনি দেয়, গল্প শোনায় শেষে।

বড়ো খবর

কুসমি বললে, তুমি যে বললে এখনকার কালের বড়ো বড়ো সব খবর তুমি আমাকে শোনাবে, নইলে আমার শিক্ষা হবে কী রকম ক'রে দাদামশায়।

দাদামশায় বললে, বড়ো খবরের ঝুলি বয়ে বেড়াবে কে বলো, তার মধ্যে যে বিস্তর রাবিশ।

সেগুলো বাদ দাও-না।

বাদ দিলে খুব অল্প একটু বাকি থাকবে, তখন তোমার মনে হবে ছোটো খবর। কিন্তু আসলে সেই খাঁটি খবর।

আমাকে খাঁটি খবরই দাও।

তাই দেব। তোমাকে যদি বি-এ পাশ করতে হ'ত, সব রাবিশই তোমার টেবিলে উঁচু করতে হত ; অনেক বাজে কথা, অনেক মিথ্যে কথা, টেনে বেড়াতে হত খাতা

বোঝাই ক'রে।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, এখনকার কালের একটা খুব বড়ো খবর দাও দেখি খুব ছোটো ক'রে, দেখি তোমার কেমন ক্ষমতা।

আচ্ছা শোনো।

শান্তিতে কাজ চলছিল।

মহাজনি নৌকোয় ঘোরতর ঝগড়া চলছে পালে আর দাঁড়ে। দাঁড়ের দল ঠক্‌ঠক্ করতে করতে মাঝির বিচারসভায় এসে উপস্থিত, বললে, এ তো আর সহ্য হয় না। ঐ যে তোমার অহংকেরে পাল, বুক ফুলিয়ে বলে আমাদের ছোটোলোক। কেননা, আমরা দিনে রাতে নীচের পাটাতনে বাঁধা থেকে জল ঠেলে ঠেলে চলি। আর উনি চলেন খেয়ালে, কারও হাতের ঠেলার তোয়াক্কা রাখেন না। সেইজন্যেই উনি হলেন বড়োলোক। তুমি ঠিক করে দাও কার কদর বেশি। আমরা যদি ছোটো লোক হই তবে জোট বেঁধে কাজে ইস্তফা দেব, দেখি তুমি নৌকো চালাও কী ক'রে।

মাঝি দেখলে বিপদ, দাঁড় ক'টাকে আড়ালে টেনে নিয়ে চুপিচুপি বললে, ওর কথায় কান দিয়ো না ভায়ারা। নিতান্ত ফাঁপা ভাষায় ও কথা ব'লে থাকে। তোমরা জোয়ানরা সব মরি-বাঁচি করে না খাটলে নৌকো একেবারে অচল। আর, ঐ পাল করেন ফাঁকা বাবুয়ানা উপরের মহলে। একটু ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে কি উনি কাজ বন্ধ করে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকেন নৌকোর চালের উপরে। তখন ফড়্‌ফড়ানি বন্ধ, সাড়াই পাওয়া যায় না। কিন্তু, সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে হাটে-ঘাটে তোমরাই আছ আমার ভরসা। ঐ নবাবির বোঝাটাকে যখন-তখন তোমাদের টেনে নিয়ে বেড়াতে হয়। কে বলে তোমাদের ছোটোলোক।

মাঝির ভয় হল, কথাগুলো পালের কানে উঠল বুঝি। সে এসে কানে কানে বললে, পাল-মশায়, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কে বলে যে তুমি নৌকো চালাও, সে তো মজুরের কর্ম। তুমি আপন ফূর্তিতে চল আর তোমার ইয়ারবক্সিরা তোমার ইশারায় পিছন-পিছন চলে। আবার ঝুলে পড় একটু যদি হাঁপ ধরে। ঐ দাঁড়গুলোর ইৎরমিতে তুমি কান দিয়ো না ভায়া, ওদের এমনি ক'ষে বেঁধে রেখেছি যে যতই ওদের ঝপ্‌ঝপানি থাক্-না কাজ না করে উপায় নেই।

শুনে পাল উঠল ফুলে। মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাই তুলতে লাগল।

কিন্তু, লক্ষণ ভালো নয়। দাঁড়গুলোর মজবুত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে, কোন্ দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে পালের গুমর। ধরা পড়বে

দাঁড়েই চালায় নৌকো— ঝড় হোক, ঝাপট হোক, উজান হোক, ভাঁটা হোক

কুসমি বললে, তোমার বড়ো খবর এইটুকু বই নয়? তুমি ঠাট্টা করছ।

দাদামশায় বললে, ঠাট্টার মতন এখন শোনাচ্ছে। দেখতে দেখতে একদিন বড়ো খবর বড়ো হয়েই উঠবে।

তখন?

তখন তোমার দাদামশায় ঐ দাঁড়গুলোর সঙ্গে তাল মেলানো অভ্যাস করতে বসবে।

আর, আমি?

যেখানে দাঁড় বড়ো বেশি কচ্‌কচ্‌ করে সেখানে দেবে একটু তেল।

দাদামশায় বললেন, খাঁটি খবর ছোটো হয়েই থাকে, যেমন বীজ। ডালপালা নিয়ে বড়ো গাছ আসে পরে। এখন বুঝেছ তো?

কুসমি বললে, হ্যাঁ, বুঝেছি।

মুখ দেখে বোঝা গেল, বোঝে নি। কিন্তু কুসমির একটা গুণ আছে, দাদামশায়ের কাছে ও সহজে মানতে চায় না যে ও কিছু বোঝে নি। ওর ইরুমাসির চেয়ে ও বুদ্ধিতে যে কম, এ কথাটা চাপা থাকাই ভালো।

*

*

পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি গোপন রেষারেষি,
মনে মনে তর্ক করে কার সমাদর বেশি।
দাঁড় ভাবে যে, পাঁচ-ছজনা গোলাম তাহার পাছে,
একলা কেবল বুড়ো মাঝি পালের তরে আছে।
পাল ভাবে যে, জলের সঙ্গে দাঁড়ের নিত্য বৈরি,
বাতাসকে তো বক্ষে নিতে আমি সদাই তৈরি;
আমার খাতির মিতার সঙ্গে ভালোবাসার জোরে,
ওরা মরে ঝেঁকে ঝেঁকেই শুধু লড়াই ক'রে—
ওঠে পড়ে পরের খেয়ে তাড়া,
আমি চলি আকাশ থেকে যখনি পাই সাড়া।

চণ্ডী

দিদি, তুমি বোধ হয় ও পাড়ার চণ্ডীবাবুকে জান?

জানি নে! তিনি যে ডাকসাইটে নিন্দুক।

বিধাতার কারখানায় খাঁটি জিনিস তৈরি হয় না, মিশল থাকেই। দৈবাৎ এক-একজন উৎরে যায়। চণ্ডী তারই সেরা নমুনা। ওর নিন্দুকতায় ভেজাল নেই। জান তো, আমি আর্টিস্‌ট্‌-মানুষ। সেইজন্যে এরকম খাঁটি জিনিস আমার দরবারে জুটিয়ে আনি। একেবারে লোকটা জীনিয়স বললেই হয়। একটা এড়িয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একদিন দেখি, অধ্যাপক অনিলের দরজায় কান দিয়ে কী শুনছে। আমি তাকে বললুম, অমন করে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছ কাকে হে।

সেটাই যদি জানতুম তা হলে তো কথাই ছিল না। চার দিকে চোখ কান খুলে রাখতে হয়, কাউকে বিশ্বাস করবার জো নেই— চোর-ছ্যাঁচড়ে দেশ ভরে গেল।

বলো কী হে।

শুনে অবাক হবেন, এই সেইদিন অমন আমার চাঁপার রঙের গামছাখানা আলনার উপর থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল।

বলো কী হে, গামছা!

আজ্ঞে হ্যাঁ, গামছা বই-কি। কোণটাতে একটুখানি ছেঁড়া ছিল, তা সেলাই করিয়ে নিয়েছিলুম।

তুমি অনিলবাবুর দরজার কাছে অমন ঘুর-ঘুর করছিলে কেন। পরের ছেঁড়া গামছা জোগাড় করবার রোগে তাঁকে ধরেছে নাকি।

আরে ছি ছি, ওঁরা হলেন বড়োলোক, গামছা কখনো চক্ষেও দেখেন নি। টার্কিস তোয়ালে না হলে ওঁর এক পা চলে না।

তা হলে?

আমি ভাবছিলুম, ওঁর পাওনা তো বেশি নয়। অথচ, এত বাবুআনা চলে কী ক'রে।

বোধ হয় ধার ক'রে!

আজকালকার বাজারে ধার তো সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ ফাঁকি।

আচ্ছা, তুমি পুলিশে খবর দিয়েছিলে নাকি।

না, তার দরকার হয় নি। সেটা বেরোল আমার স্ত্রীর ময়লা কাপড়ের ঝুড়ির ভিতর থেকে। কাউকেই বিশ্বাস করবার জো নেই।

কী বল তুমি, ওটা ঠিক জায়গাতেই তো ছিল।

আপনি সাদা লোক, আসল কথাটাই বুঝতে পারছেন না। আপনি জানেন তো আমার শালা কোচ্‌লুকে। কী রকম সে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। পয়সা জোটে কোথা থেকে। কাজটি করছেন তিনি, আর গিন্নি সেটাকে বেমালুম চাপা দিয়েছেন।

তুমি জানলে কী ক'রে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এ কি জানতে বাকি থাকে।

কখনো তাকে নিতে দেখেছ ?

যে এমন কাজ করে সে কি দেখিয়ে দেখিয়ে করে। এ দিকে দেখুন-না, পুলিশ আছে চোখ বুজে, তারা যে বখরা নিয়ে থাকে। এই-সব উৎপাত আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে দেখা দিয়েছেন ঐ আপনাদের গান্ধিমহারাজ।

এর মধ্যে তিনি আবার এলেন কোত্থেকে।

ঐ যে তাঁর অহিংস্র নীতি। ধড়াধড় না পিটলে চোরের চুরি রোগ কখনো সারে ? তিনি নিজে থাকেন কপ্‌নি প'রে। এক পয়সা সম্বল নেই। এ-সব লম্বাচওড়া বুলি তাঁকেই সাজে। আমরা গেরস্থ মানুষ, শুনে চক্ষু স্থির হয়ে যায়। এ দিকে আর-এক নতুন ফন্দি বেরিয়েছে জানেন তো ? ঐ যে যাকে আপনারা বলেন চাঁদা। তার মুনফা কম নয়। কিন্তু সেটা তলিয়ে যায় কোথায় তার হিসেব রাখে কে। মশায়, সেদিন আমারই ঘরে এসে উপস্থিত অনাথ-হাসপাতালের চাঁদা চাইতে। লজ্জা হয়, কী আর বলব। খাতা হাতে যিনি এসেছিলেন আপনারা সবাই তাঁকে জানেন। ডাক্তার — আর নাম করে কাজ নেই, কে আবার তাঁর কানে ওঠাবে। তিনি যে মাঝে মাঝে আসেন আমাদের ঘরে নাড়ী টিপতে। সিকি পয়সা দিতে হয় না বটে, তেমনি সিকি পয়সার ফলও পাই নে। তবু হাজার হোক, এম-বি তো বটে। এমনি হাল আমদের তাঁর চিকিৎসা যে রোগীরা তাঁর কাছে ঘেঁষে না। কাজেই টাকার টানাটানি হয় বই-কি।

ছি ছি, কী বলছ তুমি।

তা মশায়, আমি মুখফোড় মানুষ। সত্যিকথা আমার বাধে না। ওঁর মুখের সামনেই শুনিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু কী বলব, আমার ছেলেটাকে আদায়ের কাজে রেখে আমার মুখ বন্ধ করেছেন। তার কাছ থেকেও মাঝে মাঝে ইশারা পাই। দক্ষিণহস্ত বেশ চলছে ভালো। বুঝছেন তো ? আমাদের দেশে আজকালকার

ইংরিজি যে কী রকম অসহ্য, তার আর-একটা নমুনা আপনাকে শোনাই।

কী রকম।

আমাদের পাড়ায় আছে একটা গোমুখ্যু যাকে ওরা নাম দিয়েছে কবিবর। তাকে দিয়ে দেখুন আমার নামে কী লিখিয়েছে। ঘোর লাইবেল। নিন্দুকেরা দল পাকিয়েছে। পাড়ায় কান পাতবার জো নেই। খ্যাক্‌শিয়ালি ব'লে চেঁচাচ্ছে আমার পিছনে পিছনে। এত সাহস হত না যদি না এদের পিছনে থাকত নামজাদা মুরুব্বি সব গান্ধিজির চেলা।

দেখি দেখি কী লিখেছে। মন্দ হয় নি তো। লোকটার হাত দোরস্ত আছে।—

আলো যার মিট্‌মিটে,
স্বভাবটা খিট্‌খিটে,
বড়োকে করিতে চায় ছোটো,
সব ছবি ভুষো মেজে
কালো ক'রে নিজেকে যে
মনে করে ওস্তাদ পোটো,
বিধাতার অভিশাপে
ঘুরে মরে ঝোপে ঝাপে,
স্বভাবটা যার বদ্‌খেয়ালি,
খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ করে মিছে
সব তাতে দাঁত খিঁচে
তারে নাম দিব খ্যাক্‌শেয়ালি।

ও কী ও, আপনার দরজায় পুলিশ যে।

ব্যাপারটা কী।

চণ্ডীবাবুর ছেলের নামে কেস এসেছে।

হ্যাঁ, কিসের কেস।

অনাথ-হাসপাতালের চাঁদার টাকা তিনি ভেঙে বসেছেন।

মিথ্যে কথা। আগাগোড়া পুলিশের সাজানো। আপনি তো জানেন, আমার ছেলে একসময় আহার নিদ্রা ছেড়ে গান্ধির নামে দরজায় দরজায় চাঁদা ভিক্ষে করে বেড়িয়েছিল, সেই অবধি বরাবর তার উপর পুলিশের নজর লেগে আছে। কিছু না, এটা পলিটিক্যাল মামলা।

দাদামশায়, তোমার এই গল্পটা আমার একটুও ভালো লাগল না

*

* *

যেমন পাজি তেমনি বোকা,
গোবর-ভরা মাথা,
লোকটা কে-যে ভেবে পাচ্ছি না তা।
কবে যে কী বলেছিল ঠিক তা মনে নাই,
আচ্ছা ক'রে মুখের মতো জবাব দিতে চাই ;
কী যে জবাব, কার যে জবাব যদি মনে পড়ে—
প্রাণ ফিরে পাই ধড়ে।
হাতে পেলে দেওয়াই নাকে খত,
স্ত্রীর ছিঁড়ে দিই নথ।
রাস্কেল সে, পাজির অধম, শয়তান মিট্‌মিটে ;
দিনরাত্তির ইচ্ছে করে, ঘুঘু চরাই ভিটেয়।
বদ্‌মাশকে শিক্ষা দেব— অসহ্য এই ইচ্ছে
মনকে নাড়া দিচ্ছে।
লোকটা কে-যে পষ্ট তা নয়, এই কথাটাই পষ্ট—
অতি খারাপ, নিতান্তই সে নষ্ট।
পথের মোড়ে যদি পেতেম দেখা
মনের ঝালটা ঝেড়ে নিতেম যদি থাকত একা।
বুকটা ভ'রে অকথা সব জমে উঠছে ঢের,
লক্ষ্য মনে না পড়ে তো কাগজ করব বের,
যেখানে পাই নাম একটা করব নির্বাচন—
খালাস পাবে মন।

র

কাল তোমার ভালো লাগে নি চণ্ডীকে নিয়ে বকুনি। ও একটা ছবি মাত্র। কড়া কড়া লাইনে আঁকা, ওতে রস নাই। আজ তোমাকে কিছু বলব, সে সত্যিকার গল্প।

কুসমি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলো। তুমি তো সেদিন বললে, বরাবর মানুষ সত্যি খবর দিয়ে এসেছে গল্পের মধ্যে মুড়ে। একেবারে ময়রার দোকান বানিয়ে রেখেছে। সন্দেশের মধ্যে ছানাকে চেনাই যায় না।

দাদামশায় বললে, এ না হলে মানুষের দিন কাটত না। কত আরব্য-উপন্যাস, পারস্য-উপন্যাস, পঞ্চতন্ত্র, কত কী সাজানো হয়ে গেল। মানুষ অনেকখানি ছেলেমানুষ, তাকে রূপকথা দিয়ে ভোলাতে হয়। আর ভূমিকায় কাজ নেই। এবার শুরু করা যাক।—

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল না রাজরানী। রাজকন্যার সন্ধানে দূত গেল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ কোশল কাঞ্চী। তারা এসে খবর দেয় যে, মহারাজ, সে কী দেখলুম; কারু চোখের জলে মুক্তো ঝরে, কারু হাসিতে খ'সে পড়ে মানিক! কারু দেহ চাঁদের আলোয় গড়া, সে যেন পূর্ণিমারাত্রের স্বপ্ন।

রাজা শুনেই বুঝলেন, কথাগুলি বাড়িয়ে বলা, রাজার ভাগ্যে সত্য কথা জোটে না অনুচরদের মুখের থেকে। তিনি বললেন, আমি নিজে যাব দেখতে।

সেনাপতি বললেন, তবে ফৌজ ডাকি?

রাজা বললেন, লড়াই করতে যাচ্ছি নে।

মন্ত্রী বললেন, তবে পাত্রমিত্রদের খবর দিই?

রাজা বললেন, পাত্রমিত্রদের পছন্দ নিয়ে কন্যা দেখার কাজ চলে না।

তা হলে রাজহস্তী তৈরি করতে বলে দিই?

রাজা বললেন, আমার একজোড়া পা আছে।

সঙ্গে কয়জন যাবে পেয়াদা?

রাজা বললেন, যাবে আমার ছায়াটা।

আচ্ছা, তা হলে রাজবেশ পরুন— চুনিপান্নার হার, মানিক-লাগানো মুকুট, হীরে-লাগানো কাঁকন আর গজমোতির কানবালা।

রাজা বললেন, আমি রাজার সঙ সেজেই থাকি, এবার সাজব সন্নেসির সঙ।

মাথায় লাগালেন জটা, পরলেন কপনি, গায়ে মাখলেন ছাই, কপালে আঁকলেন তিলক আর হাতে নিলেন কমণ্ডলু আর বেলকাঠের দণ্ড। 'বোম্ বোম্ মহাদেব' ব'লে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশে দেশে রটে গেল— বাবা পিনাকীশ্বর নেমে এসেছেন হিমালয়ের গুহা থেকে, তাঁর একশো-পঁচিশ বছরের তপস্যা শেষ হল।

রাজা প্রথমে গেলেন অঙ্গদেশে। রাজকন্যা খবর পেয়ে বললেন, ডাকো আমার কাছে।

কন্যার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল, চুলের রঙ যেন ফিঙের পালক, চোখ দুটিতে হরিণের চমকে-ওঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোনো বাঁদি নিয়ে এল স্বর্ণচন্দন বাটা, তাতে মুখের রঙ হবে যেন চাঁপাফুলের মতো। কেউ বা আনল ভৃঙ্গলাঞ্ছন তেল, তাতে চুল হবে যেন পম্পাসরোবরের ঢেউ। কেউ বা আনল মাকড়সাজাল শাড়ি। কেউ বা আনল হাওয়াহাল্কা ওড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছুতেই কিছু মনের মতো হয় না। সন্নেসিকে বললেন, বাবা, আমাকে এমন চোখ-ভোলানো সাজের সন্ধান বলে দাও, যাতে রাজরাজেশ্বরের লেগে যায় ধাঁধা, কাজকর্ম যায় ঘুচে, কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিনরাত্রি কাটে।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছুই চাই না ?

রাজকন্যা বললেন, না, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, আচ্ছা, আমি তবে চললেম, সন্ধান মিললে নাহয় আবার দেখা দেব।

রাজা সেখান থেকে গেলেন বঙ্গদেশে। রাজকন্যা শুনলেন সন্ন্যাসীর নামডাক। প্রণাম করে বললেন, বাবা, আমাকে এমন কণ্ঠ দাও, যাতে আমার মুখের কথায় রাজরাজেশ্বরের কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা। আমার ছাড়া আর কারও কথা যেন তাঁর কানে না যায়। আমি যা বলাই তাই বলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই মন্ত্র আমি সন্ধান করতে বেরলুম। যদি পাই তবে ফিরে এসে দেখা হবে।

ব'লে তিনি গেলেন চলে।

গেলেন কলিঙ্গে। সেখানে আর-এক হাওয়া অন্দরমহলে। রাজকন্যা মন্ত্রণা করছেন কী ক'রে কাঞ্চী জয় ক'রে তাঁর সেনাপতি সেখানকার মহিষীর মাথা হেঁট করে দিতে পারে, আর কোশলের গুমরও তাঁর সহ্য হয় না। তার রাজলক্ষ্মীকে বাঁদি ক'রে

তাঁর পায়ে তেল দিতে লাগিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাবা, শুনেছি সহস্রঘ্নী অস্ত্র আছে শ্বেতদ্বীপে যার তেজে নগর গ্রাম সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি যাকে বিয়ে করব, আমি চাই তাঁর পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা হাত জোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা বন্দিনী হয়ে কেউ বা চামর দোলাবে, কেউ বা ছত্র ধ'রে থাকবে, আর কেউ বা আনবে তাঁর পানের বাটা।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছু চাই নে তোমার ?

রাজকন্যা বললেন, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই দেশ-জ্বালানো অস্ত্রের সন্ধানে চললেম।

সন্ন্যাসী গেলেন চলে। বললেন, ধিক্।

চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বনে। খুলে ফেললেন জটাজুট। ঝরনার জলে স্নান ক'রে গায়ের ছাই ফেললেন ধুয়ে। তখন বেলা প্রায় তিনপ্রহর। প্রখর রোদ, শরীর শ্রান্ত, ক্ষুধা প্রবল। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি। সেখানে একটি ছোটো চুলা বানিয়ে একটি মেয়ে শাকপাতা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্য। সে ছাগল চরায় বনে, সে মধু জড়ো করে রাজবাড়িতে জোগান দিতে। বেলা কেটে গেছে এই কাজে। এখন শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে শুরু করেছে রান্না। তার পরনের কাপড়খানি দাগপড়া, তার দুই হাতে দুটি শাঁখা, কানে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিষ। চোখ দুটি তার ভোমরার মতো কালো। স্নান ক'রে সে ভিজে চুল পিঠে মেলে দিয়েছে যেন বাদলশেষের রাত্তির।

রাজা বললেন, বড়ো খিদে পেয়েছে।

মেয়েটি বললে, একটু সবুর করুন, আমি অন্ন চড়িয়েছি, এখনি তৈরি হবে আপনার জন্য।

রাজা বললেন, আর, তুমি কী খাবে তা হলে।

সে বললে, আমি বনের মেয়ে, জানি কোথায় ফলমূল কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সেই আমার হবে ঢের। অতিথিকে অন্ন দিয়ে যে পুণ্যি হয় গরিবের ভাগ্যে তা তো সহজে জোটে না।

রাজা বললেন, তোমার আর কে আছে।

মেয়েটি বললে, আছেন আমার বুড়ো বাপ, বনের বাইরে তাঁর কুঁড়েঘর। আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। কাজ শেষ ক'রে কিছু খাবার নিয়ে যাই তাঁর কাছে। আমার জন্য তিনি পথ চেয়ে আছেন।

রাজা বললেন, তুমি অন্ন নিয়ে চলো, আর আমাকে দেখিয়ে দাও সেই-সব ফলমূল যা তুমি নিজে জড়ো করে খাও।

কন্যা বললে, আমার যে অপরাধ হবে।

রাজা বললেন, তুমি দেবতার আশীর্বাদ পাবে। তোমার কোনো ভয় নেই। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বাপের জন্য তৈরি অন্নের থালি সে মাথায় নিয়ে চলল। ফলমূল সংগ্রহ ক'রে দুজনে তাই খেয়ে নিলে। রাজা গিয়ে দেখলেন, বুড়ো বাপ কুঁড়েঘরের দরোজায় ব'সে।

সে বললে, মা, আজ দেরি হল কেন।

কন্যা বললে, বাবা, অতিথি এনেছি তোমার ঘরে।

বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার গরিবের ঘর, কী দিয়ে আমি অতিথিসেবা করব।

রাজা বললেন, আমি তো আর কিছুই চাই নে, পেয়েছি তোমার কন্যার হাতের সেবা। আজ আমি বিদায় নিলেম। আর-একদিন আসব।

সাত দিন সাত রাত্রি চলে গেল, এবার রাজা এলেন রাজবেশে। তাঁর অশ্ব রথ সমস্ত রইল বনের বাইরে। বৃদ্ধের পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করলেন; বললেন, আমি বিজয়পত্তনের রাজা। রানী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম দেশে বিদেশে। এতদিন পরে পেয়েছি— যদি তুমি আমায় দান কর, আর যদি কন্যা থাকেন রাজি।

বৃদ্ধের চোখ জলে ভরে গেল। এল রাজহস্তী— কাঠকুড়ানি মেয়েকে পাশে নিয়ে রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের রাজকন্যারা শুনে বললে, ছি!

*

* *

আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি
খিড়কির আঙিনায়, নামটি পিয়ারি।
আমি শুধালেম তারে, এসেছ কী লাগি।
সে কহিল চুপে চুপে, কিছু নাহি মাগি।
আমি চাই ভালো ক'রে চিনে রাখো মোরে,
আমার এ আলোটিতে মন লহো ভ'রে।

আমি যে তোমার দ্বারে করি আসাযাওয়া,
তাই হেথা বকুলের বনে দেয় হাওয়া।
যখন ফুটিয়া ওঠে যূথী বনময়
আমার আঁচলে আনি তার পরিচয়।
যেথা যত ফুল আছে বনে বনে ফোটে
আমার পরশ পেলে খুশি হয়ে ওঠে।
শুকতারা ওঠে ভোরে, তুমি থাক একা,
আমিই দেখাই তারে ঠিকমতো দেখা।
যখনি আমার শোনে নূপুরের ধ্বনি
ঘাসে ঘাসে শিহরণ জাগে-যে তখনি।
তোমার বাগানে সাজে ফুলের কেয়ারি,
কানাকানি করে তারা, এসেছে পিয়ারি।
অরুণের আভা লাগে সকালের মেঘে,
'এসেছে পিয়ারি' ব'লে বন ওঠে জেগে।
পূর্ণিমারাতে আসে ফাগুনের দোল,
'পিয়ারি পিয়ারি' রবে ওঠে উতরোল।
আমের মুকুলে হাওয়া মেতে ওঠে গ্রামে,
চারি দিকে বাঁশি বাজে পিয়ারির নামে।
শরতে ভরিয়া উঠে যমুনার বারি,
কূলে কূলে গেয়ে চলে 'পিয়ারি পিয়ারি'।

মুনশি

আচ্ছা দাদামশায়, তোমাদের সেই মুনশিজি এখন কোথায় আছেন।

এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারব তার সময়টা বুঝি কাছে এসেছে, তবু হয়তো কিছুদিন সবুর করতে হবে।

ফের অমন কথা যদি তুমি বল, তা হলে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করব।

সর্বনাশ, তার চেয়ে যে মিথ্যে কথা বলাও ভালো। তোমার দাদামশায় যখন স্কুল-পালানে ছেলে ছিল তখন মুনশিজি ছিলেন ঠিক কত বয়েস তা বলা শক্ত।

তিনি বুঝি পাগল ছিলেন ?

হাঁ, যেমন পাগল আমি।

তুমি আবার পাগল ? কী-যে বল তার ঠিক নেই।

তাঁর পাগলামির লক্ষণ শুনলে বুঝতে পারবে, আমার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল।

কী রকম শুনি।

যেমন তিনি বলতেন, জগতে তিনি অদ্বিতীয়। আমিও তাই বলি।

তুমি যা বল সে তো সত্যি কথা। কিন্তু, তিনি যা বলতেন তা যে মিথ্যে।

দেখো দিদি, সত্য কখনো সত্যই হয় না যদি সকলের সম্বন্ধেই সে না খাটে। বিধাতা লক্ষকোটি মানুষ বানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন। অধিকাংশ লোকে নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে ক'রে আরাম বোধ করে। দৈবাৎ এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে, তাদের জুড়ি নেই। মুনশি ছিলেন সেই জাতের মানুষ।

দাদামশায়, তুমি একটু স্পষ্ট ক'রে তাঁর কথা বলো-না, তোমার অর্ধেক কথা আমি বুঝতে পারি নে।

ক্রমে ক্রমে বলছি, একটু ধৈর্য ধরো।—

আমাদের বাড়িতে ছিলেন মুনশি, দাদাকে ফার্‌সি পড়াতেন। কাঠামোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি। হাড় কখানার উপরে একটা চামড়া ছিল লেগে, যেন মোমজামার মতো। দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারত না তাঁর ক্ষমতা কত। না পারবার হেতু এই যে, ক্ষমতার কথাটা জানতেন কেবল তিনি নিজে। পৃথিবীতে বড়ো বড়ো সব পালোয়ান কখনো জেতে কখনো হারে। কিন্তু, যে তালিম নিয়ে মুনশির ছিল গুমর তাতে তিনি কখনো কারও কাছে হটেন নি। তাঁর বিদ্যেতে কারও কাছে তিনি যে ছিলেন কম্‌তি সেটার নজির বাইরে থাকতে পারে, ছিল না তাঁর মনে। যদি হত ফার্‌সি পড়া বিদ্যে তা হলে কথাটা সহজে মেনে নিতে রাজি ছিল লোকে। কিন্তু, ফার্‌সির কথা পাড়লেই বলতেন, আরে ও কি একটা বিদ্যে। কিন্তু, তাঁর বিশ্বাস ছিল আপনার গানে। অথচ তাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চেঁচানি কিংবা কাঁদুনির জাতের, পাড়ার লোকে ছুটে আসত বাড়িতে কিছু বিপদ ঘটেছে মনে ক'রে। আমাদের বাড়িতে নামজাদা গাইয়ে ছিলেন বিষ্ণু তিনি কপাল চাপ্‌ড়িয়ে বলতেন, মুনশিজি আমার রুটি মারলেন দেখছি। বিষ্ণুর এই হতাশ ভাবখানা দেখে মুনশি বিশেষ দুঃখিত হতেন না— একটু মুচকে হাসতেন মাত্র। সবাই বলত,

মুনশিজি, কী গলাই ভগবান আপনাকে দিয়েছেন। খোশনামটা মুনশি নিজের পাওনা বলেই টেঁকে গুঁজতেন। এই তো গেল গান।

আরও একটা বিদ্যে মুনশির দখলে ছিল। তারও সমজদার পাওয়া যেত না। ইংরেজি ভাষায় কোনো হাড়পাকা ইংরেজও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। একবার বক্তৃতার আসরে নাবলে সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জেকে দেশছাড়া করতে পারতেন কেবল যদি ইচ্ছে করতেন। কোনোদিন তিনি ইচ্ছে করেন নি। বিষ্ণুর কৃপায় বেঁচে গেল, সুরেন্দ্রনাথের নামও। কেবল কথাটা উঠলে মুনশি একটু মুচকে হাসতেন।

কিন্তু, মুনশির ইংরেজি ভাষায় দখল নিয়ে আমাদের একটা পাপকর্মের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। কথাটা খুলে বলি। তখন আমরা পড়তুম বেঙ্গল একাডেমিতে, ডিক্রুজ সাহেব ছিলেন ইস্কুলের মালিক। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, আমাদের পড়াশুনা কোনোকালেই হবে না। কিন্তু, ভাবনা কী। আমাদের বিদ্যেও চাই নে, বুদ্ধিও চাই নে, আমাদের আছে পৈতৃক সম্পত্তি। তবুও তাঁর ইস্কুল থেকে ছুটি চুরি করে নিতে হলে তার চলতি নিয়মটা মানতে হত। কর্তাদের চিঠিতে ছুটির দাবির কারণ দেখাতে হত। সে চিঠি যত বড়ো জালই হোক, ডিক্রুজ সাহেব চোখ বুজে দিতেন ছুটি। মাইনের পাওনাতে লোকসান না ঘটলে তাঁর ভাবনা ছিল না। মুনশিকে জানাতুম ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। মুনশি মুখ টিপে হাসতেন। হবে না? বাস্‌ রে, তাঁর ইংরেজি ভাষার কী জোর। সে ইংরেজি কেবল ব্যাকরণের ঠেলায় হাইকোর্টের জজের রায় ঘুরিয়ে দিতে পারত। আমরা বলতুম, নিশ্চয়! হাইকোর্টের জজের কাছে কোনোদিন তাঁকে কলম পেশ করতে হয় নি।

কিন্তু, সবচেয়ে তাঁর জাঁক ছিল লাঠি-খেলার কারদানি নিয়ে। আমাদের বাড়ির উঠোনে রোদ্দুর পড়লেই তাঁর খেলা শুরু হত। সে খেলা ছিল নিজের ছায়াটার সঙ্গে। হুংকার দিয়ে ঘা লাগাতেন কখনো ছায়াটার পায়ে, কখনো তার ঘাড়ে, কখনো তার মাথায়। আর, মুখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখতেন চার দিকে যারা জড়ো হত তাদের দিকে। সবাই বলত, সাবাস্‌! বলত, ছায়াটা যে বর্তিয়ে আছে সে ছায়ার বাপের ভাগ্যি। এই থেকে একটা কথা শেখা যায় যে, ছায়ার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখনো হার হয় না। আর-একটা কথা এই যে, নিজের মনে যদি জানি 'জিতেছি' তা হলে সে জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শেষ দিন পর্যন্ত মুনশিজির জিত রইল। সবাই বলত 'সাবাস্‌', আর মুনশি মুখ টিপে হাসতেন।

দিদি, এখন বুঝতে পারছ, ওর পাগলামির সঙ্গে আমার মিল কোথায়। আমিও

ছায়ার সঙ্গে লড়াই করি! সে লড়াইয়ে আমি যে জিতি তার কোনো সন্দেহ থাকে না। ইতিহাসে ছায়ার লড়াইকে সত্যি লড়াই ব'লে বর্ণনা করে।

*

* *

ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের,
সতুর মনটা ছিল নেপোলিয়নের।
ইংরেজ ফৌজের সাথে ঘার রুধে
দু-বেলা লড়াই হত দুই চোখ মুদে।
ঘোড়া টগ্‌বগ্‌ ছোটে, ধুলা যায় উড়ে,
বাঙালি সৈন্যদল চলে মাঠ জুড়ে।
ইংরেজ দুদ্দাড় কোথা দেয় ছুট,
কোন্‌ দূরে মস্‌মস্‌ করে তার বুট।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনে বারে বারে,
দেশে তার জয়রব ওঠে চারি ধারে।
যখন হাত-পা নেড়ে করে বক্তৃতা
কী যে ইংরেজি ফোটে বলা যায় কি তা।
ক্লাসে কথা বেরোয় না, গলা তার ভাঙা,
প্রশ্ন শুধালে মুখ হয়ে ওঠে রাঙা।
কাহিল চেহারা তার, অতি মুখচোরা—
রোজ পেন্‌সিল তার কেড়ে নেয় গোরা।
খবরের কাগজের ছেঁড়া ছবি কেটে
খাতা সে বানিয়েছিল আঠা দিয়ে এঁটে।
রোজ তার পাতাগুলি দেখত সে নেড়ে,
ভুদু একদিন সেটা নিয়ে গেল কেড়ে।
কালি দিয়ে গাধা লিখে পিঠে দিয়ে ছাপ
হাততালি দিতে দিতে চ্যাচায় প্রতাপ।
বাহিরের ব্যবহারে হারে সে সদাই,
ভিতরের ছবিটাতে জিত ছাড়া নাই।

ম্যাজিশিয়ান

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, শুনেছি এক সময়ে তুমি বড়ো বড়ো কথা নিয়ে খুব বড়ো বড়ো বই লিখেছিলে।

জীবনে অনেক দুষ্কর্ম করেছি, তা কবুল করতে হবে। ভারতচন্দ্র বলেছেন, সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

আমার ভালো লাগে না মনে করতে যে, আমি তোমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি।

ভাগ্যবান মানুষেরই যোগ্য লোক জোটে সময় নষ্ট ক'রে দেবার।

আমি বুঝি তোমার সেই যোগ্য লোক ?

আমার কপালক্রমে পেয়েছি, খুঁজলে পাওয়া যায় না।

তোমাকে খুব ছেলেমানুষি করাই ?

দেখো, অনেকদিন ধ'রে আমি গম্ভীর পোশাকি সাজ প'রে এতদিন কাটিয়েছি, সেলাম পেয়েছি অনেক। এখন তোমার দরবারে এসে ছেলেমানুষির ঢিলে কাপড় প'রে হাঁপ ছেড়েছি। সময় নষ্ট করার কথা বলছ, দিদি— এক সময় তার হুকুম ছিল না। তখন ছিলুম সময়ের গোলাম। আজ আমি গোলামিতে ইস্তফা দিয়েছি। শেষের ক'টা দিন আরামে কাটবে। ছেলেমানুষির দোসর পেয়ে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসেছি। যা খুশি বলে যাব, মাথা চুলকে কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

তোমার এই ছেলেমানুষির নেশাতেই তুমি যা খুশি তাই বানিয়ে বলছ।

কী বানিয়েছি বলো।

যেমন তোমাদের ঐ হ. চ. হ.; অমনতরো অদ্ভুত খ্যাপাটে মানুষ তো আমি দেখি নি।

দেখো দিদি, এক-একটা জীব জন্মায় যার কাঠামোটা হঠাৎ যায় বেঁকে। সে হয় মিউজিয়মের মাল। ঐ হ. চ. হ. আমার মিউজিয়মে দিয়েছেন ধরা।

ওঁকে পেয়ে তুমি খুব খুশি হয়েছিলে ?

তা হয়েছিলুম। কেননা তখন তোমার ইরুমাসি গিয়েছেন চলে শ্বশুরবাড়ি। আমাকে অবাক ক'রে দেবার লোকের অভাব ঘটেছিল। ঠিক সেই সময় এসেছিলেন হরীশচন্দ্র হালদার একমাথা টাক নিয়ে। তাঁর তাক লাগিয়ে দেবার রকমটা ছিল

আলাদা, তোমার ইরুমাসির উল্টো। সেদিন তোমার ইরুমাসি শুরু করেছিল জটাইবুড়ির কথা। ঐ জটাইবুড়ির সঙ্গে অমাবস্যার রাত্রে আলাপ পরিচয় হ'ত। সে বুড়িটার কাজ ছিল চাঁদে বসে চরকা কাটা। সে চরকা বেশিদিন আর চলল না। ঠিক এমন সময় পালা জমাতে এলেন প্রোফেসার হরীশ হালদার। নামের গোড়ার পদবীটা তাঁর নিজের হাতেই লাগানো। তাঁর ছিল ম্যাজিক-দেখানো হাত। একদিন বাদলা দিনের সন্ধেবেলায় চায়ের সঙ্গে চিঁড়েভাজা খাওয়ার পর তিনি বলে বসলেন, এমন ম্যাজিক আছে যাতে সামনের ওই দেয়ালগুলো হয়ে যাবে ফাঁকা।

পঞ্চানন দাদা টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এ বিদ্যে ছিল বটে ঋষিদের জানা।

শুনে প্রোফেসার রেগে টেবিল চাপড়ে বললেন, আরে রেখে দিন আপনার মুনি ঋষি, দৈত্য দানা, ভূত প্রেত।

পঞ্চানন দাদা বললেন, আপনি তবে কী মানেন।

হরীশ একটিমাত্র ছোটো কথায় বলে দিলেন, দ্রব্যগুণ।

আমরা ব্যস্ত হয়ে বললুম, সে জিনিসটা কী।

প্রোফেসার বলে উঠলেন, আর যাই হোক, বানানো কথা নয়, মন্তর নয়, তন্তর নয়, বোকা-ভুলোনো আজগুবি কথা নয়।

আমরা ধরে পড়লুম, তবে সেই দ্রব্যগুণটা কী।

প্রোফেসার বললেন, বুঝিয়ে বলি। আগুন জিনিসটা একটা আশ্চর্য জিনিস, কিন্তু তোমাদের ঐসব ঋষিমুনির কথায় জ্বলে না। দরকার হয় জ্বালানি কাঠের। আমার ম্যাজিকও তাই। সাত বছর হর্তকি খেয়ে তপস্যা করতে হয় না। জেনে নিতে হয় দ্রব্যগুণ। জানবা মাত্র তুমিও পার আমিও পারি।

কী বলেন প্রোফেসার, আমিও পারি ঐ দেয়ালটাকে হাওয়া করে দিতে?

পার বই-কি। হিড়িংফিড়িং দরকার হয় না, দরকার হয় মাল-মসলার।

আমি বললেম, বলে দিন-না কী চাই।

দিচ্ছি। কিছু না— কিছু না, কেবল একটা বিলিতি আমড়ার আঁঠি আর শিলনোড়ার শিল।

আমি বললুম, এ তো খুবই সহজ। আমড়ার আঁঠি আর শিল আনিয়ে দেব, তুমি দেয়ালটাকে উড়িয়ে দাও।

আমড়ার গাছটা হওয়া চাই ঠিক আট বছর সাত মাসের। কৃষ্ণদ্বাদশীর চাঁদ ওঠবার এক দণ্ড আগে তার অঙ্কুরটা সবে দেখা দিয়েছে। সেই তিথিটা পড়া চাই

শুক্রবারে রাত্রির এক প্রহর থাকতে। আবার শুক্কুর বারটা অগ্রহায়ণের উনিশে তারিখে না হলে চলবে না। ভেবে দেখো বাবা, এতে ফাঁকি কিছুই নেই। দিনখন তারিখ সমস্ত পাকা ক'রে বেঁধে দেওয়া।

আমরা ভাবলুম, কথাটা শোনাচ্ছে অত্যন্ত বেশি খাঁটি। বুড়ো মালীটাকে সন্ধান করতে লাগিয়ে দেব।

এখনো সামান্য কিছু বাকি আছে। ঐ শিলটা তিব্বতের লামারা কালিম্পঙের হাটে বেচতে নিয়ে আসে ধবলেশ্বর পাহাড় থেকে।

পঞ্চানন দাদা এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, এটা কিছু শক্ত ঠেকছে।

প্রোফেসার বললেন, শক্ত কিছুই নয়। সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে।

মনে মনে ভাবলুম, সন্ধান করাই চাই, ছাড়া হবে না— তার পরে শিল নিয়ে কী করতে হবে।

রোসো, অল্প একটু বাকি আছে। একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চাই।

পঞ্চানন দাদা বললেন, সে শঙ্খ পাওয়া তো সহজ নয়। যে পায় সে যে রাজা হয়।

হ্যাঃ, রাজা হয় না মাথা হয়। শঙ্খ জিনিসটা শঙ্খ। যাকে বাংলায় বলে শাঁখ। সেই শঙ্খটা আমড়ার আঁঠি দিয়ে, শিলের উপর রেখে, ঘষতে হবে। ঘষতে ঘষতে আঁঠির চিহ্ন থাকবে না, শঙ্খ যাবে ক্ষ'য়ে। আর, শিলটা যাবে কাদা হয়ে। এইবার এই পিণ্ডিটা নিয়ে দাও বুলিয়ে দেয়ালের গায়। বাস্‌। এ'কেই বলে দ্রব্যগুণ। দ্রব্যগুণেই দেয়ালটা দেয়াল হয়েছে। মন্তরে হয় নি। আর দ্রব্যগুণেই সেটা হয়ে যাবে ধোঁয়া, এতে আশ্চর্য কী।

আমি বললুম, তাই তো, কথাটা খুব সত্যি শোনাচ্ছে।

পঞ্চানন দাদা মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন ব'সে ব'সে, বাঁ হাতে হুঁকোটা ধ'রে।

আমাদের সন্ধানের ত্রুটিতে এই সামান্য কথাটার প্রমাণ হলই না। এতদিন পরে ইক্কর মন্তর তন্তর রাজবাড়ি, মনে হল, সব বাজে। কিন্তু, অধ্যাপকের দ্রব্যগুণের মধ্যে কোনোখানেই তো ফাঁকি নেই। দেয়াল রইল নিরেট হয়ে। অধ্যাপকের 'পরে আমাদের ভক্তিও রইল অটল হয়ে। কিন্তু, একবার দৈবাৎ কী মনের ভুলে দ্রব্যগুণটাকে নাগালের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, ফলের আঁঠি মাটিতে পুঁতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছও পাওয়া যাবে, ফলও পাওয়া যাবে।

আমরা বললুম, আশ্চর্য।

হ. চ. হ. বললেন, কিছু আশ্চর্য নয়, দ্রব্যগুণ। ঐ আঁঠিতে মনসাসিজের আঠা একুশবার লাগিয়ে একুশবার শুকোতে হবে। তার পরে পোঁতো মাটিতে আর দেখো কী হয়।

উঠে-প'ড়ে জোগাড় করতে লাগলুম। মাস দুয়েক লাগল আঠা মাখাতে আর শুকোতে। কী আশ্চর্য, গাছও হল ফলও ধরল, কিন্তু সাত বছরে। এখন বুঝেছি কাকে বলে দ্রব্যগুণ। হ. চ. হ. বললেন, ঠিক আঠা লাগানো হয় নি।

বুঝলেম, ঐ ঠিক আঠাটা দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। বুঝতে সময় লেগেছে।

*
* *

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই—
হয় না যা তাই হলে ম্যাজিক তবেই।
নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি
জগতের ইস্কুলে তবে পাই ছুটি।
অঙ্কর কেলাসেতে অঙ্কই কষি—
সেথায় সংখ্যাগুলো যদি পড়ে খসি,
বোর্ডের 'পরে যদি হঠাৎ নামতা
বোকার মতন করে আমতা-আমতা,
দুইয়ে দুইয়ে চার যদি কোনো উচ্ছ্বাসে
একেবারে চ'ড়ে বসে উনপঞ্চাশে,
ভুল তবু নির্ভুল ম্যাজিক তো সেই;
'পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ'এ কোনো মজা নেই।
মিথ্যেটা সত্যই আছে কোনোখানে,
কবিরা শুনেছি তারি রাস্তাটা জানে—
তাদের ম্যাজিকওলা খ্যাপা পদ্যের
দোকানেতে তাই এত জোটে খদ্দের।

পরী

কুসমি বললে, তুমি বড্ড বানিয়ে কথা বল। একটা সত্যিকার গল্প শোনাও-না।

আমি বললুম, জগতে দুরকম পদার্থ আছে। এক হচ্ছে সত্য, আর হচ্ছে—আরও-সত্য। আমার কারবার আরও-সত্যকে নিয়ে।

দাদামশায়, সবাই বলে, তুমি কী যে বল কিছু বোঝাই যায় না।

আমি বললুম, কথাটা সত্যি, কিন্তু যারা বোঝে না সেটা তাদেরই দোষ।

আরও-সত্যি কাকে বলছ একটু বুঝিয়ে বলো-না।

আমি বললুম, এই যেমন তোমাকে সবাই কুসমি বলে জানে। এই কথাটা খুবই সত্য; তার হাজার প্রমাণ আছে। আমি কিন্তু সন্ধান পেয়েছি যে, তুমি পরীস্থানের পরী। এটা হল আরও-সত্য।

খুশি হল কুসমি। বলল, আচ্ছা, সন্ধান পেলে কী করে।

আমি বললুম, তোমার ছিল এক্‌জামিন, বিছানার উপরে বসে বসে ভূগোলবৃত্তান্ত মুখস্থ করছিলে, কখন তোমার মাথা ঠেকল বালিশে, পড়লে ঘুমিয়ে। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। জানলার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ল তোমার মুখের উপরে, তোমার আসমানি রঙের শাড়ির উপরে। আমি সেদিন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, পরীস্থানের রাজা চর পাঠিয়েছে তাদের পলাতকা পরীর খবর নিতে। সে এসেছিল আমার জানলার কাছে, তার সাদা চাদরটা উড়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। চর দেখল তোমাকে আগাগোড়া, ভেবে পেল না তুমি তাদের সেই পালিয়ে-আসা পরী কি না। তুমি এই পৃথিবীর পরী ব'লে তার সন্দেহ হল। তোমাকে মাটির কোল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হবে না। এত ভার সইবে না। ক্রমে চাঁদ উপরে উঠে গেল, ঘরের মধ্যে ছায়া পড়ল, চর শিশুগাছের ছায়ায় মাথা নেড়ে চলে গেল। সেদিন আমি খবর পেলুম, তুমি পরীস্থানের পরী, পৃথিবীর মাটির ভারে বাঁধা পড়ে গেছ।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, আমি পরীস্থান থেকে এলুম কী করে।

আমি বললুম, সেখানে একদিন তুমি পারিজাতের বনে প্রজাপতির পিঠে চড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলে, হঠাৎ তোমার চোখে পড়ল দিগন্তের ঘাটে এসে ঠেকেছে একটা খেয়ানৌকো। সেটা সাদা মেঘ দিয়ে গড়া, হাওয়া লেগে দুলছে। তোমার কী মনে হল, তুমি উঠে পড়লে সেই নৌকোয়। নৌকো চলল ভেসে, ঠেকল এসে পৃথিবীর

ঘাটে, তোমার মা নিলেন কুড়িয়ে।

কুসমি ভারি খুশি হয়ে বললে হাততালি দিয়ে, দাদামশায়, আচ্ছা, এ কি সত্যি।

আমি বললুম, ঐ দেখো, কে বললে সত্যি। আমি কি সত্যিকে মানি। এ হল আরও-সত্যি।

কুসমি বললে, আচ্ছা, আমি কি পরীস্থানে ফিরে যেতে পারব না।

আমি বললুম, পারতেও পার, যদি তোমার স্বপ্নের পালে পরীস্থানের হাওয়া এসে লাগে।

আচ্ছা, যদি হাওয়া লাগে তবে কোন্ রাস্তায় কোথা দিয়ে কোথায় যাব। সে কি অনে—ক দূরে।

আমি বললুম, সে খুব কাছে।

কত কাছে।

যত কাছে তুমি আছ আর আমি আছি। ঐ বিছানার বাইরে যেতে হবে না। আর-একদিন জানলা দিয়ে পড়ুক এসে জ্যোৎস্না; এবার যখন তুমি তাকিয়ে দেখবে বাইরে, তোমার আর সন্দেহ হবে না। তুমি দেখবে জ্যোৎস্নার স্রোত বেয়ে মেঘের খেয়ানৌকো এসে পৌচচ্ছে। কিন্তু, তুমি যে এখন পৃথিবীর পরী হয়েছ, ও নৌকোয় তোমার কুলোবে না। এখন তুমি তোমার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, কেবল তোমার মন থাকবে তোমার সাথি। তোমার সত্য থাকবে এই পৃথিবীতে প'ড়ে আর তোমার আরও-সত্য যাবে কোথায় ভেসে, আমরা কেউ তার নাগাল পাব না।

কুসমি বললে, আচ্ছা, এবারে পূর্ণিমারাত এলে আমি ঐ আকাশের পানে তাকিয়ে থাকব। দাদামশায়, তুমি কি আমার হাত ধরে যাবে।

আমি বললুম, আমি এইখানে বসে বসে পথ দেখিয়ে দিতে পারব। আমার সেই ক্ষমতা আছে— কেননা আমি সেই আরও-সত্যের কারবারি।

*

* *

যেটা তোমায় লুকিয়ে-জানা সেটাই আমার পেয়ার,
বাপ মা তোমায় যে নাম দিল থোড়াই করি কেয়ার।
সত্য দেখায় যেটা দেখি তারেই বলি পরী,
আমি ছাড়া কজন জানে তুমি যে অপ্সরী।

কেটে দেব বাঁধা নামের বন্দীর শৃঙ্খল,
সেই কাজেতেই লেগে গেছি আমরা কবির দল—
কোনো নামেই কোনো কালে কুলোয় নাকো যারে
তাহার নামের ইশারা দেই ছন্দের ঝংকারে।

আরও-সত্য

দাদামশায়, সেদিন তুমি যে আরও-সত্যির কথা বলছিলে, সে কি কেবল পরীস্থানেই দেখা যায়।

আমি বললুম, তা নয় গো, এ পৃথিবীতেও তার অভাব নেই। তাকিয়ে দেখলেই হয়। তবে কিনা সেই দেখার চাউনি থাকা চাই।

তা, তুমি দেখতে পাও ?

আমার ঐ গুণটাই আছে, যা না দেখবার তাই হঠাৎ দেখে ফেলি। তুমি যখন বসে বসে ভূগোল-বিবরণ মুখস্থ কর তখন মনে পড়ে যায় আমার ভূগোল পড়া। তোমার ঐ ইয়াংসিকিয়াং নদীর কথা পড়লে চোখের সামনে যে জ্যোগ্রাফি খুলে যেত তাকে নিয়ে এক্‌জামিন পাশ করা চলে না। আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সারি সারি উট চলেছে রেশমের বস্তা নিয়ে। একটা উটের পিঠে আমি পেয়েছিলুম জায়গা।

সে কী কথা দাদামশায়। আমি জানি, তুমি কোনোদিন উটে চড় নি।

ঐ দেখো দিদি, তুমি বড়ো বেশি প্রশ্ন কর।

আচ্ছা, তুমি বলে যাও। তার পরে ? উট পেলে তুমি কোথা থেকে।

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন। উট পাই বা না পাই, আমি চ'ড়ে বসি। কোনো দেশে যাই বা না যাই, আমার ভ্রমণ করতে বাধে না। ওটা আমার স্বভাব।

তার পরে কী হল।

তার পরে কত শহর গেলেম পেরিয়ে— কুচুং, হ্যাংচাও, চুংকুং ; কত মরুভূমির ভিতর দিয়ে গিয়েছি রাত্তির বেলায় তারা দেখে রাস্তা চিনে চিনে। গেলুম উস্‌খুস্‌ পাহাড়ের তরাইয়ে। জলপাইয়ের বন দিয়ে, আঙুরের খেত দিয়ে, পাইন গাছের ছায়া দিয়ে। পড়েছিলুম ডাকাতের হাতে, সাদা ভালুক সামনে দাঁড়িয়েছিল দুই থাবা তুলে।

আচ্ছা, এত যে তুমি ঘুরে বেড়ালে, সময় পেলে কখন।

যখন ক্লাশসুদ্ধ ছেলে খাতা নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল।

তুমি পরীক্ষায় পাশ করলে তা হলে কী করে।

ওর সহজ উত্তর হচ্ছে— আমি পাশ করি নি।

আচ্ছা, তুমি বলে যাও।

এর কিছুদিন আগে আমি আরব্য উপন্যাসে চীনদেশের রাজকন্যার কথা পড়েছি, বড়ো সুন্দরী তিনি। আশ্চর্যের কথা কী আর বলব, সেই রাজকন্যার সঙ্গেই আমার হল দেখা। সেটা ঘটেছিল ফুচাও নদীর ঘাটে। সাদা পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাট, উপরে নীল পাথরের মণ্ডপ। দুই ধারে দুই চাঁপা গাছ, তার তলায় দুই পাথরের সিংহের মূর্তি। পাশে সোনার ধুনুচি থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। একজন দাসী পাখা করছিল, একজন চামর দোলাচ্ছিল, একজন দিচ্ছিল চুল বেঁধে। আমি কেমন করে পড়ে গেলুম তাঁর সামনে। রাজকন্যা তখন তাঁর দুধের মতো সাদা ময়ূরকে দাড়িমের দানা খাওয়াচ্ছিলেন, চমকে উঠে বললেন, কে তুমি।

সেই মুহূর্তেই ফস্ করে আমার মনে প'ড়ে গেল যে, আমি বাংলাদেশের রাজপুত্তুর।

সে কী কথা। তুমি তো—

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন? আমি বলছি, সেদিন ছিলুম বাংলাদেশের রাজপুত্তুর, তাই তো বেঁচে গেলুম। নইলে সে তো দূর ক'রে তাড়িয়ে দিত আমাকে। তা না করে দিলে সোনার পেয়ালায় চা খেতে। চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে মেশানো সেই চা, গন্ধে আকুল করে দেয়।

তা হলে কি তোমাকে বিয়ে করল নাকি।

দেখো, ওটা বড়ো গোপন কথা। আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

কুসমি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বিয়ে নিশ্চয়ই হয়েছিল, খুব ঘটা ক'রে হয়েছিল।

দেখলুম বিয়েটা না হলে ও বড়ো দুঃখিত হবে।—শেষকালে হল বিয়ে। হ্যাংচাও শহরের আদ্ধেক রাজত্ব আর শ্রীমতী আংচনী দেবীকে লাভ করলুম। ক'রে—

করে কী হল। আবার বুঝি সেই উটে চড়ে বসলে?

নইলে এখানে ফিরে এসে দাদামশায় হলেম কী করে। হ্যাঁ, চড়েছিলুম— সে উট কোথাও যায় না। মাথার উপর দিয়ে ফুস্‌হুং পাখি গান গেয়ে চলে গেল।

ফুস্‌হুং পাখি? সে কোথায় থাকে।

কোথাও থাকে না; কিন্তু তার লেজ নীল, তার ডানা বাসন্তী, তার ঘাড়ের কাছে বাদামি, ওরা দলে দলে উড়ে গিয়ে বসল হাচাং গাছে।

হাচাং গাছের তো আমি নাম শুনি নি।

আমিও শুনি নি, তোমাকে বলতে বলতে এইমাত্র মনে পড়ল। আমার ঐ দশা, আমি আগে থাকতে তৈরি হই নে। তখনি তখনি দেখি, তখনি তখনি বলি। আজ আমার ফুস্‌হুং পাখি উড়ে চলে গেছে সমুদ্রের আর-এক পারে। অনেকদিন তার কোনো খবর নেই।

কিন্তু, তোমার বিয়ের কী হল। সেই রাজকন্যা?

দেখো, চুপ করে যাও। আমি কোনো জবাব দেব না। আর তা ছাড়া, তুমি দুঃখ কোরো না, তখনও তুমি জন্মাও নি— সে কথা মনে রেখো।

*

* *

আমি যখন ছোটো ছিলুম, ছিলুম তখন ছোটো;
আমার ছুটির সঙ্গী ছিল ছবি আঁকার পোটো।
বাড়িটা তার ছিল বুঝি শস্থী নদীর মোড়ে,
নাগকন্যা আসত ঘাটে শাঁখের নৌকো চ'ড়ে।
চাঁপার মতো আঙুল দিয়ে বেণীর বাঁধন খুলে
ঘন কালো চুলের গুচ্ছে কী ঢেউ দিত তুলে।
রৌদ্র-আলোয় ঝলক দিয়ে বিন্দুবারির মতো
মাটির 'পরে পড়ত ঝরে মুক্তা মানিক কত।
নাগকেশরের তলায় ব'সে পদ্মফুলের কুঁড়ি
দূরের থেকে কে দিত তার পায়ের তলায় ছুঁড়ি।
একদিন সেই নাগকুমারী ব'লে উঠল, কে ও।
জবাব পেলে, দয়া ক'রে আমার বাড়ি যেয়ো।

রাজপ্রাসাদের দেউড়ি সেথায় শ্বেত পাথরে গাঁথা,
মণ্ডপে তার মুক্তাঝালর দোলায় রাজার ছাতা।
ঘোড়সওয়ারি সৈন্য সেথায় চলে পথে পথে,
রক্তবরন ধ্বজা ওড়ে তিরিশঘোড়ার রথে।
আমি থাকি মালঞ্চেতে রাজবাগানের মালী,
সেইখানেতে যূথীর বনে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালি।
রাজকুমারীর তরে সাজাই কনকচাঁপার ডালা,
বেণীর বাঁধন-তরে গাঁথি শ্বেতকরবীর মালা।
মাধবীতে ধরল কুঁড়ি, আর হবে না দেরি—
তুমি যদি এস তবে ফুটবে তোমায় ঘেরি।
উঠবে জেগে রঙনগুচ্ছ পায়ের আসনটিতে,
সামনে তোমার করবে নৃত্য ময়ুর-ময়ূরীতে।
বনের পথে সারি সারি রজনীগন্ধায়
বাতাস দেবে আকুল ক'রে ফাগুনি সন্ধ্যায়।
বলতে বলতে মাথার উপর উড়ল হাঁসের দল,
নাগকুমারী মুখের 'পরে টানল নীলাঞ্চল।
ধীরে ধীরে নদীর 'পরে নামল নীরব পায়ে,
ছায়া হয়ে গেল কখন চাঁপাগাছের ছায়ে।
সন্ধ্যামেঘের সোনার আভা মিলিয়ে গেল জলে।
পাতল রাতি তারা-গাঁথা আসন শূন্যতলে।

ম্যানেজারবাবু

আজ তোমাকে যে গল্পটা বলব মনে করেছি সেটা তোমার ভালো লাগবে না।

তুমি বললেও ভালো লাগবে না কেন।

যে লোকটার কথা বলব সে চিতোর থেকে আসে নি কোনো রানা-মহারানার দল ছেড়ে—

চিতোর থেকে না এলে বুঝি গল্প হয় না?

হয় বই-কি— সেইটাই তো প্রমাণ করা চাই। এই মানুষটা ছিল সামান্য একজন

জমিদারের সামান্য পাইক। এমন-কি, তার নামটাই ভুলে গেছি। ধরে নেওয়া যাক মুজনলাল মিশির। একটু নামের গোলমাল হলে ইতিহাসের কোনো পণ্ডিত তা নিয়ে কোনো তর্ক করবে না।

সেদিন ছিল যাকে বলে জমিদারি সেরেস্তার 'পুণ্যাহ', খাজনা-আদায়ের প্রথম দিন। কাজটা নিতান্তই বিষয়-কাজ। কিন্তু, জমিদারি মহলে সেটা হয়ে উঠেছে একটা পার্বণ। সবাই খুশি— যে খাজনা দেয় সেও, আর যে খাজনা বাক্সতে ভর্তি করে সেও। এর মধ্যে হিসেব মিলিয়ে দেখবার গন্ধ ছিল না। যে যা দিতে পারে তাই দেয়, প্রাপ্য নিয়ে কোনো তক্‌রার করা হয় না। খুব ধুমধাম, পাড়াগেঁয়ে সানাই অত্যন্ত বেসুরে আকাশ মাতিয়ে তোলে। নতুন কাপড় প'রে প্রজারা কাছারিতে সেলাম দিতে আসে। সেই পুণ্যাহের দিনে ঢাক ঢোল সানাইয়ের শব্দে জেগে উঠে ম্যানেজারবাবু ঠিক করলেন, তিনি স্নান করবেন দুধে। চারি দিকে সমারোহ দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি তো সামান্য লোক নন। সামান্য জলে তাঁর অভিষেক কী করে হবে। ঘড়া ঘড়া দুধ এল গোয়ালা প্রজাদের কাছ থেকে। হল তাঁর স্নান। নাম বেরিয়ে গেল চারি দিকে; সেদিন তিনি সন্ধ্যাবেলায় খুশিমনে বাসার রোয়াকে ব'সে গুড়গুড়ি টানছেন, এমন সময় মিশির সর্দার, ব্রাহ্মণের ছেলে লাঠিখেলা নিয়ে খুব নাম করেছে, বললে, হুজুর আপনার নিমক তো খেয়েছি অনেককাল, কিন্তু অনেক-দিন বসে আছি, আমাকে তো কাজে লাগালেন না। যদি কিছু করবার থাকে তো হুকুম করুন।

ম্যানেজার গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন। মনে পড়ে গেল একটা কাজের কথা। জসিম মণ্ডল চর মহলের প্রজা, তার খেত ছিল পাশের জমিদারের সীমানা-ঘেঁষা। ফসল জন্মালেই প্রতিবেশী জমিদার লোকজন নিয়ে প্রজাকে আট্‌কাত। দায়ে পড়ে জসিমের দুই জমিদারেরই খাতায় আর দু জায়গাতেই খাজনা দিয়ে ফসল সামলাতে হত। যে ম্যানেজার দুধে স্নান করেন এটা তাঁর ভালো লাগে নি। এ বছরের জলিধানের ফসল কাটবার সময় আসছে— এটা চরের বিশেষ ফসল। চরের জমির জল নেমে গেলেই কৃষাণ পলিমাটিতে বীজ ছিটিয়ে দেয়, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ফসল গোলায় তোলে। এ বছরটা ছিল ভালো; ধানের শিষে সমস্ত মাঠ হি হি করছে। এবারকার ফসল বেদখল হলে ভারি লোকসান।

ম্যানেজার বললেন, সর্দার, একটা কাজ আছে। জসিমের জমিতে তোমাকে ধান আগলাতে হবে। একা তোমারই উপরে ভার। দেখব কেমন মরদ তুমি।

ম্যানেজার তখনও দুধের স্নানের গুমোর হজম করে উঠতে পারেন নি। মিশিরকে হুকুম দিয়ে গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন।

ধান কাটার সময় এল। দিন নেই, রাত নেই, মিশির জসিমের খেতে পাহারা দেয়।

একদিন ভরা খেতে অন্য পক্ষের লোক হল্লা ক'রে এল, মিশির বুক ফুলিয়ে বললে, বাবা-সকল, আমি থাকতে এ ধান তোমাদের ঘরে উঠবে না। সেলাম ঠুকে চলে যাও।

মিশির যত বড়ো সর্দার হোক, সেদিন সে একলা। যখন তাকে ঘেরাও করলে সে গুটিসুটি মেরে ব'সে সবাইকে আটকাতে লাগল।

অপর পক্ষের লোক বললে, দাদা, পারবে না। কেন প্রাণ দেবে।

মিশির বললে, নিমক খেয়েছি, প্রাণ যায় যাক ; নিমকের মান রাখতেই হবে।

চলল দাঙ্গা— শুধু লাঠির মার হলে হয়তো মিশির ঠেকাতেও পারত। অপর পক্ষ শড়কি চালালো। একটা এসে বিঁধল মিশিরের পায়ে।

অপর পক্ষ আবার তাকে সতর্ক করে বললে, আর কেন। এবার ক্ষান্ত দে ভাই।

মিশির বললে, মিশির সর্দার প্রাণের ভয় করে না, ভয় করে বেইমানির।

শেষকালে একটা শড়কি এসে বিঁধল তার পেটে। এটা হল মরণের মার। পুলিশের হাতে পড়বার ভয়ে অপর পক্ষ পালাবার পথ দেখলে। মিশির শড়কি টেনে উপড়ে, পেটে চাদর জড়িয়ে ছুটল তাদের পিছন-পিছন। বেশি দূরে যেতে পারলে না। পড়ে গেল মাটিতে।

পুলিশ এল। মিশির জমিদারকে বাঁচাবার জন্য, তাঁর নামও করলে না। বললে, আমি জসিমের চাকরি নিয়ে তার ধান আগলাচ্ছিলুম।

ম্যানেজার সব খবর পেলেন। গুড়গুড়ি লাগলেন টানতে।

তাঁর দুধের স্নানের খ্যাতি— এ তো যে-সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু, নিমক খেয়েছে যখন তখন প্রাণ দেওয়া— এটা এতই কী আশ্চর্য। এমন তো ঘটেই থাকে। কিন্তু, দুধে স্নান!

*
* *

তুমি ভাবো এই-যে বোঁটা
কিছুই বুঝি নয়কো ওটা,
ফুলের গুমোর সবার চেয়ে বড়ো—
বিমুখ হয়ে আজ যদি ও
আলগা করে বাঁধন স্বীয়
তখনি ফুল হয় যে পড়ো-পড়ো।
বোঁটাই ওকে হাওয়ায় নাচায়,
অপমানের থেকে বাঁচায়,
ধরে রাখে সূর্যালোকের ভোজে ;
বুক ফুলিয়ে দেয় না দেখা,
গোপনে রয় একা একা,
নিচু হয়ে সবার উপর ও যে।
বনের ও তো আদুরে নয়,
শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়,
গায়েতে ওর নাইকো অলংকার ;
রস জোগায় সে চুপে চুপে,
থাকে নিজে নীরস রূপে,
আপন জোরে বহে আপন ভার।
কাঁটা যখন উঁচিয়ে থাকে
অহিংস্র কেউ কয় না তাকে—
যতই কিন্তু করুক-না বদনাম,
পশুর কামড় থেকে যারে
বাঁচিয়ে রাখে বারে বারে
সেই তো জানে কাঁটার কত দাম।

বাচস্পতি

দাদামশায়, তুমি তোমার চার দিকে যেসব পাগলের দল জমিয়েছিলে, গুণ হিসেব ক'রে তাদের বুঝি সব নম্বর দিয়ে রেখেছিলে ?

হ্যাঁ, তা করতে হয়েছে বই-কি। কম তো জমে নি।

তোমার পয়লা নম্বর ছিলেন বাচস্পতি মশায়, তাঁকে আমার ভারি মজা লাগে।

আমার শুধু মজা লাগে না, আশ্চর্য লাগে। কারণ বলি— কবিতা লিখে থাকি। কথা বাঁকানো-চোরানো আমাদের ব্যাবসা। যে শব্দের কোনো সাদা মানে আছে তাকে আমরা ধ্বনি লাগিয়ে তার চেহারা বদল করি। সে এক রকমের জাদুবিদ্যা বললেই হয়। কাজটা সহজ নয়। আমাদের বাচস্পতি আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন যখন দেখলুম তিনি একেবারে গোড়াগুড়ি ভাষা বানিয়েছেন। কান দিয়ে ধ্বনির রাস্তায় তার মানের রাস্তা খুঁজতে হয়। আমাদের কাজটাও অনেকটা তাই, কিন্তু এতদূর পর্যন্ত নয়। আমরা তবু ব্যাকরণ অভিধান মেনে চলি। বাচস্পতির ভাষা চলত সে-সমস্তই ডিঙিয়ে। শুনলে মনে হত যেন কী একটি মানে আছে!— মানে ছিল বই-কি। কিন্তু, সেটা কানের সঙ্গে ধ্বনি মিলিয়ে আন্দাজ করতে হত। আমার 'অদ্ভুত-রত্নাকর' সভার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন বাচস্পতি মশায়। প্রথম বয়সে পড়াশুনা করেছিলেন বিস্তর, তাতে মনের তলা পর্যন্ত গিয়েছিল ঘুলিয়ে। হঠাৎ এক সময়ে তাঁর মনে হল, ভাষার শব্দগুলো চলে অভিধানের আঁচল ধ'রে। এই গোলামি ঘটেছে ভাষার কলিযুগে। সত্যযুগে শব্দগুলো আপনি উঠে পড়ত মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই মানে আনত টেনে। তিনি বলতেন, শব্দের আপন কাজই হচ্ছে বোঝানো, তাকে আবার বোঝাবে কে। একদিন একটা নমুনা শুনিয়ে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। বললেন, আমার নায়িকা যখন নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে 'দিন রাত তোমার ঐ হিদ্‌হিদ্ হিদিক্কারে আমার পাঁজঝুরিতে তিড়িতঙ্ক লাগে', তখন তার মানে বোঝাতে পণ্ডিতকে ডাকতে হয় নি। যেমন পিঠে কিল মেরে সেটাকে কিল প্রমাণ করতে মহামহোপাধ্যায়ের দরকার হয় না।

সভাপতি একদিন বিষয়টা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওহে বাচস্পতি, সেই ছেলেটার কী দশা হল।

বাচস্পতি বললেন, সে ছেলেটার বুঝকিন্ গোড়া থেকেই ছিল বুঝভুমুল গোছের।

তার নাম দিয়েছিলাম বিচ্‌কুম্‌কুর।

মথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ও নামটা কেন।

বাচস্পতি বললেন, সে যে একেবারেই বিচ্‌কুম্‌কুর। পাঠশালার পেডেঙেগাকে দেখলেই তার আন্‌তারা যেত ফুস্‌কলিয়ে। বুকের ভিতরে করতে থাকত কুড়ুকুর কুড়ুকুর। এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুস্‌কে যাবে, এ কথাটা বলেছিল পাড়ার সবচেয়ে যে ছিল পেড়াম্বর হুড়ুমুকি। একটু রসুন— বুঝিয়ে বলি। পেডেঙেগা কথাটা বালিদ্বীপের কাছে পেয়েছি। তাদের মুখের পণ্ডিত শব্দটা আপনিই হয়ে উঠেছে পেডেঙেগা। ভেবে দেখুন, কত বড়ো ওজন, ওর বিদ্যের বোঝা ঠেলে নিয়ে যেতে দশবিশ জন ডিগ্রিধারী জোয়ানের দরকার হয়। আর পণ্ডিত— ছোঃ, তুড়ি দিয়ে তুড়তুড়ুং ক'রে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

অটলদা বললেন, বাচস্পতি, তোমার আজকেকার বর্ণনাটা যে একেবারেই চলতি গ্রাম্যভাষায়। এ তোমাকে মানায় না। সেই সেদিন যে সাধুভাষা বেরিয়েছিল তোমার মুখ দিয়ে, যার সন্ধ্বংস্থনিত হাদিক্যে বুদবুধিদের মন তিংতিড়ি তিংতিড়ি ক'রে ওঠে, সেই ভাষার একটু নমুনা আজ এদের শুনিয়ে দাও। যে ভাষায় ভারতের ইতিহাসটি গেঁথেছ, যার গুরুভার হিসেব ক'রে বলেছিলে ডুণ্ডুম্মানিত ভাষা, তার পরিচয়টা চাই। শুনে এদের সকলের আন্‌তারা ফাঁচ্‌কলিয়ে যাক।

বাচস্পতি মশায় শুরু করলেন, সম্মম্‌মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেঙ্কটাক্ষ স্বরিৎক্রম্যন্ত পর্যুগাসন উত্থুংসিত—

একজন সভাসদ বললেন, বাচস্পতি মশায়, উত্থুংসিত কথাটা শোনাচ্ছে ভালো, ওর মানেটা বুঝিয়ে দিন।

পণ্ডিতজি বললেন, ওর মানে উত্থুংসিত।

তার মানে ?

তার মানে উত্থুংসিত।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, তার মানে হতেই পারে না। মেরেকেটে একটা মানে দিতেও পারি।

কী রকম।

ভিরভ্রিংগট্ট।

আর বলতে হবে না, স্পষ্ট বুঝেছি, ব'লে যান।

বাচস্পতি আবার শুরু করে দিলেন, সম্মম্‌মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেঙ্কটাক্ষ স্বরিৎক্রম্যন্ত পর্যুগাসন উত্থুংসিত নিরংকরালের সহিত—

মথুরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কেমন মশায়, বুঝেছেন তো নিরংকরাল— একেবারে জলের মতো। ওর চেয়ে বেশি বুঝতে চাই নে— মুশকিল হবে।

বাচস্পতি আবার ধরলেন, নিরংকরালের সহিত অজাতশত্রু অপরিপর্যস্মিত গর্গরায়ণকে পরমস্তি শয়নে সমুসদ্‌গারিত করিয়াছিল।

এই পর্যন্ত ব'লে বাচস্পতি মশায় একবার সভাস্থ সকলের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। বললেন, দেখুন একবার, সহজ কাকে বলে। অভিধানের প্রয়োজনই হয় না।

সভার লোকেরা বললে, প্রয়োজন হলেই বা পাব কোথায়।

বাচস্পতি মশায় একটু চোখ টিপে বললেন, ভাবখানা বুঝেছেন তো?

মথুরবাবু বললেন, বুঝেছি বই-কি। সমুদ্রগুপ্ত অজাতশত্রুকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন। আহা, বাচস্পতি মশায়, লোকটাকে একেবারে সমুসদ্‌গারিত করে দিলে গো— একেবারে পরমস্তি শয়নে।

বাচস্পতি বললেন, ছোটোলাট একবার এসেছিলেন আমাদের পাড়ার স্কুলে বুটের ধুলো দিয়ে যেতে। তখন আমি তাঁকে এই বুগবুলবুলি ভাষার একটা ইংরেজি তর্জমা শুনিয়েছিলুম।

সভাস্থ সকলেই বললেন, ইংরেজিটা শোনা যাক।

বাচস্পতি পড়ে গেলেন, দি হাব্বারফ্লুয়াস ইন্‌ফ্যাচুফুয়েশন অব আকবর ডর্বেগুি-ক্যালি ল্যাসেরটাইজড্‌ দি গর্ব্যাণ্ডিজম্‌ অফ হুমায়ুন।— শুনে ছোটোলাট একেবারে টরেটম্‌ বনে গিয়েছিলেন; মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুস্‌কায়িত। হেড পেডেণ্ডোর টিকির চার ধারে ভেরেগুম্‌ লেগে গেল, সেক্রেটারি চৌকি থেকে তড়তং করে উৎখিয়ে উঠলেন। ছেলেগুলোর উজবুম্মুখো ফুড়ফুড়োমি দেখে মনে হল, তারা যেন সব ফিরিচুঙ্কুসের একেবারে চিক্‌চাকস্‌ আমদানি। গতিক দেখে আমি চংচটকা দিলুম।

সভাপতি বললেন, বাচস্পতি, এইখানেই ক্ষান্ত দাও হে, আর বেশিক্ষণ চললে পরাগগলিত হয়ে যাব। এখনি মাথাটার মধ্যে তাজ্ঝিম্‌ মাজ্ঝিম্‌ করছে।

বাচস্পতি আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে সভাপতির ভাষা এতদিনে ওঁদের মুখবুদ্‌বুদী শব্দে রঝম্‌ গঝম্‌ করে উঠত।

*

* *

যার যত নাম আছে সব গড়া-পেটা,
যে নাম সহজে আসে দেওয়া যাক সেটা।

এই ব'লে কাউকে সে ডাকে বুজ্‌কুল,
আদ্‌রুম ডাকত সে যে ছিল অতুল।
মোতিরাম দাস নিল নাম মুচকুস,
কাশিরাম মিত্তির হল পুচফুস।
পাঁশগাড়ি নাম নিল পাঁচকড়ি ঘোষ,
আজ হতে বাজ্‌রাই হল আশুতোষ।
ভুষকুড়ি রায় হল শ্রীমজুমদার,
কুর্দম হয়ে গেল যে ছিল কেদার।
যেদিন যূথীরে নাম দিল ভুজকুশি,
সেদিন স্বামীর সাথে হল ঘুষোঘুষি।
পিচকিনি নাম দিল যবে ললিতারে
দাদা এসে রাস্‌কেল ব'লে গেল তারে।
মিঠে মিঠে নাম যত মানে দিয়ে ঘেরা,
সে বলত, ভাবীকালে রবে না তো এরা—
পিত্ত নাশিবে নাম যদি হয় তিতো,
ভুষ্ককালি নাম দেখো আমি নিয়েছি তো।
পাড়ার লোকেরা বলে ঘিরে তার বাড়ি,
ভাবীকালে পৌঁছিয়ে দিব তবে গাড়ি।
বেচারা গতিক দেখে দিল মুখ ঢাকা,
পিছে পিছে তাড়া করে মেসো আর কাকা।
দিয়েছিল যে মেয়ের নাম উজকুড়ি,
সঙ্গে উকিল নিয়ে এল তার খুড়ি।
শুনলে সে কেস্‌ হবে ডিফামেশনের,
ছেড়ে দিলে কাজ নাম-পরিবেশনের।

পান্নালাল

দাদামশায়, তোমার পাগলের দলের মধ্যে পান্নালাল ছিল খুব নতুন রকমের।

জান, দিদি? পাগলরা প্রত্যেকেই নতুন, কারও সঙ্গে কারও মিল হয় না। যেমন তোমার দাদামশায়। বিধাতার নতুন পরীক্ষা। ছাঁচ তিনি ভেঙে ফেলেন।

সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে মিল হয়, অসাধারণ পাগলের মিল হয় না। তোমাকে একটা উদাহরণ দেখাই।—

আমার দলে একজন পাগল ছিল, তার নাম ত্রিলোচন দাস। সে তিন ক্রোশ পথ না ঘুরে কখনো বাড়ি যেত না।

জিজ্ঞাসা করলে বলত, বাবা, যমের চর চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ফাঁকি দিতে না পারলে রক্ষে নাই। জান তো, আমার বাবা ছিলেন কী রকম একগুঁয়ে মানুষ? পাগল বললেই হয়। কোনোমতেই আমার পরামর্শ মানতেন না। বরাবর তিনি সিধে রাস্তায় বাড়ি গিয়েছেন— তার পরে জান তো? আজ তিনি কোথায়। আর, আমি আজ সাত বছর ধরে পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে আমার পুবের দিকের বাড়িতে যাই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, ভোজুমগুলের বাড়িতে আমার পুজোর নেমন্তন্ন।

জগতে যত বুদ্ধিমান আছে সকলেই সিধে রাস্তায় বাড়ি যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল একজন আছে যে বাড়ি যেতে তিন ক্রোশ পথ বেঁকে যায়।

আমার দুইনম্বরের কথা শোনো; সে বাচস্পতির কথা শুনে বলত, আহা, লোকটা একেবারে বেহেড হয়ে গেছে। আর, বাচস্পতি তার কথা শুনে মুখ টিপে হাসতেন; বলতেন, এই লোকটার মগজে আছে বুজগুবুলের বাসা।

প্রেসিডেন্ট্‌ বললেন, কী হে হাজরা, তোমার বাড়ির হয়েছিল কী।

এতকালের পৈতৃক ঘরটা পথের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। এমন দৌড় মারলে, কোনো চিহ্ন রাখলে না কোথাও।

বল কী।—

আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। কলকাতায় হয়েছি মানুষ, বাবার মৃত্যুর পর কিছু টাকা এল হাতে। ঠিক করলেম, পৈতৃক ভিটেটা একবার দেখে আসা দরকার। সেই ভিটের কথা এইটুকু মাত্র জানতুম— পাঁচকুণ্ডু গ্রামে ছিল তার ভিত, ভোজুঘাটার সাড়ে সাত ক্রোশ তফাতে। শুভদিন দেখে নৌকো করে পৌঁছলাম ভোজুঘাটায়। কেউ ঠিকানা বলতে পারলে না। চললেম খুঁজে বের করতে, মুদির দোকান থেকে চিঁড়ে মুড়কি নিলুম বেঁধে। সাত ক্রোশ পার হতে বাজল রাত্তির ন'টা। চার দিকে পোড়ো জমি, আগাছায় জঙ্গল, ভিটের কোনো চিহ্ন নাই। বারবার যাওয়া-আসা করেছি, ভিটে খুঁজে পাই নে। রাস্তার দোকানি আমাকে দেখে কী ভাবলে কে

জানে, দুর্দশার কথা শুনল আমার কাছে। বললে, এক কাজ করো বাপু, বোড়ো-গ্রামে বিখ্যাত গণৎকার মধুসূদন জ্যোতিষী কুষ্ঠি দেখে তোমার ভিটের খবর দিতে পারবেন।

কোথা থেকে তিনি খবর পেয়েছেন আমার হাতে কিছু মাল আছে। খুব স্ফূর্তি করে গণনায় বসে গেলেন। অনেক আঁকজোঁক কেটে শেষকালে বললেন, আপনার ঘরের সঙ্গে রাস্তার ঘোরতর মন-কষাকষি হয়ে গেছে; একেবারে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ; ভিটে রেগে দৌড় মেরেছে মাসির বাড়িতে।

ব্যস্ত হয়ে বললেম, মাসির বাড়িটা কোথায়।

শুনে বিশ্বাস করবেন না, একেবারে সাত হাত মাটির নীচে। ঐখানে মানুষ হয়েছিল, ঐখানেই মুখ লুকিয়েছে।

তা হলে এখন উপায়?

আছে উপায়। আপনি যান কলকাতায় ফিরে, উপযুক্ত-মতো কিছু টাকা রেখে যান। ঠিক সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে আসবেন। মাসিকে খুশি ক'রে আপনার পৈতৃক বাড়ি ফিরিয়ে আনব। কিন্তু, কিছু দক্ষিণা লাগবে।

আমি বললেম, তা যত লাগে লাগুক, আপনি ভাববেন না। পৈতৃক ভিটে আমার চাই।

আশ্চর্য জ্যোতিষীর বাহাদুরি। সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে এসে ভোজুঘাটার থেকে মেপে ঠিক সাড়ে সাত ক্রোশ পেরলুম। যেখানে কিছু ছিল না সেখানে বাসাটা উঠেছে মাথা তুলে। আমি বললুম, কিন্তু গণকঠাকুর, বাসাটা যে ঠেকছে একেবারে চাছাপোছা নতুন?

গণকঠাকুর বললেন, হবে না? মাসির বাড়িতে খেয়েদেয়ে একেবারে চিক্‌চিকিয়ে উঠেছে!

আপনারা হাসাহাসি করছেন, কিন্তু এ একেবারে আমার স্বচক্ষে দেখা। আমকাঠের দরজাজানালা আর তালকাঠের কড়িবরগা। আমার কলেজি বন্ধুরা কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আমার বালুকডাঙার বিখ্যাত পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীকে ডাকিয়ে আনলুম বিধান দিতে। তিনি বললেন, সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে পথের সঙ্গে ঘরের আড়াআড়ি নিয়ে।

এর বেশি আর একটিও কথা বলতে চাইলেন না। আমি কলকাতার বন্ধুদের ঠেলা দিয়ে বললুম, কেমন!

পান্নালালের গল্পটা শুনে বাচস্পতি মুচকে হেসে বললেন, ভোরম্ভোল

*

* *

মাটি থেকে গড়া হয়, পুন হয় মাটি,
আবার গড়িতে তারে দিনরাত খাটি।
একই মসলায় তারে ভাঙে আর গড়ে,
পুরোনোটা বারে বারে নূতনেতে চড়ে।
গেছে যাহা তাও আছে, এই বিশ্বাসে
ফাঁকা যেথা সেথা মন ফিরে ফিরে আসে।

চন্দনী

জানোই তো সেদিন কী কাণ্ড। একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলেম আর-কি, কিন্তু তলায় কোথায় যে ফুটো হয়েছে তার কোনো খবর পাওয়া যায় নি। না মাথা ধরা, না মাথা ঘোরা, না গায়ে কোথাও ব্যথা, না পেটের মধ্যে একটুও খোঁচাখুঁচির তাগিদ। যমরাজার চরগুলি খবর আসার সব দরজাগুলো বন্ধ করে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে মন্ত্রণা করছিল। এমন সুবিধে আর হয় না! ডাক্তারেরা কলকাতায় নব্বই মাইল দূরে। সেদিনকার এই অবস্থা।

সন্ধে হয়ে এসেছে। বারান্দায় বসে আছি। ঘন মেঘ ক'রে এল। বৃষ্টি হবে বুঝি। আমার সভাসদ্‌রা বললে, ঠাকুরদা, একসময় শুনেছি তুমি মুখে মুখে গল্প ব'লে শোনাতে, এখন শোনাও না কেন।

আর-একটু হলেই বলতে যাচ্ছিলুম, ক্ষমতায় ভাঁটা পড়েছে ব'লে।

এমনসময় একটি বুদ্ধিমতী বলে উঠলেন, আজকাল আর বুঝি তুমি পার না?

এটা সহ্য করা শক্ত। এ যেন হাতির মাথায় অঙ্কুশ। আমি বুঝলুম, আজ আমার আর নিস্তার নেই। বললুম, পারি নে তা নয়— পারি। তবে কিনা—

বাকিটা আর বলা হল না। মনে মনে তখন রাজপুতনা থেকে গল্প তলপ করতে আরম্ভ করেছি। খানিকটা কাশলুম। একবার বললুম, রোসো, একবার একটুখানি দেখে আসি, কে যেন এল।

কেউ আসে নি। শেষকালে বসতে হল।

যমদূতগুলো মোটের উপরে হাঁদা। একটু নড়তে গেলেই ধুপধাপ ক'রে শব্দ করে, আর তাদের শেলশূল-ছুরিছোরাগুলো ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে। সেদিন কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ।—

সন্ধ্যা হয়েছে, পথিক চলেছেন গোরুর গাড়িতে ক'রে। পরদিন সকালে রাজমহলে পৌঁছলে নৌকো নিয়ে তিনি যাত্রা করবেন পশ্চিমে। তিনি রাজপুত, তাঁর নাম অরিজিৎসিংহ। বাংলাদেশে ছোটো কোনো রাজার ঘরে সেনাপতির কাজ করতেন। ছুটি নিয়ে চলেছেন রাজপুতনায়। রাত্রি হয়ে এসেছে। গাড়িতে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ একসময় জেগে উঠে দেখলেন, গাড়ি চলেছে বনের মধ্যে। গাড়োয়ানকে বললেন, ঘাটের রাস্তা ছেড়ে এখানে কেন।

গাড়োয়ান বললে, আমাকে চিনলেই বুঝবেন কেন।

তার পাগড়িটা অনেকখানি আড় ক'রে পরা ছিল। সোজা ক'রে পরতেই অরিজিৎ বললেন, চিনেছি। ডাকাতের সর্দার পরাক্রমসিংহের চর তুমি। অনেক-বার তোমার হাতে পড়েছিলুম, এড়িয়ে এসেছি।

সে বললে, ঠিক ঠাওরেছেন, এবার এড়াতে পারছেন না। চলুন আমার মনিবের কাছে।

অরিজিৎ বললেন, উপায় নেই, যেতেই হবে। কিন্তু, তোমাদের ইচ্ছে পূর্ণ হবে না।

গাড়ি চলল বনের মধ্যে। এর আগের কথাটা এবার খুলে বলা যাক।—

অরিজিৎ বড়ো ঘরের ছেলে। মোগল সম্রাট তাঁর রাজ্য নিলে কেড়ে, তিনি এলেন বাংলাদেশে পালিয়ে। এখান থেকে তৈরি হয়ে একদিন তাঁর রাজ্য ফিরে নেবেন, এই ছিল তাঁর পণ। এ দিকে পরাক্রমসিং মুসলমানদের হাতে তাঁর বিষয়সম্পত্তি হারিয়ে ডাকাতের দল বানিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে; অরিজিতের সঙ্গে বিবাহ হয়, এই ছিল তাঁর চেষ্টা। কিন্তু, জাতিতে তিনি অরিজিতের সমান দরের ছিলেন না, তাঁর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে অরিজিৎ রাজি নন।

রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে। তাঁকে পরাক্রমের দরবারে এনে দাঁড় করালে পরাক্রম বললেন, ভালো সময়েই এসেছ, বিয়ের লগ্ন পড়বে আর দু দিন পরে। তোমার জন্য বরসজ্জা সব তৈরি।

অরিজিৎ বললেন, অন্যায় করবেন না। সকলেই জানে, আপনার গুষ্টিতে মুসলমান

রক্তের মিশল ঘটেছে।

পরাক্রম বললেন, কথাটা সত্য হতেও পারে, সেইজন্তেই তোমার মতো উচ্চ কুলের রক্ত মিশল ক'রে আমার বংশের রক্ত শুধরে নেবার জন্তে এতদিন চেষ্টা করেছি। আজ সুযোগ এল। তোমার মানহানি করব না। বন্দী করে রাখতে চাই নে, ছাড়া থাকবে। একটা কথা মনে রেখো, এই বন থেকে বেরোবার রাস্তা না জানলে কারোর সাধ্যি নেই এখান থেকে পালায়। মিছে চেষ্টা কোরো না, আর যা ইচ্ছা করতে পার।

রাত্রি অনেক হয়েছে। অরিজিতের ঘুম নেই, বসেছেন এসে কাশিনী নদীর ঘাটে বটগাছের তলায়। এমনসময় একটি মেয়ে, মুখ ঘোমটায় ঢাকা, তাঁকে এসে বললে, আমার প্রণাম নিন। আমি এখানকার সর্দারের মেয়ে। আমার নাম রঞ্জনকুমারী। আমাকে সবাই চন্দনী ব'লে ডাকে। আপনার সঙ্গে পিতাজি আমার বিবাহ অনেক দিন থেকে ইচ্ছা করেছেন। শুনলেম, আপনি রাজি হচ্ছেন না। কারণ কী বলুন আমাকে। আপনি কি মনে করেন আমি অস্পৃশ্য।

অরিজিৎ বললেন, কোনো মেয়ে কখনো অস্পৃশ্য হয় না, শাস্ত্রে বলেছে।

তবে কি আমাকে দেখতে ভালো নয় ব'লে আপনার ধারণা।

তাও নয়, আপনার রূপের সুনাম আমি দূর থেকে শুনেছি।

তবে আপনি কেন কথা দিচ্ছেন না।

অরিজিৎ বললেন, কারণটা খুলে বলি। করঞ্জরের রাজকন্যা নির্মলকুমারী আমার বহুদূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি। তিনি আজ বিপদে পড়েছেন। মুসলমান নবাব তাঁর পিতার কাছে তাঁর জন্তে দূত পাঠিয়েছিলেন। পিতা কন্যা দিতে রাজি না হওয়াতে যুদ্ধ বেধে গেল। আমি তাঁকে বাঁচিয়ে আনব, ঠিক করেছি। তার আগে আর-কোথাও আমার বিবাহ হতে পারবে না, এই আমার পণ। করঞ্জর রাজ্যটি ছোটো, রাজার শক্তি অল্প। বেশি দিন যুদ্ধ চলবে না জানি, তার আগেই আমাকে যেতে হবে। চলেছিলেম সেই রাস্তায়, পথের মধ্যে তোমার পিতা আমাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। কী করা যায় তাই ভাবছি।

মেয়েটি বললে, আপনি ভাববেন না। এখান থেকে আপনার পালাবার বাধা হবে না, আমি রাস্তা জানি। আজ রাত্রেই আপনাকে বনের বাহিরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। কিছু মনে করবেন না, আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যেতে হবে, কেননা এ বনের পথের সংকেত বাইরের লোককে জানতে দিতে চণ্ডেশ্বরীদেবীর মানা আছে; তা ছাড়া আপনার হাতে পরাব শিকল। তার যে কী দরকার পথেই জানতে পারবেন।

অরিজিৎ চোখবাঁধা হাতবাঁধা অবস্থায় ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চন্দনীর পিছন-পিছন চললেন। সে রাত্রে ডাকাতের দল সবাই ভাঙ খেয়ে বেহোঁশ। কেবল পাহারায় যে সর্দার ছিল সেই ছিল জেগে। সে বললে, চন্দনী, কোথায় চলেছ।

চন্দনী বললে, দেবীর মন্দিরে।

ওই বন্দীটি কে।

বিদেশী, ওকে দেবীর কাছে বলি দেব। তুমি পথ ছেড়ে দাও।

সে বললে, একলা কেন।

দেবীর আদেশ, আর-কাউকে সঙ্গে নেওয়া নিষেধ।

ওরা বনের বাইরে গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত্রি প্রায় হয়েছে ভোর। চন্দনী অরিজিৎকে প্রণাম করে বললে, আপনার আর ভয় নেই। এই আমার কঙ্কণ, নিয়ে যান, দরকার হলে পথের মধ্যে কাজে লাগতে পারে।

অরিজিৎ চললেন দূরপথে। নানা বিঘ্ন কাটিয়ে যতই দিন যাচ্ছে ভয় হতে লাগল, সময়মত হয়তো পৌঁছতে পারবেন না। বহুকষ্টে করঞ্জর রাজ্যের যখন কাছাকাছি গিয়েছেন খবর পেলেন, যুদ্ধের ফল ভালো নয়। দুর্গ বাঁচাতে পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, মুসলমানেরা দখল করে নিতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। অরিজিৎ আহারনিদ্রা ছেড়ে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন দুর্গের কাছাকাছি গিয়েছেন, দেখলেন, সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছে। বুঝলেন মেয়েরা জহরব্রত নিয়েছে। হার হয়েছে তাই সকলে চিতা জ্বালিয়েছে মরবার জন্যে। অরিজিৎ কোনোমতে দুর্গে পৌঁছলেন। তখন সমস্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। মেয়েরা আর কেউ নেই। পুরুষরা তাদের শেষ লড়াই লড়ছে। নির্মলকুমারী রক্ষা পেল কিন্তু সে মৃত্যুর হাতে, তাঁর হাতে নয় এই দুঃখ। তখন মনে পড়ল চন্দনী তাঁকে বলেছিল, তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে পর তোমাকে এখানেই ফিরে আসতে হবে ; সেজন্যে, যতদিন হোক, আমি পথ চেয়ে থাকব।

তার পর দুই মাস চলে গেল। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে অরিজিৎ সেই বনের মধ্যে পৌঁছলেন। শাঁখ বেজে উঠল, সানাই বাজল, সবাই পরল নতুন পাগড়ি লাল রঙের, গায়ে ওড়াল বাসন্তীরঙের চাদর। শুভলগ্নে অরিজিতের সঙ্গে চন্দনীর বিবাহ হয়ে গেল।

এই পর্যন্ত হল আমার গল্প। তার পরে বরাবরকার অভ্যাসমত শোবার ঘরের কেদারায় গিয়ে বসলুম। বাদলার হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি হবে-হবে করছে। সুধাকান্ত দেখতে এলেন, দরজা জানালা ঠিকমতো বন্ধ আছে কি না। এসে দেখলেন, আমি কেদারায় বসে আছি। ডাকলেন, কোনো উত্তর নেই। স্পর্শ করে বললেন, ঠাণ্ডা

হাওয়া দিচ্ছে, চলুন বিছানায়।

কোনো সাড়া নেই। তার পরে চৌষট্টি ঘণ্টা কাটল অচেতনে

*

* *

দিন-খাটুনির শেষে
বৈকালে ঘরে এসে
আরামকেদারা যদি মেলে,
গল্পটি মনগড়া,
কিছু বা কবিতা পড়া,
সময়টা যায় হেসেখেলে।
হেথায় শিমুলবন,
পাখি গায় সারাখন,
ফুল থেকে মধু খেতে আসে।
ঝোপে ঘুঘু বাসা বেঁধে
সারাদিন সুর সেধে
আধো ঘুম ছড়ায় বাতাসে।
গোয়ালপাড়ার গ্রামে
মেয়েরা নদীতে নামে,
কলরব আসে দূর হতে।
চারি দিকে ঢেউ তোলে,
বটছায়া জলে দোলে,
বালিকা ভাসিয়া চলে স্রোতে।
দিয়ে জুঁই বেল জবা
সাজানো সুহৃদ্‌সভা,
আলাপপ্রলাপ জেগে ওঠে—
ঠিক সুরে তার বাঁধা,
মুলতানে তান সাধা,
গল্প শোনায় ছেলে জোটে।

ধ্বংস

দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি।—

প্যারিস শহরের অল্প একটু দূরে ছিল তাঁর ছোটো বাসাটি। বাড়ির কর্তার নাম পিয়ের শোপ্যাঁ। তাঁর সারা জীবনের শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের চেহারা, তাদের রঙ, তাদের স্বাদ বদল ক'রে নতুন রকমের সৃষ্টি তৈরি করতে। তাতে কম সময় লাগত না। এক-একটি ফুলের ফলের স্বভাব বদলাতে বছরের পর বছর কেটে যেত। এ কাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধৈর্য। বাগান নিয়ে তিনি যেন জাদু করতেন। লাল হত নীল, সাদা হত আলতার রঙ, আঁটি যেত উড়ে, খোষা যেত খ'সে। যেটা ফলতে লাগে ছ মাস তার মেয়াদ কমে হত দু মাস। ছিলেন গরিব, ব্যাবসাতে সুবিধা করতে পারতেন না। যে করত তাঁর হাতের কাজের তারিফ তাকে দামি মাল অমনি দিতেন বিলিয়ে। যার মতলব ছিল দাম ফাঁকি দিতে সে এসে বলত, কী ফুল ফুটেছে আপনার সেই গাছটাতে, চার দিক থেকে লোক আসছে দেখতে, একেবারে তাক লেগে যাচ্ছে।

তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

তাঁর জীবনের খুব বড়ো শখ ছিল তাঁর মেয়েটি। তার নাম ছিল ক্যামিল। সে ছিল তাঁর দিনরাত্রের আনন্দ, তাঁর কাজকর্মের সঙ্গিনী। তাকে তিনি তাঁর বাগানের কাজে পাকা করে তুলেছিলেন। ঠিকমতো বুদ্ধি করে কলমের জোড় লাগাতে সে তার বাপের চেয়ে কম ছিল না। বাগানে সে মালী রাখতে দেয় নি। সে নিজের হাতে মাটি খুঁড়তে, বীজ বুনতে, আগাছা নিড়োতে, বাপের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করত। এ ছাড়া রেঁধেবেড়ে বাপকে খাওয়ানো, কাপড় শেলাই ক'রে দেওয়া, তাঁর হয়ে চিঠির জবাব দেওয়া— সব কাজের ভার নিয়েছিল নিজে। চেস্ট্‌নাট গাছের তলায় ওদের ছোট্ট এই ঘরটি সেবায় শান্তিতে ছিল মধুমাখা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা খেতে খেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে যেত। ওরা জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজার মণিমানিক দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হয়েছে দুটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে, আর-কোথাও এ পাওয়া যাবে না।

যে ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা ছিল সেই জ্যাক মাঝে মাঝে কাজে যোগ দিতে আসত ; কানে কানে জিগ্‌গেস করত, শুভদিন আসবে কবে। ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত ; বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইত না।

জর্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ফ্রান্সের। রাজ্যের কড়া নিয়ম, পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল চোখের জল লুকিয়ে বাপকে বললে, কিছু ভয় কোরো না, বাবা। আমাদের এই বাগানকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

মেয়েটি তখন হলদে রজনীগন্ধা তৈরি করে তোলবার পরখ করছিল। বাপ বলেছিলেন, হবে না; মেয়ে বলেছিল, হবে। তার কথা যদি খাটে তা হলে যুদ্ধ থেকে বাপ ফিরে এলে তাঁকে অবাক করে দেবে, এই ছিল তার পণ।

ইতিমধ্যে জ্যাক এসেছিল দু দিনের ছুটিতে রণক্ষেত্র থেকে খবর দিতে যে, পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তক্‌মা। নিজে না আসতে পেরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই সুখবর দিতে। জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণসুদ্ধ নিয়ে ছারখার হয়ে গেল বাগানটি। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।

সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাত থেকে। এ'কে বলে কালের উন্নতি।

সভ্যতার কত যে জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো দুই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহু-কালের-জড়ো-করা মন-মাতানো শিল্পের কাজ। মানুষের হাতের তেমন গুণপনা আর-কখনো হয় নি, হবে না। যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কায়দানিতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি। কিন্তু, হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্প কালের আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছু বলতে মন যায় না।

*

* *

মানুষ সবার বড়ো জগতের ঘটনা,
মনে হ'ত, মিছে না এ শাস্ত্রের রটনা
তখন এ জীবনকে পবিত্র মেনেছি
যখন মানুষ বলে মানুষকে জেনেছি।

ভোরবেলা জানালায় পাখিগুলো জাগালে
ভাবিতাম, আছি যেন স্বর্গের নাগালে।
মনে হ'ত, পাকা ধানে বাঁশি যেন বাজানো,
মায়ের আঁচল-ভরা দান যেন সাজানো।
তরী যেত নীলাকাশে সাদা পাল মেলিয়া,
প্রাণে যেত অজানার ছায়াখানি ফেলিয়া।
বুনো হাঁস নদীপারে মেলে যেত পাখা সে,
উতলা ভাবনা মোর নিয়ে যেত আকাশে।
নদীর শুনেছি ধ্বনি কত রাতদুপুরে,
অপ্সরী যেত যেন তাল রেখে নূপুরে।
পূজার বেজেছে বাঁশি ঘুম হতে উঠিতেই,
পূজায় পাড়ার হাওয়া ভরে যেত ছুটিতেই।
বন্ধুরা জুটিতাম কত নব বরষে,
সুধায় ভরিত প্রাণ সুহৃদের পরশে।
পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে
সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিঁচিয়ে।
সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের,
তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।
মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে,
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে।
মানুষকে ভুল ক'রে গড়েছেন বিধাতা,
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা।
দয়া কি হয়েছে তাঁর হতাশের রোদনে,
তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রমসংশোধনে।
আজ তিনি নররূপী দানবের বংশে
মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।

ভালোমানুষ

ছিঃ, আমি নেহাত ভালোমানুষ।

কুসমি বললে, কী যে তুমি বল তার ঠিক নেই। তুমি যে ভালোমানুষ সেও কি বলতে হবে। কে না জানে, তুমি ও পাড়ার লোটনগুণ্ডার দলের সর্দার নও। ভালোমানুষ তুমি বল কাকে।

এইবার ঠিক প্রশ্নটা এসেছে তোমার মুখে। ভালোমানুষ তাকেই বলে যে অন্যায়ের কাছেও নিজের দখল ছেড়ে দেয়, দরাজ হাতের গুণে নয়, মনের জোর নেই বলেই।

যেমন?

যেমন আজই ঘটেছিল সকালে। বেশ একটুখানি গুছিয়ে নিয়ে লিখতে বসেছিলুম, এমনসময় এসে হাজির পাঁচকড়ি। একেবারে সাহারা থেকে সিমুম হাওয়া বয়ে গেল, শুকিয়ে গেল মনের মধ্যে যা-কিছু ছিল তাজা। ঐ একটি প্রাণী বিধাতার কারখানা থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়েছিল, কোনো মানুষের সঙ্গে কোনোখানেই জোড় মেলে না। এক সময়ে ক্যাল্‌কাটাকে উচ্চারণ করেছিল কালকুট্টা, সেই অবধি সবাই ওকে ডাকত কালোকুত্তা। শুনতে শুনতে সেটা ওর কানে সয়ে গিয়েছিল। ইস্কুলে কেউ ওকে দেখতে পারত না। একদিন আমাদের রমেন 'রাস্কেল' ব'লে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘুষিয়ে ওর নাক বাঁকিয়ে দিয়েছিল; ব'লে রেখেছিল, এর পরের বারে কান দেবে বাঁকা ক'রে।

এসেই সে বসল আমার লেখাপড়া করার চৌকিটাতে। ভালোমানুষের মুখ দিয়ে বেরোল না, ওখানে আমি কাজ করব। ডেস্কের উপর ঝুঁকে যেন অন্যমনে এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে দোষ হত না যে, ওগুলো দরকারি জিনিস, ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না। কিন্তু— কী আর বলব। বললে, অনেককাল দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। শুরু করলে, আহা আমাদের সেই ইস্কুলের দিন ছিল কী সুখের। গল্প লাগালে খোঁড়া গোবিন্দ ময়রার। দেখি, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে আমার সোনা-বাঁধানো ফাউন্টেন-পেনটা, চাদরের আড়ালে ওর পকেটের দিকে। বললেই হত, ভুল করছ, কলমটা তোমার নয়, ওটা আমার। কিন্তু, আমি যে ভালোমানুষ, ভদ্রলোকের ছেলে— এতবড়ো লজ্জার কথা ওকে বলি কী ক'রে। ওর চুরিকরা হাতটার দিকে চাইতেই পারলুম না। সন্দেহ করছি লোকটা ব'লে বসবে, আজ এখানেই খাব। বলতে পারব না, না, সে হবে না। ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠেছি। হঠাৎ

মাথায় বুদ্ধি এল ; ব'লে বসলুম, রমেনের ওখানে আমাকে এখনি যেতে হবে।

কালকুত্তা বললে, ভালো হল, তোমার সঙ্গে একত্রেই যাওয়া যাক। ইস্কুল ছেড়ে অবধি তার সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি।

কী মুশকিল। ধপ্ করে বসে পড়লুম। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললুম, বৃষ্টি পড়ছে দেখছি।

ও বললে, তাতে হয়েছে কী। আমার ছাতা নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে এক ছাতাতেই যেতে পারব।

আর কেউ হলে জোর করেই বলত, সে হবে না। কিন্তু, আমার উপায় নেই। তা, ভালোমানুষ হলেও বিপদে পড়লে আমার মাথাতেও বুদ্ধি জোগায়। আমি বললুম, অত অসুবিধা করবার দরকার কী। তার চেয়ে বরঞ্চ ছাতাটা তুমি নিয়ে যাও, যখনি সুযোগ হবে ফিরিয়ে দিলেই হবে।

আর সে তিলমাত্র দেরি করল না। বললে, প্ল্যানটা শোনাচ্ছে ভালো।

ছাতাটা বগলে ক'রে চট্‌পট্ সরে পড়ল। ভয় ছিল, ফাউণ্টেন-পেনের খোঁজ উঠে পড়ে। ছাতা ফেরাবার সুযোগ কোনোদিনই হবে না। হায় রে, আমার পনেরো টাকা দামের সিল্কের ছাতাটা। ছাতা ফিরবে না, ফাউণ্টেন-পেনও ফিরবে না, কিন্তু সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে— সেও ফিরবে না।

কী বল, দাদামশায়! তোমার সেই ফাউণ্টেন-পেন, সেই ছাতা, তুমি ফিরে পাবে না?

ভদ্র বিধান-মতে ফিরে পাবার আশা নেই।

আর, অভদ্র বিধান-মতে?

ভালোমানুষের কুষ্ঠিতে সে লেখে না।

আমি তো ভালোমানুষ নই, আমি তাকে চিঠি লিখব— তোমার সে কথা জানবার দরকার হবে না।

আরে ছিছি, না না, সে কি হয়। আর, লিখে হবেই বা কী। সে বলবে, আমি নিই নি।

জানি, ও তাই বলবে। কিন্তু, আমরা যে জেনেছি ও চুরি করেছে, সেইটেই ওকে আমি জানাতে চাই।

সর্বনাশ! ঠিক সেইটেই ওকে জানাতে চাই নে— ভদ্রলোকের ছেলে চুরি করেছে— ছিছি, কতবড়ো লজ্জার কথা। আমার এমন কত গেছে, তুমি তখন জন্মাও

নি। তখন ব্রাউনিঙের কবিতার আদর নতুন বেড়েছে। খুব আগ্রহ করে পড়ছিলুম। আমার সাহিত্যিক বন্ধুকে উৎসাহ করে একটা কবিতা পড়ে শোনালুম। তিনি বললেন, এ বইটা আমার নিশ্চয় পড়া চাই, তিন দিন পরেই ফিরিয়ে দেব। আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বললুম, এটা আমি এখন পড়ছি। এতই ভালোমানুষের সুরে বলেছিলুম যে বইটা রাখতে পারা গেল না। দিনকয়েক পরে খবর নিয়ে জানলুম, তিনি গেছেন একটা মকদ্দমার তদবির করতে বহরমপুরে। ফিরতে দেরি হবে। আমার জানা হকারকে ব'লে দিলুম, ব্রাউনিঙের বড়ো এডিশনটা যদি পাওয়া যায় আমাকে যেন জানায়। কিছুদিন পরে খবর পেলাম, পাওয়া গেছে। বইটা বের করে দেখালে, আমারই সেই বই। যে পাতাখানায় আমার নাম লেখা ছিল সেই পাতাটা ছেঁড়া। কিনে নিলুম। তার পর থেকে সেই বইখানা লুকিয়ে রাখতে হল, যেন আমিই চোর। আমার লাইব্রেরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পাছে বইখানা তাঁর হাতে ঠেকে। আমার কাছে তাঁর বিদ্যে ধরা পড়েছে, এ কথাটা পাছে তিনি জানতে পান। আহা, হাজার হোক, ভদ্রলোক।

আর বলতে হবে না, দাদামশায়, পষ্ট বুঝেছি কাকে বলে ভালোমানুষ।

*

* *

মণিরাম সত্যই স্যায়না,
বাহিরের ধাক্কা সে নেয় না।
বেশি ক'রে আপনারে দেখাতে
চায় যেন কোনোমতে ঠেকাতে।
যোগ্যতা থাকে যদি থাক্‌-না,
ঢাকে তারে চাপা দিয়ে ঢাকনা।
আপনারে ঠেলে রেখে কোণেতে
তবে সে আরাম পায় মনেতে।
যেথা তারে নিতে চায় আগিয়ে
দূরে থাকে সে সভায় না গিয়ে।
বলে না সে, আরো দে বা খুবই দে ;
ঠেলা নাহি মারে পেলে সুবিধে।

যদি দেখে টানাটানি খাবারে
বলে, কী যে পেট ভার, বাবা রে !
ব্যঞ্জনে নুন নেই, খাবে তা ;
মুখ দেখে বোঝা নাহি যাবে তা।
যদি শোনে, যা তা বলে লোকরা
বলে, আহা, ওরা ছেলে-ছোকরা।
পাঁচু বই নিয়ে গেল না ব'লে ;
বলে, খোঁটা দিয়ো নাকো তা ব'লে।
বন্ধু ঠকায় যদি, সইবে ;
বলে, হিসাবের ভুল দৈবে।
ধার নিয়ে যায় কোনো সাড়া নেই
বলে তারে, বিশেষ তো তাড়া নেই।
যত কেন যায় তারে ঘা মারি
বলে, দোষ ছিল বুঝি আমারি।

মুক্তকুন্তলা

আমার খুদে বন্ধুরা এসে হাজির তাদের নালিশ নিয়ে। বললে, দাদামশায় তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ মনে কর।

তা, ভাই, ঐ ভুলটাই তো করেছিলুম। আজকাল নিজেরই বয়েসটার ভুল হিসেব করতে শুরু করেছি।

রূপকথা আমাদের চলবে না, আমাদের বয়েস হয়ে গেছে।

আমি বললুম, ভায়া, রূপকথার কথাটা তো কিছুই নয়। ওর রূপটাই হল আসল। সেটা সব বয়েসেই চলে। আচ্ছা, ভালো, যদি পছন্দ না হয় তবে দেখি খুঁজে-পেতে। নিজের বয়েসটাতে ডুব মেরে তোমাদের বয়েসটাকে মনে আনতে চেষ্টা করছি। তার থলি থেকে রূপকথা নাহয় বাদ দিলুম, তার পরের সারে দেখতে পাই মৎস্যনারীর উপাখ্যান। সেও চলবে না। তোমরা নতুন যুগের ছেলে, খাঁটি খবর চাও ; ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসবে, লেজা যদি হয় মাছের, মুড়ো কী করে হবে মানুষের। রোসো, তবে ভেবে দেখি। তোমাদের বয়েসে, এমন-কি তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়েসে আমরা ম্যাজিকওয়ালা হরীশ হালদারকে পেয়ে বসেছিলুম। শুধু তাঁর ম্যাজিকে হাত

ছিল না, সাহিত্যেও কলম চলত। আমাদের কাছে সেও ছিল ম্যাজিক-বিশেষ। আজও মনে আছে একটা ঝুল্‌ঝুলে খাতায় লেখা তাঁর নাটকটা, নাম ছিল মুক্তকুন্তলা। এমন নাম কার মাথায় আসতে পারে! কোথায় লাগে সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী। তার পর তার মধ্যে যা সব লম্বা চালের কথাবার্তা, তার বুলিগুলো শুনে মনে হয়েছিল, এ কালিদাসের ছাপ-মারা মাল। বীরাঙ্গনার দাপট কী! আর, দেশ-উদ্ধারের তাল ঠোকা! নাটকের রাজপুত্রটি ছিলেন স্বয়ং পুরুরাজের ভাগ্নে; নাম ছিল রণদুর্ধর্ষ সিং। এও একটা নাম বটে, মুক্তকুন্তলার নামের সঙ্গে সমান পাঁয়তারা করতে পারে। আমাদের তাক লেগে গেল।—

আলেকজাণ্ডার এসেছিলেন ভারত জয় করতে। রণদুর্ধর্ষ বিদায় নিতে এলেন মুক্তকুন্তলার কাছে। মুক্তকুন্তলা বললেন, যাও বীরবর, যুদ্ধে জয়লাভ করে এসো, আলেকজাণ্ডারের মুকুট এনে দেওয়া চাই আমার পায়ের তলায়। যুদ্ধে মারা পড়লেও পাবে তুমি স্বর্গলোক, আর যদি বেঁচে ফিরে এস তো স্বয়ং আছি আমি।

উঃ, কতবড়ো চটাপট হাততালির জায়গা একবার ভেবে দেখো। আমি রাজি হলেম মুক্তকুন্তলা সাজতে, কেননা আমার গলার আওয়াজটা ছিল মিহি।

আমাদের দালানের পিছন দিকে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল, তাকে বলা হত গোলাবাড়ি। সত্যিকার ছেলেমানুষের পক্ষে সেই জায়গাটা ছিল ছুটির স্বর্গ। সেই গোলাবাড়ির একটা ধারে আমাদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘর, লোহার গরাদে দেওয়া; সেই গরাদের মধ্যে হাত গলিয়ে বস্তার ফাঁকের থেকে ডাল চাল কুড়িয়ে আনতুম। ইঁটের উনুন পেতে কাঠকোট জোগাড় করে চড়িয়ে দিতুম ছেলেমানুষি খিচুড়ি। তাতে না ছিল নুন, না ছিল ঘি, না ছিল কোনোপ্রকার মসলার বালাই। কোনোমতে আধসিদ্ধ হলে খেতে লেগে যেতুম। মনে হয় নি ভোজের মধ্যে নিন্দের কিছু ছিল। এই গোলাবাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে গোটাকতক বাখারি জোগাড় করে হ. চ. হ., আমাদের বিখ্যাত নাট্যকার, নানা আয়তনের খবরের কাগজ পুরেজুড়ে একটা স্টেজ খাড়া করেছিলেন। স্টেজ শব্দটা মনে করেই আমাদের বুক ফুলে উঠত। এই স্টেজে আমাকে সাজতে হবে মুক্তকুন্তলা। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু হতভাগিনী মুক্তকুন্তলার দুঃখের দশা কিছু কিছু মনে পড়ে। এইটুকু জানি, তিনি তলোয়ার হাতে বীরপুরুষের সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ঘোড়ায় চ'ড়ে। কিন্তু, ঘোড়াটা যে কার সাজবার কথা ছিল সে ঠিক মনে আনতে পারছি নে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বীরললনা যে স্বদেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বুকে যখন বর্শা (পাতকাঠি) বিদ্ধ হল, যখন মাটিতে তাঁর মুক্তকুন্তল লুটিয়ে পড়ছে, রণদুর্ধর্ষ পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বীরাঙ্গনা বললেন, বীরবর, আমাকে এখন বিদায় দাও, হয়তো স্বর্গে গিয়ে দেখা হবে। আহা, আবার হাততালির পালা।

অভিনয়ের জোগাড়যন্ত্র মোটামুটি একরকম হয়ে এসেছিল। হরীশচন্দ্র কোথা থেকে এনেছিলেন নানা রকমের পরচুলো গোঁফদাড়ি। বউদিদির হাতে পায়ে ধরে দুটো-একটা শাড়িও জোগাড় করেছিলুম। তাঁর কৌটা থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথেয় পরবার সময় কোনো ভাবনা মনে আসে নি। স্কুলে যাবার সময় ভুলেছিলুম তার দাগ মুছতে। ছেলেদের মধ্যে মস্ত হাসি উঠেছিল। কিছুদিন আমার ক্লাসে মুখ দেখাবার জো রইল না। নাটকের অভিনয়ে সবচেয়ে ফল দেখা গেল এই হাসিতে। আর, বাকিটুকু হয়ে গেল একেবারে ফাঁকি। যেখানে আমাদের স্টেজের বাখারি পোঁতা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় সেজদাদা কুস্তির আখড়া পত্তন করলেন। মুক্ত-কুন্তলার সবচেয়ে দুঃখের দশা হল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, এই কুস্তির আড্ডায়। রণদুর্ধর্ষকে মিহি গলায় বলবার সুযোগ পেলেন না, হে বীরবর, স্বর্গে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে। তার বদলে বলতে হল, সাড়ে নটা বাজল, স্কুলের গাড়ি তৈরি।

এর থেকেই বুঝবে, আমরা যখন ছেলেমানুষ ছিলেম সে ছিলেম খাঁটি ছেলেমানুষ।

*

* *

'দাদা হব' ছিল বিষম শখ—
তখন বয়স বারো হবে,
কড়া হয় নি ত্বক।
স্টেজ বেঁধেছি ঘরের কোণে,
বুক ফুলিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
হয়েছিল দাদার অভিনয়;
কাঠের তরবারি মেরে
দাড়ি-পরা বিপক্ষেরে
বারে বারেই করেছিলুম জয়।
আজ খসেছে মুখোষটা সে,
আরেক লড়াই চারি পাশে—
মারছি কিছু অনেক খাচ্ছি মার।

দিন চলেছে অবিরত,
ভাবনা মনে জমছে কত,
　　ষোলো-আনা নয় সে অহংকার।
দেখছে নতুন পালার দাদা
হাত দুটো তার পড়ছে বাঁধা
　　এ সংসারের হাজার গোলামিতে।
তবুও সব হয় নি ফাঁকি,
তহবিলে রয় যা বাকি
　　কাজ চলছে দিতে এবং নিতে।
সাঙ্গ হয়ে এল পালা,
নাট্যশেষের দীপের মালা
　　নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে।
রঙিন ছবির দৃশ্য রেখা
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা,
　　আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জ'মে।
সময় হয়ে এল এবার
স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,
　　নেবে আসছে আঁধার-যবনিকা।
খাতা হাতে এখন বুঝি
আসছে কানে কলম গুঁজি
　　কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা।
চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা
ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা
　　কোনোমতেই চলবে না তো আর।
অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে
পড়বে ধরা শেষ গণিতে
　　জিত হয়েছে কিংবা হল হার।

—

প্রবন্ধ

বাংলাভাষা-পরিচয়

উৎসর্গ

ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

করকমলে

ভূমিকা

ছাত্রপাঠকদের প্রতি

ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা ক'রে বিস্মিত হই। আজ যে বাংলা ভাষা বহুলক্ষ মানুষের মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে সহজ করেছে পরস্পরের প্রতি মুহূর্তের বোঝাপড়া, আলাপ-পরিচয়, এর দীপ্তির পথরেখা অনুসরণ করে চললে কালের কোন্ দূরদুর্গম দিগন্তে গিয়ে পৌঁছব। তারা কোন্ যাযাবর মানুষ, যারা অজানা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রায় দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের পথিক ছিল, যারা এই ভাষার প্রথম কম্পমান অস্পষ্ট শিখার প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল অখ্যাত জন্মভূমি থেকে সুদীর্ঘ বন্ধুর বাধাজটিল পথে। সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে আর-এক যুগের বাতির মুখে জ্বলতে জ্বলতে আজ আমার এই কলমের আগায় আপন আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল। ইতিহাসের যে বিপুল পরিবর্তনের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদিযাত্রীরা চলে এসেছে তারই প্রভাবে সেই শ্বেতকায় পিঙ্গলকেশ বিপুলশক্তি আরণ্যকদের সঙ্গে এই শ্যামলবর্ণ ক্ষীণ-আয়ু শহরবাসী ইংরেজ রাজত্বের প্রজার সাদৃশ্য ধূসর হয়েছে কালের ধূলিক্ষেপে। কেবল মিল চলে এসেছে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাষার প্রাচীন সূত্রে। সে ভাষায় মাঝে মাঝে নতুন সূত্রের জোড় লেগেছে, কোথাও কোথাও ছিন্ন হয়ে তাতে বেঁধেছে পরবর্তী কালের গ্রন্থি, কোথাও কোথাও অনার্য হাতের ব্যবহারে তার সাদা রঙ মলিন হয়েছে, কিন্তু তার ধারায় ছেদ পড়ে নি। এই ভাষা আজও আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদিজন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেউ জানে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অস্পষ্ট ইতিবৃত্তের প্রাকৃত লোকেরা যে ভাষায় কথা কইত, দুই প্রধান শাখায় তা বিভক্ত ছিল— শৌরসেনী ও মাগধী। শৌরসেনী ছিল পাশ্চাত্য হিন্দির মূলে, মাগধী অথবা প্রাচ্যা ছিল প্রাচ্য হিন্দির আদিতে। আর ছিল ওড্রী, ওড়িয়া; গৌড়ী, বাংলা। আসামীর

উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু অনতিপ্রাচীন যুগে আসামীতে গদ্য ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এত বাংলায় পাই নে। সেই-সব দৃষ্টান্তে যে ভাষার পরিচয় পাই তার সঙ্গে বাংলার প্রভেদ নেই বললেই হয়।

মাগধী এবং শৌরসেনীর মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। হর্নলে সাহেবের মতে এই সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। এই ভাষা পশ্চিম থেকে ক্রমে পূর্বের দিকে এসেছে। আর দ্বিতীয় ভাষাপ্রবাহ শৌরসেনী ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'রে পশ্চিম দেশ অধিকার করেছিল। হর্নলের মতে আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল দুইবার পরে পরে। উভয়ের ভাষায় মূলগত ঐক্য থাকলেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে।

নদী যেমন অতিদূর পর্বতের শিখর থেকে ঝরনায় ঝরনায় ঝরে ঝরে নানা দেশের ভিতর দিয়ে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছয়, তেমনি এই দূর কালের মাগধী ভাষা আর্য জনসাধারণের বাণীধারায় বয়ে এসে সুদূর যুগান্তরে ভারতের সুদূর প্রান্তে বাংলাদেশের হৃদয়কে আজ ধ্বনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে। আজও শেষ হল না তার প্রকাশ-লীলা। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে সে বিস্তৃত হয়েছে, মিশ্রিত হয়েছে, গভীর হয়েছে তার প্রবাহ, দেশের সীমা ছাড়িয়ে সর্বদেশের আবেষ্টনের সঙ্গে এসে মিলেছে। সেই দূর কালের সঙ্গে আর আমাদের এই বর্তমান কালের, বহু দেশের অজানা চিত্তের সঙ্গে আর বাংলাদেশের নবজাগ্রত চিত্তের মিলনের দৌত্য নিয়ে চলেছে এই অতিপুরাতন এবং এই অতি-আধুনিক বাক্যস্রোত, এই কথা ভেবে এর রহস্যে বিস্মিত হয়ে আছি। সেই বিস্ময়ের প্রকাশ আমার এই বইটিতে।

ভাষা জিনিসটা আমরা অত্যন্ত সহজে ব্যবহার করি, কিন্তু তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখা একটুও সহজ নয়। যে নিয়মের ঐক্য ধারে পরিচয় সহজ হয় ভাষার ইতিহাসে একটা তার অবিচ্ছিন্ন সূত্রও থাকে, আবার তার বদলও চলে পদে পদে। কেন বদল হয় তার ভালো কৈফিয়ত সব সময়ে পাওয়া যায় না। সে-সমস্ত কঠিন সমস্যার বিচার নিয়ে এ বই লিখছি নে। ভাষার ক্ষেত্রে চলতে চলতে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে,

আশ্চর্য করেছে, তারই কৌতুকের ভাগ সকলকে দেব বলেই লেখবার ইচ্ছে হল। বিষয়টাকে যাঁরা ফলাও করে দেখছেন ও তলিয়ে বুঝেছেন, এ লেখায় তাঁদের কাছে দুটো-চারটে খুঁত বেরোবেই। কিন্তু তা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাত এই— তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোলবিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী। নানা দেশের শব্দমহলের, এমন-কি তার প্রেতলোকের হাটহদ্দ জানেন তিনি, প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে। চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি বকে যাব। তাতে ক'রে মনে তোমরা সেই চলে বেড়াবার স্বাদটা পাবে। তারও দাম আছে। তোমাদের জন্যে বিশ্বপরিচয় বইখানা লিখেছিলুম এই ভাবেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হয়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন-ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটোখাটো অপরাধ যদি ঘটে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার খণ্ডন হতে পারে। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল বলেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শখটা তোমাদের মনে যদি জাগাতে পারি তা হলে আমার যতটুকু শক্তি সেই অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে করে আশ্বস্ত হব।

মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তারই ব্যাখ্যা করে এই বইটি আরম্ভ করেছি। তার পরে, এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে। এই প্রাকৃতেরই স্বভাব বিচার করেছি এই বইয়ে। লেখকের পক্ষে একটা মুশকিল আছে। চলতি বাংলা চলতি

বলেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়। হয়তো উচ্চারণে এবং বাক্যব্যবহারে একজনের সঙ্গে আর-একজনের সকল বিষয়ে মিল এখনও পাকা হতে পারে নি। কিন্তু যে ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে এলোমেলো ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে। এখন থেকে বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই। এই গ্রন্থে রইল তার প্রথম চেষ্টা। ক্রমে ক্রমে নানা লোকের অধ্যবসায়ে এই ভাষার দ্বিধাগ্রস্ত প্রথাগুলি বিধিবদ্ধ হতে পারবে। এই গ্রন্থে সমর্থিত কোনো উচ্চারণ বা ভাষারীতি কারও কারও অভ্যস্ত নয়। সুতরাং ব্যবহারে পরস্পরের পার্থক্য আছে। সেই অবস্থায় রাশীকরণের প্রণালীতে অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের সাংখ্যিক তুলনায় তার বিচার স্থির হতে পারবে।

শান্তিনিকেতন
৭ কার্তিক, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাভাষা-পরিচয়

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্রয়ের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বহ হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকায় জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষ একলা নয়। প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত, বহু মানুষের হাতে তৈরি।

কখনো কখনো শোনা গেছে, বনের জন্তু মানুষের শিশুকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। কিছুকাল পরে লোকালয়ে যখন তাকে ফিরে পাওয়া গেছে তখন দেখা গেল জন্তুর মতোই তার ব্যবহার। অথচ সিংহের বাচ্ছাকে জন্মকাল থেকে মানুষের কাছে রেখে পুষলে সে নরসিংহ হয় না।

এর মানে, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানবসন্তান মানুষই হয় না, অথচ তখন তার জন্তু হতে বাধা নেই। এর কারণ বহু যুগের বহু কোটি লোকের দেহ মন মিলিয়ে মানুষের সত্তা। সেই বৃহৎ সত্তার সঙ্গে যে পরিমাণে সামঞ্জস্য ঘটে ব্যক্তিগত মানুষ সেই পরিমাণে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। সেই সত্তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে মহামানুষ।

এই বৃহৎ সত্তার মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো বিভাগ আছে। তাকে বলা যেতে পারে জাতিক সত্তা। ধারাবাহিক বহু কোটি লোক পুরুষপরম্পরায় মিলে এক-একটা সীমানায় বাঁধা পড়ে।

এদের চেহারার একটা বিশেষত্ব আছে। এদের মনের গড়নটাও কিছু বিশেষ ধরণের। এই বিশেষত্বের লক্ষণ অনুসারে দলের লোক পরস্পরকে বিশেষ আত্মীয় বলে অনুভব করে। মানুষ আপনাকে সত্য বলে পায় এই আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা বহুদূরব্যাপী বৃহৎ ঐক্যজালে।

মানুষকে মানুষ ক'রে তোলবার ভার এই জাতিক সত্তার উপরে। সেইজন্যে মানুষের সবচেয়ে বড়ো আত্মরক্ষা এই জাতিক সত্তাকে রক্ষা করা। এই তার বৃহৎ দেহ, তার বৃহৎ আত্মা। এই আত্মিক ঐক্যবোধ যাদের মধ্যে দুর্বল, সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠবার শক্তি তাদের ক্ষীণ। জাতির নিবিড় সম্মিলিত শক্তি তাদের পোষণ করে না, রক্ষা করে না। তারা পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, এই বিশ্লিষ্টতা মানবধর্মের বিরোধী। বিশ্লিষ্ট মানুষ পদে পদে পরাভূত হয়, কেননা তারা সম্পূর্ণ মানুষ নয়।

যেহেতু মানুষ সম্মিলিত জীব এইজন্যে শিশুকাল থেকে মানুষের সবচেয়ে প্রধান শিক্ষা— পরস্পর মেলবার পথে চলবার সাধনা। যেখানে তার মধ্যে জন্তুর ধর্ম প্রবল সেখানে স্বেচ্ছা এবং স্বার্থের টানে তাকে স্বতন্ত্র করে, ভালোমত মিলতে দেয় বাধা; তখন সমষ্টির মধ্যে যে ইচ্ছা, যে শিক্ষা, যে প্রবর্তনা দীর্ঘকাল ধরে জমে আছে সে জোর ক'রে বলে, 'তোমাকে মানুষ হতে হবে কষ্ট ক'রে; তোমার জন্তুধর্মের উল্টো পথে গিয়ে।' জাতিক সত্তার অন্তর্গত প্রত্যেকের মধ্যে নিয়ত এই ক্রিয়া চলছে ব'লে একটা বৃহৎ সীমানার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁদের মনুষ্যসংঘ তৈরি হয়ে উঠছে। একটা বিশেষ জাতিক নামের ঐক্যে তারা পরস্পর পরস্পরকে চেনে, তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ আচরণ নিশ্চিন্ত মনে প্রত্যাশা করতে পারে। মানুষ জন্মায় জন্তু হয়ে, কিন্তু এই সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দুঃখ করে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

এই-যে বহুকালক্রমাগত ব্যবস্থা যাকে আমরা সমাজ নাম দিয়ে থাকি, যা মনুষ্যত্বের প্রেরয়িতা, তাকেও সৃষ্টি করে চলেছে মানুষ প্রতিনিয়ত— প্রাণ দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, নব নব অভিজ্ঞতা দিয়ে, কালে কালে তার সংস্কার ক'রে। এই অবিশ্রাম দেওয়া-নেওয়ার দ্বারাই সে প্রাণবান হয়ে ওঠে, নইলে সে জড়যন্ত্র হয়ে থাকত এবং তার দ্বারা পালিত এবং চালিত মানুষ হত কলের পুতুলের মতো; সেই-সব যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা মানুষের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনা থাকত না, তাদের মধ্যে অগ্রসরগতি হত অবরুদ্ধ।

সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন, এমন-সব নক্ষত্র আছে যারা দীপ্তিহারা, তাদের প্রকাশ নেই, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তারা অখ্যাত। জীবজগতে মানুষ জ্যোতিষ্কজাতীয়। মানুষ দীপ্ত নক্ষত্রের মতো কেবলই আপন প্রকাশশক্তি বিকীর্ণ করছে। এই শক্তি তার ভাষার মধ্যে।

জ্যোতিষ্কনক্ষত্রের মধ্যে পরিচয়ের বৈচিত্র্য আছে ; কারও দীপ্তি বেশি, কারও দীপ্তি ম্লান, কারও দীপ্তি বাধাগ্রস্ত। মানবলোকেও তাই। কোথাও ভাষার উজ্জ্বলতা আছে, কোথাও নেই। এই প্রকাশবান নানা জাতির মানুষ ইতিহাসের আকাশে আলোক বিস্তীর্ণ করে আছে। আবার কাদেরও বা আলো নিবে গিয়েছে, আজ তাদের ভাষা লুপ্ত।

জাতিক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই-যে ভাষা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে, এ আমাদের বিস্মিত করে না, যেমন বিস্মিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি— যে চোখের দ্বার দিয়ে নিত্যনিয়ত আমাদের পরিচয় চলছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু একদিন ভাষার সৃষ্টিশক্তিকে মানুষ দৈবশক্তি বলে অনুভব করেছে সে কথা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি য়িহুদি পুরাণে বলেছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল বাক্য ; যখন শুনি ঋগ্বেদে বাগ্‌দেবতা আপন মহিমা ঘোষণা ক'রে বলছেন—

> আমি রাজ্ঞী। আমার উপাসকদের আমি ধনসমূহ দিয়ে থাকি। পূজনীয়াদের মধ্যে আমি প্রথমা। দেবতারা আমাকে বহু স্থানে প্রবেশ করতে দিয়েছেন।
>
> প্রত্যেক মানুষ, যার দৃষ্টি আছে, প্রাণ আছে, শ্রুতি আছে, আমার কাছ থেকেই সে অন্ন গ্রহণ করে। যারা আমাকে জানে না তারা ক্ষীণ হয়ে যায়।
>
> আমি স্বয়ং যা বলে থাকি তা দেবতা এবং মানুষদের দ্বারা সেবিত। আমি যাকে কামনা করি তাকে বলবান করি, সৃষ্টিকর্তা করি, ঋষি করি, প্রজ্ঞাবান করি।

২

কোঠাবাড়ির প্রধান মসলা ইট, তার পরে চুন-সুরকির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইট, বাংলায় তাকে বলি 'কথা'। নানারকম শব্দচিহ্নের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা।

মাটির তাল নিয়ে চাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কুমোর গ'ড়ে তোলে হাঁড়িকুঁড়ি, নানা খেলনা, নানা মূর্তি। মানুষ সেইরকম গলার আওয়াজটাকে ঠোঁটে দাঁতে জিভে

টাকরায় নাকের গর্তে ঘুরিয়ে ধ্বনির পুঞ্জ গড়ে তুলেছে ; মানুষের মনের ঝোঁক, হৃদয়ের আবেগ সেইগুলোকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে নানা আকার দিচ্ছে।

দোয়েল-কোকিলরাও ধ্বনি দিয়ে ভাব প্রকাশ করে। মানুষের ভাষার ধ্বনি তেমন সহজ নয়। মানুষের অন্য নানা আচরণের মতো প্রত্যেক শিশুকে নতুন ক'রে শুরু করতে হয়েছে ভাষার অভ্যেস, জাগিয়ে রাখতে হয়েছে এর কৌশল। সেইজন্যে মানুষের ভাষা বাঁধা পড়ে যায় না একই অচল ঠাটে।

আস্তে আস্তে বদল তার চলেইছে, দু-তিন শো বছর আগেকার ভাষার সঙ্গে পরের ভাষার তফাত ঘটে আসছেই। তবু বিশেষ জাতের ভাষার মূল স্বভাবটা থেকে যায়, কেবল তার আচারের কিছু কিছু বদল হয়ে চলে। সেইজন্যেই প্রাচীন বাংলাভাষা বদল হতে হতে আধুনিক বাংলায় এসে দাঁড়িয়েছে, অমিল আছে যথেষ্ট, তবু তার স্বভাবের কাঠামোটাকে নিয়ে আছে তার ঐক্য।

ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কাঠামোর বিচার ক'রে ভাষার জাত নির্ণয় করেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণে সমস্ত শব্দেরই এক-একটা মূল ধাতু আন্দাজ করা হয়েছে। সব আন্দাজগুলিই সম্পূর্ণ সত্য হোক বা না হোক, এর গোড়াকার তত্ত্বটাকে মানি। প্রাণজগতে প্রাণীসৃষ্টির আরম্ভে দেখা দেয় একটি একটি ক'রে জীবকোষ, তার পরে তাদেরই সমবায়ে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে অবয়বধারী জীব। এক-একটি জীব এক-একটি বিশেষ কাঠামো নিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস অনুসরণ করে। জীববিজ্ঞানীরা তাদের সেই কাঠামোর ঐক্য থেকে নানা পরিবর্তনের ভিতরেও তাদের শ্রেণী নির্ণয় করেন।

ভারতবর্ষের কতকগুলি বিশেষ ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানী গৌড়ীয় ভাষা নাম দিয়ে তাদের মেলবন্ধন করেছেন। আমি বাঙালী, মারাঠি ভাষা শুনলে তার অর্থ বুঝতে পারি নে ; কিন্তু দুটো ভাষাই যে এক জাতের, ভাষাবিজ্ঞানীরা সেটা ধরতে পেরেছেন তাদের কাঠামো থেকে। পুষ্‌তু ভাষায় কথা কয় পাঠানেরা, ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমানা পেরিয়ে ; পূর্ব সীমানায় আমরা বলি বাংলা। কিন্তু দুই ভাষারই কঙ্কাল-সংস্থানের মধ্যে যে ঐক্য আছে তার থেকে বোঝা যায় এরা আত্মীয়। এই দুই ভাষাতেই বহুসংখ্যক ধ্বনি গড়ে উঠেছে শব্দ হয়ে। একটা মূলস্বভাব তাদের ঐক্য দিয়েছে। শব্দগুলো বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে সেই স্বভাবটা ধরা পড়ে। এর থেকে বোঝা যায়, এক-এক জাতির ভাষা তার স্বতন্ত্র খেয়ালের সৃষ্টি নয়। কতকগুলি মূল ধ্বনিসংকেত নিয়ে যারা ভাষার কারবার আরম্ভ করেছিল, তারা ছড়িয়ে পড়েছে নানা দেশে। কিন্তু ধ্বনিসংকেতের আত্মীয়তা ধরা পড়ে তাঁদের কাছে, ভাষাদৃষ্টির অভিজ্ঞতা

যাঁদের আছে। প্রাচীন যুগের ঘোড়া আর এখনকার ঘোড়ায় প্রভেদ আছে বিস্তর, কিন্তু তাদের কঙ্কালের ছাঁদ দেখলে বোঝা যায়, তারা এক বংশের। ভাষার মধ্যেও সেই কঙ্কালের ছাঁদের মিল পেলেই তাদের একজাতীয়তা ধরা পড়ে।

ভাষা বানিয়েছে মানুষ, এ কথা কিছু সত্য আবার অনেকখানি সত্য নয়। ভাষা যদি ব্যক্তিগত কোনো মানুষের বা দলের কৃতকার্য হত তা হলে তাকে বানানো বলতুম; কিন্তু ভাষা একটা সমগ্র জাতের লোকের মন থেকে, মুখ থেকে, ক্রমশই গড়ে উঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জমিতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের গাছপালা যেমন অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে, ভাষার মূলপ্রকৃতিও তেমনি। মানুষের বাগ্‌যন্ত্র যদিও সব জাতের মধ্যেই একই ছাঁদের তবু তাদের চেহারায় তফাত আছে, এও তেমনি। বাগ্‌যন্ত্রের একটা-কিছু সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাতেই উচ্চারণের গড়ন যায় বদলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুখে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের মিশ্রণ ঘটবার রাস্তায় তফাত দেখতে পাওয়া যায়। তার পরে তাদের চিন্তার আছে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ, তাতে শব্দ জোড়বার ধরণ ও ভাষার প্রকৃতি আলাদা ক'রে দেয়। ভাষা প্রথমে আরম্ভ হয় নানারকম দৈবাৎ শব্দসংঘাতে, তার পরে মানুষের দেহমনের স্বভাব অনুসরণ করে সেই-সব সংকেতের ধারায় সে ভরে উঠতে থাকে। পথহীন মাঠের মধ্যে দিয়ে যখন একজন বা দু-চারজন মানুষ কোনো-এক সময়ে চলে গেছে, তখন তাদের পায়ের চাপে মাটি ও ঘাস চাপা প'ড়ে একটা আকস্মিক সংকেত তৈরি হয়েছে। পরবর্তী পথিকেরা পায়ের তলায় তারই আহ্বান পায়। এমনি করে পদক্ষেপের প্রবাহে এ পথ চিহ্নিত হতে থাকে। যদি পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে মানুষ এ পথ বানাতে বিশেষ চেষ্টা করত তা হলে রাস্তা হত সিধে; কিন্তু দেখতে পাই, মেঠো পথ চলেছে বেঁকেচুরে। তাতে রাস্তা দীর্ঘ হয়েছে কি না সে কথা কেউ বিচার করে নি।

ভাষার আকস্মিক সংকেত এমনি ক'রে অলক্ষ্যে টেনে নিয়ে চলেছে যে পথে সেটা আঁকাবাঁকা পথ। হিসেব ক'রে তৈরি হয় নি, হয়েছে ইশারা থেকে ইশারায়। পুরোনো রাস্তা কিছু কিছু জীর্ণ হয়েছে, আবার তার উপরে নতুন সংস্কারেরও হাত পড়েছে। অনেক খুঁত আছে তার মধ্যে, নানা স্থানেই সে যুক্তিসংগত নয়। না হোক, তবু সে প্রাণের জিনিস, সমস্ত জাতের প্রাণমনের সঙ্গে সে গেছে এক হয়ে।

৩

মানুষের একটা গুণ এই যে সে প্রতিমূর্তি গড়ে; তা সে পটে হোক, পাথরে হোক, মাটিতে ধাতুতে হোক। অর্থাৎ একটি বস্তুর অনুরূপে আর-একটিকে বানাতে সে আনন্দ

পায়। তার আর-একটি গুণ প্রতীক তৈরি করা, খেলার আনন্দে বা কাজের সুবিধের জন্যে। প্রতীক কোনো-কিছুর অনুরূপ হবে, এমন কথা নেই। মুখোষ প'রে বড়োলাটসাহেবের পক্ষে অবিকল রাজার চেহারার নকল করা অনাবশ্যক। ভারতবর্ষের গদিতে তিনি রাজার স্থান দখল করে কাজ চালান— তিনি রাজার প্রতীক বা প্রতিনিধি। প্রতীকটা মেনে নেওয়ার ব্যাপার। ছেলেবেলায় মাস্টারি খেলা খেলবার সময় মেনে নিয়েছিলুম বারান্দার রেলিংগুলো আমার ছাত্র। মাস্টারি শাসনের নিষ্ঠুর গৌরব অনুভব করবার জন্যে সত্যিকার ছেলে সংগ্রহ করবার দরকার হয় নি। এক টুকরো কাগজের সঙ্গে দশ টাকার চেহারার কোনো মিল নেই, কিন্তু সবাই মিলে মেনে নিয়েছে দশ টাকা তার দাম, দশ টাকার সে প্রতীক। এতে দলের লোকের দেনাপাওনাকে সোজা ক'রে দেওয়া হল।

ভাষা নিয়ে মানুষের প্রতীকের কারবার। বাঘের খবর আলোচনা করবার উপলক্ষ্যে স্বয়ং বাঘকে হাজির করা সহজও নয়, নিরাপদও নয়। বাঘে মানুষকে খায়, এই সংবাদটাকে প্রত্যক্ষ করানোর চেষ্টা নানা কারণেই অসংগত। 'বাঘ' ব'লে একটা শব্দকে মানুষ বানিয়েছে বাঘ জন্তুর প্রতীক। বাঘের চরিত্রে জানবার বিষয় থাকতে পারে বিস্তর, সে-সমস্তই ব্যবহার করা এবং জমা করা যায় ভাষার প্রতীক দিয়ে। মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে এই তার একটি বিরাট প্রতীকের জগৎ। এই প্রতীকের জালে জল স্থল আকাশ থেকে অসংখ্য সত্য সে আকর্ষণ করছে, এবং সঞ্চারণ করতে পারছে দূর দেশে ও দূর কালে। ভাষা গড়ে তোলা মানুষের পক্ষে সহজ হয়েছে যে প্রতীকরচনার শক্তিতে, প্রকৃতির কাছ থেকে সেই দানটাই মানুষের সকল দানের সেরা।

ধ্বনিতে গড়া বিশেষ বিশেষ প্রতীক কেবল যে বিশেষ বিশেষ বস্তুর নামধারী হয়ে কাজ চালাচ্ছে তা নয়, আরও অনেক সূক্ষ্ম তার কাজ। ভাষাকে তাল রেখে চলতে হয় মনের সঙ্গে। সেই মনের গতি কেবল তো চোখের দেখার সীমানার মধ্যে সংকীর্ণ নয়। যাদের দেখা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, কেবলমাত্র ভাবা যায়, মানুষের সবচেয়ে বড়ো দেনাপাওনা তাদেরই নিয়ে। খুব একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

বলতে চাই, তিনটে সাদা গোরু। ঐ 'তিন' শব্দটা সহজ নয়, আর 'সাদা' শব্দটাও যে খুব সাদা অর্থাৎ সরল তা বলতে পারি নে। পৃথিবীতে তিন-জন মানুষ, তিন-তলা বাড়ি, তিন-সের দুধ প্রভৃতি তিনের পরিমাণওয়ালা জিনিস বিস্তর আছে, কিন্তু জিনিসমাত্রই নেই অথচ তিন ব'লে একটা সংখ্যা আছে এ অসম্ভব। এ যদি ভাবতে যাই তা হলে হয়তো তিন সংখ্যার একটা অক্ষর ভাবি, সেই অক্ষরটাকে মুখে বলি তিন;

কিন্তু অক্ষর তো তিন নয়। ঐ তিন অক্ষর এবং তিন শব্দের মধ্যে নিঃশব্দে লুকোনো রয়েছে অগণ্য তিন-সংখ্যক জিনিসের নির্দেশ। তাদের নাম করতে হয় না। ভাষার এই সুবিধা নিয়ে মানুষ সংখ্যা বোঝাবার শব্দ বানিয়েছে বিস্তর। তিনটে তিন সংখ্যার গোরু একত্র করলে ৯টা গোরু হয়, এ কথা স্মরণ করাবার জন্যে গোয়ালঘরে টেনে নিয়ে যেতে হয় না। গোরু প্রভৃতি সব-কিছু বাদ দিয়ে মানুষ ভাষার একটা কৌশল বানিয়ে দিলে, বললে তিন-ত্রিক্‌খে নয়। ও একটা ফাঁদ। তাতে ধরা পড়তে লাগল কেবল গোরু নয় তিন-সংখ্যা-বাঁধা যে-কোনো তিন জিনিসের পরিমাপ। ভাষা যার নেই এই সহজ কথাটা ধরে রাখবার উপায় তার হাতে নেই।

এই উপলক্ষ্যে একটা ঘটনা আমার মনে পড়ল। ইস্কুলে-পড়া একটি ছোটো মেয়ের কাছে আমার নামতার অজ্ঞতা প্রমাণ করবার জন্যে পরিহাস ক'রে বলেছিলুম, তিন-পাঁচে পঁচিশ।

চোখদুটো এত বড়ো ক'রে সে বললে, 'আপনি কি জানেন না তিন-পাঁচে পনেরো?' আমি বললুম, 'কেমন করে জানব বলো, সব তিনই কি এক মাপের। তিনটে হাতিকে পাঁচগুণ করলেও পনেরো, তিনটে টিকটিকিকেও?' শুনে তার মনে বিষম ধিক্কার উপস্থিত হল, বললে, 'তিন যে তিনটে একক, হাতি-টিকটিকির কথা তোলেন কেন।' শুনে আমার আশ্চর্য বোধ হল। যে একক সরুও নয় মোটাও নয়, ভারিও নয় হাল্কাও নয়, যে আছে কেবল ভাষা আঁকড়িয়ে, সেই নির্গুণ একক ওর কাছে এত সহজ হয়ে গেছে যে, আস্ত হাতি-টিকটিকিকেও বাদ দিয়ে ফেলতে তার বাধে না। এই তো ভাষার গুণ।

'সাদা' কথাটাও এইরকম সৃষ্টিছাড়া। সে একটা বিশেষণ, বিশেষ্য নইলে একেবারে নিরর্থক। সাদা বস্তু থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিলে জগতে কোথাও তাকে রাখবার জায়গা পাওয়া যায় না, এক ঐ ভাষার শব্দটাতে ছাড়া। এই তো গেল গুণের কথা, এখন বস্তুর কথা।

মনে আছে আমার বয়স যখন অল্প আমার একজন মাস্টার বলেছিলেন, এই টেবিলের গুণগুলি সব বাদ দিলে হয়ে যাবে শূন্য। শুনে মন মানতেই চাইল না। টেবিলের গায়ে যেমন বানিশ লাগানো হয় তেমনি টেবিলের সঙ্গে তার গুণগুলো লেগে থাকে, এই রকমের একটা ধারণা বোধ করি আমার মনে ছিল। যেন টেবিলটাকে বাদ দিতে গেলে মুটে ডাকার দরকার, কিন্তু গুণগুলো ধুয়ে মুছে ফেলা সহজ। সেদিন এই কথা নিয়ে হাঁ করে অনেকক্ষণ ভেবেছিলুম। অথচ মানুষের ভাষা গুণহীনকে নিয়ে অনেক বড়ো বড়ো কারবার করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের ভাষায় একটা সরকারি শব্দ আছে, 'পদার্থ'। বলা বাহুল্য, জগতে পদার্থ ব'লে কোনো জিনিস নেই ; জল মাটি পাথর লোহা আছে। এমনতরো অনির্দিষ্ট ভাবনাকে মানুষ তার ভাষায় বাঁধে কেন। জরুরি দরকার আছে বলেই বাঁধে।

বিজ্ঞানের গোড়াতেই এ কথাটা বলা চাই যে, পদার্থ মাত্রই কিছু না কিছু জায়গা জোড়ে। ঐ একটা শব্দ দিয়ে কোটি কোটি শব্দ বাঁচানো গেল। অভ্যাস হয়ে গেছে ব'লে এ সৃষ্টির মূল্য ভুলে আছি। কিন্তু ভাষার মধ্যে এই-সব অভাবনীয়কে ধরা মানুষের একটা মস্ত কীর্তি।

বোঝা-হাল্কা-করা এই-সব সরকারি শব্দ দিয়ে বিজ্ঞান দর্শন ভরা। সাহিত্যেও তার কমতি নেই। এই মনে করো, 'হৃদয়' শব্দটা বলি অত্যন্ত সহজেই। কারও হৃদয় আছে বা হৃদয় নেই, যত সহজে বলি তত সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি নে। কারও 'মনুষ্যত্ব' আছে বলতে কী আছে তা সমস্তটা স্পষ্ট করে বলা অসাধ্য। এ ক্ষেত্রে ধ্বনির প্রতীক না দিয়ে অন্যরকম প্রতীকও দেওয়া যেতে পারে। মনুষ্যত্ব ব'লে একটা আকারহীন পদার্থকে কোনো-একটা মূর্তি দিয়ে বলাও চলে। কিন্তু মূর্তিতে জায়গা জোড়ে, তার ভার আছে, তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। তা ছাড়া তাকে বৈচিত্র্য দেওয়া যায় না। শব্দের প্রতীক আমাদের মনের সঙ্গে মিলিয়ে থাকে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থের বিস্তার হতেও বাধা ঘটে না।

এ কথাটা জেনে রাখা ভালো যে, এই-সব ভার-লাঘব-করা সরকারি অর্থের শব্দগুলিকে ইংরেজিতে বলে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্‌ শব্দ। বাংলায়, এর একটা নতুন প্রতিশব্দের দরকার। বোধ করি 'নির্বস্তুক' বললে কাজ চলতে পারে। বস্তু থেকে গুণকে নিষ্ক্রান্ত করে নেওয়া যে ভাবমাত্র তাকে বলবার ও বোঝাবার জন্যে নির্বস্তুক শব্দটা হয়তো ব্যবহারের যোগ্য। এই অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্‌ শব্দগুলোকে আশ্রয় করে মানুষের মন এত দূরে চলে যেতে পেরেছে যত দূরে তার ইন্দ্রিয়শক্তি যেতে পারে না, যত দূরে তার কোনো যানবাহন পৌঁছয় না।

৪

মানুষ যেমন জানবার জিনিস ভাষা দিয়ে জানায় তেমনি তাকে জানাতে হয় সুখ-দুঃখ, ভালো লাগা - মন্দ লাগা, নিন্দা-প্রশংসার সংবাদ। ভাবে ভঙ্গীতে, ভাষাহীন আওয়াজে, চাহনিতে, হাসিতে, চোখের জলে এই-সব অনুভূতির অনেকখানি বোঝানো যেতে পারে। এইগুলি হল মানুষের প্রকৃতিদত্ত বোবার ভাষা, এ ভাষায় মানুষের ভাবপ্রকাশ প্রত্যক্ষ। কিন্তু সুখ দুঃখ ভালোবাসার বোধ অনেক সূক্ষ্মে যায়, ঊর্ধ্বে যায় ;

তখন তাকে ইশারায় আনা যায় না, বর্ণনায় পাওয়া যায় না, কেবল ভাষার নৈপুণ্যে যত দূর সম্ভব নানা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভাষা হৃদয়বোধের গভীরে নিয়ে যেতে পেরেছে বলেই মানুষের হৃদয়াবেগের উপলব্ধি উৎকর্ষ লাভ করেছে। সংস্কৃতিমানদের বোধশক্তির রূঢ়তা যায় ক্ষয় হয়ে, তাঁদের অনুভূতির মধ্যে সূক্ষ্ম সুকুমার ভাবের প্রবেশ ঘটে সহজে। গোঁয়ার হৃদয় হচ্ছে অশিক্ষিত হৃদয়। অবশ্য স্বভাবদোষে রুচি ও অনুভূতির পরুষতা যাদের মজ্জাগত তাদের আশা ছেড়ে দিতে হয়। জ্ঞানের শক্তি নিয়েও এ কথা খাটে। স্বাভাবিক মূঢ়তা যাদের দুর্ভেদ্য, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় তাদের বুদ্ধিকে বেশি দূর পর্যন্ত সার্থকতা দিতে পারে না।

মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। দুইয়ের ভাষায় অনেক তফাত। জ্ঞানের ভাষা যত দূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই ; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা ক'রে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্তমত, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা ক'রে দিয়ে।

ভালো লাগা বোঝাতে কবি বললেন, 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে'। বললেন, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়'। এখানে কথাগুলোর ঠিক মানে নিলে পাগলামি হয়ে দাঁড়াবে। কথাগুলো যদি বিজ্ঞানের বইয়ে থাকত তা হলে বুঝতুম, বিজ্ঞানী নতুন আবিষ্কার করেছেন এমন একটি দৈহিক হাওয়া যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় পাথর কঠিন থাকতে পারে না, গ্যাস রূপে হয় অদৃশ্য। কিংবা কোনো মানুষের শরীরে এমন একটি রশ্মি পাওয়া গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে লাবণি, পৃথিবীর টানে যার বিকিরণ মাটির উপর দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। শব্দের অর্থকে একান্ত বিশ্বাস করলে এইরকম একটা ব্যাখ্যা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু এ-যে প্রাকৃত ঘটনার কথা নয়, এ-যে মনে-হয়-যেন'র কথা। শব্দ তৈরি হয়েছে ঠিকটা-কী জানাবার জন্যে ; সেইজন্যে ঠিক-যেন-কী বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়, বাঁকাতে হয়। ঠিক-যেন-কী'র ভাষা অভিধানে বেঁধে দেওয়া নেই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কৌশলে কাজ চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব। বস্তুত কবিত্ব এত বড়ো জায়গা পেয়েছে তার প্রধান কারণ, ভাষার শব্দ কেবল আপন সাদা অর্থ দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই কবি লাবণ্য শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা ত্যাগ ক'রে বানিয়ে বললেন, যেন লাবণ্য একটা ঝরনা, শরীর থেকে ঝ'রে পড়ে মাটিতে। কথার

অর্থ টাকে সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দিয়ে এ হল ব্যাকুলতা ; এতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে 'বলতে পারছি নে'। এই অনির্বচনীয়তার সুযোগ নিয়ে নানা কবি নানারকম অত্যুক্তির চেষ্টা করে। সুযোগ নয় তো কী ; যাকে বলা যায় না তাকে বলবার সুযোগই কবির সৌভাগ্য। এই সুযোগেই কেউ লাবণ্যকে ফুলের গন্ধের সঙ্গে তুলনা করতে পারে, কেউ বা নিঃশব্দ বীণাধ্বনির সঙ্গে— অসংগতিকে আরও বহু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে। লাবণ্যকে কবি যে লাবণি বলেছেন সেও একটা অধীরতা। প্রচলিত শব্দকে অপ্রচলিতের চেহারা দিয়ে ভাষার আভিধানিক সীমানাকে অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হল।

হৃদয়াবেগে যার সীমা পাওয়া যায় না তাকে প্রকাশ করতে গেলে সীমাবদ্ধ ভাষার বেড়া ভেঙে দিতে হয়। কবিত্বে আছে সেই বেড়া ভাঙার কাজ। এইজন্যেই মা তার সন্তানকে যা নয় তাই ব'লে এককে আর ক'রে জানায়। বলে চাঁদ, বলে মানিক, বলে সোনা। এক দিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আর-এক দিকে অস্পষ্ট কথারও। এক দিকে বিজ্ঞান চলেছে ভাষার সিঁড়ি বেয়ে ভাষাসীমার প্রত্যন্তে, ঠেকেছে গিয়ে ভাষাতীত সংকেতচিহ্নে ; আর-এক দিকে কাব্যও ভাষার ধাপে ধাপে ভাবনার দূরপ্রান্তে পৌঁছিয়ে অবশেষে আপন বাঁধা অর্থের অন্যথা করেই ভাবের ইশারা তৈরি করতে বসেছে।

৫

জানার কথাকে জানানো আর হৃদয়ের কথাকে বোধে জাগানো, এ ছাড়া ভাষার আর-একটা খুব বড়ো কাজ আছে। সে হচ্ছে কল্পনাকে রূপ দেওয়া। এক দিকে এইটেই সবচেয়ে অদরকারি কাজ, আর-এক দিকে এইটেতেই মানুষের সবচেয়ে আনন্দ। প্রাণলোকে সৃষ্টিব্যাপারে জীবিকার প্রয়োজন যত বড়ো জায়গাই নিক-না, অলংকরণের আয়োজন বড়ো কম নয়। গাছপালা থেকে আরম্ভ ক'রে পশুপক্ষী পর্যন্ত সর্বত্রই রঙে রেখায় প্রসাধনের বিভাগ একটা মস্ত বিভাগ। পাশ্চাত্য মহাদেশে যে ধর্মনীতি প্রচলিত, পশুরা তাতে অসম্মানের জায়গা পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, সেই কারণেই য়ুরোপের বিজ্ঞানীবুদ্ধি জীবমহলে সৌন্দর্যকে একান্তই কেজো আদর্শে বিচার করে এসেছে। প্রকৃতিদত্ত সাজে সজ্জায় ওদের বোধশক্তি প্রাণিক প্রয়োজনের বেশি দূরে যে যায়, এ কথা য়ুরোপে সহজে স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু সৌন্দর্য একমাত্র মানুষের কাছেই প্রয়োজনের অতীত আনন্দের দূত হয়ে এসেছে আর পশুপক্ষীর সুখবোধ

একান্তভাবে কেবল প্রাণধারণের ব্যবসায়ে সীমাবদ্ধ, এমন কথা মানতেই হবে তার কোনো কারণ নেই।

যাই হোক, সৌন্দর্যকে মানুষ অহৈতুক বলে মেনে নিয়েছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা মানুষকে টানে প্রাণযাত্রার গরজে; সৌন্দর্যও টানে, কিন্তু তাতে প্রয়োজনের তাগিদ নেই। প্রয়োজনের সামগ্রীর সঙ্গে আমরা সৌন্দর্যকে জড়িয়ে রাখি, সে কেবল প্রয়োজনের একান্ত ভারাকর্ষণ থেকে মনকে উপরে তোলবার জন্যে। প্রাণিক শাসনক্ষেত্রের মাঝখানে সৌন্দর্যের একটি মহল আছে যেখানে মানুষ মুক্ত, তাই সেখানেই মানুষ পায় বিশুদ্ধ আনন্দ।

মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে। তাই ভাষার কাজে মানুষের দুটো বিভাগ আছে— একটা তার গরজের; আর-একটা তার খুশির, তার খেয়ালের। আশ্চর্যের কথা এই যে, ভাষার জগতে এই খুশির এলেকায় মানুষের যত সম্পদ সযত্নে সঞ্চিত এমন আর-কোনো অংশে নয়। এইখানে মানুষ সৃষ্টিকর্তার গৌরব অনুভব করেছে, সে পেয়েছে দেবতার আসন।

সৃষ্টি বলতে বোঝায় সেই রচনা যার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ। মানুষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে, আপনারই পরিচয় দেয় সৃষ্টিতে। বিশ্বে যখন আমরা এমন-কিছুকে পাই যা রূপে রসে নিরতিশয়ভাবে তার সত্তাকে আমাদের চেতনার কাছে উজ্জ্বল করে তোলে, যাকে আমরা স্বীকার না করে থাকতে পারি নে, যার কাছ থেকে অন্য কোনো লাভ আমরা প্রত্যাশাই করি নে, আপন আনন্দের দ্বারা তাকেই আমরা আত্মপ্রকাশের চরম মূল্য দিই। ভাষায় মানুষের সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টি সাহিত্য। এই সৃষ্টিতে যেটি প্রকাশ পেয়েছে তাকে যখন চরম বলেই মেনে নিই তখন সে হয় আমার কাছে তেমনি সত্য যেমন সত্য ঐ বটগাছ। সে যদি এমন-কিছু হয় সচরাচরের সঙ্গে যার মিল না থাকে, অথচ যাকে নিশ্চিত প্রতীতির সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে বলি 'এই যে তুমি', তা হলে সেও সত্য হয়েই সাহিত্যে স্থান পায়, প্রাকৃত জগতে যেমন সত্যরূপে স্থান পেয়েছে পর্বত নদী। মহাভারতের অনেক-কিছুই আমার কাছে সত্য; তার সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক, এমন-কি প্রাকৃতিক কোনো প্রমাণ না থাকতে পারে, এবং কোনো প্রমাণ আমি তলব করতেই চাই নে, তাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছি এই যথেষ্ট। আমরা যখন নতুন জায়গায় ভ্রমণ করতে বেরোই তখন সেখানে নিত্য অভ্যাসে আমাদের চৈতন্য মলিন হয় নি বলেই সেখানকার অতি সাধারণ দৃশ্য সম্বন্ধেও আমাদের অনুভূতি স্পষ্ট থাকে; এই স্পষ্ট অনুভূতিতে যা দেখি তার সত্যতা উজ্জ্বল, তাই সে আমাদের আনন্দ দেয়। তেমনি সেই সাহিত্যকেই

আমরা শ্রেষ্ঠ বলি যা রসজ্ঞদের অনুভূতির কাছে আপন রচিত রসকে রূপকে অবশ্যস্বীকার্য করে তোলে। এমনি করে ভাষায় জিনিসকে মানুষের মনের কাছে সত্য করে তোলবার নৈপুণ্য যে কী, তা রচয়িতা স্বয়ং হয়তো বলতে পারেন না।

প্রাকৃতিক জগতে অনেক-কিছুই আছে যা অকিঞ্চিৎকর বলে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু অনেক আছে যা বিশেষভাবে সুন্দর, যা মহীয়ান, যা বিশেষ কোনো ভাবস্মৃতির সঙ্গে জড়িত। লক্ষ লক্ষ জিনিসের মধ্যে তাই সে বাস্তবরূপে বিশেষভাবে আমাদের মনকে টেনে নেয়। মানুষের রচিত সাহিত্যজগতে সেই বাস্তবের বাছাই করা হতে থাকে। মানুষের মন যাকে বরণ করে নেয় সব-কিছুর মধ্যে থেকে সেই সত্যের সৃষ্টি চলছে সাহিত্যে; অনেক নষ্ট হচ্ছে, অনেক থেকে যাচ্ছে। এই সাহিত্য মানুষের আনন্দলোক, তার বাস্তব জগৎ। বাস্তব বলছি এই অর্থে যে, সত্য এখানে আছে বলেই সত্য নয়, অর্থাৎ এ বৈজ্ঞানিক সত্য নয়— সাহিত্যের সত্যকে মানুষের মন নিশ্চিত মেনে নিয়েছে বলেই সে সত্য।

মানুষ জানে, জানায়; মানুষ বোধ করে, বোধ জাগায়। মানুষের মন কল্পজগতে সঞ্চরণ করে, সৃষ্টি করে কল্পরূপ: এই কাজে ভাষা তার যত সহায়তা করে ততই উত্তরোত্তর তেজস্বী হয়ে উঠতে থাকে।

সাহিত্যে যে স্বতঃপ্রকাশ সে আমাদের নিজের স্বভাবের। তার মধ্যে মানুষের অন্তরতর পরিচয় আপনিই প্রতিফলিত হয়। কেন হয় তার একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

যে সত্য আমাদের ভালো লাগা-মন্দ লাগার অপেক্ষা করে না, অস্তিত্ব ছাড়া যার অন্য কোনো মূল্য নেই, সে হল বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু যা-কিছু আমাদের সুখদুঃখ-বেদনার স্বাক্ষরে চিহ্নিত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে সুপ্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে তাই বাস্তব। কোন্‌টা আমাদের অনুভূতিতে প্রবল করে সাড়া দেবে, আমাদের কাছে দেখা দেবে নিশ্চিত রূপ ধরে, সেটা নির্ভর করে আমাদের শিক্ষাদীক্ষার, আমাদের স্বভাবের, আমাদের অবস্থার বিশেষত্বের উপরে। আমরা যাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করি সেইটেতেই আমাদের যথার্থ পরিচয়। এই বাস্তবের জগৎ কারও প্রশস্ত, কারও সংকীর্ণ। কারও দৃষ্টিতে এমন একটা সচেতন সজীবতা আছে, বিশ্বের ছোটো বড়ো অনেক-কিছুই তার অন্তরে সহজে প্রবেশ করে। বিধাতা তার চোখে লাগিয়ে রেখেছেন বেদনার স্বাভাবিক দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ-শক্তি। আবার কারও কারও জগতে আন্তরিক কারণে বা বাহিরের অবস্থাবশত বেশি ক'রে আলো পড়ে বিশেষ কোনো সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে। তাই মানুষের বাস্তববোধের বিশেষত্ব ও

আয়তনেই যথার্থ তার পরিচয়। সে যদি কবি হয় তবে তার কাব্যে ধরা পড়ে তার মন এবং তার মনের দেখা বিশ্ব। যুদ্ধের পূর্বে ও পরে ইংরেজ কবিদের দৃষ্টিক্ষেত্রের আলো বদল হয়ে গেছে, এ কথা সকলেই জানে। প্রবল আঘাতে তাদের মানসিক পথযাত্রার রথ পূর্বকার বাঁধা লাইন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। তার পর থেকে পথ চলেছে অন্য দিকে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পুরোনো সাহিত্য থেকে একটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করা যেতে পারে।

মঙ্গলকাব্যের ভূমিকাতেই দেখি, কবি চলেছেন দেশ ছেড়ে। রাজ্যে কোনো ব্যবস্থা নেই, শাসনকর্তারা যথেচ্ছাচারী। নিজের জীবনে মুকুন্দরাম রাষ্ট্রশক্তির যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে তিনি সবচেয়ে প্রবল করে অনুভব করেছেন অন্যায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ; বিদেশে উপবাসের পর স্নান করে তিনি যখন ঘুমোলেন, দেবী স্বপ্নে তাঁকে আদেশ করলেন দেবীর মহিমাগান রচনা করবার জন্যে। সেই মহিমাকীর্তন ক্ষমাহীন ন্যায়ধর্মহীন ঈর্ষাপরায়ণ ক্রূরতার জয়কীর্তন। কাব্যে জানালেন, যে শিবকে কল্যাণময় বলে ভক্তি করা যায় তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁর ভক্তদের পদে পদে পরাভব। ভক্তের অপমানের বিষয় এই যে, অন্যায়কারিণী শক্তির কাছে সে ভয়ে মাথা করেছে নত, সেই সঙ্গে নিজের আরাধ্য দেবতাকে করেছে অশ্রদ্ধেয়। শিবশক্তিকে সে মেনে নিয়েছে অশক্তি বলেই।

মনসামঙ্গলের মধ্যেও এই একই কথা। দেবতা নিষ্ঠুর, ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা-প্রচারের অহংকারে সব দুষ্কর্মই সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন ক'রে, ধর্মকে অস্বীকার ক'রে, তবেই ভীরুর পরিত্রাণ, বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।

অপর দিকে আমাদের পুরাণকথাসাহিত্যে দেখো প্রহ্লাদচরিত্র। যাঁরা এই চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তাঁরা উৎপীড়নের কাছে মানুষের আত্মপরাভবকেই বাস্তব ব'লে মানেন নি। সংসারে সচরাচর ঘটে সেই দীনতাই, কিন্তু সংখ্যা গণনা করে তাঁরা মানবসত্যকে বিচার করেন নি। মানুষের চরিত্রে যেটা সত্য হওয়া উচিত তাঁদের কাছে সেইটেই হয়েছে প্রত্যক্ষ বাস্তব, যেটা সর্বদাই ঘটে এর কাছে সেটা ছায়া। যে কালের মন থেকে এ রচনা জেগেছিল সে কালের কাছে বীর্যবান দৃঢ়চিত্ততার মূল্য যে কতখানি, এই সাহিত্য থেকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আর-এক কবিকে দেখো, শেলি। তাঁর কাব্যে অত্যাচারী দেবতার কাছে মানুষ বন্দী। কিন্তু পরাভব এর পরিণাম নয়। অসহ্য পীড়নের তাড়নাতেও অন্যায় শক্তির

কাছে মানুষ অভিভূত হয় নি। এই কবির কাছে অত্যাচারীর পীড়নশক্তির দুর্জয়তাই সবচেয়ে বড়ো সত্য হয়ে প্রকাশ পায় না, তাঁর কাছে তার চেয়ে বাস্তব সত্য হচ্ছে অত্যাচারিতের অপরাজিত বীর্য।

সাহিত্যের জগৎকে আমি বলছি বাস্তবের জগৎ, এই কথাটার তাৎপর্য আরও একটু ভালো করে বুঝে দেখা দরকার। এ তর্ক প্রায় মাঝে মাঝে উঠেছে যে, প্রাকৃত জগতে যা অপ্রিয় যা দুঃখজনক, যাকে আমরা বর্জন করতে ইচ্ছা করি, সাহিত্যে তাকে কেন আদর করে স্থান দেওয়া হয়, এমন-কি বিরহান্তক নাটক কেন মিলনান্তক নাটকের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়ে থাকে।

যা আমাদের মনে জোরে ছাপ দেয়, বাস্তবতার হিসাবে তারই প্রভাব আমাদের কাছে প্রবল। দুঃখের ধাক্কায় আমরা একটুও উদাসীন থাকতে পারি নে। এ কথা সত্য হলেও তর্ক উঠবে, দুঃখ যখন অপ্রিয় তখন সাহিত্যে তাকে উপভোগ্য বলে স্বীকার করি কেন। এর সহজ উত্তর এই— দুঃখ অপ্রিয় নয়, সাহিত্যেই তার প্রমাণ। যা-কিছু আমরা বিশেষ করে অনুভব করি তাতে আমরা বিশেষ করে আপনাকেই পাই। সেই পাওয়াতে আনন্দ। চার দিকে আমাদের অনুভবের বিষয় যদি কিছু না থাকে তা হলে সে আমাদের পক্ষে মৃত্যু; কিংবা যদি কেবলমাত্র তাই থাকে যাতে স্বভাবত আমাদের ঔৎসুক্যের অভাব বা ক্ষীণতা তা হলে মনে অবসাদ আসে, কেননা তাতে করে আমাদের আপনাকে অনুভব করাটা সচেতন হয়ে ওঠে না। দুঃখের অনুভূতি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি চেতিয়ে রাখে; কিন্তু সংসারে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি এবং আঘাত জড়িয়ে থাকে, সেইজন্যে আমাদের প্রাণপুরুষ দুঃখের সম্ভাবনায় কুণ্ঠিত হয়। জীবনযাত্রার আঘাত বা ক্ষতি সাহিত্যে নেই বলেই বিশুদ্ধ অনুভবটুকু ভোগ করতে পারি। গল্পে ভূতের ভয়ের অনুভূতিতে ছেলেরা পুলকিত হয়, কেননা তাদের মন এই অনুভূতির অভিজ্ঞতা পায় বিনা দুঃখের মূল্যে। কাল্পনিক ভয়ের আঘাতে ভূত তাদের কাছে নিবিড়ভাবে বাস্তব হয়ে ওঠে, আর এই বাস্তবের অনুভূতি ভয়ের যোগেই আনন্দজনক। যারা সাহসী তারা বিপদের সম্ভাবনাকে যেচে ডেকে আনে, ভয়ানকে আনন্দ আছে বলেই। তারা এভারেস্টের চূড়া লঙ্ঘন করতে যায় অকারণে। তাদের মনে ভয় নেই বলেই ভয়ের কারণ-সম্ভাবনায় তাদের নিবিড় আনন্দ। আমার মনে ভয় আছে, তাই আমি দুর্গম পর্বতে চড়তে যাই নে, কিন্তু দুর্গমযাত্রীদের বিবরণ ঘরে বসে পড়তে ভালোবাসি; কেননা তাতে বিপদের স্বাদ পাই অথচ বিপদের আশঙ্কা থাকে না। যে ভ্রমণবৃত্তান্তে বিপদ যথেষ্ট ভীষণ নয় তা পড়তে তত ভালো লাগে না। বস্তুত প্রবল অনুভূতি মাত্রই আনন্দজনক, কেননা সেই অনুভূতি-দ্বারা প্রবলরূপে

আমরা আপনাকে জানি। সাহিত্য বহু বিচিত্রভাবে আমাদের আপনাকে জানার জগৎ, অথচ সে জগতে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই।

সাহিত্যে মানুষের আত্মপরিচয়ের হাজার হাজার ঝরনা বয়ে চলেছে— কোনোটা পঙ্কিল, কোনোটা স্বচ্ছ, কোনোটা ক্ষীণ, কোনোটা পরিপূর্ণপ্রায়। কোনোটা মানুষের মরবার সময়ের লক্ষণ জানায়, কোনোটা জানায় তার নবজাগরণের।

বিচার করলে দেখা যায়, মানুষের সাহিত্যরচনা তার দুটো পদার্থ নিয়ে। এক হচ্ছে যা তার চোখে অত্যন্ত করে পড়েছে, বিশেষ করে মনে ছাপ দিয়েছে। তা হাস্যকর হতে পারে, অদ্ভুত হতে পারে, সাংসারিক আবশ্যকতা অনুসারে অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। তার মূল্য এই যে, তাকে মনে এনেছি একটা সুস্পষ্ট ছবিরূপে, ঘটনারূপে; অর্থাৎ সে আমাদের অনুভূতিকে অধিকার করেছে বিশেষ ক'রে, ছিনিয়ে নিয়ে চেতনার ক্ষীণতা থেকে। সে হয়তো অবজ্ঞা বা ক্রোধ উদ্রেক করে, কিন্তু সে স্পষ্ট। যেমন মন্থরা বা ভাঁড়ুদত্ত। দৈনিক ব্যবহারে তার সঙ্গ আমরা বর্জন করে থাকি। কিন্তু সাহিত্যে যখন তার ছবি দেখি তখন হেসে কিংবা কোনো রকমে উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠি, 'ঠিক বটে!' এইরকম কোনো চরিত্রকে বা ঘটনাকে নিশ্চিত স্বীকার করাতে আমাদের আনন্দ আছে। নিয়তই বহু লক্ষ পদার্থ এবং অসংখ্য ব্যাপার যা আমাদের জীবনমনের ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে তা প্রবলরূপে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় হয় না। কিন্তু যা-কিছু স্বভাবত কিংবা বিশেষ কারণে আমাদের চৈতন্যকে উদ্রিক্ত ক'রে আলোড়িত করে সেই-সব অভিজ্ঞতার উপকরণ আমাদের মনের ভাণ্ডারে জমা হতে থাকে, তারা বিচিত্রভাবে আমাদের স্বভাবকে পূর্ণ করে। মানুষের সাহিত্য মানুষের সেই সম্ভাবিত, সম্ভবপর, অসংখ্য অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। জাভাতে দেখে এলুম আশ্চর্য নৃত্যকৌশলের সঙ্গে হনুমানে ইন্দ্রজিতে লড়াইয়ের নাট্যাভিনয়। এই দুই পৌরাণিক চরিত্র এমন অন্তরঙ্গভাবে তাদের অভিজ্ঞতার জিনিস হয়ে উঠেছে যে, চার দিকের অনেক পরিচিত মানুষের এবং প্রত্যক্ষ ব্যাপারের চেয়ে এদের সত্তা এবং আচরণ তাদের কাছে প্রবলতররূপে সুনিশ্চিত হয়ে গেছে। এই সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতার আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে তাদের নাচে গানে।

সাহিত্যের আর-একটা কাজ হচ্ছে, মানুষ যা অত্যন্ত ইচ্ছা করে সাহিত্য তাকে রূপ দেয়। এমন করে দেয় যাতে সে আমাদের মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সংসার অসম্পূর্ণ; তার ভালোর সঙ্গে মন্দ জড়ানো, সেখানে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ভরপুর মেটে না। সাহিত্যে মানুষ আপনার সেই আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণতার জগৎসৃষ্টি করে চলেছে। তার ইচ্ছার আদর্শে যা হওয়া উচিত ছিল, যা হয় নি, তাকে মূর্তিমান ক'রে মেটাচ্ছে সে

আপন ক্ষোভ। সেই রচনার প্রভাব ফিরে এসে তার নিজের সংসাররচনায় চরিত্ররচনায় কাজ করছে। মানুষের বড়ো ইচ্ছাকে যে সাহিত্য আকার দিয়েছে, এবং আকার দেওয়ার দ্বারা মানুষের মনকে ভিতরে ভিতরে বড়ো ক'রে তুলছে, তাকে মানুষ যুগে যুগে সম্মান দিয়ে এসেছে।

এইসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালো মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয় তার শুভবুদ্ধি, যে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হতে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্তা দেখা দেয় তার ব্যাধিরূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে তখন পাতায় পাতায় রঙিন তার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে, সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেইরকম কোনো জাতির চরিত্রকে যখন আত্মঘাতী রিপুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে তখন তার সাহিত্যে, তার শিল্পে, কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ নির্দেশ ক'রে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে তারা মানুষের শত্রু। কেননা সাহিত্যকে শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।

মানুষ যে কেবল ভোগরসের সমজদার হয়ে আত্মশ্লাঘা করে বেড়াবে তা নয়; তাকে পরিপূর্ণ করে বাঁচতে হবে, অপ্রমত্ত পৌরুষে বীর্যবান হয়ে সকলপ্রকার অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। স্বজাতির সমাধির উপরে ফুলবাগান নাহয় নাই তৈরি হল।

৬

সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার প্রবাল আপন দেহের আবরণ মোচন করতে করতে কখন্ এক সময়ে দ্বীপ বানিয়ে তোলে। তেমনি বহুসংখ্যক মন আপনার অংশ দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাষাদ্বীপ।

মানুষ বানিয়েছে আপনার গায়ের কাপড়। বয়স বাড়তে বাড়তে তার দেহের মাপের বদল হয়। বারবার পুরোনো কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন কাপড় না বানালে তার চলে না। জাতির মন কখনো বাড়ে, আবার রুগী উপবাসীর যেরকম দশা হয় তেমনি

কখনো বা সে কমেও বটে। কিন্তু পুরোনো জামার মতো ভাষাটাকে ফেলে দিয়ে দর্জির দোকানে নতুন ভাষার ফরমাশ দিতে হয় না। মনের গড়নের সঙ্গেই চলেছে তার গড়ন, মনের বাড়নের সঙ্গেই তার বাড়। আমার এই প্রায় আশি বছর বয়সে নিজেরই ভিতর থেকে দেখতে পাই, সত্তর বছর পূর্বের বাঙালির মন আর এখনকার মনে তফাত বিস্তর। দেখতে পাচ্ছি এই তার মনের বদল ভাষার মধ্যেও ভিতরে-ভিতরে কাজ করছে। সত্তর বছর আগেকার ভাষা এখন নেই। এর উপরে লেগেছে অনেক মনের নব নব স্পর্শ ও প্রবর্তনা। কিন্তু সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো এক-একজন বিশেষ মনীষীর মনে। নতুন বাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত জড়তা থেকে; দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল; তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুত বেগে, আর তখনি তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে।

৭

আমরা যাকে দেশ বলি, বাইরে থেকে দেখতে সে ভূগোলের এক অংশ। কিন্তু তা নয়। পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন আছে তার বায়ুমণ্ডল, যেখানে বয় তার প্রাণের নিশ্বাস, যেখানে ওঠে তার গানের ধ্বনি, যার মধ্যে দিয়ে আসে তার আকাশের আলো, তেমনি একটা মনোমণ্ডল স্তরে স্তরে এই ভূভাগকে অদৃশ্য আবেষ্টনে ঘিরে ফেলেছে— সমস্ত দেশকে সেই দেয় অন্তরের ঐক্য।

পৃথিবীর আবহ-আস্তরণের মতোই তার সব কাজ সব দান সকলকে নিয়ে। যা ভূখণ্ড এ তাকেই করে তুলেছে দেশ। ধারাবাহিক বৃহৎ আত্মীয়তার ঐক্যবেষ্টনে প্রাকৃতিককে আচ্ছন্ন করে দিয়ে তাকে করেছে মানবিক। এই সীমার মধ্যে অনেক যুগের মা তার ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়েছে একই ভাষার গান গেয়ে, সন্ধেবেলায় তাদের কোলে টেনে এনে বলেছে রূপকথা একই ভাষায়। পূজা করেছে এরা এক ভাষার মন্ত্রে, স্ত্রী পুরুষ একই ভাষায় পরস্পর ভালোবাসার আলাপ করেছে; তার ভাষা অভিষিক্ত হয়ে গেছে প্রাণের রসে। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো ভুলচুক হয়েছে, শয়তানি

বুদ্ধি পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ এনেছে, হানাহানি বাধিয়েছে, সমস্ত দলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা খুঁচিয়ে তুলেছে। কিন্তু সেটাই সমস্ত দেশের প্রকৃতিতে সবচেয়ে সত্য আকার ধরে মুখ্য স্থান নেয় নি, তাই দেশের লোক দেশকে বলেছে মাতৃভূমি। এখানে উন্মেষিত হয়েছে এমন একটা মানবিকতার নিবিড় ঐক্য যা সমস্ত জাতকে রক্ষা করে, প্রবল করে, জ্ঞান দেয়, আনন্দিত করে সৌন্দর্যসৃষ্টিতে। যে দেশে এইরকম ঐক্যের মহৎরূপ অপূর্ণতা থেকে ক্রমে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, বারবার উদ্ধার করেছে সমস্ত জাতকে বিঘ্নবিপদ থেকে বীর্য ও শুভবুদ্ধির জোরে, সেই দেশকেই মানুষ একান্তভাবে আপনার মধ্যে পেয়েছে, ভালোবেসেছে, সত্যি করে তাকে বলতে পেরেছে মাতৃভূমি।

এ কথা হয়তো আমরা অনেকে জানি নে যে, বাংলাদেশের বা ভারতবর্ষের মাতৃভূমি নাম আমাদের দেওয়া নয়। ঐ শব্দটাকে আমরা তর্জমা করে নিয়েছি ইংরেজি মাদারল্যাণ্ড্ থেকে। আমার বিশ্বাস এক সময়ে ভারতবর্ষে একটি উদ্‌বোধনের বিশেষ যুগ এসেছিল যখন ভরতরাজবংশকে স্মৃতির কেন্দ্রস্থলে রেখে ভারতের আর্যজাতীয়েরা নিজের ঐক্য উপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই যুগেই বেদ পুরাণ দর্শনশাস্ত্র, লোকপ্রচলিত কথা ও কাহিনী, সংগ্রহ করবার উদ্যোগ এ দেশে জেগে উঠেছিল। সে অনেক দিনের কথা।

কিন্তু স্বাজাতিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি। বহুধাবিভক্ত ভারত ছোটো ছোটো রাজ্যে উপরাজ্যে পরস্পর কেবলই কাড়াকাড়ি হানাহানি করেছে, সাধারণ শত্রু যখন দ্বারে এসেছে সকলে এক হয়ে বিদেশীর আক্রমণ ঠেকাতে পারে নি।

এই শোচনীয় আত্মবিচ্ছেদ ও বহির্বিপ্লবের সময়ে ভারতবর্ষে একটিমাত্র ঐক্যের মহাকর্ষশক্তি ছিল, সে তার সংস্কৃতভাষা। এই ভাষাই ধর্মে কর্মে কাব্য-ইতিহাস-পুরাণ-চর্চায় তার সভ্যতাকে রেখেছিল বাঁধ বেঁধে। এই ভাষাই পিতৃপুরুষের চিত্তশক্তি দিয়ে সমস্ত দেশের দেহে ব্যাপ্ত করেছিল ঐক্যবোধের নাড়ির জাল। দেশের যে মাতৃশক্তি হৃদয়ের আত্মীয়তায় দেশের নানা জাতিকে এক সন্ততিসূত্রে বাঁধতে পারত তার উৎস ছিল না এর মাটিতে। কিন্তু যে পিতৃশক্তি চিত্তোৎকর্ষের পথ দিয়ে ভাবী বংশকে জ্ঞানসম্পদে সম্মানিত করেছে তা আমরা পেয়েছি একটি আশ্চর্য ভাষার দৌত্য হতে।

ভারতবর্ষের নাম মাতার নাম নয়, কেননা ভারতবর্ষ যথার্থই পিতৃভূমি। তাই ভারতবর্ষের দেশ জুড়ে ব্যাপ্ত ঋষিদের নাম, আর রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের চরিত-বৃত্তান্ত। তাই পরকালে পিতৃলোকের পথকে সদ্‌গতির পথ বলে জানি।

এ কথা মনে রাখা উচিত যে, দেশবাসী সকলকে আমরা এক নাম দিয়ে পরিচিত

করি নি। মহাভারতে আমরা কাশী কাঞ্চি মগধ কোশল প্রভৃতি প্রদেশের কথা শুনেছি, কিন্তু তাদের সমস্তকে নিয়ে এক দেশের কথা শুনি নি। আজ আমরা যে হিন্দু নাম দিয়ে নিজেদের ধর্ম ও আচার -গত একটা বিশেষ ঐক্যের পরিচয় দিয়ে থাকি, সে নামকরণ আমাদের নিজকৃত নয়। বাইরে থেকে মুসলমান আমাদের এই নাম দিয়েছিল। হিন্দুস্থান নাম মুসলমানদের কাছ থেকে পাওয়া। আর যে একটি নামে আমাদের দেশ জগতের কাছে এক দেশ বলে খ্যাত সে হচ্ছে ইণ্ডিয়া, সে নামও বিদেশী। বস্তুত ভারতবাসী বোঝাবার কোনো নামকে যদি যথার্থ ন্যাশনাল বলা যায়, অর্থাৎ যে নামে ভারতের সকল জাতিকে বর্ণধর্ম-আচার-নির্বিশেষে এক ব'লে ধরা হয়েছে, সে ইণ্ডিয়ান। আমাদের ভাষায় আমাদের স্বাদেশিক নাম নেই।

বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা বাংলাপ্রদেশের অংশ-প্রত্যংশ অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারী দফতরের কাঁচিতে তার ভাষাটাকে ছেঁটে ফেলতে পারেন নি।

ইতিমধ্যে স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব। দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম, আত্মত্যাগ, জনহিতব্রত। ইংরেজের এই দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, অধিকার করেছে আমাদের সাহিত্যকে। আজ আমরা দেশের নামে গৌরব স্থাপন করতে চাই মানুষের ইতিহাসে।

এই-যে আমাদের দেশ আজ আমাদের মনকে টানছে, এর সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছে আমাদের ভাষার প্রতি টান। মাতৃভাষা নামটা আজকাল আমরা ব্যবহার করে থাকি, এ নামও পেয়েছি আমাদের নতুন শিক্ষা থেকে। ইংরেজিতে আপন ভাষাকে বলে মাদার টাঙ্গ, মাতৃভাষা তারই তর্জমা। এমন দিন ছিল যখন বাঙালি বিদেশে গিয়ে আপন ভাষাকে অনায়াসেই পুরোনো কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলতে পারত; বিলেতে গিয়ে ভাষাকে সে দিয়ে আসত সমুদ্রে জলাঞ্জলি, ইংরেজভাষিণী অনুচরীদের সঙ্গে রেখে ছেলেমেয়েদের মুখে বাংলা চাপা দিয়ে তার উপরে ইংরেজির জয়পতাকা দিত সগর্বে উড়িয়ে। আজ আমাদের ভাষা এই অপমান থেকে উদ্ধার পেয়েছে, তার গৌরব আজ সমস্ত বাংলাভাষীকে মাহাত্ম্য দিয়েছে। বৎসরে বৎসরে জেলায় জেলায় সাহিত্যসম্মেলন বাঙালির একটা পার্বণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; এ নিয়ে তাকে চেতিয়ে তুলতে হয় নি, হয়েছে স্বভাবতই।

৮

বাংলাভাষা ভারতবর্ষের প্রায় পাঁচ কোটি লোকের ভাষা। হিন্দি বা হিন্দুস্থানি যাদের যথার্থ ঘরের ভাষা, শিক্ষা-করা ভাষা নয়, সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন, তাদের সংখ্যা চার কোটি বারো লক্ষের কাছাকাছি। এর উপরে আছে আট কোটি আটাশি লক্ষ লোক যারা তাদের খাঁটি মাতৃভাষা বর্জন ক'রে সাহিত্যে সভাসমিতিতে ইস্কুলে আদালতে হিন্দুস্থানির শরণাপন্ন হয়। তাই হিন্দুস্থানিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্যে এক ভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।

রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই-কি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ নিয়তই অদল বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী, য়ুরোপীয় চিত্ত জয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ-সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেই দিন য়ুরোপের বড়োদিন। আমাদের দেশেও সেই বড়োদিনের অপেক্ষা করব— সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।

৯

বাংলাভাষাকে চিনতে হবে ভালো ক'রে; কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা চাই।

রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলাবাক্যাধীপেরও আছে দুই রানী— একটাকে আদর করে

নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা ; আর-একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। অলংকারের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে ; কবি বলেন : কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্। যার মাধুর্য আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা। রূপকথায় শুনেছি সুয়োরানী ঠাঁই দেয় দুয়োরানীকে গোয়ালঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরানী যায় নির্বাসনে, টিঁকে থাকে একলা দুয়োরানী রানীর পদে। বাংলায় চলতি ভাষা বহু কাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকোনো আঙিনার পাশে যেখানে সন্ধেবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসীতলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে। গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।

চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না।

আমাদের মুখরিত দিনরাত্রির সব কথা ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা।

তবু একটা কথা মানতে হবে যে, মানুষের বলবার কথা সবই যে সহজ তা নয় ; এমন কথা আছে যা ভালো করে এঁটে না বললে বলাই হয় না। সেই-সব বিচার-করা কথা কিংবা সাজিয়ে-বলা কথা চলে না দিনরাত্রির ব্যবহারে, যেমন চলে না দরবারি পোশাক কিংবা বেনারসি শাড়ি। আমরা সর্বদা মুখের কথায় বিজ্ঞান আওড়াই নে। তত্ত্বকথাও পণ্ডিতসভায়, তার আলোচনায় বিশেষ বিস্তার দরকার করে। তাই তর্ক ওঠে, এদের জন্যে চলতি ভাষার বাইরে একটা পাকা গাঁথুনির ভাষা বানানো নেহাত দরকার ; সাধু ভাষায় এরকম মহলের পত্তন সহজ, কেননা, ও ভাষাটাই বানানো।

কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক। আমরা লিখিয়ে-পড়িয়ের দলে চলতি ভাষাকে অনেক কাল থেকে জাতে ঠেলেছি। সাহিত্যের আসরে তাকে পা বাড়াতে দেখলেই দরোয়ান এসেছে তাড়া করে। সেইজন্যেই খিড়কির দরজায় পথ চলার অভ্যাসটাই ওর হয়ে গেছে স্বাভাবিক। অন্দরমহলে যে মেয়েরা অভ্যস্ত তাদের ব্যবহার সহজ হয় পরিচিত আত্মীয়দের মধ্যেই, বাইরের লোকদের সামনে তাদের মুখ দিয়ে কথা সরে না। তার কারণ এ নয় যে তাদের শক্তি নেই, কিন্তু সংকুচিত হয়েছে তাদের শক্তি। পাশ্চাত্য জাতিদের ভাষায় এই সদর-অন্দরের বিচার নেই। তাই

সেখানে সাহিত্য পেয়েছে চলনশীল প্রাণ, আর চলতি ভাষা পেয়েছে মননশীলতার ঐশ্বর্য। আমাদের ঘোমটা টানার দেশে সেটা তেমন করে প্রচলিত হয় নি ; কিন্তু হবার বাধা বাইরের শাসনে, স্বভাবের মধ্যে নয়।

সে অনেক দিনের কথা। তখন রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার অধ্যাপক। তাঁর একজন ছাত্রের কাছে শুনেছি, পরীক্ষা দিতে যাবার পূর্বে বাংলা রচনা সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'বাবা, সুশীতলসমীরণ লিখতে গিয়ে যত্বে ণত্বে কিংবা হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরে যদি ধাঁধা লাগিয়ে দেয় তা হলে লিখে দিয়ো 'ঠাণ্ডা হাওয়া'।' সেদিনকার দিনে এটি সোজা কথা ছিল না। তখনকার সাধু বাংলা ঠাণ্ডা হাওয়া কিছুতেই সইতে পারত না, তখনকার রুগীরা যেমন ঠাণ্ডা জল খেতে পেত না তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও।

সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাত নিয়ে। 'হচ্ছে' 'করছে'কে যদি জলচল করে নেওয়া যায় তা হলে জাতঠেলাঠেলি অনেকটা পরিমাণে ঘোচে। উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিঘ্ন ঘটিয়েছিল, এইটে থেকেই সর্পবংশধ্বংসের উৎপত্তি : এর ক্রিয়াক'টাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধু ভাষার ভঙ্গী দিলেই কালীসিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তাঁর কাজে ও কথায় অসংগতি : মুখের ভাষাতেও এটা বলা চলে, আবার এও বলা যায় 'তাঁর কাজে কথায় মিল নেই'। 'বাসুকি ভীমকে আলিঙ্গন করলেন' এ কথাটা মুখের ভাষায় অশুচি হয় না, আবার 'বাসুকি ভীমের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন' এটাতেও বোধ হয় নিন্দের কারণ ঘটে না। বিজ্ঞানে দুর্বোধ তথ্য আছে, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের সাধু ভাষাও গলদঘর্ম হয়, আবার চলতি ভাষারও চোখে অন্ধকার ঠেকে। বিজ্ঞানের চর্চা আমাদের দেশে যখন ছড়িয়ে পড়বে তখন উভয় ভাষাতেই তার পথ প্রশস্ত হতে থাকবে। নতুন-বানানো পারিভাষিকে উভয় পক্ষেরই হবে সমান স্বত্ব।

১০

এইখানে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষাগুলিকেও এমনি করেই গ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়। তার পারিভাষিক শব্দগুলো গ্রীক লাটিন থেকে ধার নেওয়া কিংবা তারই উপাদান নিয়ে তারই ছাঁচে

ঢালা। ইংরেজি ভাষায় দেখা যায়, তার পুরাতন পরিচিত দ্রব্যের নামগুলি স্তাক্সন এবং কেল্ট্। এগুলি সব আদিম জাতির আদিম অবস্থার সম্পত্তি। সেই পুরাতন কাল থেকে যতই দূরে চলে এসেছে ততই তার ভাষাকে অধিকার করেছে গ্রীক ও লাটিন। আমাদেরও সেই দশা। খাঁটি বাংলা ছিল আদিম কালের, সে বাংলা নিয়ে এখনকার কাজ ষোলো-আনা চলা অসম্ভব।

অভিধান দেখলে টের পাওয়া যাবে ইংরেজি ভাষার অনেকখানিই গ্রীক-লাটিনে গড়া। বস্তুত তার হাড়ে মাস লেগেছে ঐ ভাষায়। কোনো বিশেষ লেখার রচনারীতি হয়তো গ্রীক-লাটিন-ঘেঁষা, কোনোটার বা অ্যাংলো-স্তাক্সনের ছাঁদ। তাই বলে ইংরেজি ভাষা দুটো দল পাকিয়ে তোলে নি। কৃত্রিম ছাঁচে ঢালাই করা একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা খাড়া ক'রে তাই নিয়ে কোনো সম্প্রদায় কৌলীন্তের বড়াই করে না। নানা বন্দর থেকে নানা শব্দসম্পদের আমদানি ক'রে কথায় ও লেখায় একই তহবিল তারা ভর্তি করে তুলেছে। ওদের ভাষার খিড়কির দরজায় একতারা-বাজিয়ের আর সদর দরজায় বীণার ওস্তাদের ভিড় হয় না।

আমাদের ভাষাও সেই এক বড়ো রাস্তার পথেই চলেছে। কথার ভাষার বদল চলছে লেখার ভাষার মাপে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে চলতি ভাষায় যে-সব কথা ব্যবহার করলে হাসির রোল উঠত, আজ মুখের বাক্যে তাদের চলাফেরা চলছে অনায়াসেই। মনে তো আছে, আমার অল্প বয়সে বাড়ির কোনো চাকর যখন এসে জানালে 'একজন বাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন', মনিবদের আসরে চার দিক থেকে হাসি ছিটকে পড়ল। যদি সে বলত 'অপিক্ষে' তা হলে সেটা মাননসই হ'ত। আবার অল্পকিছুদিন আগে আমার কোনো ভৃত্য মাংসের তুলনায় মাছ খাওয়ার অপদার্থতা জানিয়ে যখন আমাকে বললে 'মাছের দেহে সামর্থ্য কতটুকুই বা আছে', আমার সন্দেহ হয় নি যে সে উচ্চ প্রাইমারি স্কুলে পরীক্ষা পাশ করেছে। আজ সমাজের উপরতলায় নীচের তলায় ভাষাব্যবহারে আর্য-অনার্যের মিশোল চলেছে। মনে করো সাধারণ আলাপে আজ যদি এমন কথা কেউ বলে যে 'সভ্যজগতে অর্থনীতির সঙ্গে গ্রন্থি পাকিয়ে রাষ্ট্রনীতির জটিলতা যতই বেড়ে উঠছে শান্তির সম্ভাবনা যাচ্ছে দূরে', তা হলে এই মাত্র সন্দেহ করব, লোকটা বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মেশাবার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই বাক্যকে প্রহসনে উদ্ধৃত করবার যোগ্য বলে কেউ মনে করবে না। নিঃসন্দেহ এর শব্দগুলো হয়ে উঠেছে সাহিত্যিক, কেননা বিষয়টাই তাই। পঞ্চাশ বছর আগে এরকম বিষয় নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা হত না, এখন তা হয়ে থাকে, কাজেই কথা ও লেখার সীমানার ভেদ থাকছে না। সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে

গুরুচণ্ডালী অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে।

এটা হতে পেরেছে তার কারণ, সীমাসরহদ্দ নিয়ে মামলা করে না চলতি ভাষা। স্বদেশী বিদেশী হাল্কা ভারী সব শব্দই ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারে তার আঙিনায়। সাধু ভাষায় তাদের পাসপোর্ট্ মেলা শক্ত। পার্সি আরবি কথা চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে। তারা এমন আতিথ্য পেয়েছে যে তারা যে ঘরের নয় সে কথা ভুলেই গেছি। 'বিদায়' কথাটা সংস্কৃতসাহিত্যে কোথাও মেলে না। সেটা আরবি ভাষা থেকে এসে দিব্যি সংস্কৃত পোশাক প'রে বসেছে। 'হয়রান করে দিয়েছে' বললে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে যে ভাবটা মানে আসে কোনো সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না। অমুকের কণ্ঠে গানে 'দরদ' লাগে না, বললে ঠিক কথাটি বলা হয়, ও ছাড়া আর-কোনো কথাই নেই। গুরুচণ্ডালীর শাসনকর্তা যদি দরদের বদলে 'সংবেদনা' শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না।

ভাষার অবিমিশ্র কৌলীন্য নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করেন এমন গোঁড়া লোক আজও আছেন। কিন্তু ভাষাকে দুইমুখো ক'রে তার দুই বাণী বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাকে অসাধু বলাই উচিত। ভাষায় এরকম কৃত্রিম বিচ্ছেদ জাগিয়ে রেখে আচারের শুচিতা বানিয়ে তোলা পুণ্যকর্ম নয়, এখন আর এটা সম্ভবও হবে না।

সুনীতিকুমার বলেন খৃস্টীয় দশম শতকের কোনো-এক সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম। কিন্তু ভাষার সম্বন্ধে এই 'জন্ম' কথাটা খাটে না। যে জিনিস অনতিব্যক্ত অবস্থা থেকে ক্রমশ ব্যক্ত হয়েছে তার আরম্ভসীমা নির্দেশ করা কঠিন। দশম শতকের বাংলাকে বিংশ শতকের বাঙালি আপন ভাষা বলে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ। শতকে শতকে ভাষা ক্রমশ ফুটে উঠেছে, আধুনিক কালেও চলছে তার পরিণতি। নতুন নতুন জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, রীতির সঙ্গে, আমাদের পরিচয় যত বেড়ে চলেছে, আমাদের ভাষার প্রকাশ ততই হচ্ছে ব্যাপক। গত ষাট বছরে যা ঘটেছে দু-তিন শতকেও তা ঘটে নি।

বাংলা ভাষার কাঁচা অবস্থায় যেটা সবচেয়ে আমাদের চোখে পড়ে সে হচ্ছে ক্রিয়া-ব্যবহার সম্বন্ধে ভাষার সংকোচ। সদ্য-ডিম-ভাঙা পাখির বাচ্ছার দেখা যায় ডানার ক্ষীণতা। ক্রিয়াপদের মধ্যেই থাকে ভাষার চলবার শক্তি। রূপগোস্বামীর লেখা কারিকা থেকে পুরোনো বাংলা গদ্যের একটু নমুনা দেখলেই এ কথা বুঝতে পারা যাবে—

প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতি

রাধিকাতেও বসে।... পূর্ব্বরাগের মূল দুই হটাৎ প্রবণ অকস্মাৎ শ্রবণ।[১]

ক্রিয়াপদ-ব্যবহার যদি পাকা হত, তা হলে উড়ে চলার বদলে ভাষার এরকম লাফ দিয়ে দিয়ে চলা সম্ভব হত না। সেই সময়কেই বাংলা ভাষার পরিণতির যুগ বলব যখন থেকে তার ক্রিয়াপদের যথোচিত প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য ঘটেছে। পুরাতন গদ্যের বিস্তৃত নমুনা যদি পাওয়া যেত তা হলে ক্রিয়াপদ-অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অভিব্যক্তির ধারা নির্ণয় করা সহজ হত।

রামমোহন রায় যখন গদ্য লিখতে বসেছিলেন তখন তাঁকে নিয়ম হেঁকে হেঁকে, কোদাল হাতে, রাস্তা বানাতে হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বঙ্কিমের কলমে যে গদ্য দেখা দিয়েছিল তাতে যতটা ছিল পিণ্ডতা, আকৃতি ততটা ছিল না। যেন ময়দা নিয়ে তাল পাকানো হচ্ছিল, লুচি বেলা হয় নি।

সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ থেকে তার একটা নমুনা দিই—

গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পা সজাণ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিম্বুপম জীবনে চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে সেসব উৎসব শব হইলে কি হইবে।[২]

তার পরে বিদ্যাসাগর এই কাঁচা ভাষায় চেহারার শ্রী ফুটিয়ে তুললেন। আমার মনে হয় তখন থেকে বাংলা গদ্যভাষায় রূপের আবির্ভাব হল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি ঈশ্বর গুপ্তের আসরে প্রথম হাত পাকাচ্ছিলেন অত্যন্ত আড়ষ্ট বাংলা ভাষায়, সেই ভাষারই বন্ধন মোচন করেছিলেন সেই বঙ্কিম। তিনিই তাকে দিয়েছিলেন চলবার স্বাধীনতা।

আমরা পুরাতন সাহিত্যে পেয়েছি পদ্য, সেইটেই বনেদি। কিন্তু এ কথা বলা ঠিক হবে না, সাধু ভাষার আদর্শ ছিল তার মধ্যে। ভাষাকে ছন্দে-ওজন-করা পদে বিভক্ত করতে গেলে তার মধ্যে স্বাভাবিক কথা বলার নিয়ম খাটে না, ক্রমে তার একটা বিশেষ রীতি বেঁধে যায়। প্রথমত কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াপদের সহজ পর্যায় রক্ষা হতেই পারে না। তার পরে তার মধ্যে কতকগুলি পুরোনো শব্দ ও রীতি থেকে যায়, ছন্দের আশ্রয় পেয়ে যারা কালের বদল মানে না। চারটে লাইন পদ্য বানিয়ে তার দৃষ্টান্ত

১ সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস -লিখিত 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' প্রবন্ধ থেকে তুলে দেওয়া হল। —সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪০, পৃ ৪৬

২ সংবাদপ্রভাকর, ২৩ এপ্রিল, ১৮৫২। —বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ৩৮

দেখানো যাক—

কার সনে নাহি জানি করে বসি কানাকানি,
সাঁঝবেলা দিগ্‌বধূ কাননে মর্মরে।
আঁচলে কুড়ায়ে তারা কী লাগি আপনহারা,
মানিকের বরমালা গাঁথে কার তরে।

এই কটা লাইনকে সাধুভাষায় ঢালাই করতে গেলে হবে এইরকম— সন্ধ্যাকালে দিগ্বধূ অরণ্যমর্মরধ্বনিতে কাহার সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত তাহা জানি না। জানি না কী কারণে ও কাহার জন্য আত্মবিহ্বল অবস্থায় সে আপন বস্ত্রাঞ্চলে নক্ষত্রসংগ্রহপূর্বক মাণিক্যের বরমাল্য গ্রন্থন করিতেছে।

'সনে' কথাটা এখন আর বলি নে, প্রাচীন পদাবলীতে ঐ অর্থে 'সঙে' কথা সর্বদা পাওয়া যায়। 'নাহি জানি' কথাটার 'নাহি' শব্দটা এখনকার নিয়মে 'জানি'র সঙ্গে মিলতে পারে না। 'নাহি' শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'নাস্তি', চলিত কথায় 'নেই'। 'জানি'র সঙ্গে 'নেই' জোড়া যায় না, বলি 'জানি নে'। 'সাঁঝবেলা' গ্রাম্যভাষায় এখনো চলে, কিন্তু যাদের জন্যে ঐ শ্লোকটা লেখা তাদের সঙ্গে আলাপে 'সাঁঝবেলা' শব্দটা বেখাপ। 'বসিয়া'র জায়গায় 'বসি' আমরা বলি নে। যে শ্রেণীর লোকের ভাষায় 'লেগে' শব্দের ব্যবহার চলে তাদের খুশি করবার জন্যে দিগ্বধূ কখনো তারার মালা গাঁথেই না। 'জন্যে'র পরিবর্তে 'লাগি' বা 'লাগিয়া' কিংবা 'তরে' শব্দটা ছন্দের মধ্যস্থতায় ছাড়া ভদ্রনামধারীদের রসনায় প্রবেশ পায় না। যেমতি তেমতি নেহারো উড়িলা হেরো মোরে পানে যবে হেথা সেথা নারে তারে প্রভৃতি শব্দ পদ্যের ফরমাশি।

যদি বর্ষার দিনে বন্ধু এসে কথা জুড়ে দেয় 'হেরো ঐ পুব দিকের পানে, রহি রহি বিজুলি চমক দেয়, মোর ডর লাগে, নাহি জানি কী লাগি সাধ যায় তোমা সনে একা বসি মনের কথা করি কানাকানি', তবে এটাকে মধুরালাপের ভূমিকা বলে কেউ মনে করবে না, বন্ধুর জন্যে উদ্‌বিগ্ন হবে।

তবু মন ভোলাবার ব্যবসায়ে পদ্য যদি সাদা ভাষার বাজে মালমশলা মেশায় তবে তাকে মাপ করা যায়, কিন্তু চলতি ব্যবহারে গদ্য যদি হঠাৎ সাধু হয়ে ওঠে তবে মহাপণ্ডিতেরাও মনে করবে, বিদ্রূপ করা হচ্ছে। কারও মাসির 'পরে বিশেষ সম্মান দেখাবার জন্যে কেউ যদি বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় বলে 'আপনকার মাতৃস্বসা আশা করি দুঃসাধ্য অতিসার ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন', তবে বোনপো ইংরেজের মুখে শুনলে মনে মনে হাসবে, বাঙালির মুখে শুনলে উচ্চহাস্য ক'রে উঠবে।

তর্ক ওঠে, বাংলাদেশে কোন্ প্রদেশের ভাষাকে সাহিত্যিক কথ্যভাষা বলে মেনে নেব। উত্তর এই যে, কোনো বিশেষ কারণে বিশেষ প্রদেশের ভাষা স্বতই সর্বজনীনতার মর্যাদা পায়। যে-সকল সৌভাগ্যবান দেশে কোনো একমাত্র ভাষা বিনা তর্কে সর্বদেশের বাণীরূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও নানা প্রাদেশিক উপভাষা আছে। বিশেষ কারণে টস্কানি প্রদেশের উপভাষা সমস্ত ইটালির এক ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। তেমনি কলকাতা শহরের নিকটবর্তী চার দিকের ভাষা স্বভাবতই বাংলাদেশের সকলদেশী ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। এই এক ভাষার সর্বজনীনতা বাংলাদেশের কল্যাণের বিষয় বলেই মনে করা উচিত। এই ভাষায় ক্রমে পূর্ববঙ্গেরও হাত পড়তে আরম্ভ হয়েছে, তার একটা প্রমাণ এই যে, আমরা দক্ষিণের লোকেরা 'সাথে' শব্দটা কবিতায় ছাড়া সাহিত্যে বা মুখের আলাপে ব্যবহার করি নে। আমরা বলি 'সঙ্গে'। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কানে যেমনি লাগুক, 'সঙ্গে' কথাটা 'সাথে'র কাছে হার মেনে আসছে। আরও একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। মাত্র চারজন লোক : এমন প্রয়োগ আজকাল প্রায় শুনি। বরাবর বলে এসেছি 'চারজনমাত্র লোক', অর্থাৎ চারজনের দ্বারা মাত্রা-পাওয়া, পরিমিত-হওয়া লোক। অবশ্য 'মাত্র' শব্দ গোড়ায় বসলে কথাটাতে জোর দেবার সুবিধে হয়। ভাষা সব সময়ে যুক্তি মানে না।

যা হোক, যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব। এবং আশা করব, সাধু ভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রামলাভ করবে। সেই কবরস্থান তীর্থস্থান হবে, এবং অলংকৃত হবে তার স্মৃতিশিলাপট।

১১

মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভার একটা কীর্তি হল চাকা বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে দুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদানপ্রদানের কাজ চলল বেগে।

ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হল মোট-বাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে মুখে চলল ভাষার দেনা-পাওনা।

কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি 'একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল', তখন এই বলার মধ্যে এই খবরটা

ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন—

রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়াগরজন
ঝিম্ ঝিম্ শবদে বরিখে—

তখন কথা থেমে গেলেও বলা থামে না।

এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আশ্রিত কোনো দিনক্ষণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ বৃষ্টি শুব্ধ হয়ে যায় নি। এই খবরটির উপর ছন্দ যে দোলা সৃষ্টি করে দেয় সে দোলা ঐ খবরটিকে প্রবহমান করে রাখে।

অণু পরমাণু থেকে আরম্ভ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। বস্তুত এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে তখনি সে সুর হয়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়। সেই ছন্দ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই সে হয় সংবাদ; সেই সংবাদে প্রাণ নেই, নিত্যতা নেই।

মেঘদূতের কথা ভেবে দেখো। মনিব একজন চাকরকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, গদ্যে এই খবরের মতো এমন খবর তো সর্বদা শুনছি। কেবল তফাত এই যে, রামগিরি অলকার বদলে হয়তো আমরা আধুনিক রামপুরহাট হাটখোলার নাম পাচ্ছি। কিন্তু মেঘদূত কেন লোকে বছর বছর ধরে পড়ছে। কারণ, মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এই কাব্য চিরকালের সজীব বস্তু। গতিচাঞ্চল্যের ভিতরকার কথা হচ্ছে, 'আমি আছি' এই সত্যটির বিচিত্র অনুভূতি। 'আমি আছি' এই অনুভূতিটা তো বদ্ধ নয়, এ-যে সহস্র রূপে চলায় ফেরায় আপনাকে জানা। যতদিন পর্যন্ত আমার সত্তা স্পন্দিত নন্দিত হচ্ছে ততদিন 'আমি আছি'র বেগের সঙ্গে সৃষ্টির সকল বস্তু বলছে, 'তুমি যেমন আছ আমিও তেমনি আছি।' 'আমি আছি' এই সত্যটি কেবলই প্রকাশিত হচ্ছে 'আমি চলছি'র দ্বারা। চলাটি যখন বাধাহীন হয়, চার দিকের সঙ্গে যখন সুসংগত হয়, সুন্দর হয়, তখনি আনন্দ। ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দরূপ। আর্টে কাব্যে গানে প্রকাশের সেই আনন্দমূর্তি ছন্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়।

একদা ছিল না ছাপাখানা, অক্ষরের ব্যবহার হয় ছিল না নয় ছিল অল্প। অথচ মানুষ যে-সব কথা সকলকে জানাবার যোগ্য মনে করেছে দলের প্রতি শ্রদ্ধায়, তাকে বেঁধে রাখতে চেয়েছে এবং চালিয়ে দিতে চেয়েছে পরস্পরের কাছে।

এক শ্রেণীর কথা ছিল যেগুলো সামাজিক উপদেশ। আর ছিল চাষবাসের পরামর্শ,

শুভ-অশুভের লক্ষণ, লগ্নের ভালোমন্দ ফল। এই-সমস্ত পরীক্ষিত এবং কল্পিত কথাগুলোকে সংক্ষেপ করে বলতে হয়েছে, ছন্দে বাঁধতে হয়েছে, স্থায়িত্ব দেবার জন্যে। দেবতার স্তুতি, পৌরাণিক আখ্যান বহন করেছে ছন্দ। ছন্দ তাদের রক্ষা করেছে যেন পেটিকার মধ্যে। সাহিত্যের প্রথম পর্বে ছন্দ মানুষের শুধু খেয়ালের নয়, প্রয়োজনের একটা বড়ো সৃষ্টি; আধুনিক কালে যেমন সৃষ্টি তার ছাপাখানা। ছন্দ তার সংস্কৃতির ধাত্রী, ছন্দ তার স্মৃতির ভাণ্ডারী।

চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা ক'রে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে ভোলাবার ও ঘুম পাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়। সাধুভাষী সাহিত্যমহলের বাইরে তাদের বসতি। তারা যে সমস্তই প্রাচীন তা নয়। লক্ষণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাদের অনেক আছে যারা আমাদের সমান বয়সেরই আধুনিক, এমন-কি ছন্দে মিলে ভাবে আমাদেরই শাক্রেদি সন্দেহ করি। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই—

অচীন ডাকে নদীর বাঁকে
ডাক যে শোনা যায়।
অকূল পাড়ি, থামতে নারি,
সদাই ধারা ধায়।
ধারার টানে তরী চলে,
ডাকের চোটে মন যে টলে,
টানাটানি ঘুচাও জগায়
হল বিষম দায়।

এর মিল, এর মাজাঘষা ছাঁদ ও শব্দবিন্যাস আধুনিক। তবুও যেটা লক্ষ্য করবার বিষয় সে হচ্ছে এর চলতি ভাষা। চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ। উপরের ঐ কবিতাকে সাধু ভাষার ছন্দে ঢালাই করলে তার চেহারা হয় নিম্নলিখিত-মতো—

অচিনের ডাকে নদীটির বাঁকে
ডাক যেন শোনা যায়।
কূলহীন পাড়ি, থামিতে না পারি,
নিশিদিন ধারা ধায়।

সে ধারার টানে তরীখানি চলে
সেই ডাক শুনে মন মোর টলে,
এই টানাটানি ঘুচাও অপার
হয়েছে বিষম দায়।

যদি উচ্চারণ মেনে বানান করা যেত তা হলে বাউলের গানের চেহারা হত—

অচিণ্ডাকে নদীর্ বাঁকে ডাক্‌ষে শোনা যায়।

সাধু ভাষার কবিতায় বাংলা শব্দের হসন্তরীতি যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্তু তাদের পরস্পরকে ঠোকাঠুকি ঘেঁষাঘেঁষি করতে দেওয়া হয় না। বাউলের গানে আছে 'ডাকের চোটে মন যে টলে'। এখানে 'ডাকের' আর 'চোটে', 'মন' আর 'যে', এদের মধ্যে উচ্চারণের কোনো ফাঁক থাকে না। কিন্তু সাধু ভাষার গানে 'মন' আর 'মোর' হসন্ত শব্দ হলেও হসন্ত শব্দের স্বভাব রক্ষা করে না, সন্ধির নিয়মে পরস্পর এঁটে যায় না।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো ছন্দ পয়ারের ছাঁদের, অর্থাৎ দুই সংখ্যার ওজনে। যেমন—

খনা ডেকে ব'লে যান
রোদে ধান ছায়ায় পান।
দিনে রোদ রাত্তে জল
তাতে বাড়ে ধানের বল।

এমনি ক'রে হতে হতে ছন্দের মধ্যে এসে পড়ে তিনের মাত্রা। যেমন—

আনহি বসন্ত আনহি চাষ,
বলে ডাক তাহার বিনাশ।

কিংবা—

আষাঢ়ে কাড়ান নাম্বকে,
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে,
ভাদরে কাড়ান শিষকে,
আশ্বিনে কাড়ান কিসকে।

এর অর্থ বোঝাবার দায়িত্ব নিতে পারব না।

দুই মাত্রার ছড়ার ছন্দ পরিণত রূপ নিয়েছে পয়ারে। বাঙালি বহুকাল ধরে এই ছন্দে গেয়ে এসেছে রামায়ণ মহাভারত একটানা সুরে। এই ছন্দে প্রবাহিত প্রাদেশিক পুরাণকাহিনী রঙিয়েছে বাঙালির হৃদয়কে। দারিদ্র্য ছিল তার জীবন-যাত্রায়, তার ভাগ্যদেবতা ছিল অত্যাচারপরায়ণ, সে এমন নৌকোয় ভাসছিল যার হাল

ছিল না তার নিজের হাতে; যখন তার আকাশ থাকত শান্ত তখন গ্রামের এ ঘাটে ও ঘাটে চলত তার আনাগোনা সামান্য কারবার নিয়ে, কখনো বা দিনের পর দিন দুর্যোগ লেগেই থাকত, ভাগ্যের অনিশ্চয়তায় হঠাৎ কে কোথায় পৌঁছয় তার ঠিক ছিল না, হঠাৎ নৌকোসুদ্ধ হত ভরাডুবি। এরা ছড়া বাঁধে নি নিজের কোনো স্মরণীয় ইতিহাস নিয়ে। এরা গান বাঁধে নি ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখবেদনায়। এরা নিঃসন্দেহই ভালোবেসেছে, কিন্তু নিজের জবানিতে প্রকাশ করে নি তার হাসিকান্না। দেবতার চরিত-বৃত্তান্তে এরা ঢেলেছে এদের অন্তরের আবেগ; হরপার্বতীর লীলায় এরা নিজের গৃহস্থালির রূপ ফুটিয়েছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গানে এরা সেই প্রেমের কল্পনাকে মনের মধ্যে ঢেউ লাগিয়েছে যে প্রেম সমাজবন্ধনে বন্দী নয়, যে প্রেম শ্রেয়োবুদ্ধি-বিচারের বাইরে। একমাত্র কাহিনী ছিল রামায়ণ-মহাভারতকে অবলম্বন করে যা মানবচরিত্রের নতোন্নতকে নিয়ে হিমালয়ের মতো ছিল দিক থেকে দিগন্তরে প্রসারিত। কিন্তু সে হিমালয় বাংলাদেশের উত্তরতম সীমার দূর গিরিমালার মতোই; তার অভ্রভেদী মহত্ত্বের কঠিন মূর্তি সমতল বাংলার রসাতিশয্যের সঙ্গে মেলে না। তা বিশেষভাবে বাংলার নয়, তা সনাতন ভারতের। অন্নদামঙ্গলের সঙ্গে, কবিকঙ্কণের সঙ্গে, রামায়ণ-মহাভারতের তুলনা করলে উভয়ের পার্থক্য বোঝা যাবে। অন্নদামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল বাংলার; তাতে মনুষ্যত্বের বীর্য প্রকাশ পায় নি, প্রকাশ পেয়েছে অকিঞ্চিৎকর প্রাত্যহিকতার অনুজ্জ্বল জীবনযাত্রা।

এই কাব্যের পণ্য ভেসেছিল পয়ার ছন্দে। ভাঙাচোরা ছিল এর পদবিন্যাস। গানের সুর দিয়ে এর অসমানতা মিলিয়ে দেওয়া হত, দরকার হত না অক্ষর সাজাবার কাজে সতর্ক হবার। পুরানো কাব্যের পুঁথি দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। অত্যন্ত উঁচুনিচু তার পথ। ভারতচন্দ্রই প্রথম ছন্দকে সৌষম্যের নিয়মে বেঁধেছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় পণ্ডিত। ভাষাবিন্যাসে ছন্দে প্রাদেশিকতার শৈথিল্য তিনি মানতে পারেন নি।

পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র হয়েছে ছন্দ বৈষ্ণব পদাবলীতে। তার একটা কারণ, এগুলি একটানা গল্প নয়। এই পদগুলিতে বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাত লেগেছে। দোলায়িত হয়েছে সেই আবেগ তিনমাত্রার ছন্দে। দ্বৈমাত্রিক এবং ত্রৈমাত্রিক ছন্দে বাংলা কাব্যের আরম্ভ। এখনো পর্যন্ত ঐ দুই জাতের মাত্রাকে নানা প্রকারে সাজিয়ে বাংলায় ছন্দের লীলা চলছে। আর আছে দুই এবং তিনের জোড় বিজোড় সংখ্যা মিলিয়ে পাঁচ কিংবা নয়ের অসম মাত্রার ছন্দ।

মোট কথা বলা যায়, দুই এবং তিন সংখ্যাই বাংলার সকল ছন্দের মূলে। তার

রূপের বৈচিত্র্য ঘটে যতিবিভাগের বৈচিত্র্যে, এবং নানা ওজনের পংক্তিবিন্যাসে। এই-রকম বিভিন্ন বিভাগের যতি ও পংক্তি নিয়ে বাংলায় ছন্দ কেবলই বেড়ে চলেছে।

এক সময়ে শ্রেণীবদ্ধ মাত্রা গুণে ছন্দ নির্ণয় হত। বালকবয়সে একদিন সেই চোদ্দ অক্ষর মিলিয়ে ছেলেমানুষি পয়ার রচনা ক'রে নিজের কৃতিত্বে বিস্মিত হয়েছিলুম। তার পরে দেখা গেল, কেবল অক্ষর গণনা ক'রে যে ছন্দ তৈরি হয় তার শিল্পকলা আদিম জাতের। পদের নানা ভাগ আর মাত্রার নানা সংখ্যা দিয়ে ছন্দের বিচিত্র অলংকৃতি। অনেক সময়ে ছন্দের নৈপুণ্য কাব্যের মর্যাদা ছাড়িয়ে যায়।

চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসন্তসংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে। সেটা পয়ার হলেও অক্ষর-গোনা পয়ার হবে না, সে হবে মাত্রা-গোনা পয়ার। কিন্তু কথাটা ঠিক হল না, বস্তুত সাধু ভাষার পয়ারও মাত্রা-গোনা। সাহিত্যিক কবুলতি পত্রে সাধু ভাষায় অক্ষর এবং মাত্রা এক পরিমাণের বলে গণ্য হয়েছে। এইমাত্র রফা হয়েছে যে সাধু ভাষার পদ্য-উচ্চারণকালে হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে গায়ে লেগে যাবে না; অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে।—

সতত হে নদ তুমি পড়ো মোর মনে,
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

চলতি বাংলায় 'নদ' আর 'তুমি', 'মোর' আর 'মনে' হসন্তের বাঁধনে বাঁধা। এই পয়ারে ঐ শব্দগুলিকে হসন্ত বলে যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্তু ওর বাঁধন আলগা করে দেওয়া হয়েছে। 'কান' আর 'আমি', 'ভ্রান্তির' আর 'ছলনে' হসন্তের রীতিতে হওয়া উচিত ছিল যুক্ত শব্দ; কিন্তু সাধু ছন্দের নিয়মে ওদের জোড় বাঁধতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

একটা খাঁটি ছড়ার নমুনা দেখা যাক—

এ পার গঙ্গা ও পার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারই মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর।

এটা পয়ার কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। তবু উচ্চারণ মিলিয়ে বানান করলে চোদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না—

এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছেন্শিবু সদাগর।

ছড়ায় প্রায় দেখা যায় মাত্রার ঘনতা কোথাও কম, কোথাও বেশি। আবৃত্তিকারের

উপর ছন্দ মিলিয়ে নেবার বরাত দেওয়া আছে। ছন্দের নিজের মধ্যে যে ঝোঁক আছে তার তাড়ায় কণ্ঠ আপনি প্রয়োজনমত স্বর বাড়ায় কমায়।—

শিবু ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্তে দান।

এখানে 'বিয়ে হবে' শব্দে মাত্রা টিলে হয়ে গেছে। যদি থাকত 'শিবু ঠাকুরের বিয়ের সভায় তিন কন্তে দান', তা হলে মাত্রা পুরো হত। কিন্তু বাংলাদেশে ছেলে বুড়ো এমন কেউ নেই যে আপনিই 'বিয়ে— হবে—' স্বরে টান না দেয়।

বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস,
তাহার অধিক ধলো কন্তে তোমার হাতের শঙ্খ।

ছুটো লাইনের মাত্রার কমি-বেশি স্পষ্ট; কিন্তু ভয়ের কারণ নেই, স্বতই আবৃত্তির টানে ছুটো লাইনের ওজন মিলে যায়। ছন্দে চলতি ভাষা আইন জারি না করেও আইন মানিয়ে নিতে পারে।

ছেলে ভোলাবার ছড়া শুনলে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, এতে অর্থের সংগতির দিকে একটুও দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি দেবার দরকার বোধ করা হয় নি। যুক্তিবাঁধন-ছেঁড়া ছবিগুলো ছন্দের ঢেউয়ের উপর টগ্‌বগ্‌ করে ভেসে উঠছে, ভেসে যাচ্ছে। স্বপ্নের মতো একটা আকস্মিক ছবি আর-একটা ছবিকে জুটিয়ে আনছে। একটা শব্দের অনুপ্রাসে হোক বা আর-কোনো অনির্দিষ্ট কারণে হোক, আর-একটা শব্দ রবাহূত এসে পড়ছে। আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে অবচেতন চিত্তের এই-সমস্ত স্বপ্নের লীলাকে স্থান দেবার একটা প্রেরণা দেখা যায়। আধুনিক মনস্তত্ত্বে মানুষের মগ্নচৈতন্তের সক্রিয়তার উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। চৈতন্তের সতর্কতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বপ্নলোকের অসংলগ্ন স্বতঃসৃষ্টিকে কাব্যে উদ্ধার ক'রে আনবার একটা প্রয়াস দেখতে পাই। নীচের ছড়াটির মতো এই জাতের রচনা কোনো আধুনিক কবির হাত দিয়ে বেরিয়েছে কি না জানি নে। খবর যা পেয়েছি তাতে জানা যায়, এর চেয়ে অসংলগ্ন কাব্যের অভ্যুদয় হয়েছে।—

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন রেখেছে,
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
ছু পারে ছুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে,
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ও পারেতে ছুটি মেয়ে নাইতে নেবেছে,
ঝুমু ঝুমু চুলগাছটি ঝাড়তে লেগেছে।
কে রেখেছে, কে রেখেছে, দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।

দাদা যাবে কোন্‌খান দে, বকুলতলা দে।
বকুল ফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্যি বাজে সীতেনাথের খেলা।
সীতেনাথ বলে রে ভাই, চালকড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ,
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ।
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্‌ করে,
চাঁদমুখে রোদ লেগে রক্ত ফেটে পড়ে।

সুদূর কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই কাব্য যারা আউড়িয়েছে এবং যারা শুনেছে তারা একটা অর্থের অতীত রস পেয়েছে; ছন্দতে ছবিতে মিলে একটা মোহ এনেছে তাদের মনের মধ্যে। সেইজন্যে অনেক নামজাদা কবিতার চেয়ে এর আয়ু বেড়ে চলেছে। এর ছন্দের চাকা ঘুরে চলেছে বহু শতাব্দীর রাস্তা পেরিয়ে।

আদিম কালের মানুষ তার ভাষাকে ছন্দের দোল লাগিয়ে নিরর্থক নাচাতে কুণ্ঠিত হয় নি। নাচের নেশা আছে তার রক্তে। বুদ্ধি যখন তার চেতনায় একাধিপত্য করতে আরম্ভ করেছে, তখনি সে নেশা কাটিয়ে উঠে মেনেছে শব্দের সঙ্গে অর্থের একান্ত যোগ। আদিম মানুষ মন্ত্র বানিয়েছে, সে মন্ত্রের শব্দে অর্থের শাসন নেই অথবা আছে সামান্য। তার মন ছন্দে দোলায়িত ধ্বনির রহস্যে ছিল অভিভূত। তার মনে ধ্বনির এই-যে সম্মোহনপ্রভাব, দেবতার উপরে, প্রাকৃতিক শক্তির উপরেও তার ক্রিয়া সে কল্পনা করত। তাই সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির অনেক গানের শব্দে অর্থ হয়েছে গৌণ; অর্থের যে আভাস আছে সে কেবল ধ্বনির গুণে মনের মধ্যে মোহ বিস্তার করে, অর্থাৎ কোনো স্পষ্ট বার্তার জন্যে তার আদর নয়, ব্যঞ্জনার অনির্দেশ্যতাই তাকে প্রবলতা দেয়। মা তার ছেলেকে নাচাচ্ছে—

খেনা নাচন খেনা,
বট পাকুড়ের ফেনা।
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান,
সোনার জাদুর জন্যে যাবে নাচ্‌না কিনে আন্‌।

এর মধ্যে খানিকটা অর্থহীন ধ্বনি, খানিকটা অর্থবান ছবির টুকরো নিয়ে যে ছড়া বানানো হয়েছে তাতে আছে সেই নাচন যে নাচন স্বপ্নলোকে কিনতে পাওয়া যায়।

এই-যে ধ্বনিতে অর্থে মিলে মনের মধ্যে মোহাবেশ জাগিয়ে তোলা, এটা সকল যুগের কবিতার মধ্য দিয়েই কমবেশি প্রকাশ পায়; তাই অর্থের প্রবলতা বেড়ে উঠলে কবিতার সম্মোহন যায় কমে। ধ্বনির ইশারা দিয়ে যা নিজেকে অভাবনীয় রূপে

সার্থক করে তোলে, শিক্ষকের ব্যাখ্যার দ্বারা তা যখন সমর্থনের অপেক্ষা করে তখন কবিতার মন্ত্রশক্তি হারায় তার গুণ। ছন্দ আছে জাদুর কাজে, খেয়াল গেলে বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করতে সে সাহস করে।

সাহিত্যের মধ্যে কারুকাজ, কাব্যে যার প্রাধান্য, তার একটা দিক হচ্ছে শব্দের বাছাই-সাজাই করা। কালে কালে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ভাষায় শব্দ জমে যায় বিস্তর। তার মধ্যে থেকে বেছে নিতে হয় এমন শব্দ যা কল্পনার ঠিক ফরমাশটি মানতে পারে পুরো পরিমাণে।

রামপ্রসাদ বলেছেন: আমি করি দুখের বড়াই। 'বড়াই'-বর্গের অনেক ভারী ভারী কথা ছিল: গর্ব করি, গৌরব করি, মাহাত্ম্য বোধ করি। কিন্তু 'দুঃখকেই বড়ো ক'রে নিয়েছি' বলবার জন্যে অমন নিতান্ত সহজ অর্থাৎ ঠিক কথাটি বাংলাভাষায় আর নেই।

যেমন আছে শব্দের বাছাই তেমনি আছে ভাবপ্রকাশের বাছাইয়ের কাজ।

বাউল বলতে চেয়েছে, চার দিকে অচিন্তনীয় অপরিসীম রহস্য, তারই মধ্যে চলেছে জীবনযাত্রা। সে বললে—

পরান আমার স্রোতের দীয়া
(আমায় ভাসাইলা কোন্ ঘাটে)।
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিশুইৎ-ঢালা।
আন্ধারমাঝে কেবল বাজে লহরেরই মালা।
তার তলেতে কেবল চলে নিশুইৎ রাতের ধারা,
সাথের সাথি চলে বাতি, নাই গো কূলকিনারা।

নানা রহস্যে একলা-জীবনের গতি, যেন চার দিকের নিশুৎ অন্ধকারে স্রোতে-ভাসানো প্রদীপের মতো— এমন সহজ উপমা মিলবে কোথায়। একটা শব্দ-বাছাই লক্ষ্য করা যাক: লহরেরই মালা। ঊর্মি নয়, তরঙ্গ নয়, ঢেউ নয়, শব্দ জাগাচ্ছে জলে ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, ইংরেজিতে যাকে বলে ripples। অন্ধকারের তলায় তলায় রাত্রির ধারা চলেছে, এ ভাবটা মনে হয় যেন আধুনিক কবির ছোঁয়াচ-লাগা। রাত্রি স্তব্ধ হয়ে আছে, এইটেই সাধারণত মুখে আসে। তার প্রহরগুলি নিঃশব্দ নির্লক্ষ্য স্রোতের মতো বয়ে চলেছে, এ উপমাটায় হালের টাঁকশালের ছাপ লেগেছে বলেই মনে হয়।

শব্দ-বাছাই ভাব-বাছাইয়ের শিল্পকাজ চলেছে পৃথিবীর সাহিত্য জুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে চলেছে ধ্বনির কাজ। সেটা গদ্যে চলে অলক্ষ্যে, পদ্যে চলে প্রত্যক্ষে।

মুখে মুখে প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষায় কলাকৌশলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষ দলবাঁধা জীব। একলার ব্যবহারে সে আটপৌরে, দলের ব্যবহারে সুসজ্জিত। সকলের সঙ্গে আচরণে মানুষের যে সৌজন্য সেই তার ব্যবহারের শিল্পকার্য। তাতে যত্নপূর্বক বাছাই সাজাই আছে। সর্বজনীন ব্যবহারে ব্যক্তিগত খেয়ালের যথেচ্ছাচার নিন্দনীয়। এ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে ও অন্যকে একটা চিরন্তন আদর্শের দ্বারা সম্মান দেয়। সাহিত্যকে কদাচিৎ শ্রীভ্রষ্ট সৌজন্যভ্রষ্ট করায় প্রকাশ পায় সমাজের বিকৃতি, প্রকাশ পায় কোনো সাময়িক বা মারাত্মক ব্যাধির লক্ষণ।

ভাষা অবতীর্ণ হয়েছে মানুষকে মানুষের সঙ্গে মেলাবার উদ্দেশ্যে। সাধারণত সে মিলন নিকটের এবং প্রত্যহের। সাহিত্য এসেছে মানুষের মনকে সকল কালের সকল দেশের মনের সঙ্গে মুখোমুখি করবার কাজে। প্রাকৃত জগৎ সকল কালের সকল স্থানের সকল তথ্য নিয়ে, সাহিত্যজগৎ সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের কল্পনা-প্রবণ মন নিয়ে। এই জগৎ-সৃষ্টিতে যে-সকল বড়ো বড়ো রূপকার আপন বিশ্বজনীন প্রতিভা খাটিয়েছেন সেই-সব সৃষ্টিকর্তাদেরকে মানুষ চিরস্মরণীয় বলে স্বীকার করেছে। বলেছে তাঁরা অমর। পঞ্জিকার গণনা অনুসারে অমর নয়। মাহেঞ্জদারোর ভগ্নাবশেষ যখন দেখি তখন বোঝা যায়, তারই মতো এমন অনেক সভ্যতা মাটির তলায় লুপ্ত হয়ে গেছে। সেদিনকার বিলুপ্ত সভ্যতাকে যাঁরা একদিন বাণীরূপ দিয়েছিলেন তাঁদের সেই বাণীও নেই, সেই স্মৃতিও নেই। কিন্তু যখন তাঁরা বর্তমান ছিলেন তখন তাঁদের কীর্তির যে মূল্য ছিল সে কেবল উপস্থিত কালের নয়, সে নিত্যকালের। সকল কালের সকল মানুষের চিত্তমিলনবেদিকায় উৎসর্গ করা তাঁদের দান সেদিন অমরতার স্বাক্ষর পেয়েছিল, আমরা সে সংবাদ জানি আর নাই জানি।

১২

সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান প্রভেদ ক্রিয়াপদের চেহারায়। যেমন সাধুভাষার 'করিতেছি' হয়েছে চলতি ভাষায় 'করছি'।

এরও মূল কথাটা হচ্ছে আমাদের ভাষাটা হসন্তবর্ণের শক্ত মুঠোয় আঁটবাঁধা। 'করিতেছি' এলানো শব্দ, পিণ্ড পাকিয়ে হয়েছে 'করছি'।

এই ভাষার একটা অভ্যেস দেখা যায়, তিন বা ততোধিক অক্ষর-ব্যাপী শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে হসন্ত লাগিয়ে শেষ অক্ষরে একটা স্বরবর্ণ জুড়ে শব্দটাকে তাল পাকিয়ে দেওয়া। যথা ক্রিয়াপদে: ছিটকে পড়া, কাৎরে ওঠা, বাৎলে দেওয়া, সাঁৎরে যাওয়া,

ইন্‌হনিয়ে চলা, বদ্‌লিয়ে দেওয়া, বিগ্‌ড়িয়ে যাওয়া।

বিশেষ্যপদে : কাৎলা ভেট্‌কি কাঁক্‌ড়া শাম্‌লা স্যাক্‌ড়া চাম্‌চে নিম্‌কি চিম্‌টে টুক্‌রি কুন্‌কে আধ্‌লা কাঁচ্‌কলা সক্‌ড়ি দেশ্‌লাই চাম্‌ড়া মাট্‌কোঠা পাগ্‌লা পল্‌তা চাল্‌তে গাম্‌লা আম্‌লা।

বিশেষণ, যেমন : পুঁচ্‌কে বোট্‌কা আল্‌গা ছুট্‌কো হাল্‌কা বিধ্‌কুটে পাৎলা ডান্‌পিটে শুট্‌কো পান্‌সা চিম্‌সে।

এই হসন্তবর্ণের প্রভাবে আমাদের চলতি ভাষায় যুক্তবর্ণের ধ্বনিরই প্রাধান্য ঘটেছে।

আরও গোড়ায় গেলে দেখতে পাই, এটা ঘটতে পেরেছে অকারের প্রতি ভাষার উপেক্ষাবশত।

সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণ মিলিয়ে দেখলে প্রথমেই কানে ঠেকে অ স্বরবর্ণ নিয়ে। সংস্কৃত আ স্বরের হ্রস্বরূপ সংস্কৃত অ। বাংলায় এই হ্রস্ব আ অর্থাৎ অ আমাদের উচ্চারণে আ নাম নিয়েই আছে ; যেমন : চালা কাঁচা রাজা। এ-সব আ এক মাত্রার চেয়ে প্রশস্ত নয়। সংস্কৃত আ'কারযুক্ত শব্দ আমরা হ্রস্বমাত্রাতেই উচ্চারণ করি, যেমন 'কামনা'।

বাংলা বর্ণমালার অ সংস্কৃত স্বরবর্ণের কোঠায় নেই। ইংরেজি star শব্দের a সংস্কৃত আ, ইংরেজি stir শব্দের i সংস্কৃত অ। ইংরেজি ball শব্দের a বাংলা অ। বাংলায় 'অল্পসল্প'র বানান যাই হোক, ওর চারটে বর্ণেই সংস্কৃত অ নেই। হিন্দিতে সংস্কৃত অ আছে, বাংলা অ নেই। এই নিয়েই হিন্দুস্থানি ওস্তাদের বাঙালি শাকরেদেরা উচ্চ অঙ্গের সংগীতে বাংলা ভাষাকে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করেন।

বাংলা অ যদিও বাংলাভাষার বিশেষ সম্পত্তি তবু এ ভাষায় তার অধিকার খুবই সংকীর্ণ। শব্দের আরম্ভে যখন সে স্থান পায় তখনি সে টিঁকে থাকতে পারে। 'কলম' শব্দের প্রথম বর্ণে অ আছে, দ্বিতীয় বর্ণে সে 'ও' হয়ে গেছে, তৃতীয় বর্ণে সে একেবারে লুপ্ত। ঐ আদিবর্ণের মর্যাদা যদি সে অব্যাঘাতে পেত তা হলেও চলত, কিন্তু পদে পদে আক্রমণ সইতে হয়, আর তখনি পরাস্ত হয়ে থাকে। 'কলম' যেই হল 'কল্‌মি', অমনি প্রথম বর্ণের অকার বিগড়িয়ে হল ও। শব্দের প্রথমস্থিত অকারের এই ক্ষতি বারে বারে নানা রূপেই ঘটছে, যথা : মন বন ধন্য যক্ষ হরি মধু মসৃণ। এই শব্দগুলিতে আদ্য অকার 'ও' স্বরকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। দেখা গেছে, ন বর্ণের পূর্বে তার এই দুর্গতি, ক্ষ বা ঋ ফলার পূর্বেও তাই। তা ছাড়া দুটি স্বরবর্ণ আছে ওর শত্রু, ই আর উ। তারা পিছনে থেকে ঐ আদ্য অ'কে করে দেয় ও, যেমন : গতি ফণী বধূ

যদু। য ফলার পূর্বেও অকারের এই দশা, যেমন: কল্য মন্ত পণ্য বন্য। যদি বলা যায় এইটেই স্বাভাবিক তা হলে আবার বলতে হয়, এ স্বভাবটা সর্বজনীন নয়। পূর্ববঙ্গের রসনায় অকারের এ বিপদ ঘটে না। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, অকারকে বাংলা বর্ণমালায় স্বীকার করে নিয়ে পদে পদে তাকে অশ্রদ্ধা করা হয়েছে বাংলাদেশের বিশেষ অংশে। শব্দের শেষে হসন্ত তাকে খেদিয়েছে, শব্দের আরম্ভে সে কেবলই তাড়া খেতে থাকে। শব্দের মাঝখানেও অকারের মুখোষ প'রে ওকারের একাধিপত্য, যথা: খড়ম বালক আদর বাঁদর কিরণ টোপর চাকর বাসন বাদল বছর শিকড় আসল মঙ্গল সহজ। বিপদে ওর একমাত্র রক্ষা সংস্কৃত ভাষার করক্ষেপে, যেমন: অ-মল বি-জন নী-রস কু-রঙ্গ স-বল দুর্-বল অন্-উপম প্রতি-পদ। এই আশ্রয়ের জোরও সর্বত্র খাটে নি, যথা: বিপদ বিষম সকল।

মধ্যবর্ণের অকার রক্ষা পায় য বর্ণের পূর্বে, যথা: সময় মলয় আশয় বিষয়।

মধ্যবর্ণের অকার ওকার হয়, সে-যে কেবল হসন্ত শব্দে তা নয়। আকারান্ত এবং যুক্তবর্ণের পূর্বেও এই নিয়ম, যথা: বসন্ত আলস্য লবঙ্গ সহস্র বিলম্ব স্বতন্ত্র রচনা রটনা যোজনা কল্পনা বঞ্চনা।

ইকার আর উকার পদে পদে অকারকে অপদস্থ করে থাকে তার আরও প্রমাণ আছে।

সংস্কৃত ভাষায় ঈয় প্রত্যয়ের যোগে 'জল' হয় 'জলীয়'। চলতি বাংলায় ওখানে আসে উআ প্রত্যয়: জল+উআ=জলুআ। এইটে হল প্রথম রূপ।

কিন্তু উ স্বরবর্ণ শব্দটাকে স্থির থাকতে দেয় না। তার বাঁ দিকে আছে বাংলা অ, ডান দিকে আছে আ, এই দুটোর সঙ্গে মিশে দুই দিকে দুই ওকার লাগিয়ে দিল, হয়ে দাঁড়ালো 'জোলো'।

অকারে বা অযুক্ত বর্ণে যে-সব শব্দের শেষ সেই-সব শব্দের প্রান্তে অ বাসা পায় না, তার দৃষ্টান্ত পূর্বে দিয়েছি। ব্যতিক্রম আছে ত প্রত্যয়-ওয়ালা শব্দে, যেমন: গত হত ক্ষত। আর কতকগুলি সর্বনাম ও অব্যয় শব্দে, যেমন: যত তত কত যেন কেন হেন। আর 'এক শো' অর্থের 'শত' শব্দে। কিন্তু এ কথাটাও ভুল হল। বানানের ছলনা দেখে মনে হয় অন্তত ঐ কটা জায়গায় অ বুঝি টিঁকে আছে। কিন্তু সে ছাপার অক্ষরে আপনার মান বাঁচিয়ে মুখের উচ্চারণে ওকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, হয়েছে: নতো শতো গতো ক্যানো।

অকারের অত্যন্ত অনাদর ঘটেছে বাংলার বিশেষণ শব্দে। বাংলাভাষায় দুই

অক্ষরের বিশেষণ শব্দ প্রায়ই অকারান্ত হয় না, তাদের শেষে থাকে আকার একার বা ওকার। এর ব্যতিক্রম অতি অল্পই। প্রথমে সেই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যতগুলি মনে পড়ে দেওয়া যাক। রঙ বোঝায় যে শব্দে, যেমন : লাল নীল শ্যাম। স্বাদ বোঝায় যে শব্দে, যেমন : টক ঝাল। সংখ্যাবাচক শব্দ : এক থেকে দশ ; তার পরে, বিশ ত্রিশ ও ষাট। এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। এইরকম সংখ্যাবাচক শব্দ কেবলমাত্র সমাসে খাটে, যেমন : একজন দশঘর দুইমুখো তিনহপ্তা। কিন্তু বিশেষ্য পদের সঙ্গে জোড়া না লাগিয়ে ব্যবহার করতে গেলেই ওদের সঙ্গে 'টি' বা 'টা', 'খানা' বা 'খানি' যোগ করা যায়, এর অন্যথা হয় না। কখনো কখনো বা বিশেষ অর্থে ই প্রত্যয় জোড়া হয়, যেমন : একই লোক, দুইই বোকা। কিন্তু এই প্রত্যয় আর বেশি দূর চালাতে গেলে 'জন' শব্দের সহায়তা দরকার হয়, যেমন : পাঁচজনই দশজনেই। 'জন' ছাড়া অন্য বিশেষ্য চলে না ; 'পাঁচ গোরুই' 'দশ চৌকিই' অবৈধ, ওদের ব্যবহার করা দরকার হলে সংখ্যাশব্দের পরে টি টা খানি খানা জুড়তে হবে, যথা : দশটা গোরুই, পাঁচখানি তক্তাই। এক দুই -এর বর্গ ছাড়া আরও দুটি দুই অক্ষরের সংখ্যাবাচক শব্দ আছে, যেমন : আধ এবং দেড়। কিন্তু এরাও বিশেষ্যশব্দ-সহযোগে সমাসে চলে, যেমন : আধঘোমটা দেড়পোওয়া। সমাস ছাড়া বিশেষণ রূপ : দেড়া আধা। সমাসসংশ্লিষ্ট একটা শব্দের দৃষ্টান্ত দেখাই : জোড়হাত। সমাস ছাড়ালে হবে 'জোড়া হাত'। 'হেঁট' বিশেষণ শব্দটি ক্রিয়াপদের যোগে অথবা সমাসে চলে : হেঁটমুণ্ড, কিংবা হেঁট-করা, হেঁট-হওয়া। সাধারণ বিশেষণ অর্থে ওকে ব্যবহার করি নে, বলি নে 'হেঁট মানুষ'। বস্তুত 'হেঁট হওয়া' 'হেঁট করা' জোড়া ক্রিয়াপদ, জুড়ে লেখাই উচিত। 'মাঝ' শব্দটাও এই জাতের, বলি : মাঝখানে মাঝদরিয়া। এ হল সমাস। আর বলি : মাঝ থেকে। এখানে 'থেকে' অপাদানের চিহ্ন, অতএব 'মাঝ-থেকে' শব্দটা জোড়া শব্দ। বলি নে : মাঝ লোক, মাঝ ঘর। এই মাঝ শব্দটা খাঁটি বিশেষণ রূপ নিলে হয় 'মেঝো'।

দুই অক্ষরের হসন্ত বাংলা বিশেষণের দৃষ্টান্ত ভেবে ভেবে আরও কিছু মনে আনা যেতে পারে, কিন্তু অনেকটা ভাবতে হয়। অপর পক্ষে বেশি খুঁজতে হয় না, যেমন : বড়ো ছোটো মেঝো সেজো ভালো কালো ধলো রাঙা সাদা ফিকে খাটো রোগা মোটা বেঁটে কুঁজো বাঁকা সিধে কানা খোঁড়া বোচা নুলো ন্যাকা খাঁদা ট্যারা কটা গোটা ন্যাড়া খ্যাপা মিঠে ভাঁসা কষা খাসা ভোকা কাঁচা পাকা খাঁটি মেকি কড়া চোখা রোখা ভিজে হাজা শুকো গুঁড়ো বুড়ো ওঁচা খেলো ছ্যাঁদা ঝুঁটো ভীতু উঁচু নিচু কালা হাবা বোকা ঢ্যাঙা বেঁটে টুঁটো ঘনো।

বাংলা বর্ণমালায় ই আর উ সবচেয়ে উদ্যমশীল স্বরবর্ণ। রাসায়নিক মহলে অক্সিজেন গ্যাস নানা পদার্থের সঙ্গে নানা বিকার ঘটিয়ে দিয়ে নিজেকে রূপান্তরিত করে, ই স্বরবর্ণ টা সেইরকম। অন্তত আ'কে বিগড়িয়ে দেবার জন্যে তার খুব উদ্যম, যেমন : থলি+আ=থ'লে, করি+আ=ক'রে। ইআ প্রত্যয়ের ই পূর্ববর্তী একটা বর্ণকে ডিঙিয়ে শব্দের আদি ও অন্তে বিকার ঘটায়, তার দৃষ্টান্ত : জাল+ইআ=জেলে, বালি+ইআ=বেলে, মাটি+ইআ=মেটে, লাঠি+ইআল=লেঠেল।

পরে যেখানে আকার আছে ই সেখানে আ'এ হাত না দিয়ে নিজেকেই বদলে ফেলেছে, তার দৃষ্টান্ত যথা : মিঠাই=মেঠাই, বিড়াল=বেড়াল, শিয়াল=শেয়াল, কিতাব=কেতাব, খিতাব=খেতাব।

আবার নিজেকে বজায় রেখে আকারটাকে বিগড়িয়ে দিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত দেখো : হিসাব=হিসেব, নিশান=নিশেন, বিকাল=বিকেল, বিলাত=বিলেত। ই কোনো উৎপাত করে নি এমন দৃষ্টান্তও আছে, সে বেশি নয়, অল্পই, যেমন : বিচার নিবাস কৃষাণ পিশাচ।

একদা বাংলা ক্রিয়াপদে আ স্বরবর্ণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। করিলা চলিলা করিবা যাইবা : এইটেই নিয়ম ছিল। ইতিমধ্যে ই উপদ্রব বাধিয়ে দিলে। নিরীহ আকারকে সে শান্তিতে থাকতে দেয় না ; 'দিলা'কে করে তুলল 'দিলে', 'করিবা' হল 'করবে'।

বাংলা ক্রিয়াপদের সদ্য-অতীতে ইল প্রত্যয়ে বিকল্পে ও এবং এ লাগে, যেমন : করলো করলে। 'করিল' হয়েছে 'করলো', ইকারের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে। 'করিলা' থেকে 'করলে' হয়েছে ইকারের শাসন মেনেই, অর্থাৎ আ'কে নিকটে পেয়ে ই তার যোগে একটা এ ঘটিয়েছে। মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, দক্ষিণবঙ্গের কথ্য বাংলার কথা বলছি। এই ভাষায় 'করিলাম' যদি 'করলেম' হয়ে থাকে সে তার স্বরবর্ণের প্রবৃত্তিবশত। এই কারণেই 'হইয়া' হয়েছে 'হয়ে'।

বাংলায় উ স্বরবর্ণও খুব চঞ্চল। ইকার টেনে আনে এ স্বরকে, আর ও স্বরকে টানে উকার : পট+উআ=পোটো। মাঝের উ ডাইনে বাঁয়ে দিলে স্বর বদলিয়ে। শব্দের আদ্যক্ষরে যদি থাকে আ, তা হলে এই সব্যসাচী বাঁ দিকে লাগায় এ, ডান দিকে ও। 'মাঠ' শব্দে উআ প্রত্যয় যোগে 'মাঠুআ', হয়ে গেল 'মেঠো' ; 'কাঠুআ' থেকে 'কেঠো'। উকারের আত্মবিসর্জনের যেমন দৃষ্টান্ত দেখলুম, তার আত্মপ্রতিষ্ঠারও দৃষ্টান্ত আছে, যেমন : কুড়াল=কুড়ুল, উনান=উনুন। কোথাও বা আদ্যক্ষরের উকার পরবর্তী আকারকে ও ক'রে দিয়ে নিজে খাঁটি থাকে, যেমন : জুতা=জুতো, গুঁড়া=গুঁড়ো,

পূজা=পুজো, সুতা=সুতো, ছুতার=ছুতোর, কুমার=কুমোর, উজাড়=উজোড়। উকারের পরবর্তী অকারকে অনেক স্থলেই উকার করে দেওয়া হয়, যেমন : পুতল=পুতুল, পুখর=পুখুর, হুকম=হুকুম, উপড়=উপুড়।

একটা কথা বলে রাখি, ইকারে সঙ্গে উকারের একটা যোগসাজোস আছে। তিন অক্ষরের কোনো শব্দের তৃতীয় বর্ণে যদি ই থাকে তা হলে সে মধ্যবর্ণের আ'কে তাড়িয়ে সেখানে বিনা বিচারে উ'এর আসন করে দেয়। কিন্তু প্রথমবর্ণে উ কিংবা ই থাকা চাই, যেমন : উড়ানি=উড়ুনি, নিড়ানি=নিড়ুনি, পিটানি=পিটুনি। কিন্তু 'পেটানি'র বেলায় খাটে না ; কারণ ওটা একার, ইকার নয়। 'মাতানি'র বেলায়ও এইরূপ। 'খাটুনি' হয়, যেহেতু ট'এ আকারের সংস্রব নেই। গাঁথুনি মাতুনি রাঁধুনি'রও উকার এসেছে অকারকে সরিয়ে দিয়ে। সেই নিয়মে : এখুনি চিরুনি। 'চালানি' শব্দে আকারকে মেরে উকার দখল পেলে না, কিন্তু 'চালনি' শব্দে অকারকে ঠেলে ফেলে অনায়াসে হল 'চালুনি'।

উকারের ব্যবহার দেখলে মনে পড়ে কোকিলকে, সে যেখানে সেখানে পরের বাসায় ডিম পেড়ে যায়।

এও দেখা গেছে ইআ প্রত্যয়-ওয়ালা শব্দে ই'কে ঠেলে উ অনধিকারে নিজে আসন জুড়ে বসে, যেমন : জঙ্গল=জঙ্গলিয়া=জঙ্গুলে, বাদল=বাদলিয়া=বাদুলে। এমনিতরো : নাটুকে মাতুনে।

হাতুড়ে কাঠুরে সাপুড়ে হাটুরে ঘেসুড়ে : এদের মধ্যে কোনো-একটা প্রত্যয় যোগে র বা ড় এসে জুটেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'ঘেসুড়ে'র ঘাসে লাগল একার, 'সাপুড়ে'র সাপ রইল নির্বিকার। ভাষাকে প্রশ্ন করলে এক-এক সময়ে ভালো জবাব পাই, এক-এক সময় পাইও নে। চাষ যে করে সে 'চাষুড়ে' হল না কেন।

আমার হিন্দিভাষী বন্ধু বলেন, বাংলায় 'সাপুড়ে' ; হিন্দিতে : সঁপেরা=সাঁপ+হারা। বাংলা 'কাঠুরে' হিন্দিতে 'লকড়হারা', হিন্দিতে 'কাঠহারা' কথা নেই। হিন্দির এই 'হারা' তদ্ধিত প্রত্যয় ; অধিকার অর্থে এর প্রয়োগ, ক্রিয়া অর্থে নয়। বোধ করি সেই কারণে 'চাষুড়ে' শব্দটা সম্ভব হয় নি।

স্বরবিকারের আর-একটা অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখো। ইআ প্রত্যয়-যোগে একটা ওকার খামখা হয়ে গেল উ : গোবোর+ইয়া=গুব্‌রে, কোঁদোল+ইয়া=কুঁদুলে। 'কুঁদলে' হল না কেন সেও একটা প্রশ্ন। 'গোবোর' থেকে ওকারটাকে হসন্তের ঘায়ে তাড়িয়ে দিলে। 'কোঁদোল' শব্দেও হসন্তকে জায়গা না দিয়ে, নিজে বসল জমিয়ে।

অকারের প্রতি উপেক্ষা সম্বন্ধে আরও প্রমাণ দেওয়া যায়। হাত বুলিয়ে সন্ধান

করাকে বলে 'হাৎড়ানো', অসমাপিকায় 'হাৎড়িয়ে'। এখানে 'হাত'এর ত থেকে ছেঁটে দেওয়া হল অকার। অথচ 'হাতুড়ে' শব্দের বেলায় নাহক একটা উকার এনে জুড়ে দিলে, তবু অকারকে কিছুতে আমল দিল না। 'বাদল' শব্দের উত্তর ইআ প্রত্যয় যোগ ক'রে 'বাদ্‌লে' করলে না বটে, কিন্তু দিলে 'বাদুলে' করে।

এই-সব দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারি, অন্তত পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের রসনার টান আছে উকারের দিকে। 'হাতড়ি' শব্দ তাই সহজেই হয়েছে 'হাতুড়ি'। তা ছাড়া দেখো : বাছুর তেঁতুল বামুন মিশুক হিংসুক বিদ্যুৎবার।[১]

এই প্রসঙ্গে আর-একটা দৃষ্টান্ত দেবার আছে। 'চিবোতে' 'ঘুমোতে' শব্দের স্থলে আজকাল 'চিবুতে' 'ঘুমুতে' উচ্চারণ ও বানান চলেছে। আজকাল বলছি এইজন্যে যে, আমার নিজের কাছে এই উচ্চারণ ছিল অপরিচিত ও অব্যবহৃত। 'চিবোতে' 'ঘুমোতে' শব্দের মূলরূপ : চিবাইতে ঘুমাইতে। আ+ই'কে ঠেলে ফেলে নিঃসম্পর্কীয় উ এসে বসল। অবশ্য এর অন্য নজির আছে। বিনানি = বিনুনি, ঝিমানি = ঝিমুনি, পিটানি = পিটুনি শব্দে দেখা যাচ্ছে প্রথম বর্ণের ইকার তার সবর্ণ তৃতীয় বর্ণের 'পরে হস্তক্ষেপ করলে না, অথচ মধ্যবর্ণের আ'কে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসিয়ে দিলে উ। মনে রাখতে হবে, প্রথম বর্ণের ইকার তার এই বন্ধু উ'কে নিমন্ত্রণের জন্যে দায়ী। গোড়ায় যেখানে ইকারের ইঙ্গিত নেই সেখানে উ পথ পায় না ঢুকতে। পূর্বেই তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। 'ঠ্যাঙানি' হয় না 'ঠেঙুনি', 'ঠকানি' হয় না 'ঠকুনি', 'বাঁকানি' হয় না 'বাঁকুনি'। 'চিবুতে' 'ঘুমুতে' উচ্চারণ আমার কানে ঠিক ব'লে ঠেকে না, সে যে নিতান্ত কেবল অভ্যাসের জন্যে তা আমি মানতে পারি নে। বাংলা ভাষায় এ উচ্চারণ অনিবার্য নয়। আমার বিশ্বাস 'চিনাইতে' শব্দকে কেউ 'চিনুতে' বলে না, অন্তত আমার তাই ধারণা। 'ত্বলাইতে' কেউ কি 'ত্বলুতে', কিংবা 'ছুটাইতে' 'ছুটুতে' বলে ? 'বুঝাইতে' বলতে 'বুঝুতে' কেউ বলে কিনা নিশ্চিত জানি নে, আশা করি বলে না। 'পুরাইতে' বলতে 'পুরুতে' কিংবা 'ঠকাইতে' বলতে 'ঠকুতে' শুনি নি। আমার নিশ্চিত বোধ হয় 'কান জুড়ুল' কেউ বলে না, অথচ 'ঘুমাইল' ও 'জুড়াইল' একই ছাঁদের কথা। 'আমাকে দিয়ে তার ঘোড়াটা কিনাইল' বাক্যটাকে চলতি ভাষায় যদি বলে 'আমাকে দিয়ে তার ঘোড়াটা কিনুল', আমার বোধ হয় সেটা বেআড়া শোনাবে। এই 'শোনাবে' শব্দটা 'শুনুবে' হয়ে উঠতে বোধ হয় এখনো দেরি আছে। আমরা এক কালে যে-সব

১ হিন্দিতে 'হাতুড়ি' শব্দের প্রতিশব্দ স্ত্রীলিঙ্গে 'হথৌড়ি'। বিহারীতে স্ত্রীলিঙ্গে 'হথউরি'। উড়া এবং উরা প্রত্যয় থেকে উকারের প্রবেশ স্বাভাবিক। হিন্দিতেও হ্রস্ব ওকারকে উকারের মতো বলবার ও লেখবার প্রবৃত্তি আছে : বোলবানা = বুলবানা, ফোড়বানা = ফুড়বানা, গোবর + ঐলা = গুবরৈলা।

উচ্চারণে অভ্যস্ত ছিলুম এখন তার অন্যথা দেখি, যেমন : পেত্তোল (পিত্তোল), ভেত্তোর (ভিত্তোর), তেতো (তিতো), সোন্দোর (সুন্দোর), ডাল দে (দিয়ে) মেখে খাওয়া, তার বে (বিয়ে) হয়ে গেল।

উকারের ধ্বনি তার পরবর্তী অক্ষরেও প্রতিধ্বনিত হতে পারে, এতে আশ্চর্যের কথা নেই, যেমন : মুণ্ডু কুণ্ডু তন্দুর কন্দুর পুতুর মুগুর। তবু 'কুণ্ডল' ঠিক আছে, কিন্তু 'কুণ্ডুলি'তে লাগল উকার। 'সুন্দর' 'সুন্দরী'তে কোনো উৎপাত ঘটে নি। অথচ 'গণনা' শব্দে অনাহূত উকার এসে বানিয়ে দিলে 'গুনে'। 'শয়ন' থেকে হল 'শুয়ে', 'বয়ন' থেকে 'বুনে', 'চয়ন' থেকে 'চুনে'।

বাংলা অকারের প্রতি বাংলা ভাষার অনাদরের কথা পূর্বেই বলেছি। ইকার-উকারের পূর্বে তার স্বরূপ লোপ হয়ে ও হয়। ঐ নিরীহ স্বরের প্রতি একারের উপদ্রবও কম নয়। উচ্চারণে তার একটা অকার-তাড়ানো ঝোঁক আছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাধারণ লোকের মুখের উচ্চারণে। বাল্যকালে প্রলয়-ব্যাপারকে 'পেল্লায়' ব্যাপার বলতে শুনেছি মেয়েদের মুখে। সমাজের বিশেষ স্তরে আজও এর চলন আছে, এবং আছে : পেল্লাদ (প্রহ্লাদ), পেন্নাম (প্রণাম), পেরথম (প্রথম), পেরধান (প্রধান), পেরজা (প্রজা), পেসোন্নো (প্রসন্ন), পেসাদ অথবা পেরসাদ (প্রসাদ)। 'প্রত্যাশা' ও 'প্রত্যয়' শব্দের অপভ্রংশে প্রথম বর্ণে হস্তক্ষেপ না ক'রে দ্বিতীয় বর্ণে বিনা কৈফিয়তে একার নিয়েছে বাসা, হয়েছে 'পিত্তেস', 'পিত্তেয়', কখনো হয় 'পেত্তয়'। একারকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে ইকার এবং ঋকার, তারও দৃষ্টান্ত আছে, যেমন : সেদ্ধো (সিদ্ধ), নেত্তো (নিত্য বা নৃত্য), কেষ্টো (কিষ্টো), শেকোল (শিকল), বেরোদ (বৃহৎ), খেস্টান (খৃস্টান)। প্রথম বর্ণকে ডিঙিয়ে মাঝখানের বর্ণে একার লাফ দিয়েছে সেও লক্ষ্য করবার বিষয়, যেমন : নিশ্বেস বিশ্বেস, সরেস (সরস), নীরেস ঈশেন বিলেত বিকেল অদেষ্ট।

স্বরবর্ণের খেয়ালের আর-একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক।—

'পিটানো' শব্দের প্রথম বর্ণের ইকার যদি অবিকৃত থাকে তা হলে দ্বিতীয় বর্ণের আকারকে দেয় ওকার করে, হয় 'পিটোনো'। ইকার যদি বিগড়ে গিয়ে একার হয় তা হলে আকার থাকে নিরাপদে, হয় 'পেটানো'। তেমনি : মিটোনো=মেটানো, বিলোনো=বেলানো, কিলোনো=কেলানো। ইকার একারে যেমন অদল-বদলের সম্বন্ধ তেমনি উকারে ওকারে। শব্দের প্রথম বর্ণে উ যদি খাঁটি থাকে তা হলে দ্বিতীয় বর্ণের অকারকে পরাস্ত ক'রে করবে ওকার। যেমন 'ভুলানো' হয়ে থাকে 'ভুলোনো'। কিন্তু যদি ঐ উকারের স্খলন হয়ে হয় ওকার তা হলে আকারের ক্ষতি

হয় না, তখন হয় 'ভোলানো'। তেমনি : ডুবোনো = ডোবানো, ছুটোনো = ছোটানো। কিন্তু 'ঘুমোনো' কখনোই হয় না 'ঘোমানো', 'কুলোনো' হয় না 'কোলানো' কেন। অকর্মক বলে কি ওর স্বতন্ত্র বিধান।

দেখা যাচ্ছে বাংলা উচ্চারণে ইকার এবং উকার খুব কর্মিষ্ঠ, একার এবং ওকার ওদের শরণাগত, বাংলা অকার এবং আকার উৎপাত সইতেই আছে।

স্বরবর্ণের কোঠায় আমরা ঋ'কে ঋণস্বরূপে নিয়েছি বর্ণমালায়, কিন্তু উচ্চারণ করি ব্যঞ্জন বর্ণের— রি। সেইজন্যে অনেক বাঙালি 'মাতৃভূমি'কে বলেন 'মাত্রিভূমি'। যে কবি তাঁর ছন্দে ঋকারকে স্বরবর্ণরূপে ব্যবহার করেন তাঁর ছন্দে ঐ বর্ণে অনেকের রসনা ঠোকর খায়।

সাধারণত বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। তবু কোনো কোনো স্থলে স্বরের উচ্চারণ কিছু পরিমাণে বা সম্পূর্ণ পরিমাণে দীর্ঘ হয়ে থাকে। হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের দিকে কান দিলে সেটা ধরা পড়ে, যেমন 'জল'। এখানে জ'এ যে অকার আছে তার দীর্ঘতা প্রমাণ হল 'জলা' শব্দের জ'এর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে। 'হাত' আর 'হাতা'য় প্রথমটির হা দীর্ঘ, দ্বিতীয়টির হ্রস্ব। 'পিঠ' আর 'পিঠে', 'ভূত' আর 'ভুতো', 'ঘোল' আর 'ঘোলা'— তুলনা করে দেখলে কথাটা স্পষ্ট হবে। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা সর্বত্রই, বাংলায় স্থানবিশেষে। কথায় ঝোঁক দেবার সময় বাংলা স্বরের উচ্চারণ সব জায়গাতেই দীর্ঘ হয়, যেমন : ভা—রি তো পণ্ডিত, কে—বা কার খোঁজ রাখে, আ—জই যাব, হল—ই বা, অবা—ক করলে, হাজা—রো লোক, কী— যে বকো, এক ধা—র থেকে লাগা—ও মার। যুক্তবর্ণের পূর্বে সংস্কৃতে স্বর দীর্ঘ হয়, বাংলায় তা হয় না।

বাংলায় একটা অতিরিক্ত স্বরবর্ণ আছে যা সংস্কৃত ভাষায় নেই। বর্ণমালায় সে ঢুকেছে একারের নামের ছাড়পত্র নিয়ে, তার জন্যে স্বতন্ত্র আসন পাতা হয় নি। ইংরেজি bad শব্দের a তার সমজাতীয়। বাংলায় তার বিশেষ বানান করবার সময় আমরা য ফলায় আকার দিয়ে থাকি। বাংলায় আমরা যেটাকে বলি অন্তঃস্থ য, চ বর্গের জ'এর সঙ্গে তার উচ্চারণের ভেদ নেই। য'এর নীচে ফোঁটা দিয়ে আমরা আর-একটা অক্ষর বানিয়েছি তাকে বলি ইয়। সেটাই সংস্কৃত অন্তঃস্থ য। সংস্কৃত উচ্চারণ-মতে 'যম' শব্দ 'য়ম'। কিন্তু ওটাতে 'জম' উচ্চারণের অজুহাতে য়'র ফোঁটা দিয়েছি সরিয়ে। 'নিয়ম' শব্দের বেলায় য়'র ফোঁটা রক্ষে করেছি, তার উচ্চারণেও সংস্কৃত বজায় আছে। কিন্তু যফলা-আকারে (্যা) য়'কে দিয়েছি খেদিয়ে আর আ'টাকে দিয়েছি বাঁকা করে। সংস্কৃতে 'ন্যাস' শব্দের উচ্চারণ 'নিয়াস', বাংলায়

হল nas। তার পর থেকে দরকার পড়লে য ফলার চিহ্নটাকে ব্যবহার করি আকারটাকে বাঁকিয়ে দেবার জন্যে। Paris শব্দকে বাংলায় লিখি 'প্যারিস', সংস্কৃত বানানের নিয়ম অনুসারে এর উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল 'পিয়ারিস'। একদা 'ন্যায়' শব্দটাকে বাংলায় 'নেয়ায়' লেখা হয়েছে দেখেছি।

অথচ 'ন্যায়' শব্দকে বানানের ছলনায় আমরা তৎসম শব্দ বলে চালাই। 'যম'কেও আমরা ভয়ে ভয়ে বলে থাকি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, অথচ রসনায় ওটা হয়ে দাঁড়ায় তদ্ভব বাংলা।

সংস্কৃত শব্দের একার বাংলায় অনেক স্থলেই স্বভাব পরিবর্তন করেছে, যেমন 'খেলা', যেমন 'এক'। জেলাভেদে এই একারের উচ্চারণ একেবারে বিপরীত হয়। তেল মেঘ পেট লেজ— শব্দে তার প্রমাণ আছে।

পূর্বেই দেখিয়েছি আ এবং বাংলা অ স্বরবর্ণ সম্বন্ধে ইকার এবং উকারের ব্যবহার আধুনিক খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে চাঞ্চল্যজনক, অর্থাৎ এরা সর্বদা অপঘাত ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু এদের অনুগত একারের প্রতি এরা সদয়। 'এক' কিংবা 'একটা' শব্দের এ গেছে বেঁকে, কিন্তু উ তাকে রক্ষা করেছে 'একুশ' শব্দে। রক্ষা করবার শক্তি আকারের নেই, তার প্রমাণ 'এগারো' শব্দে। আমরা দেখিয়েছি ন'এর পূর্বে অ হয়ে যায় ও, 'যেমন' 'ধন' 'মন' শব্দে। ঐ ন একারের বিকৃতি ঘটায়: ফেন সেন কেন যেন। ইকারের পক্ষপাত আছে একারের প্রতি, তার প্রমাণ দিতে পারি। 'লিখন' থেকে হয়েছে 'লেখা'— বিশুদ্ধ এ— 'গিলন' থেকে 'গেলা'। অথচ 'দেখন' থেকে 'দ্যাখা', 'বেচন' থেকে 'ব্যাচা', 'হেলন' থেকে 'হ্যালা'। অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে এদের বিশেষ রূপগ্রহণের মূল পাওয়া যায়, যেমন: লিখিয়া—লেখা (পূর্ববঙ্গে 'ল্যাখা'), গিলিয়া—গেলা। কিন্তু: খেলিয়া—খ্যালা, বেচিয়া—ব্যাচা। মিলন অর্থে আর-একটা শব্দ আছে 'মেলন', তার থেকে হয়েছে 'ম্যালা', আর 'মিলন' থেকে হয়েছে 'মেলা' (মিলিত হওয়া)।

য ফলায় আকার না থাকলেও বাংলায় তার উচ্চারণ অ্যাকার, যেমন 'ব্যয়' শব্দে। এটা হল আদ্যক্ষরে। অন্যত্র ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব ঘটায়, যেমন 'সভ্য'। পূর্বে বলেছি ইকারের প্রতি একারের টান। 'ব্যক্তি' শব্দের ইকার প্রথম বর্ণে দেয় একার বসিয়ে, 'ব্যক্তি' শব্দ হয়ে যায় 'বেক্তি'। হ'এর সঙ্গে য ফলা যুক্ত হলে কোথা থেকে জ'এ-ঝ'এ জটলা ক'রে হয়ে দাঁড়ায় 'সোজ্ঝো'। অথচ 'সহ্য' শব্দটাকে বাঙালি তৎসম বলতে কুণ্ঠিত হয় না। বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমন-কি কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার

নিয়মে তখনি সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে হয়েছে, আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।

য ফলার উচ্চারণ বাংলায় কোথাও সম্মানিত হয় নি, কিন্তু এক কালে বাংলার ক্রিয়াপদে পথ হারিয়ে সে স্থান পেয়েছিল। 'খাইল' 'আইল' শব্দের 'খাল্য' 'আল্য' রূপ প্রাচীন বাংলায় দেখা গিয়েছে। ইকারটা শব্দের মাঝখান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে শেষকালে গিয়ে পড়াতে এই ইঅ'র সৃষ্টি হয়েছিল।

বাংলার অন্ত প্রদেশে এই যফলা-আকারের অভাব নেই, যেমন 'মায়্যা মানুষ'। বাংলা সাধু ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়াপদে যফলা-আকার ছদ্মবেশে আছে, যেমন : হইয়া খাইয়া। প্রাচীন পুঁথিতে অনেক স্থলে তার বানান দেখা যায় : হয়্যা খায়্যা।

সম্প্রতি একটা প্রশ্ন আমার কাছে এসেছে। 'যাওয়া খাওয়া পাওয়া দেওয়া নেওয়া' ধাতু 'যেতে খেতে পেতে দিতে নিতে' আকার নিয়ে থাকে, কিন্তু 'গাওয়া বাওয়া চাওয়া কওয়া বওয়া' কেন তেমনভাবে হয় না 'গেতে বেতে চেতে ক'তে ব'তে'। এর যে উত্তর আমার মনে এসেছে সে হচ্ছে এই যে, যে ধাতুতে হ'এর প্রভাব আছে তার ই লোপ হয় না। 'গাওয়া'র হিন্দি প্রতিশব্দ 'গাহনা', 'চাওয়া'র চাহনা, 'কওয়া'র কহনা। কিন্তু 'খানা দেনা লেনা'র মধ্যে হ নেই। 'বাহন' থেকে 'বাওয়া', সুতরাং তার সঙ্গে হ'এর সম্বন্ধ আছে। 'ছাদন' ও 'ছাওয়া'র মধ্যপথে বোধকরি 'ছাহন' ছিল, তাই 'ছাইতে'র জায়গায় 'ছেতে' হয় না।

স্বরবর্ণের অনুরাগ-বিরাগের সূক্ষ্ম নিয়মভেদ এবং তার স্বৈরাচার কৌতুকজনক। সংস্কৃত উচ্চারণে যে নিয়ম চলেছিল প্রাকৃতে তা চলল না, আবার নানা প্রাকৃতে নানা উচ্চারণ। বাংলা ভাষা কয়েক শো বছর আগে যা ছিল এখন তা নেই। এক ভাষা ব'লে চেনাই শক্ত। আগে বলত 'পড়ই', এখন বলে 'পড়ে'; 'হোহ' হয়ে গেছে 'হও'; 'আমহি' হল 'আমি'; 'বামহন' হল 'বামুন'; এই বদল হওয়ার ঝোঁক বহু লোককে আশ্রয় ক'রে এমন স্বতোবেগে চলছে যেন এ সজীব পদার্থ। হয়তো এই মুহূর্তেই আমাদের উচ্চারণ তার কক্ষপথ থেকে অতি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ফ হচ্ছে f, ভ হচ্ছে ব, চ হচ্ছে স, এখনো কানে স্পষ্ট ধরা পড়ছে না।

যে প্রাচীন প্রাকৃতের সঙ্গে বাংলা প্রাকৃতের নিকটসম্বন্ধ তার রঙ্গভূমিতে আমাদের স্বরবর্ণগুলি জন্মান্তরে কী রকম লীলা করে এসেছে তার অনুসরণ করে এলে অপভ্রংশের কতকগুলি বাঁধা রীতি হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে পথের পথিক আমি নই। খবর নিতে হলে যেতে হবে সুনীতিকুমারের দ্বারে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে রসনার প্রকৃতিগত কোনো সাধারণ নিয়ম বের করা কঠিন হবে। কেননা দেখা যাচ্ছে, পূর্ব উত্তর বঙ্গে এবং দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে অনেক স্থলে কেবল যে উচ্চারণের পার্থক্য আছে তা নয়, বৈপরীত্যও লক্ষিত হয়।

বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের উচ্চারণবিকার নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করেছি আমার বাংলা শব্দতত্ত্বে[১]।

স্বরবর্ণ সম্বন্ধে পালা শেষ করার পূর্বে একটা কথা বলে নিই। এর পরে প্রত্যয় সম্বন্ধে যেখানে বিস্তারিত করে বলেছি সেখানটা পড়লে পাঠকরা জানতে পারবেন বাংলা ভাষাটা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা।

বাংলায় এ ও উ এই তিনটে স্বরবর্ণ কেবল যে অর্থবান শব্দের বানানের কাজে লাগে তা নয়। সেই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছু ভঙ্গী তৈরি করে। 'হরি'কে যখন 'হরে' বলি কিংবা 'কালী'কে বলি 'কেলো', তখন সেটা সম্মানের সম্ভাষণ বলে শোনাবে না। কিন্তু 'হরু' বা 'কালু', 'ভুলু' বা 'খুকু', এমন-কি 'ধাদু' শব্দে স্নেহ বহন করে। পূর্বে দেখানো হয়েছে বাংলা ই এবং উ স্বরটা সম্মানী, এ এবং ও অন্ত্যজ। আ স্বরটা অনাদৃত, ওর ব্যবহার আছে অনাদরে, যেমন: মাখন = মাখ্‌না, মদন = মদ্‌না, বামন = বাম্‌না। ইংরেজিতে 'রবর্ট' থেকে 'বর্টি', 'এলিজাবেথ' থেকে 'লিজি', 'মার্গারেট' থেকে 'ম্যাগি', 'উইলিয়ম' থেকে 'উইলি', চার্লস্‌' থেকে 'চার্লি'— ইকার স্বরে দেয় আত্মীয়তার টান। ইকারে আদর প্রকাশ বাংলাতেও পাওয়া যায়। সেখানে আকারকে ঠেলে দিয়ে ই এসে বসে, যেমন: লতা = লতি, কণা = কনি, ক্ষমা = ক্ষেমি, সরলা = সর্‌লি, মীরা = মীরি। অকারান্ত শব্দেও এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেমন: স্বর্ণ = স্বর্নি। এগুলি সব মেয়ের নাম। আই যোগেও আদরের সুর লাগে, যেমন: নিমাই নিতাই কানাই বলাই। এ কিংবা ও স্বরের অবজ্ঞা, উ স্বরের স্নেহব্যঞ্জনা সংস্কৃতে পাই নে।

বাংলা বর্ণমালায় কতকগুলো বর্ণ আছে যারা বেকার, আর কতকগুলো আছে যারা বেগার খাটে অর্থাৎ নিজের কর্তব্য ছেড়ে অন্যের কাজে লাগে। ক বর্গের অনুনাসিক ঙ সাধু ভাষায় যুক্তবর্ণে ছাড়া অন্যত্র আপন গৌরবে স্থান পায় নি। যেখানে রসনায় তার উচ্চারণকে স্বীকার করেছে সেখানে লেখায় উপেক্ষা করেছে তার স্বরূপকে। 'রক্তবর্ণ' বলতে বোঝায় যে শব্দ তাকে লেখা হয়েছে 'রাঙা', অর্থাৎ তখনকার ভদ্রলোকেরা ভুল বানান করতে রাজি ছিলেন, কিন্তু ঙ'র বৈধ দাবি কিছুতে মানতে

১ শব্দতত্ত্ব: রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ড

চান নি। বানান-জগতে আমিই বোধ হয় সবপ্রথমে ঙ'র প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেম, সেও বোধ করি ছন্দের প্রতি মমতাবশত। যেখানে 'ভাঙ্গা' বানান ছন্দকে ভাঙে সেখানে ভাঙন রক্ষা করবার জন্যে ঙ'র শরণ নিয়ে লিখেছি 'ভাঙা'। কিন্তু চ বর্গের ঞ'র যথোচিত সদ্গতি করা যায় নি। এই ঞ অন্য ব্যঞ্জনবর্ণকে আঁকড়িয়ে টিঁকে থাকে, একক নিজের জোরে কোথাও ঠাঁই পায় না। ঐ 'ঠাঁই' কথাটা মনে করিয়ে দিলে যে, এক কালে ঞ ছিল ঐ শব্দটার অবলম্বন। প্রাচীন সাহিত্যে অনেক শব্দ পাওয়া যায় অস্তিমে যার ঞ'ই ছিল আশ্রয়, যেমন: নাঞি মুঞি খাঞা হঞা। এইজাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়া মাত্রেই ঞা'র প্রভুত্ব ছিল। আমার বিশ্বাস, এটা রাঢ়দেশের লেখক ও লিপিকরদের অভ্যস্ত ব্যবহার। অনুনাসিক বর্জনের জন্যেই পূর্ববঙ্গ বিখ্যাত।

বাংলা বর্ণমালায় আর-একটা বিভীষিকা আছে, মূর্ধন্য এবং দন্ত্য ন'এ ভেদাভেদ-তত্ত্ব। বানানে ওদের ভেদ, ব্যবহারে ওরা অভিন্ন। মূর্ধন্য ণ'এর আসল উচ্চারণ বাঙালির জানা নেই। কেউ কেউ বলেন, ওটা মূলত দ্রাবিড়ি। ওড়িয়া ভাষায় এর প্রভাব দেখা যায়। ড়'এ চন্দ্রবিন্দুর মতো ওর উচ্চারণ। খাঁড়া চাঁড়াল ভাঁড়ার প্রভৃতি শব্দে ওর পরিচয় পাওয়া যায়।

ল কলকাতা অঞ্চলে অনেক স্থলে নকার গ্রহণ করে, যেমন: নেওয়া নুন নেবু, নিচু (ফল), নাল (লালা), নাগাল নেপ ন্যাপা, নোয়া (সধবার হাতের), ন্যাজ, নোড়া (লোষ্ট্র), ন্যাংটা (উলঙ্গ)। কাব্যের ভাষায়: করিনু চলিনু। গ্রাম্য ভাষায়: নাটি, ন্যাকা (লেখা), নাল (লাল বর্ণ), নক্ষ ইত্যাদি।

বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃতের তিনটে বর্ণ আছে, শ স ষ। কিন্তু সবক'টির অস্তিত্বের পরিচয় উচ্চারণে পাই নে। ওরা বাঙালি শিশুদের বর্ণপরিচয়ে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়েছে। উচ্চারণ ধ'রে দেখলে আছে এক তালব্য শ। আর বাকি দুটো আসন দখল করেছে সংস্কৃত অভিধানের দোহাই পেড়ে। দন্ত্য স'এর উচ্চারণ অভিধান অনুসারে বাংলায় নেই বটে, কিন্তু ভাষায় তার দুটো-একটা ফাঁক জুটে গেছে। যুক্তবর্ণের যোগে রসনায় সে প্রবেশ করে, যেমন: স্নান হস্ত কাস্তে মাস্তল। শ্রী মিশ্র অশ্রু: তালব্য শ'এর মুখোষ পড়েছে কিন্তু আওয়াজ দিচ্ছে দন্ত্য স'এর। সংস্কৃতে যেখানে র ফলায় সংশ্রবে এসেছে তালব্য শ, বাংলায় সেখানে এল দন্ত্য স। এ ছাড়া 'নাচতে' 'মুছতে' প্রভৃতি শব্দে চ-ছ'এর সঙ্গে ত'এর ঘেঁষ লেগে দন্ত্য স'এর ধ্বনি জাগে।

সংস্কৃতে অন্তস্থ, বর্গীয়, দুটো ব আছে। বাংলায় যাকে আমরা বলে থাকি তৎসম শব্দ, তাতেও একমাত্র বর্গীয় ব'এর ব্যবহার। হাওয়া খাওয়া প্রভৃতি ওয়া-ওয়ালা শব্দে অন্তস্থ ব'এর আভাস পাওয়া যায়। আসামি ভাষায় এই ওয়া অন্তস্থ ব দিয়েই

লেখে, যেমন : 'হওয়া'র পরিবর্তে 'হবা'। হ এবং অন্তঃস্থ ব'এর সংযুক্ত বর্ণেও রসনা অন্তঃস্থ ব'কে স্পর্শ করে, যেমন : আহ্বান জিহ্বা।

বাংলা বর্ণমালার সবপ্রান্তে একটি যুক্তবর্ণকে স্থান দেওয়া হয়েছে, বর্ণনা করবার সময় তাকে বলা হয় : ক'এ মূর্ধন্য ষ 'ক্ষিয়ো'। কিন্তু তাতে না থাকে ক, না থাকে মূর্ধন্য ষ। শব্দের আরম্ভে সে হয় খ ; অন্তে মধ্যে দুটো খ'এ জোড়া ধ্বনি, যেমন 'বক্ষ'। এই ক্ষ'র একটা বিশেষত্ব দেখা যায়, ইকারের পূর্বে সে একার গ্রহণ করে, যেমন : ক্ষেতি ক্ষেমি ক্ষেপি। তা ছাড়া আকার হয় ্যাকার, যেমন 'ক্ষান্ত' হয় 'খ্যান্তো' ; কারও কারও মুখে 'ক্ষমা' হয় 'খ্যামা'।

১৩

আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র যতই বেড়ে চলেছে ততই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চলতি ভাষার কারখানায় জোড়তোড়ের কৌশলগুলো অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষ্যকে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। তাই বাংলা ভাষার আপন রীতিতে নতুন শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য। সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলো টুকরো শব্দ আছে যেগুলোর স্বতন্ত্র কাজ নেই, তারা বাক্যের লাইন বদলিয়ে দেয়। রেলের রাস্তায় যেমন সিগ্‌ন্যাল, ভিন্ন দিকে ভিন্ন রঙের আলোয় তাদের ভিন্ন রকমের সংকেত, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপসর্গগুলো শব্দের মাথায় চড়া সেইরকম সিগ্‌ন্যাল। কোনোটাতে আছে নিষেধ, কোনোটা দেখায় এগোবার পথ, কোনোটা বাইরের পথ, কোনোটা নীচের দিকে, কোনোটা উপরের দিকে, কোনোটা চার দিকে, কোনোটা ডাকে ফিরে আসতে। 'গত' শব্দে আ উপসর্গ জুড়ে দিলে হয় 'আগত', সেটা লক্ষ্য করায় কাছের দিক ; নির্ জুড়ে দিলে হয় 'নির্গত', দেখিয়ে দেয় বাইরের দিক ; অনু জুড়ে দিলে হয় 'অনুগত', দেখিয়ে দেয় পিছনের দিক ; তেমনি 'সংগত' 'দুর্গত' 'অপগত' প্রভৃতি শব্দে নানা দিকে তর্জনী চালানো। উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে। তারা আছে একই শব্দের নানা অর্থ বানাবার কাজে। নতুন শব্দ তৈরি করবার বেলায় তাদের নইলে চলে না।

শব্দগড়নের কাজে বাংলাতেও কতকগুলো প্রত্যয় পাওয়া যায়। তার একটার দৃষ্টান্ত অন, যার থেকে হয়েছে : চলন বলন গড়ন ভাঙন। এরই সহকারী আ প্রত্যয়, যার থেকে পাওয়া যায় বিশেষ্য পদে : চলা বলা গড়া ভাঙা। এই প্রত্যয়টা বাংলায় সবচেয়ে সাধারণ, প্রায় সব ক্রিয়াতেই একে জোড়া যায়। এই আ প্রত্যয়

বিশেষণেও লাগে, যেমন : ঠেলা গাড়ি, ভাঙা রাস্তা। কিন্তু তি দিয়ে একটা প্রত্যয় আছে যেটা বিশেষভাবে বিশেষণেরই, যেমন : চলতি গাড়ি, কাটতি মাল, ঘাটতি ওজন। মুশকিল এই যে, সব জায়গাতেই কাজে লাগাতে পারি নে, কেন পারি নে তারও স্পষ্ট কৈফিয়ত পাওয়া যায় না। 'গড়তি টেবিল' কিংবা 'কথা-কইতি খোকা' বলতে মুখে বাধে, এর কোনো সংগত কারণ ছিল না। কাজ চালাবার জন্যে অন্য কোনো প্রত্যয় খুঁজতে হয়, সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। যে টেবিল গড়া চলছে তাকে সংস্কৃতে বোধ হয় 'সংঘটমান' বলা চলে, কিন্তু বাংলায় কিছু হাৎড়ে পাই নে। যে খোকা কথা কয় ইএ প্রত্যয়ের সাহায্যে তাকে 'কথা-কইয়ে' বলা যেতে পারে। অথচ ঐ প্রত্যয় দিয়ে 'হাসিয়ে' 'কাঁদিয়ে' বলা নিষিদ্ধ। কাঁদার বেলায় আর-এক প্রত্যয় খুঁজে পাওয়া যায় উনে, বলি 'কাঁদুনে'। কিন্তু 'হাসুনে' বললে হাসির উদ্রেক হবে। অথচ 'নাচুনে' চলতে পারে। 'দৌড়ুনে' কথার দরকার আছে কিন্তু বলা হয় না, কেউ যদি সাহস ক'রে বলে খুশি হব। 'দ্রুতধাবনশীল ঘোড়া'র চেয়ে 'জোরে-দৌড়ুনে ঘোড়া' কানে ভালোই শোনায়। এই শব্দগুলোর প্রত্যয়টাকে ঠিক উনে বলা চলবে না; 'নাচুনে' শব্দের গোড়া হচ্ছে : নাচন+ইয়া=নাচনিয়া। বাংলা ভাষার প্রকৃতি ই এবং আ'কে উ এবং এ করে দিয়েছে, হয়ে উঠেছে 'নাচুনে'। এই কথাটা মনে ক'রে কৌতুক লাগে যে, দুটো অসদৃশ স্বরবর্ণকে ঠেলে দিয়ে কোথা থেকে উ এবং এ যায় জুটে।

সংস্কৃতে প্রত্যয় নিয়ম মেনে চলে, বাংলায় প্রায়ই ফাঁকি দেয়। বেসুর-বিশিষ্টকে বলি 'বেসুরা' (চলতি উচ্চারণ 'বেসুরো'); সুর-বিশিষ্টকে বলি নে 'সুরা' বা 'সুরো', আর কী বলি তাও তো ভেবে পাই নে। 'সুরেলা গলা' হয়তো বলে থাকি জানি নে, অন্তত বলতে দোষ নেই। বালি-বিশিষ্টকে বলি 'বালিয়া', অপভ্রংশে 'বেলে'; কিন্তু চিনি-বিশিষ্টকে বলব না 'চিনিয়া' বা 'চিনে', চিনদেশজ বাদামকে 'চিনে বাদাম' বলতে আপত্তি করি নে।

অনা প্রত্যয়-যোগে হয় 'পাও' থেকে 'পাওনা', 'গাও' থেকে 'গাওনা'। কিন্তু 'ধাও' থেকে 'ধাওনা' হয় না। অন্য প্রত্যয় যোগে হতে পারে 'ধাওয়াই'। 'কূট' থেকে 'কোটনা'; 'ফুট' থেকে 'ফুটকি' হয়, 'ফোটনা' হয় না। 'বাঁটা' থেকে 'বাঁটনা' হয়; 'ছাঁটা' থেকে 'ছাঁটাই' হবে, 'ছাঁটনা' হবে না।

সংস্কৃতে মৎ প্রত্যয় কোথাও 'মান' কোথাও 'বান' হয়, কিন্তু তার নিয়ম পাকা। সেই নিয়ম মেনে যেখানে দরকার 'মান' বা 'বান' লাগিয়ে দেওয়া যায়। সংস্কৃতে 'শক্তিমান' বলব, 'ধনবান' বলব; বাংলায় একটাকে বলব 'জোয়ালো' আর-একটাকে

'টাকাওয়ালা'। অন্য ভাষাতেও ভাষার খেয়াল ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি কম। যেমন ইংরেজিতে আছে: হেল্‌থি ওয়েল্‌থি প্লাকি লাকি ওয়েটি স্টিকি মিস্টি ফগি। কিন্তু 'কারেজি' নয়, 'কারেজিয়স'। তবু একটা নিয়ম পাওয়া যায়। এক সিলেব্‌ল্‌'এর হালকা কথায় প্রায় সর্বত্রই বিশিষ্ট অর্থে y লাগে, বড়ো মাত্রার কথায় এই প্রত্যয় খাটে না।

পূর্বেই বলেছি বাংলা ভাষাতেও প্রত্যয় আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগ সংকীর্ণ, আর তাদের নিয়ম ও ব্যতিক্রমে পাল্লা চলেছে, কে হারে কে জেতে।

সংস্কৃতে আছে ত প্রত্যয়-যুক্ত 'বিকশিত পুষ্প', বাংলায় 'ফোটা ফুল'। বুক-ফাটা কান্না, চুল-চেরা তর্ক, মন-মাতানো গান, নুয়ে-পড়া ডাল, কুলি-খাটানো ব্যাবসা: এই দৃষ্টান্তগুলোতে পাওয়া যায় আ প্রত্যয়, আনো প্রত্যয়। কাজ চলে, কিন্তু এর চেয়ে আর-একটু জটিল হলে মুশকিল বাধে। 'অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা' খাস বাংলায় সহজে বলবার জো নেই।

কিন্তু এ কথাও জেনে রাখা ভালো, খাস বাংলায় এমন-সব বলবার ভঙ্গী আছে যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। শব্দকে দ্বিগুণ করবার একটা কৌশল কথ্য বাংলায় চলতি, কোনো অর্থবান শব্দে তার ইশারা দেওয়া যায় না। মাঠ ধুধু করছে, রৌদ্র করছে ঝাঁঝাঁ: মানেওয়ালা কথায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। তার কারণ, অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে: উস্‌খুস্‌ নিস্‌পিস্‌ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ কাচুমাচু শব্দের ধরাবাঁধা অর্থ নেই। তাদের কাছ থেকে যেন উপরিপাওনা আদায় হয়, তাতে ব্যাকরণী টাঁকশালের ছাপ নেই।

বাংলায় আর-একরকম শব্দদ্বৈত আছে তাদের মধ্যে অর্থের আভাস পাই, কিন্তু তারা যতটা বলে তার চেয়ে আঙুল দেখিয়ে দেয় বেশি। সংস্কৃতে আছে 'পতনোন্মুখ', বাংলায় বলে 'পড়ো-পড়ো'। সংস্কৃতে যা 'আসন্ন' বাংলায় তা 'হব-হব'। সেইরকম: গেল-গেল যায়-যায়। সংস্কৃতে যা 'বাষ্পাকুল' বাংলায় তা 'কাঁদো-কাঁদো'। সংস্কৃতে বলে 'অবরুদ্ধস্বরে', বাংলায় বলে 'বাধো-বাধো গলায়'। বাংলায় ঐ কথাগুলোতে কেবল যে একটা ভাব পাওয়া যায় তা নয়, যেন ছবি পাই। একটা শ্লোক বলা যাক—

যাব-যাব করে, চরণ না সরে,
ফিরে-ফিরে চায় পিছে,
পড়ো-পড়ো জলে ভরো-ভরো চোখ
শুধু চেয়ে থাকে নীচে।

ঠিক এরকম একটুকরো রেখালেখ্য এই বাধো-বাধো ভাষাতেই বানানো চলে।

বাংলায় বর্ণনার ছবিকে স্পষ্ট করবার জন্যেই এই-যে অস্পষ্ট ভাষার কায়দা, এর কথা বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনায় আরও বিস্তারিত করে বলেছি।[১]

বাংলায় কোনো কোনো প্রত্যয় অর্থগত ব্যবহার অতিক্রম ক'রে এইরকম ইঙ্গিতের দিকে পৌঁচেছে, তার উল্লেখ করা যাক: কিপ্‌টেমো ছিব্‌লেমো ছেলেমো জ্যাঠামো ঠ্যাটামো ফাজ্‌লেমো বিট্‌লেমো পেজোমো হ্যাংলামো বোকামো বাঁদ্‌রামো গোঁড়ামো মাৎলামো গুণ্ডামো।

সংস্কৃতের কোন্ প্রত্যয়ের সঙ্গে এর তুলনা করব? ত্ব প্রত্যয় দিয়ে 'কিপ্‌টেমো'কে 'কিপ্‌টেত্ব' বলা যেতে পারে। কিন্তু ত্ব প্রত্যয় নির্বিকার, ভালো-মন্দ প্রিয়-অপ্রিয় জড়-অজড়ে ভেদ করে না। অথচ উপরের ফর্দটা দেখলেই বোঝা যাবে, শব্দগুলো একেবারেই ভদ্রজাতের নয়। গাল-বর্ষণের জন্যেই যেন পাঁকের পিণ্ড জমা করা হয়েছে। ঐ মো বা আমো প্রত্যয়ের যোগে 'বাঁদ্‌রামো' বলি, কিন্তু 'সিংহমো' বলি নে। 'কিপ্‌টেমো' হল, 'দাতামো' হল না। 'পেজোমো' বলা চলে অনায়াসে, কিন্তু 'সেধোমো' (সাধুত্ব) বলতে বাধে। একটা প্রত্যয় দিয়ে বিশেষ ক'রে মনের ঝাল মেটাবার উপায় বোধ করি আর-কোনো ভাষাতেই নেই।

আর-একটা প্রত্যয় দেখো, পনা: বুড়োপনা ন্যাকাপনা ছিব্‌লেপনা আদুরেপনা গিন্নিপনা। সবগুলোর মধ্যেই কটাক্ষপাত। ব্যাকরণের প্রত্যয়ের যেরকম ভেদনির্বিচার হওয়া উচিত, এ একেবারেই তা নয়। চণ্ডীমণ্ডপে বসে বিরুদ্ধ দলকে খোঁচা দেবার জন্যেই এগুলো যেন বিশেষ করে শান-দেওয়া।

আনা প্রত্যয়টা দেখো: বাবুআনা বিবিআনা সাহেবিআনা নবাবিআনা মুরুব্বি-আনা গরিবিআনা। বলা বাহুল্য, এর ভাবখানা একেবারেই ভালো নয়। ঐ যে 'গরিবিআনা' শব্দটা বলা হয়েছে, ওর মধ্যেও কপট অহংকারের ভাণ আছে। যদি বলা যায় 'সাধুআনা' তা হলে বুঝতে হবে সেটা সত্যিকার সাধুত্ব নয়।

এই জাতের আর-একটা প্রত্যয় আছে, গিরি। তার সঙ্গে প্রায় 'ফলাতে' কথার যোগ হয়: বাবুগিরি গুরুগিরি সাধুগিরি দাতাগিরি। এতে ভাণ করা, মিথ্যে অহংকার করা বোঝায়।

আরও একটা প্রত্যয় দেখা যাক, অনি বা আনি: বকুনি ধমকানি ছিঁচ্‌কাঁদুনি শাসানি হাঁপানি নাকানি-চোবানি জ্বলুনি কাঁপুনি মুখ-ঝাঁকানি থ্যাকানি লোক-হাসানি ফোঁপানি গ্যাঙানি ভ্যাঙানি ঘ্যাঙানি খিঁচুনি ছট্‌ফটানি কুট্‌কুটুনি ফোস্‌ফোসানি। এর সবগুলিই গাল-দেওয়া শব্দ নয়, কিন্তু অপ্রিয়। হাসিটা তো ভালো জিনিস, কিন্তু, আনি

১ দ্বাদশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর ৩৭৪ পৃ

প্রত্যয় দিয়ে হল 'লোকহাসানি', হাসির গুণটা গেল বিগড়িয়ে। ছাঁকুনি নিড়ুনি বিনুনি চাটনি শব্দ বস্তুবাচক, সেইজন্যে তাদের মধ্যে নিন্দার ঝাঁজ প্রবেশ করতে পারে নি।

ইআ [বিকারে 'এ'] প্রত্যয়টা যখন বস্তুসূচক না হয়ে ভাবসূচক হয়, তখন তার ইঙ্গিতে কোথাও সুখের বা শ্রদ্ধার আভাস পাব না। যেমন: নড়্‌বড়ে নিড়্‌বিড়ে খিট্‌খিটে কট্‌মটে টন্‌টনে কন্‌কনে মিন্‌মিনে প্যান্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে ভ্যাজ্‌ভেজে ভ্যাদ্‌ভেদে ম্যাজ্‌মেজে ম্যাড়্‌মেড়ে জব্‌জবে খস্‌খসে জ্যাল্‌জেলে। সামান্য কয়েকটা ব্যতিক্রম আছে, 'জল্‌জলে' 'টুক্‌টুকে'; সংখ্যা বেশি নয়।

এবার দেখা যাক উআ'র বিকারে 'ও' প্রত্যয়: মেয়ো বেতো জোরো মুলো টেকো ঝেঁকো শুঁকো কুনো বুনো পেঁকো, কোতো (বাবু), রোখো খেলো ভেতো, খেগো (পোকায়)। এগুলোও সুবিধের নয়; হয় তুচ্ছ নয় পীড়াকর। ভাত যে খায় সে নিন্দনীয় নয়, কিন্তু কাউকে যদি বলি 'ভেতো' তবে তাকে সম্মান করা হয় না। জীবমাত্রই খাদ্যপদার্থ ব্যবহার করে, সেটা দোষের নয়; কিন্তু কোনো-একটা খাদ্যের সম্পর্কে কাউকে যদি বলা হয় 'খেগো' তা হলে বুঝতে হবে সেই খাদ্য সম্বন্ধে অবজ্ঞার কারণ আছে। যথাস্থানে যথাপরিমাণে জল উপাদেয়, কিন্তু যাকে বলি 'জোলো' তার মূল্য বা স্বাদের সম্বন্ধে অপবাদ দেওয়া হয়।

মন্দত্ব বোঝাতে সংস্কৃতে দুঃ ব'লে একটা উপসর্গ আছে, কু'ও যোগ করা যায়। কিন্তু বাংলায় এই প্রত্যয়গুলোতে যে কুৎসাবিশিষ্ট অবমাননা আছে অন্য কোনো ভাষায় বোধ হয় তা পাওয়া যায় না।

এবার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ের আলোচনা ক'রে প্রত্যয়ের পালা শেষ করা যাক।

খাপছাড়াভাবে সংস্কৃতের অনুসরণে নী ও ঈ প্রত্যয়ের যোগে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাবার রীতি বাংলায় আছে, কিন্তু তাকে নিয়ম বলা চলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণকেও মেনে চলবার অভ্যেস তার নেই। সংস্কৃতে ব্যাঘ্রের স্ত্রী 'ব্যাঘ্রী', বাংলায় সে 'বাঘিনী'। সংস্কৃতে 'সিংহী'ই স্ত্রীজাতীয় সিংহ, বাংলায় সে 'সিংহিনী'। আকারযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ সংস্কৃত থেকে বাংলা ধার নিয়েছে, যেমন 'লতা'; কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় বাংলায় নেই। সংস্কৃতে আছে জানি, এত বেশি জানি যে, আকারান্ত শব্দ দেখবামাত্র তাকে নারীশ্রেণীয় বলে সন্দেহ করি। বাংলাদেশের মেয়েদের 'সবিতা' নাম দেখে প্রায়ই আশঙ্কা হয় 'পিতা'কে পাছে কেউ এই নিয়মে মাতা ব'লে গণ্য করে। মেয়েদের নামে 'চন্দ্রমা' শব্দেরও ব্যবহার দেখেছি, আর মনে পড়ছে কোনো দুর্যোগে ভগবান চন্দ্রমা স্ত্রীছদ্মবেশে বাঙালির ঘরেও দেখা দিয়েছেন, বাঙালির কাব্যেও অবতীর্ণ হয়েছেন।

এ দিকে 'নীলিমা' 'তনিমা' প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দ আকারের টানে মেয়েদের নামের সঙ্গে এক মালায় গাঁথা পড়ে। 'নিভা' নামক একটা ছিন্নমুণ্ড শব্দ 'শরচ্চন্দ্রনিভাননা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্ত হয়েছে বাঙালি মেয়েদের নামমালায় আকারের টিকিট দেখিয়ে।

স্ত্রীলিঙ্গের কোনো একটি বা একাধিক প্রত্যয় যদি নির্বিশেষে বা বাঁধা নিয়মে ভাষায় খাটত তা হলে একটা শৃঙ্খলা থাকত, কিন্তু সে সুযোগ ঘটে নি। বাংলায় 'উট' হয়তো 'উটী', কিন্তু 'মোষ' হয় না 'মোষী', এমন-কি 'মোষিনী'ও না— কী হয় বলতে পারি নে, বোধ করি 'মাদী মোষ'। 'হাতি' সম্বন্ধেও ঐ এক কথা, 'নাতনী' বলি কিন্তু 'হাতিনী' বলি নে। উট-হাতির চেয়ে কুকুর-বিড়াল পরিচিত জীব, 'কুকুরী' 'বিড়ালী' বললেই চলত, কিংবা 'কুকুরনী' 'বিড়ালনী'। বলা হয় না। মানুষ সম্বন্ধেও কেমন একটা ইতস্তত আছে— 'খোট্টানি' 'উড়েনি' ব'লে থাকি, কিন্তু 'পাঞ্জাবিনী' 'শিখিনী' 'মগিনী' বলি নে; 'মাদ্রাজিনী'ও তদ্রূপ; 'বাঙালিনী' বলি নে, 'কাঙালিনী' বলে থাকি।

আত্মীয়তা সম্বন্ধের নামগুলিতে স্ত্রী প্রত্যয়ের ছাপ আছে: দিদি মাসি পিসি শ্যালী শাশুড়ি ভাইঝি বোনঝি। 'ননদ' শব্দে ইনী যোগ না করলেও তার প্রভাব সম্পূর্ণ থেকে যায়। জা শ্যালাজ প্রভৃতি শব্দে দীর্ঘ ঈকারের সমাগম নেই।

জাতঘটিত ব্যাবসাঘটিত নামে নী ইনী যথেষ্ট চলে: বামুনী কায়েতনী। অন্য জাত সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 'বদ্দিনী' কখনো শুনি নি। 'বাগ্‌দিনী' চলে, 'ডোমনী' 'হাড়িনী'ও শুনেছি, 'সাঁওতালনী' বললে খটকা লাগে না। পুরুতনী ধোবানী নাপতিনী কামারনী কুমোরনী তাঁতিনী: সর্বদাই ব্যবহার হয়। অথচ শেলাই ব্যাবসা ধরলেও মেয়েরা 'দর্জিনী' উপাধি পাবে কি না সন্দেহ। যা হোক মোটের উপর বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে নী ইনী প্রত্যয়টারই চল বেশি।

একটা বিষয়ে বাংলাকে বাহাদুরি দিতে হবে। য়ুরোপীয় অনেক ভাষায়, তা ছাড়া হিন্দি হিন্দুস্থানি গুজরাটি মারাঠিতে, কাল্পনিক খেয়ালে বা স্বরবর্ণের বিশেষত্ব নিয়ে লিঙ্গভেদপ্রথা চলেছে। ভাষার এই অসংগত ব্যবহার বিদেশীদের পক্ষে বিষম সংকটের। বাংলা এ সম্বন্ধে বাস্তবকে মানে। বাংলায় কোনোদিন ঘুড়ি উড্ডীয়মানা হবে না, কিংবা বিজ্ঞাপনে নির্মলা চিনির পাকে সুমধুরা রসগোল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে না। কিংবা শুশ্রূষার কাজে দারুণা মাথাধরায় বরফশীতলা জলপটির প্রয়োগ-সম্ভাবনা নেই।

এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি। সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘ ঈকার বা ন'এ দীর্ঘ ঈকার মানবার যোগ্য নয়। খাঁটি

বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদসূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার দ্বারা তার ব্যভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এই-সকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ইকারকে মানব। 'ইংরেজি' বা 'মুসলমানি' শব্দে যে ই-প্রত্যয় আছে সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই অসংকোচ হ্রস্ব ইকার ব্যবহার করা উচিত। ওটাকে ইন্‌-ভাগান্ত গণ্য করলে কোন্‌ দিন কোনো পণ্ডিতাভিমানী লেখক 'মুসলমানিনী' কায়দা বা 'ইংরেজিনী' রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন এমন আশঙ্কা থেকে যায়।

১৪

বাংলা বিশেষ্যপদে বহুবচনের প্রভাব অল্পই। অধিকাংশ স্থলেই 'সব' 'গুলি' 'সকল' প্রভৃতি শব্দ জোড়া দিয়ে কাজ চালানো হয়। এ ভাষায় সর্বনাম শব্দে বহুবচনের বিভক্তি যতটা চলে অন্যত্র ততটা নয়। বহুবচনে 'মানুষরা' ব'লে থাকি অথচ 'ঘোড়ারা' বলতে কানে ঠেকে, অথচ 'ঘোড়াদের' বলা চলে। মোটের উপর এ কথা খাটে যে সচেতন জীবদের নিয়ে বহুবচনে রা এবং সম্বন্ধে ও কর্মকারকে দের চিহ্ন ব্যবহার হয়ে থাকে। 'মোষেরা খুব বলবান জীব' বা 'ময়ূরদের পুচ্ছ লম্বা' এটা নিয়মবিরুদ্ধ নয়। এই রা চিহ্ন সাধারণ বিশেষ্যে লাগে। বিশেষ বিশেষ্যে ওর প্রয়োগ কানে বাধে। বলতে পারি 'ঐ মোষরা পাঁকে ডুবে আছে', কিন্তু 'ঐ মোষগুলো পাঁকে ডুবে আছে' বললেই মানানসই হয়। 'মোষরা' বললে মোষজাতিকে মনে আসে, 'মোষগুলো' বললে মনে আসে বিশেষ মোষের দল।

'মানুষরা নিষ্ঠুরভাবে পশুকে হার মানালো' ঠিক শোনায়, এও ঠিক শোনায়: কুলিগুলো নির্দয়ভাবে গাড়িতে বোঝা চাপিয়েছে। কিন্তু 'মানুষগুলো পশুকে হার মানায়' অশুদ্ধ। সাধারণ বিশেষ্যে রা চলে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ্যে গুলো। 'মানুষরা ওখানে জটলা করছে' বললে মনে হয় যেন জানানো হচ্ছে অন্য কোনো জীব করে নি। এখানে 'মানুষগুলো' বললেই সংশয় থাকে না।

'টেবিলরা' 'চৌকিরা' নিষিদ্ধ। জড়পদার্থের 'গুলো' ছাড়া গতি নেই। আর-একটা শব্দ আছে, কথার পূর্বে বসে সমষ্টি বোঝায়, যেমন 'সব': সব চৌকি, সব জন্তু, সব মানুষ। কিন্তু এখানে এই শব্দ কেবলমাত্র বহুবচন বোঝায় না, সঙ্গে সঙ্গে

একটা ঝোঁক দেয়। সব চৌকি সরিয়ে দাও, অর্থাৎ একটাও বাকি রেখো না। সব ভিখিরিই বাঙালি, অর্থাৎ নির্বিশেষে বাঙালি। 'সব' প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে 'গুলো' প্রয়োগটা যোগ দিতে চায়, যেমন: সব চৌকিগুলোই ভাঙা, সব ভিখিরিগুলোই চেঁচাচ্ছে। এখানে 'সব' বোঝাচ্ছে একান্ততা, আর 'গুলো' বোঝাচ্ছে বহুবচন। বহুবচনে এক সময়ে 'সব' ব্যবহৃত হত। কবিতায় এখনো দেখা যায়, যেমন: পাখিসব তোমাসব ইত্যাদি। আমরা বলি: কাফ্রিরা সব কালো। বহুবচনের রা বিভক্তির সঙ্গে জোড়া লাগে 'সব' শব্দ: এরা সব গেল কোথায়। শুধু 'এরা গেল কোথায়' বললেই চলে, কিন্তু 'সব' শব্দের দ্বারা সমষ্টির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই 'সব' শব্দ একবচনকে বহুবচন করে না, বহুবচনকে সুনির্দিষ্ট করে। 'সবাই' শব্দে আরও বেশি জোর লাগে: এরা যে সবাই চলে গেছে, কিংবা, চৌধুরীদের সবাইকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। 'সব' শব্দের সমার্থক হচ্ছে 'সকল': এরা সকলেই চ'লে গেছে, কিংবা, চৌধুরীদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু 'সকল' শব্দের প্রয়োগ 'সব' শব্দের চেয়ে সংকীর্ণ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ভাষার একটা বিশেষ ভঙ্গীর কথা বলি। 'সব' শব্দের অর্থে কোনো দূষণীয়তা নেই, 'যত' সর্বনাম শব্দটাও নিরীহ। কিন্তু দুটোকে এক করলে সেই জুড়িশব্দটা হয়ে ওঠে নিন্দার বাহন। 'মূর্খ' 'কুঁড়ে' কিংবা 'লক্ষ্মীছাড়া' প্রভৃতি কটুস্বাদ বিশেষণ ঐ 'যত সব' শব্দটাকে বাহন ক'রে ভাষায় যেন মুখ সিট্‌কোতে আসে, যথা: যত সব বাঁদর, কিংবা কুঁড়ে, কিংবা লক্ষ্মীছাড়া। এখানে বলা উচিত ঐ 'যত' শব্দটার মধ্যেই আছে বিষ। 'যত বাঁদর এক জায়গায় জুটেছে' বললেই যথেষ্ট অকথ্য বলা হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়টা এই যে, 'যত' শব্দটা একটা অসম্পূর্ণ সর্বনাম, 'তত' দিয়ে তবে এর সম্পূর্ণতা। 'তত' বাদ দিলে 'যত' হয়ে পড়ে বেকার, লেগে যায় অনর্থক গালমন্দর কাজে।

বাংলা ভাষায় সর্বনামের খুব ঘটা। নানা শ্রেণীর সর্বনাম, যথা ব্যক্তিবাচক, স্থানবাচক, কালবাচক, পরিমাণবাচক, তুলনাবাচক, প্রশ্নবাচক।

'মুই' এক কালে উত্তমপুরুষ সর্বনামের সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত ছিল, প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে তা দেখতে পাই। 'আমহি' ক্রমশ 'আমি' রূপ ধরে ওকে করলে কোণঠেসা, ও রইল গ্রাম্য ভাষার আড়ালে। সেকালের সাহিত্যে ওকে দেখা গেছে দীনতাপ্রকাশের কাজে, যেমন: মুঞি অতি অভাগিনী।

নিজের প্রতি অবজ্ঞা স্বাভাবিক নয় তাই ওকে সংকোচে সরে দাঁড়াতে হল। কিন্তু মধ্যমপুরুষের বেলায় যথাস্থানে কুণ্ঠার কোনো কারণ নেই, তাই 'তুই' শব্দে বাধা ঘটে নি,

নীচের বেঞ্চিতে ও রয়ে গেল। 'তুহি' 'তুমি'-রূপে ভর্তি হয়েছে উপরের কোঠায়। এরও গৌরবার্থ অনেকখানি ক্ষয়ে গেল, বোধকরি নির্বিচার সৌজন্যের আতিশয্যে। তাই উপরওয়ালাদের জন্যে আরও একটা শব্দের আমদানি করতে হয়েছে, 'আপহিঁ' থেকে 'আপনি'। আইনমতে মধ্যমপুরুষের আসন ওর নয়, ওর অনুবর্তী ক্রিয়াপদের রূপ দেখলেই তার প্রমাণ হয়। 'তুমি'র বেলায় 'আছ'; 'আপনি'র বেলায় 'আছেন', এই শব্দটি যদি খাঁটি মধ্যমপুরুষ-জাতীয় হত তা হলে ওর অনুচর ক্রিয়াপদ হতে পারত 'আপনি আছ' কিংবা 'আছঁ'।

'আপনি' শব্দের মূল হচ্ছে সংস্কৃত 'আত্মন্'। বাংলায় প্রথমপুরুষেও 'স্বয়ং' অর্থে এর ব্যবহার আছে, যেমন: সে আপনিই আপনার প্রভু। আত্মীয়কে বলা হয় 'আপন লোক'। হিন্দিতে সম্মানসূচক অর্থে প্রথমপুরুষ মধ্যমপুরুষ উভয়তই 'আপ' ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষায় উত্তমপুরুষে 'আম'-প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার চলে, সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। তার তিনরকম রূপ প্রচলিত: করলাম, করলুম, করলেম। 'করলাম' নদিয়া হতে শুরু করে বাংলার পূর্বে ও উত্তরে চলে থাকে। এর প্রাচীন রূপ দেখেছি: আইলাঙ কইলাঙ। আমরা দক্ষিণী বাঙালি, আমাদের অভ্যস্ত 'করলুম' ও 'করলেম'। উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদে সানুনাসিক উকার পদ্যে এখনো চলে, যেমন: হেরিনু করিনু। কলকাতার অপভাষায় 'করনু' 'খেনু' ব্যবহার শোনা যায়। ক্রিয়াপদে এই সানুনাসিক উ প্রাচীন সাহিত্যে যথেষ্ট পাই: কেন গেলুঁ কালিন্দীর কূলে, দুকূলে দিলুঁ দুখ, মলুঁ মলুঁ সই। 'করলেম' শব্দের আলোচনা পরে করা যাবে। কৃত্তিবাসের পুরাতন রামায়ণে দেখেছি 'রাখিলোম প্রাণ'। তেমনি পাওয়া যায় 'তুমি'র জায়গায় 'তোমি'। বাংলা ভাষায় উকারে ওকারে দেনাপাওনা চলে এ তার প্রমাণ।

প্রথমপুরুষের মহলে আছে 'সে' আর 'তিনি'। রামমোহন রায়ের সময়ে দেখা যায় 'তিনি' শব্দের সাধুভাষার প্রয়োগ 'তেঁহ'। মেয়েদের মুখে 'তেনার' 'তেনবা' আজও শোনা যায়, ওটা 'তেঁহ' শব্দের কাছাকাছি। প্রাচীন রামায়ণে 'তাঁর' 'তাঁহার' শব্দ নেই বললেই হয়, তার বদলে আছে 'তান' 'তাহান'। ন'কারের অনুনাসিকটা বহুবচনের রূপ। তাই সম্মানের চন্দ্রবিন্দুতিলকধারী বহুবচনরূপী 'তেঁহ' ও 'তিঁহো' (পুরাতন সাহিত্যে) হয়েছে 'তিনি'। গৌরবে তার রূপ বহুবচনের বটে, কিন্তু ব্যবহার একবচনের। তাই পুনর্বার বহুবচনের আবশ্যকে রা বিভক্তি জুড়ে 'তাঁহা' শব্দের রাস্তা দিয়ে 'তাঁহারা' শব্দ সাজানো হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে যে ক্রিয়াপদটি তার দখলে তাতে আছে প্রাচীন ন'কারান্ত বহুবচনরূপ, যেমন 'আছেন'। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে পরবর্তী

বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদে বহুবচনের চিহ্ন থাকলেও তার অর্থ হয়েছে লোপ। সংস্কৃতে বহুবচনে 'পতন্তি' শব্দ আছে প্রথমপুরুষের পতন বোঝাতে। বাংলায় সেই অন্তি'র ন রয়েছে 'পড়েন' শব্দে, কিন্তু এ ভাষায় 'তিনি'ও পড়েন 'তাঁরা'ও পড়েন। এই ন'কার-ধারী ক্রিয়াপদ কেবল 'আপনি' আর 'আপনারা', 'তিনি' ও 'তাঁরা', এঁদের সম্মান রক্ষার কাজেই নিযুক্ত। প্রাচীন রামায়ণে এইরূপ স্থানে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় 'পড়েন্ত' 'দেখিলেন্ত' প্রভৃতি ন্ত-বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ একবচনে এবং বহুবচনে, প্রথমপুরুষে।

সদ্যঅতীত কালের প্রথমপুরুষ ক্রিয়াপদে বিকল্পে ইল এবং ইলে প্রয়োগ হয়, যেমন: সে ফল পাড়ল, সে ফল পাড়লে। এই একার প্রয়োগ প্রাচীন পদাবলীতে দৈবাৎ দেখেছি, যথা: বিঁধিলে বাণ। কিন্তু অনেক দেখা গেছে ময়নামতীর গানে, যেমন: বিকল দেখি হাড়িপা রহিলে। এ সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, অচেতনবাচক শব্দের ক্রিয়াপদে 'এ' লাগে না। অসমাপিকাতে লাগে, যেমন: পা ফুললে ডাক্তার ডেকো। 'তার পা ফুলল' হয়, 'পা ফুললে' হয় না। নির্বস্তুক শব্দ সম্বন্ধেও সেই কথা: তাঁর কলকাতায় যাওয়া ঘটল না। 'ঘটলে না' হতে পারে না। এ ছাড়া নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্রিয়াপদে 'এ' খাটে না: এল গেল হল, প'ল (পড়ল), ম'ল (মরল)। দুই অক্ষরের ক্রিয়াপদমাত্রে এই ব্যতিক্রম হয় এমন যেন মনে করা না হয়। তার প্রমাণ: খেল নিল দিল শুল ধুল। ইতে-প্রত্যয়যুক্ত জোড়া ক্রিয়াপদে 'এ' লাগে না, যেমন: করতে থাকল, হাসতে লাগল। কিন্তু ইয়া-প্রত্যয়যুক্ত জোড়া ক্রিয়াপদে লাগে, যেমন: সে হেসে ফেললে। এ ছাড়া আরও দুই-এক জায়গায় কানে সন্দেহ ঠেকে, যেমন 'ভোর বেলায় সে মরলে' বলি নে, 'মরল'ই ঠিক শোনায়। কিন্তু 'তিনি মরলেন' নিত্যব্যবহৃত। 'কলকাতায় সে চললে' বলি নে, কিন্তু 'তিনি চললেন' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

প্রাচীন রামায়ণে দেখা গেছে প্রথমপুরুষের সদ্যঅতীত ক্রিয়াপদে প্রায় সর্বত্রই ক-প্রত্যয়-সমেত একার, যেমন: দিলেক লইলেক। আবার একারের সম্পর্ক নেই এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে, যেমন: চলিল সত্বর, পাঠাইল ত্বরিত। আধুনিক বাংলায় এইরূপ ক্রিয়াপদে কোথাও 'এ' লাগে কোথাও লাগে না, কিন্তু অন্তস্থিত ক-প্রত্যয়টা খসে গেছে।

প্রথমপুরুষ ইল-প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদে এই-যে একার প্রয়োগ, এরই সঙ্গে সম্ভবত 'করলেম' 'চললেম' শব্দের একার-উচ্চারণের যোগ আছে। করলেন (করিল তিনি), আর, করলেম (করিল আমি): এক নিয়মে পাশাপাশি বসতে পারে। আরও একটা কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে, সে হচ্ছে স্বরবিকারের নিয়ম। ই'র পর আ থাকলে

জুইয়ে দিলে 'এ' হয় তার অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন 'ঈশান' থেকে 'ঈশেন', 'বিলাত' থেকে 'বিলেত', 'নিশান' থেকে 'নিশেন'।

এক কালে 'মুই' ভদ্র সমাজে ত্যাজ্য ছিল না। প্রাচীন রামায়ণে পাওয়া যায় 'মুঞি নরপতি'। কর্মকারকে 'মোকে', কোথাও বা 'মোখে'। বহুবচনে 'মোরা'। আজ 'মোরা' রয়ে গেছে কাব্যলোকে। কবির কলমে 'আমরা' শব্দের চেয়ে 'মোরা' শব্দের চলন বেশি। প্রাচীন বাংলায় 'আমরা' 'তোমরা'র পরিবর্তে 'আমিসব' 'তুমিসব' শব্দের ব্যবহার প্রায়ই দেখা গেছে।

আমি তুমি আপনি তিনি: ব্যক্তিবাচক সর্বনাম, মানুষ সম্বন্ধেই খাটে। 'সে' কেবলমাত্র মানুষ নয় জন্তু সম্বন্ধেও খাটে, যেমন: কুকুরটাকে মারতেই সে চেঁচিয়ে উঠল। 'সে' থেকে বিশেষণ শব্দ হয়েছে 'সেই'। এর প্রয়োগ সর্বত্রই: সেই মানুষ, সেই গাছ, সেই গোরু। 'এ' থেকে হয়েছে 'এই'। 'এ' বোঝায় কাছের বর্তমান পদার্থকে, 'সে' বোঝায় অবর্তমানকে। সম্মানার্থে 'এ' থেকে হয়েছে 'ইনি'।

বাংলা ভাষার একটা বিশেষত্ব এই যে, সর্বনামে লিঙ্গভেদ নেই। ইংরেজিতে প্রথম পুরুষে he পুংলিঙ্গ, she স্ত্রীলিঙ্গ, it ক্লীবলিঙ্গ। ইংরেজিতে যদি বলতে হয়, সে প'ড়ে গেছে, তবে সেই প্রসঙ্গে he she বা it বলাই চাই। বাংলায় ক্লীবলিঙ্গের নির্দেশ আছে, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের নেই। সে এ ও তিনি ইনি উনি: স্ত্রীও হয়, পুরুষও হয়। ক্লীবলিঙ্গে 'সে' 'এ' 'ও' শব্দে নির্দেশক চিহ্ন যোগ করা চাই, যেমন: সেটা ওটা সেখানা ওখানা। বাংলা কাব্যে এই প্রথমপুরুষ সর্বনামে যখন ইচ্ছাপূর্বক লিঙ্গ নির্দেশ করা হয় না তখন তার ইংরেজি তর্জমা অসম্ভব হয়। 'যে' সর্বনাম পদের সঙ্গে কোনো না কোনো বিশেষ্য উহ্য বা ব্যক্ত রূপে থাকেই। 'যে গান গাচ্ছে' বলতে বোঝায়, যে মানুষ। অন্যত্র: যে ঘড়ি চলছে না, যে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

'যেই' শব্দের একটি প্রয়োগ আছে, তাতে 'মুহূর্তে' বা 'ক্ষণে' উহ্য থাকে, যথা: যেই এল অমনি চলে গেল, যেই দেখা সেই আর মুখে কথা নেই। এখানে 'যেই আর সেই' শব্দের পিছনে উহ্য আছে 'ক্ষণে'। অন্যত্র 'যেই' বা 'সেই' শব্দের প্রয়োগে উহ্য থাকে 'মানুষ', যেমন: যেই আসুক সেই মার খাবে। 'যাই' শব্দের সঙ্গে উহ্য থাকে দুটি বিশেষণের দ্বন্দ্ব, যেমন: সে যাই বলুক। অর্থাৎ, এটাই বলুক বা ওটাই বলুক, ভালোই বলুক বা মন্দই বলুক। আর-এক প্রকার প্রয়োগ আছে 'যেই কথা সেই কাজ', অর্থাৎ কাজে কথায় প্রভেদ নেই— এখানে ই প্রত্যয় নিশ্চয়তা অর্থে ঝোঁক দেবার জন্যে।

'যে' অসম্পূর্ণার্থক সর্বনাম বিশেষণ, মানবার্থে তার পূরণ হয় 'ও' এবং 'সে' দিয়ে। অন্য জীব বা বস্তুর সম্বন্ধে যখন তার প্রয়োগ হয় তখন সেই বস্তু বা জীবের নাম তার

সঙ্গে জুড়তে হয়, যেমন : যে পুকুর, যে ঘটি, যে বেড়াল। নির্বস্তুক শব্দেও সেই নিয়ম, যেমন : যে স্নেহ শিশুর অনিষ্ট করে সে স্নেহ নিষ্ঠুরতা।

কখনো কখনো বাক্যকে অসম্পূর্ণ রেখে 'যে' শব্দের ব্যবহার হয়, যেমন : যে তোমার বুদ্ধি। বাকিটুকু উহ্য আছে বলেই এর দংশনের জোর বেশি। বাংলা ভাষায় এইরকম খোঁচা-দেওয়া বাঁকা ভঙ্গীর আরও অনেক দৃষ্টান্ত পরে পাওয়া যাবে।

মানুষ ছাড়া আর কিছুকে কিংবা সমূহকে বোঝাতে গেলে 'যে' ছেড়ে 'যা' ধরতে হবে, যেমন : যা নেই ভারতে (মহাভারতে) তা নেই ভারতে। কিন্তু 'যারা' শব্দ 'যা' শব্দের বহুবচন নয়, 'যে' শব্দেরই বহুবচন, তাই ওর প্রয়োগ মানবার্থে। 'তা' বোঝায় অচেতনকে, কিন্তু 'তারা' বোঝায় মানুষকে। 'সে' শব্দের বহুবচন 'তারা'।

শব্দকে দুনো করে দেবার যে ব্যবহার বাংলায় আছে, 'কে' এবং 'যে' সর্বনাম শব্দে তার দৃষ্টান্ত দেখানো যাক : কে কে এল, যে যে এসেছে। এর পূরণার্থে 'সে সে লোক' না বলে বলা হয় 'তারা' কিংবা 'সেই সেই লোক'। 'যেই যেই লোক'এর ব্যবহার নেই। সম্বন্ধপদে 'যার যার' 'তার তার' মানবার্থে চলে। এইরকম দ্বৈতে বহুকে এক এক ক'রে দেখবার ভাব আছে। ভিন্ন ভিন্ন তুমি'কে নির্দেশ ক'রে 'তুমি তুমি' 'তোমার তোমার' বললে দোষ ছিল না, কিন্তু বলা হয় না।

যে বাক্যের প্রথম অংশে দ্বৈতে আছে 'যে' তার পূরণার্থক শেষ অংশে সমগ্রবাচক বহুবচন-ব্যবহারটাই নিয়ম, যেমন : যে যে লোক, বা যাঁরা যাঁরা এসেছেন তাঁদের পান দিয়ো।

যত এত তত অত কত শব্দ পরিমাণবাচক। এদের মধ্যে 'তত' শব্দ ছাড়া আর সবগুলিতে দ্বিত্ব চলে।

এখন তখন যখন কখন কালবাচক। 'কখন্' শব্দ প্রায়ই প্রশ্নসূচক, সাধারণভাবে 'কখন্' বলতে অনিশ্চিত বা দূরবর্তী সময় বোঝায় : কখন্ যে গেছে। কিন্তু 'কখনো' প্রশ্নার্থক হয় না। প্রশ্নের ভাবে যখন বলি 'সে কখনো এ কাজ করে' তখন 'কি' অব্যয়-শব্দ উহ্য থাকে। দ্বিত্বে 'কখনো' শব্দের অর্থ 'মাঝে মাঝে'। 'কখনোই' একটা 'না' চায় : কখনোই হবে না।

'কখন্' শব্দের 'কী খেনে' -ভঙ্গীওয়ালা রূপ কাব্যসাহিত্যে পাওয়া যায়।

'কভু' শব্দের অর্থও 'কখনো'। এখন দৈবাৎ পদ্যে ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগে না। ওর জুড়ি ছিল 'তবু' শব্দটা, কিন্তু ওর সময়বাচক অর্থটা নেই। 'তবু' শব্দের দ্বারা এমন কোনো সম্ভাবনা বোঝায় যেটা ঠিক উপযুক্ত বা আকাঙ্ক্ষিত নয় : যদিও রৌদ্র প্রখর তবু সে ছাতা মাথায় দেয় না, আমি তো বারণ করেছি তবু যদি যায়

দুঃখ পাবে। কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণে বহুবচন বা কর্মকারক নেই। সম্বন্ধপদে: এখনকার তখনকার কখনকার, কোন্ সময়কার, কোন্ সময়টার। অধিকরণে: কোন্ সময়ে, যে সময়ে। পদ্যে 'কোন্ খনে', গ্রাম্য ভাষায় 'কী খেনে' এবং অধিকাংশ স্থলেই শুভ অশুভ লক্ষণ-সূচনায় এর প্রয়োগ হয়। অপাদান: যখন থেকে, কোন্ সময় থেকে।

কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ আরও একটা বাকি আছে 'কবে'। ওর দুটি জুড়ি ছিল: এবে যবে। তারা পদ্যে আশ্রয় নিয়েছে। 'তবে' একদা ওদেরই দলে ছিল, কিন্তু এখন 'তবু' শব্দের মতো সেও অর্থ বদলিয়েছে। একটা সম্ভাবনার সঙ্গে আর-একটা সম্ভাবনাকে সে জোড়ে, যেমন: যদি যাও তবে বিপদে পড়বে। তবে এক কাজ করো: 'তবে' শব্দের পূর্ববর্তী উহ্য ব্যাপারের প্রসঙ্গে কোনো কাজ করার পরামর্শ।

এই প্রসঙ্গে 'সবে' শব্দটার উল্লেখ করা যেতে পারে। বলে থাকি: সবে এইমাত্র চলে গেছে, সবে পাঁচটা বেজেছে। এখানে 'সবে' অব্যয়, ওতে মাত্রা বোঝায়, সকল ক্ষেত্রেই পরিমাণের সীমা বোঝাতে তার প্রয়োগ: সবে পাঁচজন। সবে ভোর হয়েছে: অর্থাৎ সময়ের মাত্রা ভোরে এসে পৌঁচেছে। সেইরকম: সবে এক পোওয়া দুধ।

যেমন তেমন অমন এমন কেমন তুলনাবাচক। 'কেমনে' শব্দের ব্যবহার পদ্যে করণকারকে। 'কেমন' শব্দের দ্বৈতে সন্দেহ বোঝায়: কেমন কেমন ঠেকছে। গা কেমন কেমন করছে: একটা অনির্দিষ্ট অসুস্থ ভাব। 'কেমন' শব্দের সঙ্গে 'যেন'-যোগে সংশয় ঘনীভূত হয়, আর সে সংশয়টা অপ্রিয়। লোকটাকে কেমন যেন ঠেকছে: অর্থাৎ ভালো ঠেকছে না। ভঙ্গীওয়ালা 'কেমন' শব্দটা আছে খোঁচা দেবার কাজে: কেমন জব্দ, কেমন মার মেরেছে, কেমন জুতো, কেমন ঠকানটাই ঠকিয়েছে।

অধিকরণের বাহনরূপে 'এমনি' শব্দের ব্যবহার আছে: এমনিতেই জায়গা পাই নে। খোঁচা দেবার ভঙ্গীতেও এই শব্দটার যোগ্যতা আছে: এমনিই কী যোগ্যতা।

'যত' শব্দ তার জুড়ি হারালে টিটকারির কাজে লাগে সে কথা পূর্বেই বলেছি। 'অত' কথাটারও তীক্ষ্ণতা আছে, যেমন: অত চালাকি কেন, অত বাবুগিরি তোমাকে মানায় না, অত ভালোমানুষি করতে হবে না।

এজাতীয় আরও দৃষ্টান্ত আছে, যথা 'যে' এবং 'যেমন'। 'সে' এবং 'তেমন'এর সঙ্গে যদি বিচ্ছেদ ঘটানো যায় তবে মুখ বাঁকানোর ভঙ্গী আনে, যথা: যে মধুর বাক্য তোমার। 'তেমন'এর সঙ্গ-বর্জিত 'যেমন' শব্দটাও বদমেজাজি: যেমন তোমার বুদ্ধি।

এই ধরণেরই আর-একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ে: কোথাকার মানুষ হে। এ বাক্যটার চেহারা প্রশ্নেরই মতো, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা রাখে না। এতে যে সংবাদ

উহ্য আছে সে নিবাসঘটিত নয়, সে হচ্ছে লোকটার ধৃষ্টতার বা মূর্খতার পরিচয় নিয়ে। কোথাকার সাধুপুরুষ এসে জুটল : লোকটার সাধুতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ হচ্ছে না।

'যেমতি' 'তেমতি' পদ্যে আশ্রয় নিয়েছে। 'সেইমতো' 'এইমতো' এখনো টিঁকে আছে। কিন্তু 'এর মতো' 'তার মতো'র ব্যবহারটাই বেশি। করণকারকে রয়ে গেছে 'কোনোমতে'। অথচ 'কোনোমতো' বা 'কোন্‌মতো' শব্দটা নেই।

'কেন' শব্দটা সর্বনাম। এর অর্থ প্রশ্নবাচক, এর রূপটা করণকারকের। ঘটনা ঘটল কেন : অর্থাৎ ঘটল কী কারণের দ্বারা। 'কেনে বা' প্রাচীন কাব্যেও পড়েছি, গ্রাম্য লোকের মুখেও শোনা যায়।

কেন, কেন বা, কেনই বা। 'লোকটা কেন কাঁদছে' এ একটা সাধারণ প্রশ্ন। 'কেন বা কাঁদছে' বললে কান্নাটা যে ব্যর্থ বা অবোধ্য সেইটে বলা হল। কেন বা এলে বিদেশে : অর্থাৎ বিদেশে আসাটা নিষ্ফল। কেনই বা মরতে এখানে এলুম : এ হল পরিতাপের ধিক্কার। এর মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই প্রয়োগগুলির সবগুলোই অপ্রিয়তাব্যঞ্জক। কেন তিনি তিব্বতি পড়ছেন তা নিজেই জানেন না : এ সহজ কথা। যেই বলা হল 'কেনই বা তিনি তিব্বতি পড়তে বসলেন' অমনি বোঝা যায়, কাজটা সুবুদ্ধির মতো হয় নি।

'কেন' শব্দের এক বর্গের শব্দ 'যেন' 'হেন'। 'যেন' সাদৃশ্য বোঝাতে। 'হেন' শব্দের প্রয়োগ বিশেষণে, যথা : হেন রূপ দেখি নাই কভু, হেন কাজ নেই যা সে করতে পারে না, সে-হেন লোকও তেড়ে এল। হেন কাজ = এমন কাজ। সে-হেন = তার মতো।

'যেন' শব্দটাতে বিদ্রূপের ভঙ্গী লাগানো চলে : যেন নবাব খাঞ্জে খাঁ, যেন আহ্লাদে পুতুল, যেন কার্ত্তিকটি, যেন ডানাকাটা পরী। বাংলায় বিদ্রূপের ভঙ্গীরীতি অত্যন্ত সুলভ।

'তেন' শব্দের ব্যবহার লোপ পেয়েছে। 'হেন' শব্দের অর্থ 'মতো' কিংবা 'এই-মতো'। এর সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় 'তেন' শব্দের অর্থ 'সেইমতো'। 'হেন-তেন' জোড়া শব্দ এখনো চলিত আছে। হেন-তেন কত কী ব'কে গেল : অর্থাৎ, ব'কল কখনো এরকম কখনো সেরকম, অসংলগ্ন বকুনি। প্রাচীন বাংলায় দেখেছি 'যেন কন্যা তেন বর'। এখানে 'যেন' শব্দের 'যে-হেন' অর্থ।

'যেন' শব্দটা 'হেন' শব্দের জুড়ি। পদাবলীতে পাওয়া গেছে, 'যেহ্ন' (যে-হেন)। বোঝা যায় এই 'হেন' শব্দের যোগেই 'যেন' শব্দ চেহারা পেয়েছে। আধুনিক বাংলায় 'যেন' শব্দটা তুলনা-উপমার কাজেই লাগে, কিন্তু পুরাতন বাংলায় তার অর্থের বিকৃতি

হয় নি। তখন তার অর্থ ছিল 'যেমন': যেন যায় তেন আইসে, যেন রাজা তেন দেশ।

'হেন' শব্দটা রয়ে গেছে ভাষার মহদাশ্রয় পক্ষে। কিন্তু 'সে' কিংবা 'এ' শব্দের যোগে এখনো চলে, যেমন: সে-হেন লোক। এই 'হেন' শব্দের যোগে ঐ 'সে' শব্দে অক্ষমতা বা অসম্মানের আভাস দেয়। যেমন: সে-হেন লোক দৌড় মারলে। 'হেন' শব্দের যোগে 'এ' শব্দে অসামান্যতা বোঝায়, যেমন: এ-হেন লোক দেখা যায় না, এ-হেন দুর্দশাতেও মানুষ পড়ে।

'কেন'র সঙ্গে 'যে' যোগ করলে পরিতাপ বা ভর্ৎসনার ভঙ্গী আসে, যেমন: কেন যে মরতে আসা, কেন যে এতগুলো পাস করলে। 'কী করতে' শব্দটারও ঐ-রকম ঝোঁক, অর্থাৎ তাতে আছে ব্যর্থতার ক্ষোভ।

শুধু 'কী' শব্দের মধ্যেও এই রকমের ভঙ্গী। এই কাজে ওর সঙ্গে যোগ দেয় ই অব্যয়: কী চেহারাই করেছ, কী কবিতাই লিখেছেন, কী সাধুগিরিই শিখেছ। ঐ 'কী'এর সঙ্গে 'বা' যোগ করলে ঝাঁজ আরও বাড়ে। 'কী বা'কে বাঁকিয়ে 'কীবে' করলে ভঙ্গীতে আরও বিদ্রূপ পৌঁছয়। ই'র সহযোগিতা বাদ দিলে 'কী' বিশুদ্ধ বিস্ময় প্রকাশের কাজে লাগে: কী সুন্দর তার মুখ।

সম্মান খর্ব করবার বিশেষ প্রত্যয় বাংলা ভাষায় যথেষ্ট পাওয়া গেল, সর্বনামের প্রয়োগেও বক্রোক্তি দেখা গেছে। কিন্তু শ্রদ্ধা বা প্রশংসা -প্রকাশের প্রয়োজনে ভাষায় কেবল একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে 'আহা' অব্যয় শব্দটার যোগে, যেমন: আহা মানুষটি বড়ো ভালো। করুণা প্রকাশেও এর ব্যবহার আছে। অথচ 'আহামরি' শব্দের পরিণামটা ভালো হয় নি। গোড়ায় এর উদ্দেশ্য ভালোই ছিল, এখন এ শব্দটার যে প্রকৃত স্বভাব সেইটাই গেছে বিপরীত হয়ে। এটা হয়েছে বিদ্রূপের বাহন। ওটাকে আরও একটু প্রশস্ত ক'রে হল 'আহা ম'রে যাই'; এর ঝাঁজ আরও বেশি। পদে পদে বাংলায় এই বাঁকা ভঙ্গীটা এসে পড়ে: ভা-রি তো পণ্ডিত, ম-স্ত নবাব। এদের কণ্ঠস্বর উৎসাহে দীর্ঘকৃত হয়ে গাল পাড়ে যথার্থ মানেটাকে ডিঙিয়ে। হাঁদারাম ভোঁদারাম বোকারাম ভ্যাবাগঙ্গারাম শব্দগুলোর ব্যবহার চূড়ান্ত মূঢ়তা প্রকাশের জন্যে। কিন্তু 'সুবুদ্ধিরাম' 'সুপটুরাম' বলবার প্রয়োজনমাত্র ভাষা অনুভব করে না। সবচেয়ে অদ্ভুত এই যে 'রাম' শব্দের সঙ্গেই যত বোকা বিশেষণের যোগ, 'বোকা লক্ষ্মণ' বলতে কারও রুচিই হয় না।

'কি' যেখানে অব্যয় সেখানে প্রশ্নের সংকেত। উহ্য বিশেষ্যের সহযোগে বিশেষণে ওর প্রয়োগ আছে। তুমি কী করছ: অর্থাৎ 'কী কাজ' করছ। আর-একটা প্রয়োগ বিস্ময়

বোঝাতে, যেমন : কী সুন্দর। পূর্বেই বলেছি তীক্ষ্ণধার স্বরবর্ণ ই সঙ্গে না থাকলে এর সৌজন্য বজায় থাকে। বিশেষণ-প্রয়োগে 'কী', যথা : কী কাজে লাগবে জানি নে। 'কী' বিশেষণ শব্দে অচেতন বা নির্বস্তুক বা অনির্দিষ্ট বোঝায় : ওর কী দশা হবে, কী হ'তে কী হল। বিকল্প বোঝাতে ওর প্রয়োগ আছে, যেমন : কী রাম কী শ্যাম কাউকেই বাদ দেওয়া যায় না। 'কোন্' বিশেষণ জড় চেতন দুইয়েই লাগে।

সর্বনামের কর্মকারকে সাধারণত কে বিভক্তি : আমাকে তোমাকে। 'সে'র বেলায় 'তাকে' কিংবা 'সেটিকে' 'সেটাকে'।

বাংলা সর্বনাম করণকারকে একটা বিভক্তির উপরে আর-একটি চিহ্ন জোড়া হয়। বিভক্তিটা সম্বন্ধপদের, যেমন 'আমার', ওতে জোড়া হয় 'দ্বারা' শব্দ : আমার দ্বারা। আর-একটা শব্দচিহ্ন আছে 'দিয়ে'। তার বেলায় মূলশব্দে লাগে কর্মকারকের বিভক্তি : আমাকে দিয়ে।

'কী' শব্দের করণকারকের রূপ : কিসে, কিসে ক'রে, কী দিয়ে, কিসের দ্বারা। অধিকরণেরও রূপ 'কিসে', যথা : এ লেখাটা কিসে আছে। এ-সমস্তই একবচনের ও অজীববাচকের দৃষ্টান্ত, এরা বহুবচনে হবে : এগুলোকে দিয়ে, সেগুলোকে দিয়ে, কোন্‌গুলোকে দিয়ে। অসম্মানে মানুষের বেলা হয় ; নচেৎ হয় : এদের দিয়ে, তাদের দিয়ে, ওদের দিয়ে।

সাধারণত বাংলায় বিশেষণপদের বহুবচনরূপ নেই। ওদের অধিকৃত বিশেষ্য শব্দগুলিতে বহুবচনের ব্যবস্থা করতে হয়, যথা : বুনো পশুদের, পিতলের ঘটিগুলোর। বলা বাহুল্য 'ঘটিদের' হয় না, 'পশুদের' হয়। রা এবং দের বিভক্তি জড়বাচক শব্দের অধিকারে নেই। তার পক্ষে গুলো শব্দই বৈধ। অথচ গুলো অপর পক্ষের ব্যবহারেও লাগে। কিন্তু পরিমাণবাচক 'এত' 'তত' 'যত' 'কত' বিশেষণের সঙ্গে বহুবচন-বিভক্তি গুলো যুক্ত হয়। তা ছাড়া 'এ' 'সে' 'যে' 'ও' 'ঐ' 'সেই' 'কোন্' শব্দের সঙ্গে বহুবচনে কর্তৃপদে গুলো ও কর্মকারকে বা সম্বন্ধে দের যোগ করা হয়।

বাংলা সর্বনামশব্দ-প্রয়োগে একটা খটকার জায়গা আছে।

'আমাকে তোমাকে খাওয়াতে হবে' এমন কথা শোনা যায়। কে কাকে খাওয়াবে তর্কটা পরিষ্কার হয় না। এমন স্থলে যিনি খাওয়াবার কর্তা তাঁকে সম্বন্ধ-আসনে বসালে কথাটা পাকা হয়। আর সেটা যদি ক্রিয়াপদের পূর্বেই থাকে তা হলে দ্বিধা মেটে। 'আমাকে তোমার খাওয়াতে হবে' বাক্যটা স্পষ্ট। গোল বাধে বহুবচনের বেলায়। কেননা বহুবচনের সম্বন্ধপদে দের আর কর্মকারকের দের একই চেহারায়। এর একমাত্র উপায় কে বিভক্তি দ্বারা কর্মকারককে নিঃসংশয় করা। 'আমাদেরকে

তোমাদের খাওয়াতে হবে' বললে নিশ্চিন্ত মনে নিমন্ত্রণে যাওয়া যায়। সম্বন্ধকারকের চিহ্নে কর্মকারকের কাজ চালিয়ে নেওয়া ভাষার অমার্জনীয় ঢিলেমি।

১৫

বাংলায় নির্দেশকশব্দরূপে প্রধানত ব্যবহৃত হয়: টি টা খানি খানা। ইংরেজিতে এর প্রতিরূপ the। ইংরেজিতে the বসে শব্দের পূর্বে, বাংলায় নির্দেশক শব্দ বসে শব্দের পরে, বস্তুবাচক বা জীববাচক শব্দের অনুষঙ্গে। যা বস্তু বা জীব -বাচক নয় স্থানবিশেষে তার সঙ্গেও যোগ হয়, যেমন: বেশি লজ্জাটা ভালো নয়, ওর হাসিটি বড়ো মিষ্টি। এখানে লজ্জা ও হাসিকে বস্তুর মতোই কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে।

এক দুই তিন শব্দ সংখ্যাবাচক। ওদের সঙ্গে প্রায় নিত্যযোগ টি ও টা'র। ইংরেজিতে এ দস্তুর নেই। বাংলায় সংখ্যাবাচক শব্দ যখন সমাসে বাঁধা পড়ে তখন তাদের টি টা পড়ে খ'সে, যেমন: দশসের আটহাত পাঁচমিশলি। তা ছাড়া 'জন' শব্দের সংযোগে টি টা চলে না। 'একটি জন' বলি নে, অথচ 'একটি মানুষ' বলেই থাকি।

আরও কয়েকটি নির্দেশক শব্দ আছে, যেমন: টু টুক্ টুকু গোছা গাছি। তেল জল ধুলো কাদা প্রভৃতি অনির্দিষ্ট-আকার-বাচক শব্দে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার চলে না। 'একটা তেল' 'একটি ধুলো' বলি নে, কিন্তু 'একটু তেল' 'একটু ধুলো' বলেই থাকি। 'অনেকটা জল' 'অনেকটা ময়দা' বলে থাকি কিন্তু 'অনেকটি' মাটি বা দুধ বলা চলে না। কেননা টা শব্দে ব্যাপকতা বোঝায়, টি শব্দে বোঝায় খণ্ডতা।

টু টুক্ টুকু: স্বল্পতাসূচক। সজীব পদার্থে এর ব্যবহার নেই। ছোটো গাধার বাচ্ছাকেও কেউ 'গাধাটুকু' বলবে না, পরিহাস ক'রে 'মানুষটুকু' বলা চলে।

সরু লম্বা জিনিসের সঙ্গে 'গাছি' 'গাছা'র ব্যবহার: দড়িগাছা বেতগাছা হারগাছা। দুই-একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে, যেমন 'চুড়িগাছি'। লম্বায়-ছোটো জিনিসে চলে না; 'গোঁফগাছি' কিছুতেই নয়। টুকু চলে ছোটো জিনিসে, কিন্তু গড়নওয়ালা জিনিসে নয়। 'চুনটুকু' হয়, 'পদ্মটুকু' হয় না; 'আংটিটুকু' হয় না, 'পশমটুকু' হয়। সন্ন্যাসীঠাকুরের 'রাগটুকু' প্রভৃতি অবস্তুবাচক শব্দেও চলে; 'একটুকু' হয়, কিন্তু 'দুটুকু' 'তিনটুকু' হয় না। 'ঐটুক্' শব্দের সঙ্গে 'খানি' জোড়া যায়, 'খানা' যায় না; 'একটুকখানি', কিন্তু 'একটুকখানা' নয়। জীববাচক শব্দে খাটে না; 'একটুক জীব' নেই কোথাও।

আরও কয়েকটি নির্দেশক পদ আছে যা শব্দের পূর্বে বসে। তারা সর্বনাম জাতের, যেমন: সেই এই ঐ।

১৬

বাংলা বিশেষ্যশব্দে সংস্কৃত বিশেষ্যশব্দের অনুস্বার বিসর্গ না থাকাতে কর্তৃকারকে চিহ্নের কোনো উৎপাত নেই। একেবারে নেই বলাও চলে না। কর্তৃপদে মাঝে মাঝে একারের সংকেত দেখা যায়, যেমন : পাগলে কী না বলে।

ভাষাবিজ্ঞানীরা এইরকম প্রয়োগকে তির্যকৃরূপ বলেন, এ যেন শব্দকে ত্যাড়চা করে দেওয়া। সব গৌড়ীয় ভাষায় এই তির্যকৃরূপ পাওয়া যায়, যেমন : দেবে জনে ঘোড়ে। বাংলায় বলি : দেবে মানবে লেগেছে, পাঁচজনে যা বলে। 'ঘোড়ে' বাংলায় নেই, আছে 'ঘোড়ায়' : ঘোড়ায় লাথি মেরেছে।

এই তির্যকৃরূপের ভিতর দিয়েই কারকের বিভক্তিগুলো তৈরি হয়েছে, আর হয়েছে বহুবচনের রূপ, যেমন : মানুষে থেকে, মানুষেরা মানুষেতে মানুষেদের। তোমা আমা যাহা তাহা থেকে : তোমার আমার যাহার তাহার তোমাকে আমাকে ইত্যাদি।

এই তির্যকৃরূপের কর্তৃকারক এক সময়ে সাধারণ অর্থে ছিল : আপনে শিখায় প্রভু শচীর নন্দনে, সোই আপনে করু সেবা। প্রাচীন রামায়ণে দেখা যায় নামসংজ্ঞায় প্রায় সর্বত্রই এই তির্যকৃরূপ, যেমন : সুমিত্রায়ে কৌশল্যায়ে মন্থরায়ে লোমপাদে। এখন এর ব্যবহারে একটা বিশেষত্ব ঘটেছে। 'বানরে কলা খায়' বলে থাকি, 'গোপালে সন্দেশ খায়' বলি নে। বাংলার কোনো কোনো অংশে তাও বলে শুনেছি। ময়মনসিংহগীতিকায় আছে : কোনো দোষে দোষী নয় আমার সোয়ামিজনে।

শ্রেণীবাচক কর্তৃপদে তির্যকৃরূপ দেখা যায়, অন্যত্র যায় না। 'বাঘে গোরুটাকে খেয়েছে' বললে বোঝায় : বাঘজাতীয় জন্তুতে গোরুকে খেয়েছে, ভালুকে খায় নি। যখন বলি 'রামে মারলে মরব, রাবণে মারলেও মরব', তখন ব্যক্তিগত রাম রাবণের কথা বলি নে ; তখন রামশ্রেণীয় আঘাতকারী ও রাবণশ্রেণীয় আঘাতকারীর কথা বলা হয়।

'জন' শব্দের তির্যকৃরূপ 'জনা'। একো জনা একো রকমের : এই 'জনা' বিশেষ একজনের সম্বন্ধে নয়, জনগুলি এক-একটি শ্রেণীগত। 'একহ' শব্দ থেকে হয়েছে 'একো'।

মনে রাখা দরকার, কর্তৃপদের এই তির্যকৃরূপ জড় পদার্থে খাটে না। যখন বলি 'মেঘে অন্ধকার করেছে' তখন বুঝতে হবে, 'মেঘে' করণকারক।

গৌড়ীয় ভাষার প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, শব্দরূপে সম্বন্ধপদের চিহ্নই প্রাধান্য পেয়েছিল। অবশেষে প্রয়োজনমত তারই উপরে স্বতন্ত্র কারকের বিভক্তি যোগ করতে হয়েছে। তারই নিদর্শন পাই কর্মকারকে 'তোমারে' 'শ্রীরামেরে' প্রভৃতি শব্দে।

আধুনিক বাংলা পদ্যেও এই যে বিভক্তিরই প্রাধান্য। বাংলা রামায়ণ-মহাভারতে কর্মকারকে কে বিভক্তি অল্প। কবিকঙ্কণে দেখা গেছে: খাওয়াব তোমাকে হে নবাৎ আম্ররসে। অন্যত্র: উজানী নগরকে বাসিবে যেন হিম। এরকম প্রয়োগ বেশি নেই।

বাংলা নির্বস্তুক পদার্থ-বাচক শব্দের কর্মকারকে টা টি'র প্রয়োগবাহুল্য, যথা 'মৃত্যুভয় দূর করো', 'চক্ষুলজ্জা ছাড়ো'। কিন্তু ওরই মধ্যে একটু বিশেষত্বের ঝোঁক দিয়ে বলা চলে: মৃত্যুভয়টা দূর করো, চক্ষুলজ্জাটা ছাড়ো। 'মৃত্যুভয়টাকে দূর করো' বলতেও দোষ নেই।

মানুষের বা জন্তু-জানোয়ারের বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন নিয়ে শৈথিল্য করা হয় নি: গোপাল যদি সন্দেশের যোগ্য হয় তা হলে গোপালকেই সন্দেশ দেওয়া যায়। কিন্তু যে বিশেষ্যপদ সাধারণবাচক তার বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন কাজে লাগে না, যেমন: রাখাল গোরু চরায়। 'গোরুকে' চরায় না। ময়রা সন্দেশ বানায়, 'সন্দেশকে' বানায় না।

বিপদ এই, একটা নিয়মের নাগাল যেই পাওয়া যায় অমনি জুটে যায় অনিয়মের দৃষ্টান্ত, যথা: যে গাড়োয়ান গোরুকে পীড়ন করে সে তো কশাইয়েরই খুড়তুতো ভাই। এখানে গোরু যদিও সাধারণ বিশেষ্য তবু এখানে কর্মকারকে কে বিভক্তি দ্বারা তার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ্যের মতো ব্যবহার করা হল। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো: এখানে 'ঝি' 'বৌ' বিশেষ বিশেষ্য নয়, সাধারণ বিশেষ্য, তবু কে বিভক্তি গ্রহণ করেছে। এটা বেআইনি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আইন আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। রাখালসাধারণ গোরু চরিয়ে থাকে, সেই তার ব্যাবসা। কিন্তু গাড়োয়ান গোরুকে যে পীড়ন করে সে একটা বিশেষ ঘটনা, না পিটোতেও পারত। বউয়ের উপকারের জন্যে শাশুড়ি যদি ঝিকে মারে সে একটা বিশেষ ব্যাপার, মারাটা সাধারণ ঘটনা নয়। ব'লে থাকি 'ময়রা মালপো তৈরি করে', 'মালপোকে তৈরি করে' বলিই নে। কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলা অসম্ভব নয় যে: ময়রা মালপোকে করে তোলে জুতোর সুকতলা। মালপো তৈরি করা সাধারণ ময়রা কর্তৃক সাধারণ ব্যাপার; সুকতলার মতো মালপো তৈরি করাটা নিঃসন্দেহ সাধারণ ব্যাপার নয়।

সর্বনামের প্রসঙ্গে করণকারকের নিয়ম পূর্বেই বলা হয়েছে। অন্য বিশেষ্যপদ সম্বন্ধেও প্রায় সেই একই কথা। দ্বারা দিয়ে ক'রে: এই তিনটে শব্দ করণকারকের প্রধান উপকরণ। সর্বনামের সঙ্গে অন্য বিশেষ্যপদের একটা প্রভেদ বিভক্তি নিয়ে; সর্বনামে কে, বিশেষ্যে এ। যথা: হাতে রান্না ভালো ভাতে মারার চেয়ে,

পৃথিবী পুরাবে তুমি ভরতের ধনে। সর্বনামে এই বিভক্তি বিকল্পে র, যেমন: তোমায় দিয়ে। নিম্নের দৃষ্টান্তে কর্মকারকের চিহ্ন দেখি নে, যথা: মন দিয়ে শোনো, হাত দিয়ে খাও, লোক দিয়ে চিঠি পাঠাও। মন দিয়ে কাজ করো, বাজে কাজে হাত দিয়ো না: এখানে মনও নির্বস্তুক, হাতও তাই; এ হাত দৈহিক হাত নয়, এ হাত বলতে বোঝায় চেষ্টা। লোক দিয়ে চিঠি পাঠাও: এ লোক কোনো বিশেষ লোক নয়, সাধারণভাবে যাকে হোক কাউকে দিয়ে চিঠি পাঠাবার কথা হচ্ছে। ঘরামি দিয়ে চাল ছাইতে হবে: এখানে বিকল্পে 'ঘরামিকে দিয়ে'ও হয়। কিন্তু ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যে কর্মকারকের কে বিভক্তি থাকাই চাই: রামকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ো। মানুষ ছাড়া অন্য জীববাচক বিশেষ্য সম্বন্ধেও এই নিয়ম, যেমন: বাঁদরকে দিয়ে চাষ করানো চলে না, ধোবার গাধাকে দিয়ে ঘোড়দৌড় খেলাবে না কি।

করণকারকে 'ক'রে' শব্দ অধিকরণরূপের সঙ্গে যুক্ত হয়: গ্লাসে ক'রে জল খাও, তুলিতে ক'রে আঁকো।

করণকারকে 'দিয়ে' আর 'ক'রে' শব্দে পার্থক্য আছে। 'পাল্কিতে ক'রে' যাওয়া চলে, 'পাল্কি দিয়ে' চলে না। খাবার বেলায় বলি 'হাতে ক'রে খাও'; নেবার বেলায় বলি 'হাত দিয়ে নাও'। একটাতে হাত হচ্ছে উপায়, আর-একটাতে হাত হচ্ছে আধার। পাল্কিতে 'ক'রে' মানুষ যায়, কিন্তু যায় পথ 'দিয়ে'। এখানে পাল্কি উপায়, পথ আধার। কিন্তু অর্থহিসাবে বিকল্পে হাত উপায়ও হতে পারে, আধারও হতে পারে। তাই 'হাত দিয়ে খাও' বলাও চলে, 'হাতে ক'রে খাও' বলতেও দোষ নেই।

ব'লে থাকি: বড়ো রাস্তা দিয়ে যখন যাবে গাড়িতে ক'রে যেয়ো। কোনো সাহেব যদি বলে 'রাস্তায় ক'রে যাবার সময় গাড়ি দিয়ে যেয়ো', বুঝব সে বাঙালি নয়। লোক 'দিয়ে' পাঠাব চিঠি, লোকটা উপায়; ব্যাগে 'ক'রে' সে চিঠি নেবে, ব্যাগটা আধার।

১৭

'হতে' আর 'থেকে' এই দুটো শব্দ বাংলা অপাদানের সম্বল। প্রাচীন হিন্দিতে 'হতে' শব্দের জুড়ি পাওয়া যায় 'হন্তো', নেপালিতে 'ভন্দা', সংস্কৃত 'ভবন্ত'। প্রাচীন রামায়ণে দেখেছি: ঘরে হনে, ভূমি হনে।

অপভ্রংশ প্রাকৃতের অপাদানে পাওয়া যায়: হোংতও হোংতউ। 'থেকে' শব্দটার ধ্বনিসাদৃশ্য পাওয়া যায় নেপালিতে, যেমন: 'ভাঁহা দেখি—সেখান থেকে, মাঝ দেখি—মাঝ থেকে। গুজরাটিতে আছে 'থকি'। বাংলায় অপাদানে একটা গ্রাম্য প্রয়োগ

আছে 'ঠেঞে' (ঠাঁই হতে), যথা : তোমার ঠেঞে কিছু আদায় করতে হবে।

একদা পালি ব্যাকরণে পেয়েছিলুম-'অজ্জতগ্গে' শব্দ। এর সংস্কৃত মূল 'অদ্যতঃ অগ্রে'; 'আজ থেকে' শব্দের সঙ্গে এর ধ্বনি ও অর্থের মিল আছে। জানি নে পণ্ডিতদের কাছে এ ইঙ্গিত গ্রাহ্য হবে কি না।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। 'পশুর থেকে মানুষের উৎপত্তি' এ কথা বলা চলে। কিন্তু 'মানুষ থেকে গন্ধ বেরচ্ছে' বলি নে, বলি 'মানুষের গা থেকে' কিংবা 'কাপড় থেকে'। 'বিপিন থেকে টাকা পেয়েছি' বলা চলে না, বলতে হয় 'বিপিনের কাছ থেকে টাকা পেয়েছি'। এর কারণ, অচেতন পদার্থের নামের সঙ্গেই 'থেকে' শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তাই 'মেঘ থেকে' বৃষ্টি নামে, 'পাখি থেকে' গান ওঠে না, 'পাখির কণ্ঠ থেকে' গান ওঠে।

কেবল 'থেকে' নয়, 'হতে' শব্দ-প্রয়োগেও ঐ একই কথা। 'অযোধ্যা হতে' রাম নির্বাসিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন 'রাবণের কাছ হতে'।

তুলনামূলক অর্থেও ব্যবহৃত হয় : হতে থেকে চেয়ে চাইতে।

অন্য প্রসঙ্গে সম্বন্ধপদের আলোচনা হয়ে গেছে। এক কালে বহুবচনে সম্বন্ধপদের 'দিগের' শব্দের পূর্বেও সম্বন্ধের আর-একটা বিভক্তি থাকত, যেমন 'আমারদিগের'।

বাংলা সম্বন্ধপদের একটা প্রত্যয় আছে 'কার'। এর ব্যবহার সার্বত্রিক নয়। সময়-বাচক ক্রিয়াবিশেষণে 'এখন' 'তখন' 'যখন' 'কখন'এর সঙ্গে 'কার' জোড়া হয়। বিশেষ কোনো 'বেলাকার' 'দিনকার' 'রাতকার'ও চলে। 'আজ' এবং 'কাল' শব্দে কর্মকারকের বিভক্তির সঙ্গে যোগ ক'রে ওর ব্যবহার : আজকেকার কালকেকার। 'পর্শুকার', অমুক 'হপ্তাকার' বা 'বছরকার' হয়, কিন্তু অমুক 'মাসকার' কিংবা অমুক 'ঘণ্টাকার' হয় না। 'সকলকার' হয়, 'সমস্তকার' হয় না। 'সত্যকার' হয়, 'মিথ্যাকার' হয় না। ভিতর-কার বাহিরকার উপরকার নিচেকার এদিককার ওদিককার এধারকার ওধারকার— চলে। ব্যক্তি বা বস্তুবাচক শব্দ সম্পর্কে এর ব্যবহার নেই। 'জন' শব্দ যোগে সংখ্যাবাচক শব্দে 'কার' প্রয়োগ হয় : একজনকার দুজনকার। কিন্তু 'জন' ছাড়া মনুষ্যবাচক আর-কোনো শব্দের সঙ্গে ওর যোগ নেই। 'ইংরেজকার' বলা চলে না।

১৮

হওয়া থাকা আর করা, এই তিন অবস্থাকে প্রকাশ করে ক্রিয়াপদে। আমি ধনী, তুমি পণ্ডিত—এ কথা ইংরেজিতে বলতে গেলে এর সঙ্গে 'হওয়া' ক্রিয়াপদ যোগ

করতে হয়, বাংলায় সেটা উহ্য থাকে। 'রাস্তাটা সোজা', 'পুকুরটা গভীর', যখন বলি তখন সেটাতে তার নিত্য অবস্থা জানায়। কিন্তু 'বর্ষায় পুকুর ঘোলা হয়েছে' এটা আকস্মিক অবস্থা, তাই হওয়ার কথাটা তুলতে হয়। ওর লোভ হয়েছে, মনে হচ্ছে ওর জর হবে— বাক্যগুলিও এইরকম।

সাবেক বাংলায় বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দ -সহযোগে ইংরেজি is ও are -এর অনুরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়: তুমি কে বটো, সে কে বটে, আমি রাজার ঝিয়ারি বটি। অচেতনবাচক শব্দেও চলত, যেমন : ঐ গাছটা কী বটে, এই নদী গঙ্গাই বটে। 'বটে' শব্দটা এখনো ভাষায় আছে, বিশেষ ঝোঁক দেবার জন্যে, যেমন : লোকটা ধনী বটে। আবার ভঙ্গীর কাজেও লাগে, যেমন : বটে, চালাকি পেয়েছ ! 'বটে'র সঙ্গে 'কিন্তু'র যোগ হলে ভঙ্গীটা আরও জমে, যেমন : উনি সর্দারি করেন বটে কিন্তু টের পাবেন। ইংরেজিতে স্বভাব বা অবস্থা বোঝাতে is বা are ব্যতীত বিশেষ্যের গতি নেই, বাংলায় তা নয়। ইংরেজিতে বলাই চাই He is lame, কিন্তু বাংলায় যদি বলি 'সে খোঁড়া বটে' তা হলে হয় বোঝাবে, তার খোঁড়া অবস্থাটা একটা বিশেষ আবিষ্কার, নয় ওর সঙ্গে একটা অসংগত ব্যাপারের যোগ আছে। যেমন : ও খোঁড়া বটে কিন্তু দৌড়য় খুব। কিংবা সন্দেহের বিদ্রূপ প্রকাশ করে : তুমি খোঁড়া বটে ! অর্থাৎ, খোঁড়া নও যে তা প্রমাণ করতে পারি।

বাংলায় থাকার কথাটা যখন জানাই তখন বলি— আছি বা আছে, ছিলে ছিল বা ছিলুম। 'আছিল' শব্দেরই সংক্ষেপ 'ছিল'। কিন্তু ভবিষ্যতের বেলায় হয় 'থাকব'। বাংলায় ক্রিয়াপদের রূপ প্রধানত এই থাকার ভাবকে আশ্রয় করে। করেছে করছে করেছিল করছিল— শব্দগুলো 'আছি' ক্রিয়াপদকে ভিত্তি ক'রে স্থিতির অর্থকেই মুখ্য করেছে। সংস্কৃত ভাষায় এটা নেই, গৌড়ীয় ভাষায় আছে। হিন্দিতে বলে 'চলা থা', চলেছিল। কাজটা যদিও চলা, তবু থা শব্দে বলা হচ্ছে, চলার অবস্থাতে স্থিতি করেছিল। গতিটা যেন স্থিতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

যে কাজকে নির্দেশ করা হচ্ছে প্রধানত সেই কাজের মূল ধাতুকে দিয়েই ক্রিয়াপদের গড়ন। 'খা' ধাতুতে খাওয়া বোঝায়, খাওয়া কাজের সমস্ত ক্রিয়ারূপ এই ধাতুর যোগেই তৈরি। কিন্তু বাংলা ভাষায় অনেকস্থলে কার্যটা ক্রিয়ার রূপ ধরে নি। ক্ষুধা পাওয়া, তৃষ্ণা পাওয়া, প্রতি দিনের ঘটনা ; অথচ বাংলায় সেটা ক্রিয়ারূপ নেয় নি, বিশেষ্যের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে বলতে হয় : ক্ষুধা পেল, তৃষ্ণা পেল। হওয়া উচিত ছিল 'ক্ষুধিল' 'তৃষিল', কাব্যে এইরকম ক্রিয়ারূপের কোনো বাধা নেই। কিন্তু গদ্যবাংলায় ক্রিয়াপদকে অনেক স্থলে গোটা বিশেষ্যপদের ভার বয়ে বেড়াতে হয়।

বাংলায় দুটো ক্রিয়াপদ জুড়ে ক্রিয়াবিশেষণ গড়ার একটা রীতি আছে। তাতে যে ইঙ্গিতের ভাষা তৈরি হয়েছে তার ভাবপ্রকাশের শক্তি অসাধারণ। সামান্য এই কথাটা 'রয়ে বসে কাজ করা' যা বলে তা কোনো বাঁধা সংস্কৃত শব্দে বলাই যায় না। 'উঠেপ'ড়ে' 'উঠেহেঁটে' কিংবা 'নেচেকুঁদে' বেড়ানোতে ফূর্তি প্রকাশ পায় সেটার ঠিক উপযুক্ত শব্দ অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের স্বজাতীয় শব্দ : তেড়েফুঁড়ে কেটেছেঁটে বেঁচেবর্তে রয়েসয়ে হেসেখেলে। এমন আরও বিস্তর আছে। অনেক স্থলে ঐ জোড়া শব্দের দুটিতে অর্থের সাম্য থাকে না। বস্তুত ওগুলো শব্দযোজনায় একরকম খেপামি। 'বেয়েছেয়ে দেখা'য় যা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে বাওয়া এবং ছাওয়ার কোনো সম্পর্কই নেই। যখন বলি 'নেড়েচেড়ে দেখতে হবে' তখন 'নেড়ে' শব্দের সহচরটিকে ব্যবহার করা হয় অর্থহীন বাটখারার মতো ওজন ভারী করবার জন্যে। চেয়েচিন্তে কেঁদেকেটে : এরা আছে অনুপ্রাসের গাঁঠ বাঁধার কাজে। এঁটেসেঁটে খেটেখুটে খেয়ে-দেয়ে ঠেলেঠুলে : এরা ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে মনকে ঠেলে দেবার কাজ করে।

আর একরকম ক্রিয়াবিশেষণ আছে পদকে দুনো করে দিয়ে। যেমন, 'জর হবে হবে' কিংবা 'জর জর করছে'। মনটা 'পালাই পালাই' করে। এর মধ্যে খানিকটা অনিশ্চয়তা অর্থাৎ হওয়ার কাছাকাছি ভাব আছে। 'লড়াই লড়াই খেলা' সত্যিকার লড়াই নয় কিন্তু যেন লড়াই। 'হতে হতে হল না' অর্থাৎ হতে গিয়ে হল না। এতে যেমন জোর কমায়, আবার কোনো স্থলে জোর বাড়ায় : দেখতে দেখতে জল বেড়ে গেল, হাতে হাতে ফল পাওয়া। সরে সরে যাওয়া, চলে চলে ক্লান্ত, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল, পিছু পিছু চলা, কাছে কাছে থাকা : এই দ্বিত্বে নিরন্তরতার ভাব পাওয়া যায়, কিন্তু একটানা নিরন্তরতা নয়, এর মধ্যে একটা বারংবারত্ব আছে। 'পাতে-পাতেই মাছের মুড়ো দেওয়া হয়েছে' বললে মনে হয় সেটা যেন একে একে পরে পরে গণনীয়। 'পাথরটা পড়ি পড়ি করছে', কোনো কালেই হয়তো পড়বে না, কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্তে বারে বারে তার ভাবখানা পড়বার মতো। 'আপনি আপনিই তিনি বকে যাচ্ছেন' বললে কেবল যে স্বগত বকা বোঝায় তা নয়, বোঝায় পুনঃ পুনঃ বকা। এরকম ভাবব্যঞ্জনা কোনো স্পষ্টার্থক বিশেষণের দ্বারা সম্ভব নয়। এ যেন সিনেমায় ছবি নেওয়ার প্রণালীতে পুনঃ পুনঃ অনুভূতির সমষ্টি।

ক্রিয়ার বিশেষণে অর্থহীন ধ্বনি সম্বন্ধে বাংলা শব্দতত্ত্ব বইখানিতে অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি, যেমন : ফস্ ক'রে, চট্ ক'রে, ধুপ্ ক'রে, ধাঁ ক'রে, সোঁ ক'রে, চ্যাঁচ ক'রে দেওয়া, গ্যাঁট হয়ে বসা, টিপ করে প্রণাম করা। এদের কোনো শব্দই সার্থক নয়, অথচ অর্থবান শব্দের চেয়ে এরা স্পষ্ট করে মনে রেখাপাত করে। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, ধু ধু

করছে মাঠ, থই থই করছে জল : এরা এক আঁচড়ের ছবি।

শারীরিক বেদনাগুলি ইংরেজি ভাষায় অর্থবান শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়, যেমন : throbbing cutting gnawing pricking ইত্যাদি। এরকম দৈহিক উপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বাংলা ভাষায় নেই। বাংলার আছে ধ্বনি : দব্‌দব্‌ ঝন্‌ঝন্‌ টন্‌টন্‌ কন্‌কন্‌ কুটকুট কর্‌কর্‌ তিড়িক্‌তিড়িক্‌ ঘিন্‌ঘিন্‌ ঝিম্‌ঝিম্‌ সুড়্‌সুড়্‌ সির্‌সির্‌। এই ধ্বনিগুলির সঙ্গে অনুভূতির কোনোই শব্দগত সাদৃশ্য নেই, তবু এই নিরর্থক শব্দগুলির দ্বারা অনুভূতির যেমন স্পষ্ট ধারণা হয় এমন আর কিছুতেই হতে পারে না।

বাংলা ক্রিয়াপদে আর-এক বিশেষত্ব আছে দুটো ক্রিয়ার জোড় দেওয়া, তাদের মধ্যে অর্থের সংগতি না থাকলেও, যেমন : হয়ে যাওয়া, হয়ে পড়া, হতে থাকা, হয়ে ওঠা ; করে যাওয়া, করে ফেলা, করে তোলা, করে দেওয়া, করে চলা, করে ওঠা, করতে থাকা। হয়ে পড়া, করে ফেলা 'র ভাবটা একই ; একটা অক্রিয়, একটা সক্রিয়। আর-একরকম আছে বিশেষ্যের সঙ্গে ক্রিয়ার কিংবা দুই ক্রিয়ার অসংগত যোগ, যেমন : মার খাওয়া, উঠে পড়া, গাল দেওয়া, বসে যাওয়া, ঘুরে মরা, গিয়ে পড়া, খেয়ে বাঁচা, নেড়ে দেওয়া।

১৯

ক্রিয়াপদে দু রকমের অনুজ্ঞা আছে। এক, উপস্থিত ব্যক্তিকে অনুরোধ বা আদেশ করা। আর, উপস্থিত বা অনুপস্থিত কারও সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করা, যেমন 'ও করুক'।

হোক যাক চলুক বা করুক প্রভৃতি শব্দগুলিতে ক প্রত্যয় পুরোনো ভাষায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল না, যথা : জাউ, মন্দ পবন বহু, উদিত হউ চন্দা, মউরগণ নাদ করু।

পূর্বেই বলেছি বাংলা ভাষার প্রধান লক্ষণ, তার ভঙ্গীর প্রাবল্য। উপরোক্ত শ্রেণীর ক্রিয়াপদে একটা অনর্থক গে শব্দের যোগে যে ইঙ্গিত প্রকাশ করা হয় সেটা সহজ শব্দের দ্বারা হয় না, যথা : হোকগে করুকগে মরুকগে। এতে ঔদাসীন্যে ও ক্ষোভে জড়িয়ে যে ভাবটা ব্যক্ত করে সেটা অন্য ভাষায় সহজে বলা যায় না। কেননা গে শব্দের কোনো অর্থ নেই, ওটা একটা মুদ্রা। 'হোকগে' শব্দের ইংরেজি তর্জমা করতে হলে বলতে হয় : Let it happen, I don't care। ওর সঙ্গে 'তুমিও যেমন' যদি যোগ করা যায় তা হলে ভঙ্গিমা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ইংরেজি বাক্যে হয়তো এর কাছাকাছি যায় : Oh let it be, don't bother। মোটের উপর এই

শব্দভঙ্গীর ভাবখানা এই যে, যা হচ্ছে বা করা হচ্ছে সেটা ভালো নয়, সেটা ক্ষতিকর, বা অপ্রিয়, কিন্তু তবু ওটাকে গ্রাহ্য করার দরকার নেই। 'মরুকগে' শব্দে এই ভাবাভঙ্গী খুবই স্পষ্ট হয়েছে। এই ছোট্ট বাংলা শব্দটির ইংরেজি প্রতিবাক্য : Hang it, let it go to the dogs।

ইংরেজিতে সাধারণ ব্যবহারের ক্রিয়াপদ অনুজ্ঞায় প্রায়ই এক মাত্রার হয়, যেমন, run stop cut beat shoot march hold throw। যেখানে যুগ্ম ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় সেখানে এক মাত্রার দুটি শব্দ জোড়া লাগে, যেমন : come in, go out, cut down, stand up, run on ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এইরূপ সংক্ষিপ্ত শব্দে আজ্ঞার জোর পৌঁছয়। স্কাউটের বা ফৌজের কুচকাওয়াজে ইংরেজিতে যে-সব আদেশবাক্য আছে এই কারণে সেগুলো জোরালো হয়। যে-সকল শব্দ ব্যঞ্জনবর্ণে শেষ হয় তারা ধাক্কা দেয় জোরে। stand up শব্দ উভয়ে মিলে দুই মাত্রার বটে কিন্তু তাতে দুই ব্যঞ্জনবর্ণের দুটো ঠোকর আছে।

'দাঁড়াও' শব্দটাও দুই মাত্রার, কিন্তু তার আগাগোড়া স্বরবর্ণ, তাদের স্পর্শ মোলায়েম। কথাটা ধাঁ করে ছোটে না।

'তুই' 'তোরা' বর্গের অনুজ্ঞায় এই দুর্বলতা নেই। বোস্ ওঠ্ ছোট্ থাম্ কাট্ মার্ ধর্ খেল্ : এগুলি দৌড়দার শব্দ। আদিকালে ভাষায় 'তু' 'তুই' ছিল একমাত্র মধ্যম-পুরুষের সর্বনাম শব্দ। সেটা যদি চলে আসত তা হলে ক্রিয়াপদকে স্বরবর্ণ এমন নরম করে রাখত না, হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণে তাকে তীক্ষ্ণতা দিত। 'করো' হ'ত 'কর্'। 'কোরো' হ'ত 'করিস'। 'দাঁড়া' শব্দ যদিও স্বরবর্ণ বহন করে তবু 'দাঁড়াও' শব্দের চেয়ে তার মধ্যে প্রভুশক্তি বেশি। 'ঘুমো' আর 'ঘুমোও' তুলনা করলে অনুজ্ঞার দিক থেকে প্রথমোক্তটির প্রবলতা মানতে হয়।

চলতি বাংলা ভঙ্গীপ্রধান ভাষা, তার একটা লক্ষণ ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় অসংগত ভাবে 'না' শব্দের ব্যবহার। এর কাজ হচ্ছে আদেশ বা অনুরোধকে অনুনয়ে নরম করে আনা।

'হোক না' 'করোই না' ক্রিয়াপদে 'না' শব্দে নির্বন্ধ প্রকাশ পায়, কোনো-এক পক্ষের অনিচ্ছাকে যেন ঠেলে দেওয়া। 'না' শব্দের দ্বারা 'হাঁ' প্রকাশ করা আর প্রথমপুরুষ-বাচক 'আপনি'কে মধ্যমপুরুষের অর্থে ব্যবহার একই মনস্তত্ত্বমূলক। যিনি উপস্থিত আছেন যেন তিনি উপস্থিত নেই, তাঁর সঙ্গে মোকাবিলায় কথা বলার স্পর্ধা বক্তার পক্ষে সম্ভব নয়, এই ভাণের দ্বারাই তাঁর উপস্থিতির মূল্য যায় বেড়ে। তেমনি অনুরোধ জানানোর পরক্ষণেই 'না' বলে তার প্রতিবাদ ক'রে অনুরোধের মধ্যে সম্মানের কাকুতি এনে

দেওয়া হয়। 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের রূপ বাংলা ভাষার আর-একটি বিশেষত্ব, যথা: আমি নই, তুমি নও, সে নয়, তিনি নন, আমি নেই, তুমি নেই, সে নেই, তিনি নেই; হই নে, হও না, হন না, হয় নি, হন নি।

বাংলা ক্রিয়াপদে নানারকম শব্দ-যোজনায় নানারকম ভঙ্গী। তার কতকগুলি সার্থক, কতকগুলি নিরর্থক। ক্রিয়াপদে এতরকম ইশারা বোধ হয় আর-কোনো ভাষায় নেই।

পড়ল বা, করলে বা, শব্দে আশঙ্কার সূচনা। কোনো ক্রিয়াবিশেষণ-যোগে এর ভাবটা প্রকাশ হতে পারত না।

এতে যদি ইকার যোগ করা যায় তাতে আর-একরকম ভঙ্গী এসে পড়ে। হলই বা, করলই বা: এর ভঙ্গীতে স্বরের বৈচিত্র্য অনুসারে ক্ষমাও বোঝাতে পারে, স্পর্ধাও বোঝাতে পারে, উপেক্ষাও বোঝাতে পারে।

হল বুঝি, করল বুঝি, হল ব'লে, করল ব'লে: আসন্ন অপ্রিয়তার আশঙ্কা।

হল যে, করল যে: উদ্‌বেগ।

হল তো, করলে তো: অপ্রত্যাশিতের সম্বন্ধে বিস্ময়।

আবার ওকেই প্রশ্নের স্বরে বদলিয়ে যদি বলা হয় 'হল তো?' তা হলে জানানো হয়: এখন তো আর কোনো নালিশ রইল না?

হোক না, করুক না, হোক্‌গে, করুক্‌গে, মরুক্‌গে: ঔদাসীন্য।

হলই বা, করলই বা, নাই বা হল, নাহয় হল: স্পর্ধার ভাষা।

হবে বা, হবেও বা: দ্বিধা এবং স্বীকার মিশিয়ে।

হবেই হবে, করবেই করবে: সুনিশ্চিত প্রত্যাশা।

করতেই হবে, হতেই হবে, করাই চাই, হওয়াই চাই: ইচ্ছার জোর প্রয়োগ।

হলেই হল: অর্থাৎ হয় যদি তবে আর-কোনো তর্কের দরকার নেই।

হোক্‌গে ছাই, মরুক্‌গে ছাই: প্রবল ঔদাস্য।

২০

অব্যয়। বাংলা ভাষায় প্রশ্নসূচক অব্যয় সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি।

প্রশ্নসূচক কি শব্দের অনুরূপ আর-একটি 'কি' আছে, তাকে দীর্ঘস্বর দিয়ে লেখাই কর্তব্য। এ অব্যয় নয়, এ সর্বনাম। এ তার প্রকৃত অর্থের প্রয়োজন সেরে মাঝে মাঝে খোঁচা দেবার কাজে লাগে, যেমন: কী তোমার ছিরি, কী-যে তোমার বুদ্ধি।

তিনটি আছে যোজক অব্যয় শব্দ : এবং আর ও। 'এবং' সংস্কৃত শব্দ। এর প্রকৃত অর্থ 'এইমতো'। ইংরেজি and শব্দের অর্থে কতদিন এর ব্যবহার চলেছে জানি নে। পুরোনো কাব্যসাহিত্যে 'এবং' শব্দের দেখা পাই নি। আধুনিক কাব্যসাহিত্যেও এর ব্যবহার নেই বললেই হয়। খাঁটি বাংলা যোজক শব্দ 'আর', হিন্দি 'ঔর'। সংস্কৃত 'অপর' শব্দ থেকে এর উদ্ভব। 'এবং' শব্দ তার অর্থের অসংগতি সত্ত্বেও পুরাতন 'আর'কে সাধু ভাষা থেকে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছে। তাড়ানো সহজ হয়েছে তার প্রধান কারণ, স্বাভাবিক বাংলায় দ্বন্দ্বসমাসেই যোজকের কাজ সারা হয়ে থাকে। আমরা বলি : হাতিঘোড়া লোকলস্কর নিয়ে রাজা চলেছেন। আমরা বলি : চৌকিটেবিল আয়না-আলমারিতে ঘর ঠাসা। ইংরেজিতে উভয় স্থলেই একটা and না বসিয়ে চলে না, যথা : The king marches with his elephants, horses and soldiers। The room is full of chairs, tables, clothes-racks and almirahs।

বাংলায় যদি বলি 'রাস্তা দিয়ে চলেছে হাতি আর ঘোড়া', তা হলে বোঝাবে বিশেষ করে ওরাই চলেছে।

'আর' শব্দের আরও কয়েকটি কাজ আছে, যেমন : আর কত খাবে : অর্থাৎ অতিরিক্ত আরও কত খাবে। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না : অর্থাৎ পুনশ্চ দেখা হবে না।

তোমাকে আর চালাকি করতে হবে না : এ একটা ভঙ্গিওয়ালা কথা। এই শব্দ থেকে 'আর' শব্দটা বাদ দিলেও চলে, কিন্তু তাতে ঝাঁজ মরে যায়।

সাহিত্যে 'ও' শব্দটা 'এবং' শব্দের সমান পর্যায়ে চলেছে। কিন্তু চলতি ভাষায় 'ও' সংস্কৃত 'চ'এর মতো, যথা : আমি যাচ্ছি তুমিও যাবে, ব্যাঙ যায় ব্যাঙ যায় খল্‌সে বলে আমিও যাব।

এক কালে এই 'ও' ছিল 'হ' রূপে, যেমন : সেহ, এহ বাহ্য, এহ তো মানুষ নয়। এই হ অবিকৃত রূপে বাকি আছে সাধু ভাষায় 'কেহ' শব্দে। চলতি ভাষায় 'কেও' থেকে ক্রমে 'কেউ' হয়েছে। পুরাতন সাহিত্যে 'কেহ' পাওয়া যায়, 'তেঁহ' শব্দটা আজ হয়েছে 'তিনি'। 'ওহ' নেই কিন্তু সাধু ভাষায় 'উহা' আছে। 'যেহ' নেই, আছে 'যাহা'। এই শেষ দুটি বিশেষণ অপ্রাণী সম্পর্কে।

যোজক 'ও'র উৎপত্তি ফার্সি উব (অন্ত্যস্থ ব) শব্দ থেকে, সুতরাং and'এর প্রতিশব্দরূপে এর ব্যবহার অবৈধ নয়। কিন্তু তবু ভাষায় ভালো করে মিশ খায় নি। তুমি ও আমি একসঙ্গেই যাব : এ খাঁটি বাংলা নয়। আমরা সহজে বলি : তুমি আমি

একসঙ্গেই যাব। কেউ কেউ মনে করেন 'অপি' থেকে 'ও' হয়েছে, কিন্তু স্বরবিকারের নিয়ম অনুসারে সেটা সম্ভব কি না সন্দেহ করি।

রাজাও চলেছে সন্ন্যাসীও চলেছে: এ খাঁটি বাংলা। কিন্তু 'রাজা ও সন্ন্যাসী চলেছে' কানে ঠিক লাগে না। সে এগোয়ও না পিছোয়ও না: 'ও' শব্দের এই যথার্থ ব্যবহার। সে এগোয় না ও পিছোয় না: এ বাক্যটা দুর্বল।

তুমিও যেমন, হবেও বা: এ-সব জায়গায় 'ও' ভাষাভঙ্গীর সহায়তা করে।

দেখা যায় 'এবং' শব্দটাকে দিয়ে আমরা অনেক স্থানে and শব্দের অনুকরণ করাই। He has a party of enemies and they vilify him in the newspapers এ বাক্যটা ইংরেজি মতে শুদ্ধ, কিন্তু আমরা যখন ওরই তর্জমা করে বলি 'তাঁর একদল শত্রু আছে এবং ওরা খবরের কাগজে তাঁর নিন্দে করে', তখন বোঝা উচিত এটা বাংলারীতি নয়। আমরা এখানে 'এবং' বাদ দিই। He has enemies and they are subsidised by the government এই বাক্যটা তর্জমা করবার সময় ফস্ করে বলা অসম্ভব নয় যে: তাঁর শত্রু আছে এবং তারা সরকারের বেতন-ভোগী। কিন্তু ওটা ঠিক হবে না, 'এবং' পরিত্যাগ করতে হবে। বাক্যের এক অংশে 'থাকা', আর-এক অংশে 'হওয়া', এদের মাঝখানে 'এবং' মধ্যস্থতা করবার অধিকার রাখে না। তিনি হচ্ছেন পাকা জোচ্চোর, এবং তিনি নোট জাল করেন: ইংরেজিতে চলে, বাংলায় চলে না।

'সে দরিদ্র এবং সে মূর্খ' এ চলে, 'সে চরকা কাটে এবং ধান ভেনে খায়' এও চলে। কারণ প্রথম বাক্যের দুই অংশই অস্তিত্ববাচক, শেষ বাক্যের দুই অংশই কর্তৃত্ববাচক। কিন্তু 'সে দরিদ্র এবং সে ধান ভেনে খায়' এ ভালো বাংলা নয়। আমরা বলি: সে দরিদ্র, ধান ভেনে খায়। ইংরেজিতে অনায়াসে বলা চলে: She is poor and lives by husking rice।

প্রয়োগবিশেষে 'যে' সর্বনামশব্দ ধরে অব্যয়রূপ, যেমন: হরি যে গেল না। 'যে' শব্দ 'গেল না' ব্যাপারটা নির্দিষ্ট করে দিল। তিনি বললেন যে, আজই তাঁকে যেতে হবে: 'তাঁকে যেতে হবে' বাক্যটাকে 'যে' শব্দ যেন ঘের দিয়ে স্বতন্ত্র করে দিলে। শুধু উক্তি নয়, ঘটনাবিশেষকেও নির্দিষ্ট করা তার কাজ, যেমন: মধু যে রোজ বিকেলে বেড়াতে যায় আমি জানতুম না। মধু বিকেলে বেড়াতে যায়, এই ব্যাপারটা 'যে' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত হল।

আর-একটা অব্যয় শব্দ আছে 'ই'। 'ও' শব্দটা মিলন জানায়, 'ই' শব্দ জানায় স্বাতন্ত্র্য। 'তুমিও যাবে', অর্থাৎ মিলিত হয়ে যাবে। 'তুমিই যাবে', অর্থাৎ একলা

যাবে। 'সে যাবেই ঠিক করেছে', অর্থাৎ তার যাওয়াটাই একান্ত। 'ও' দেয় জুড়ে, 'ই' ছিঁড়ে আনে।

বক্রোক্তির কাজেও 'ই'কে লাগানো হয়েছে: কী কাণ্ডই করলে, কী বাঁদরামিই শিখেছ। 'কী শোভাই হয়েছে' ভালোভাবে বলা চলে, কিন্তু মন্দভাবে বলা আরও চলে। এর সঙ্গে 'টা' জুড়ে দিলে তীক্ষ্ণতা আরও বাড়ে, যেমন: কী ঠকানটাই ঠকিয়েছে। আমরা সোজা ভাষায় প্রশংসা করে থাকি: কী চমৎকার, কী সুন্দর। ওর সঙ্গে একটু-আধটু ভঙ্গিমা জুড়ে দিলেই হয়ে দাঁড়ায় বিদ্রূপ।

'তা' শব্দটা কোথাও সর্বনাম কোথাও অব্যয়। তুমি যে না বলে যাবে তা হবে না: এখানে না বলে যাওয়ার প্রতিনিধি হচ্ছে তা, অতএব 'সর্বনাম'। তা, তুমি বরং গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো: এই 'তা' অব্যয় এবং অর্থহীন, না থাকলেও চলে। তবু মনে হয় একটুখানি ঠেলা দেবার জন্যে যেন প্রয়োজন আছে। তা, এক কাজ করলে হয়: একটা বিশেষ কাজের দিকটা ধরিয়ে দিল ঐ 'তা'।

'বুঝি', সহজ অর্থ 'বোধ করি'। অথচ বাংলা ভাষায় 'বুঝি' 'বোধ করি' 'বোধ হচ্ছে' বললে সংশয়যুক্ত অনুমান বোঝায়: লোকটা বুঝি কালা, তুমি বুঝি কলকাতায় যাবে। 'তুমি কি যাবে' এই বাক্যে 'কি' অব্যয়ে সুস্পষ্ট প্রশ্ন। কিন্তু 'তুমি বুঝি যাবে' এই প্রশ্নে যাবে কি না সন্দেহ করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় 'বুঝি' শব্দে বুঝি ভাবটাকে অনিশ্চিত করে রাখে। বুঝির সঙ্গে 'বা' জুড়ে দিলে তাতে অনুমানের সুরটা আরও প্রবল হয়।

যদি, যদি বা, যদিই বা, যদিও বা। যদি অন্যায় কর শাস্তি পাবে: এটা একটা সাধারণ বাক্য। যদি বা অন্যায় ক'রে থাকি: এর মধ্যে একটু ফাঁক আছে, অর্থাৎ না করার সম্ভাবনা নেই-যে তা নয়। যদিই বা অন্যায় করে থাকি: অন্যায় করাটা নিশ্চিত বলে ধরে নিলেও আরও কিছু বলবার আছে। যদিও বা অন্যায় করে থাকি: অন্যায় সত্ত্বেও স্পর্ধা আছে মনে।

'তো' অব্যয়শব্দে অনেক স্থলে 'তবু' বোঝায়, যেমন: বেলায় এলে তো খেলে না কেন। কিন্তু, তুমি তো বলেই খালাস, সে তো হেসেই অজ্ঞান, আমি তো ভালো মনে করেই তাকে ডেকেছিলুম, তুমি তো বেশ লোক, সে তো মস্ত পণ্ডিত— এ-সব স্থলে 'তো' শব্দে একটু ভর্ৎসনার বা বিস্ময়ের আভাস লাগে, যথা: তুমি তো গেলে না, সে তো বসেই রইল, তবে তো দেখছি মাটি হল।

'গো' শব্দের প্রয়োগ সম্বোধনে 'তুমি' বর্গের মানুষ সম্বন্ধে, 'তুই' বা 'আপনি' বর্গের নয়: কেন গো, মশায় গো, কী গো, ওগো শুনে যাও, হাঁ গো তোমার হল কী।

সংস্কৃত 'ভোঃ' শব্দের মতো এর বহুল ব্যবহার নেই। হাঁ গো, না গো : মুখের কথায় চলে ; মেয়েদের মুখেই বেশি। ভয় কিংবা ঘৃণা -প্রকাশে 'মা গো'। 'বাবা গো' শুধু ভয়-প্রকাশে। 'শোনো' শব্দের প্রতি 'গো' যোগ দিয়ে অনুরোধে মিনতির সুর লাগানো যায়। 'কী গো' 'কেন গো' শব্দে বিদ্রূপ চলে : কেন গো, এত রাগ কেন ; কেন গো, তোমার যে দেখি গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ; কী গো, এত রাগ কেন গো মশায় ; কী গো, হল কী তোমার। ভয় বা দুঃখ -প্রকাশে মেয়েদের মুখে 'কী হবে গো', কিংবা অনুনয়ে 'একা ফেলে যেয়ো না গো'। 'হাঁগা' 'কেনে গা' গ্রাম্য ভাষায়।

শুধু 'হে' শব্দ আহ্বান অর্থে সাহিত্যেই আছে। মুখের কথায় চলে 'ওহে'। কিংবা প্রশ্নের ভাবে : কে হে, কেন হে, কী হে। অনুজ্ঞায় 'চলো হে'। মাননীয়দের সম্বন্ধে এই 'ওহে'র ব্যবহার নেই। 'তুমি' 'তোমার' সঙ্গেই এর চল, 'আপনি' বা 'তুই' শব্দের সঙ্গে নয়।

'রে' শব্দ অসম্মানে কিংবা স্নেহপ্রকাশে : হাঁ রে, কেন রে, ওরে বেটা ভূত, ওরে হতভাগা, ওরে সর্বনেশে। এর সম্বন্ধ 'তুই' 'তোরা'র সঙ্গে।

'লো' 'লা' মেয়েদের মুখের সম্বোধন। এও 'তুই' শব্দের যোগে। ভদ্রমহল থেকে ক্রমশ এর চলন গেছে উঠে।

অব্যয় শব্দ আরও অনেক আছে, কিন্তু এইখানেই শেষ করা যাক।

২১

ভাষার প্রকৃতির মধ্যে একটা গৃহিণীপনা আছে। নতুন শব্দ বানাবার সময় অনেক স্থলেই একই শব্দে কিছু মালমসলা যোগ ক'রে কিংবা দুটো-তিনটে শব্দ পাশাপাশি আঁট করে দিয়ে তাদের বিশেষ ব্যবহারে লাগিয়ে দেয়, নইলে তার ভাণ্ডারে জায়গা হত না। এই কাজে সংস্কৃত ভাষার নৈপুণ্য অসাধারণ। ব্যবস্থাবন্ধনের নিয়মে তার মতো সতর্কতা দেখা যায় না। বাংলা ভাষায় নিয়মের খবরদারি যথেষ্ট পাকা নয়, কিন্তু সেও কতকগুলো নির্মাণরীতি বানিয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলোকে সমাসের পর্যায়ে ফেলা যায়, যেমন : চটামেজাজ নাকিসুর তোলাউনুন ভোলামন। এগুলো হল বিশেষ্য-বিশেষণের জোড়। বিশেষণগুলোও ক্রিয়াপদকে প্রত্যয়ের শান দিয়ে বসানো। সেও একটা মিতব্যয়িতার কৌশল। বদমেজাজি ভালোমানুষি তিনমহলা, এগারোহাতি (শাড়ি) : এখানে জোড়া শব্দের শেষ অংশীদারের পিঠে ইকারের আকারের ছাপ লাগিয়ে দিয়ে তাকে এক শ্রেণীর বিশেষ্য থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে আর-এক শ্রেণীর বিশেষ্যে। অবশেষে সেই বিশেষ্যের

গোড়ার দিকে বিশেষণ যোগ ক'রে তাকে বিশেষত্ব দিয়েছে। অবিকৃত বিশেষ্য-বিশেষণের মিলন ঘটানো হয়েছে সহজেই ; তার দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্য গেঁথে সংস্কৃত বহুব্রীহি মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের মতো এক-একটা বাক্যাংশকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। যেমন 'পুজোবাড়ি', অর্থাৎ পুজো হচ্ছে যে বাড়িতে সেই বাড়ি। কাঠকয়লা : কাঠ পুড়িয়ে যে কয়লা হয় সেই কয়লা। হাঁটুজল : হাঁটু পর্যন্ত গভীর যে জল সেই জল। মাটকোঠা : মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে যে কোঠা। দুই বিশেষণের যোগে যে সমাস তারও গ্রন্থি ছাড়িয়ে দিলে অর্থের ব্যাখ্যা বিস্তৃত হয়ে পড়ে ; যেমন : কাঁচামিঠে : কাঁচা তবুও মিষ্টি। বাদশাহি-কুঁড়ে : বাদশার সমতুল্য তার কুঁড়েমি। সেয়ানা-বোকা : লোকটাকে বোকার মতো দেখায় কিন্তু আসলে সেয়ানা। বিশেষ্য এবং ক্রিয়া থেকে বিশেষণ-করা শব্দের যোগ, যেমন : পটলচেরা : অর্থাৎ পটল চিরলে যে গড়ন পাওয়া যায় সেই গড়নের। কাঠঠোকরা : কাঠে যে ঠোকর মারে। চুলচেরা : চুল চিরলে সে যত সূক্ষ্ম হয় তত সূক্ষ্ম।

কিন্তু শব্দরচনায় বাংলা ভাষার নিজের বিশেষত্ব আছে, তার আলোচনা করা যাক।

বাংলা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা। ভাবপ্রকাশের এরকম সাহিত্যিক রীতি অন্য কোনো ভাষায় আমার জানা নেই।

অর্থহীন ধ্বনিসমবায়ে শব্দরচনার দিকে এই ভাষায় যে ঝোঁক আছে তার আলোচনা পূর্বেই করেছি। আমাদের বোধশক্তি যে শব্দার্থজালে ধরা দিতে চায় না বাংলা ভাষা তাকে সেই অর্থের বন্ধন থেকে ছাড়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নি, আভিধানিক শাসনকে লঙ্ঘন ক'রে সে বোবার প্রকাশ-প্রণালীকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি। পোকা কিল্‌বিল্ করছে : এ বাক্যের ভাবটা ছবিটা কোনো স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় না। 'খিট্‌খিটে' শব্দের প্রতিশব্দ ইংরেজিতে আছে irritable, peevish, pettish ; কিন্তু 'খিট্‌খিটে' শব্দের মতো এমন তার জোর নেই। নেশায় চুর্‌চুর্ হওয়া, কট্‌মট্ ক'রে তাকানো, ধপাস্ ক'রে পড়া, পা টন্ টন্ করা, গা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করা : ঠিক এ-সব শব্দের ভাব বোঝানো ধাতুপ্রত্যয়ওয়ালা ভাষার কর্ম নয়। ইংরেজিতে বলে creeping sensation, বাংলায় বলে 'গা ছম্‌ছম্ করা' ; আমার তো মনে হয় বাংলারই জিত। গুটিকয়েক রঙের বোধকে ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করায় বাংলা ভাষার একটা আকুতি দেখতে পাওয়া যায় : টুক্‌টুকে, টক্‌টকে, দগ্‌দগে লাল ; ধব্‌ধবে, ফ্যাক্‌ফেকে, ফ্যাট্‌ফেটে সাদা ; মিস্‌মিসে, কুচ্‌কুচে কালো।

বাংলায় শব্দের দ্বিত্ব ঘটিয়ে যে ভাবপ্রকাশের রীতি আছে সেও একটা ইশারার ভঙ্গী, যেমন : টাটকা-টাটকা গরম-গরম শীত-শীত মেঘ-মেঘ জ্বর-জ্বর যাব-যাব উঠি-উঠি। অর্থের অসংগতি, অত্যুক্তি, রূপক-ব্যবহার, তাতেও প্রকাশ হয় ভঙ্গীর চাঞ্চল্য ; অন্য ভাষাতেও আছে, কিন্তু বাংলায় আছে প্রচুর পরিমাণে।

আকাশ থেকে পড়া, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া, হাড় কালী করে দেওয়া, পিটিয়ে লম্বা করা, ভেসে দেওয়া, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনো, তেলে বেগুনে জ্বলা, পিত্তি জ্বলে যাওয়া, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, ঘেন্না পিত্তি, বুদ্ধির ঢেঁকি, পাড়া মাথায় করা, তুলো ধুনে দেওয়া, ঘোল খাইয়ে দেওয়া, হেসে কুরুক্ষেত্র, হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছেঁড়া, কিল খেয়ে কিল চুরি, আদায় কাঁচকলায়, আহ্লাদে আটখানা : এমন বিস্তর আছে।

বাংলায় অনেক জোড়া শব্দ আছে যার এক অংশে অর্থ, অন্য অংশে নিরর্থকতা। তাতে করে অর্থের চারি দিকে একটা ঝাপসা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে ; সেই জায়গাটাতে যা তা কল্পনা করবার উপায় থাকে।

আমরা বলি 'ওষুধপত্র'। 'ওষুধ' বলতে কী বোঝায় তা জানা আছে, কিন্তু 'পত্রটা' যে কী তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা অসম্ভব। ওটুকু অব্যক্তই রেখে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং ওতে অনেক কিছুই বোঝাতে পারে। হয়তো ফীভাবৃমিক্শ্চারের সঙ্গে মকরধ্বজ, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন, থর্মমীটর, কুইনীনের বড়ি, হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের বাক্স। হয়তো তাও নয়। হয়তো কেবলমাত্র দু বোতল ডি-গুপ্ত। এমনি 'মালপত্র' 'দলিল-পত্র' 'বিছানাপত্র' প্রভৃতি শব্দে ব্যক্ত অব্যক্তের যুগলমিলন।

আর-একরকম জোড়মেলানো শব্দ আছে যেখানে দুই ভাগেরই এক মানে, কিংবা প্রায় সমান মানে ; যেমন 'লোকলস্কর'। এই 'লস্কর' শব্দে সব জায়গাতেই যে ফৌজ বোঝাবেই তা নয় ; প্রায় ওতে 'লোক' শব্দের অর্থের সঙ্গে অনির্দিষ্ট লোকসঙ্ঘের ব্যাপকতা বোঝায়। অন্যরকম করে বলতে গেলে হয়তো বলতুম, হাজার হাজার লোক চলেছে ; অথচ গুণে দেখলে হয়তো আড়াইশো'র বেশি লোক পাওয়া যেত না।

খুব 'চড়চাপড়' লাগালে : ওর মধ্যে চড়টা সুনিশ্চিত, চাপড়টা অনিশ্চিত। ওটা কি তবে একবার গালে চড়, একবার পিঠে চাপড়। খুব সম্ভব তা নয়। তবে কি অনেকগুলো চড়। হতেও পারে।

মারাধরা মারধোর : বর্ণিত ঘটনায় শুধু হয়তো মারাই হয়েছিল কিন্তু ধরা হয় নি। কিন্তু 'মারধোর' শব্দের দ্বারা মারটাকে সুনির্দিষ্ট সীমার বাইরে ব্যাপ্ত করা হল। যে উৎপাতটা ঘটেছিল তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো এই শব্দে

ইঙ্গিতের মধ্যে সেরে দেওয়া হয়েছে।

'কালিকিষ্টি' এটা একটা ভঙ্গীওয়ালা কথা। শুধু 'কালো' বলে যখন মনে তৃপ্তি হয় না তখন তার সঙ্গে 'কিষ্টি' যোগ করে কালিমাকে আরও অবজ্ঞায় ঘনিয়ে তোলা হয়।

ভাবনাচিন্তা আপদবিপদ কাটাছাঁটা হাঁকডাক শব্দে অর্থের বিস্তার করে। শুধু 'চিন্তা' দুঃখজনক, কিন্তু 'ভাবনাচিন্তা' বিচিত্র এবং দীর্ঘায়িত।

স্বতন্ত্র শব্দে 'আপদ' কিংবা 'বিপদ' বলতে যে বিশেষ ঘটনা বোঝায়, যুক্ত শব্দে ঠিক তা বোঝায় না। 'আপদবিপদ' সমষ্টিগত, ওর মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে নানাপ্রকার দুর্যোগের সম্ভাবনার সংকেত আছে।

'ধারধোর' শব্দে ধার করার উপরেও আর কিছু অস্পষ্টভাবে উদ্বৃত্ত থাকে। হয়তো, কাউকে ধ'রে পড়া। রূপক অর্থে শুধু 'ছাই' শব্দে তুচ্ছতা বোঝায় যথেষ্ট, এই অর্থে 'ছাই' শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে, যেমন: কী ছাই বকছ। কিন্তু 'ছাইভস্ম কী যে বকছ', এতে প্রলাপের বহর যেন বড়ো করে দেখানো হয়।

'হাঁড়িকুঁড়ি' শব্দ সংক্ষেপে পাকশালার বহুবিধ আয়োজনের ছবি এনে দেয়। এরকম স্থলে তন্নতন্ন বর্ণনার চেয়ে অস্পষ্ট বর্ণনার প্রভাব বেশি। 'মামলা-মকদ্দমা' শব্দটা ব্রিটিশ আদালতের দীর্ঘপ্রলম্বিত বিপত্তির দ্বিপদী প্রতীক। এইজাতীয় শব্দের কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল: মাথামুণ্ডু মালমসলা গোনাগুন্তি চালচলন বাঁধাছাঁদা হাসিতামাশা বিয়েথাওয়া দেওয়াথোওয়া বেঁটেখাটো পাকাপোক্ত মায়াদয়া ছুটোছাটা কুটোকাটা কাঁটাখোঁচা ঘোরাফেরা নাচাকোঁদা জাঁকজমক গড়াপেটা জানাশোনা চাষাভুষো দাবিদাওয়া অদলবদল ছেলেপুলে নাতিপুতি।

২২

চলতি বাংলার আর-একটি বিশেষত্ব জানিয়ে দিয়ে এ বই শেষ করি। যাঁরা সাধু ভাষায় গদ্যসাহিত্যকে রূপ দিয়েছিলেন স্বভাবতই তাঁদের হাতে বাক্যবিন্যাসের একটা ধারা বাঁধা হয়েছিল।

তার প্রয়োজন নিয়ে তর্ক নেই। আমার বক্তব্য এই যে, এ বাঁধাবাঁধি বাংলা চলতি ভাষার নয়।

কোথায় গেলেন তোমার দাদা, তোমার দাদা কোথায় গেলেন, গেলেন কোথায় তোমার দাদা, দাদা তোমার গেলেন কোথায়, কোথায় গেলেন দাদা তোমার: প্রথম

পাঁচটি বাক্যে 'গেলেন' ক্রিয়াপদের উপর এবং শেষের বাক্যটিতে 'কোথায়' শব্দের উপর ঝোঁক দিয়ে এই সবকটা প্রয়োগই চলে। আশ্চর্য তোমার সাহস, কিংবা, রেখে দাও তোমার চালাকি, একেবারে ভাসিয়ে দিলে কেঁদে : সাধু ভাষার ছাঁদের চেয়ে এতে আরও বেশি জোর পৌঁছয়। যা থাকে অদৃষ্টে, যা করেন ভগবান, সে প'ড়ে আছে পিছনে : এ আমরা কেবল-যে বলি তা নয়, এইটেই বলি সহজে।

বাংলা ভাষার একটা বিপদ তার ক্রিয়াপদ নিয়ে ; 'ইল' 'তেছে' 'ছিল' -যোগে বিশেষ বিশেষ কালবাচক ক্রিয়ার সমাপ্তি। ক্রিয়াপদের এই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্যে লেখকদের সতর্ক থাকতে হয়। বাংলা বাক্যবিন্যাসে যদি স্বাধীনতা না থাকত তা হলে উপায় থাকত না। এই স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু তাই বলে স্বৈরাচার নেই। 'ভাসিয়ে একেবারে দিলে কেঁদে' কিংবা 'ভাসিয়ে দিলে একেবারে কেঁদে' বলি নে। 'সে প'ড়ে সবার আছে পিছনে' কিংবা 'রেখে চালাকি দাও তোমার' হবার জো নেই। তার কারণ জোড়া ক্রিয়ার জোড় ভাঙা অবৈধ।

চলতি গদ্যের একটা নমুনা দেওয়া যাক। এতে সাধু গদ্যভাষার বাক্যপদ্ধতি অনেকটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে—

> কুঞ্জবাবু চললেন মথুরায়। তাঁর ভাই মুকুন্দ যাবে স্টেশন পর্যন্ত। বৈজু দারোয়ান চলেছে মাঠাকরুনের পাল্কির পাশে পাশে, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, ছিটের মের্জাই গায়ে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ঘর সামলাবার জন্যে রয়ে গেছে ভজু সর্দার। টেমি কুকুরটা ঘুমোচ্ছিল সিমেন্টের বস্তার উপর ল্যাজে মাথা গুঁজে, গোলমাল শুনে ছুটে এল এক লাফে। যত ওরা বারণ করে ততই কেঁই-কেঁই ঘেউ-ঘেউ রবে মিনতি জানায়, ঘন ঘন নাড়ে বোঁচা ল্যাজটা। রেল লাইন থেকে শোনা যাচ্ছে মালগাড়ি আসার শব্দ। ডাকগাড়ি আসতে বাকি আছে বিশ মিনিট মাত্র। বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুকুন্দ ; সে যাবে কলকাতার দিকে, আজ সেখানে মোহনবাগানের ম্যাচ। ঐ বুঝি দেখা গেল সিগ্ন্যাল-ডাউন। এ দিকে নামল ঝমাঝম্ বৃষ্টি, তার সঙ্গে জোর হাওয়া। বেহারাগুলো পাল্কি নামালো অশথতলায়। হঠাৎ একটি ভিখিরি মেয়ে ছুটে এসে বললে, 'দরজা খোলো মা, একবার মুখখানি দেখে নিই।' দরজা খুলে চমকে উঠলেন গিন্নিঠাকরুন, 'ওমা, ও কে গো! আমাদের বিনোদিনী যে! কে করলে ওর এ দশা!' কুকুরটা ওকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, ওর বুকে দুই পা তুলে কাঁই-কাঁই করতে লাগল আনন্দে। বিনোদিনী একবার তার গলা জড়িয়ে ধরল দুই হাতে, তার পরেই ওকে সরিয়ে দিল, জোরে

ঠেলা দিয়ে। গোলেমালে কোথায় মেয়েটি পালালো ঝড়ের আড়ালে, দেখা গেল না। চারি দিকে সন্ধানে ছুটল লোকজন। বড়োবাবু স্বয়ং হাঁকতে থাকলেন 'বিনু বিনু', মিলল না কোনো সাড়া। মুকুন্দ রইল তার সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়িতে, রুমালে মুখ লুকিয়ে একেবারে চুপ। রেলগাড়ি কখন্ গেল বেরিয়ে। বৃষ্টির বিরাম নেই।

২৩

আমাদের দেহের মধ্যে নানাপ্রকার শরীরযন্ত্রে মিলে বিচিত্র কর্মপ্রণালীর যোগে শক্তি পাচ্ছে প্রাণ সমগ্রভাবে। আমরা তাদের বহন করে চলেছি কিছুই চিন্তা না করে। তাদের কোনো জায়গায় বিকার ঘটলে তবেই তার দুঃখবোধে দেহব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ করে চেতনা জেগে ওঠে।

আমাদের ভাষাকেও আমরা তেমনি দিনরাত্রি বহন করে নিয়ে চলেছি। শব্দপুঞ্জে বিশেষ্যে বিশেষণে সর্বনামে বচনে লিঙ্গে সন্ধিপ্রত্যয়ে এই ভাষা অত্যন্ত বিপুল এবং জটিল। অথচ তার কোনো ভার নেই আমাদের মনে, বিশেষ কোনো চিন্তা নেই। তার নিয়মগুলো কোথাও সংগত কোথাও অসংগত, তা নিয়ে পদে পদে বিচার ক'রে চলতে হয় না।

আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতিনিয়ত বর্ণে গন্ধে রূপে রসে বোধের জাল বিস্তার করে চলেছে, আমাদের ভাষাও তেমনি সৃষ্টি করছে কত ছবি, কত রস— তার ছন্দে, তার শব্দে। কত রকমের তার জাদুশক্তি। মানুষ যখন কালের নেপথ্যে অন্তর্ধান করে তখনো তার বাণীর লীলা সজীব হয়ে থাকে ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে। আলোকের রঙ্গশালায় গ্রহতারার নাট্য চলেছে অনাদিকাল থেকে। তা নিয়ে বিজ্ঞানীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। দেশকালে মানুষের ভাষারঙ্গের সীমা তার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ, কিন্তু বাণীলোকের রহস্যের বিস্ময়করতা এই নক্ষত্রলোকের চেয়ে অনেক গভীর ও অভাবনীয়। নক্ষত্রলোকের তেজ বহু লক্ষ তারা চলার পথ পেরিয়ে আজ আমাদের চোখে এসে পৌঁছল; কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক বেশি আশ্চর্য যে, আমাদের ভাষা নীহারিকাচক্রে ঘূর্ণ্যমান সেই নক্ষত্রলোককে স্পর্শ করতে পেরেছে।

—

আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকাশোন্মুখ বইখানিতে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা করে কাজ আরম্ভ করি। তার যে উত্তর দিয়েছিলুম নিয়ে তা উদ্‌ধৃত করে দিই। সেটা পড়লে পাঠকেরা বুঝবেন আমার বইখানি তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নয়, রূপের পরিচয় নিয়ে।—

আমার পক্ষে যা সবচেয়ে দুঃসাধ্য তাই তুমি আমাকে ফরমাশ করেছ। অর্থাৎ মানুষের মূর্তির ব্যাখ্যা করবার ভার যে নিয়েছে তাকে তুমি মানুষের শরীরবিজ্ঞানের উপদেষ্টার মঞ্চে চড়াতে চাও। অহংকারে মানুষকে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্ধ করে— মধুসূদনের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, দর্পহরণ করবার প্রয়োজন ঘটবার পূর্বেই তিনি আমাকে যেন কৃপা করেন। আমার এ গ্রন্থে ব্যাকরণের বন্ধুর পথ একেবারেই এড়াতে পারি নি, প্রতি মুহূর্তে পদস্খলনের আশঙ্কায় কম্পান্বিত আছি। ভয় আছে, পাছে আমার স্পর্ধা দেখে তাত্ত্বিকেরা 'হায় কৃষ্টি' 'হায় কৃষ্টি' ব'লে বক্ষে করাঘাত করতে থাকেন। কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শারীরতত্ত্বের যাথাতথ্যে ভুল করেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, আমার বইখানি যদি সেই সৌভাগ্য লাভ করে তা হলেই ধন্য হব। ১৬।১১।৩৮

—

পথের সঞ্চয়

পথের সঞ্চয়

যাত্রার পূর্বপত্র

মাঠের মাঝখানে এই আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়। এখানে আমরা বড়োয় ছোটোয় একসঙ্গে থাকি, ছাত্র ও শিক্ষকে এক ঘরে শয়ন করি, তেমনি এখানে আরও আমাদের সঙ্গী আছে; আকাশ আলোক এবং বাতাসের সঙ্গেও আমরা কোনো আড়ালের সম্পর্ক রাখি নাই। এখানে ভোরের আলো একেবারে আমাদের চোখের উপর আসিয়া পড়ে, আকাশের তারা একেবারে আমাদের মুখের উপর তাকাইয়া থাকে। ঝড় যখন আসে সে একেবারে দিক্‌প্রান্তে ধুলার উত্তরীয় দুলাইয়া বহু দূর হইতে আমাদের খবর দিতে থাকে। কোনো ঋতু যখন আসন্ন হয় তখন তাহার প্রথম সংবাদটি আমাদের গাছের পত্রে পত্রে প্রকাশিত হয়। বিশ্বপ্রকৃতিকে এক মুহূর্ত আমাদের দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয় না।

আমাদের ইচ্ছা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গেও আমাদের এমনি একটা যোগ থাকে। সর্বমানুষের ইতিহাসে যে-সমস্ত ঋতু আসে-যায়, সূর্যের যে উদয়াস্ত ঘটে, ঝড়-বাদলের যে মাতামাতি চলে, সমস্তকেই যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া এবং বড়ো আকাশের মধ্যে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই, ইহাই আমাদের মনের বাসনা। আমরা লোকালয় হইতে দূরে আছি বলিয়াই আমাদের এই সুযোগ আছে। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ এখানে কোনো একটি ছাঁচের মধ্যে আসিয়া পড়িতে পায় না, আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাকে অবাধে বিশুদ্ধ রূপে গ্রহণ করিতে পারি।

মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধটিকে অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি। কিন্তু, সেই নিমন্ত্রণ তো বিদ্যালয়ের দুই শো ছাত্র মিলিয়া রক্ষা করিতে যাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের হইয়া আমি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। আমার একলার মধ্যেই তোমাদের সকলের ভ্রমণ সারিয়া লইব। যখন আবার তোমাদের আশ্রমে ফিরিয়া আসিব তখন বাহিরের পৃথিবীটাকে আমার জীবনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব।

যখন ফিরিব তখন অবকাশমত অনেক কথা হইবে, এখন বিদায়ের সময় দুই-একটা কথা পরিষ্কার করিয়া যাইতে চাই।

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি য়ুরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতেছ কেন।' এ কথার কী জবাব দিব ভাবিয়া পাই না। ভ্রমণ করাই ভ্রমণ করিতে যাইবার উদ্দেশ্য, এমন একটা সরল উত্তর যদি দিই তবে প্রশ্নকর্তারা নিশ্চয় মনে করিবেন, কথাটাকে নিতান্ত হাল্কারকম করিয়া উড়াইয়া দিলাম। ফলাফল বিচার করিয়া লাভ-লোকসানের হিসাব না ধরিয়া দিতে পারিলে, মানুষকে ঠাণ্ডা করা যায় না।

প্রয়োজন না থাকিলে মানুষ অকস্মাৎ কেন বাহিরে যাইবে, এ প্রশ্নটা আমাদের দেশেই সম্ভব। বাহিরে যাইবার ইচ্ছাটাই যে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এ কথাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কেবলমাত্র ঘর আমাদিগকে এত বাঁধনে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইবার সময় আমাদের এত অযাত্রা, এত অবেলা, এত হাঁচি টিক্‌টিকি, এত অশ্রুপাত যে, বাহির আমাদের পক্ষে অত্যন্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আত্মীয়মণ্ডলী আমাদের দেশে এত নীরন্ধ্র নিবিড় যে, পরের মতো পর আমাদের কাছে আর-কিছুই নাই। এইজন্যই অল্প সময়ের জন্যও বাহির হইতে হইলেও সকলের কাছে আমাদের এত বেশি জবাবদিহি করিতে হয়। বাঁধা থাকিয়া থাকিয়া আমাদের ডানা এমনি বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উড়িবার আনন্দ যে একটা আনন্দ, এ কথাটা আমাদের দেশে বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অল্প বয়সে যখন বিদেশে গিয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে একটা আর্থিক উদ্দেশ্য ছিল, সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের বা বারিস্টার হওয়ার চেষ্টা একটা ভালো কৈফিয়ত— কিন্তু, বাহান্ন বৎসর বয়সে সে কৈফিয়ত খাটে না, এখন কোনো পারমার্থিক উদ্দেশ্যের দোহাই দিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন আছে, এ কথাটা আমাদের দেশের লোকেরা মানিয়া থাকে। সেইজন্য কেহ কেহ কল্পনা করিতেছেন, এ বয়সে আমার যাত্রার উদ্দেশ্য তাহাই। এইজন্য তাঁহারা আশ্চর্য হইতেছেন, সে উদ্দেশ্য য়ুরোপে সাধিত হইবে কী করিয়া। এই ভারতবর্ষের তীর্থে ঘুরিয়া এখানকার সাধু-সাধকদের সঙ্গ লাভ করাই একমাত্র মুক্তির উপায়।

আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি, কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছি, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া যাইব, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। দুইটা চক্ষু পাইয়াছি, সেই দুটা চক্ষু

বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।

তবু এ কথাও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, লাভের প্রতিও আমার লোভ আছে; কেবল সুখ নহে, এই ভ্রমণের সংকল্পের মধ্যে প্রয়োজনসাধনেরও একটা ইচ্ছা গভীরভাবে লুকানো রহিয়াছে।

আমি মনে করি, য়ুরোপের কেহ যদি যথার্থ শ্রদ্ধা লইয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যাইতে পারেন তবে তাঁহারা তীর্থভ্রমণের ফললাভ করেন। তেমন য়ুরোপীয়ের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগকে ভক্তি করি।

সে ভক্তির কারণ ইহা নহে যে, আমাদের ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য তাঁহাদের শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়া আমাদের কাছে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। তাঁহাদেরই হৃদয়ের শক্তি দেখিয়া আমার মন প্রণত হয়। অপরিচয়ের বাধা ভেদ করিয়া সত্যকে স্বীকার ও কল্যাণকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সর্বদা দেখিতে পাই না। পরের দেশে না গেলে সত্যের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা অভ্যস্ত তাহাকেই বড়ো সত্য বলিয়া মানা ও যাহা অনভ্যস্ত তাহাকেই তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া বর্জন করা, ইহাই দীনাত্মার লক্ষণ।

অনভ্যাসের মন্দিরের কপাট ঠেলিয়া যখন আমরা সত্যকে পূজা দিয়া আসিতে পারি, তখন সত্যের প্রতি ভক্তিকে আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের সেই পূজা স্বাধীন; আমাদের সেই ভক্তি প্রথার দ্বারা অন্ধভাবে চালিত নহে।

য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে। ভারতবর্ষে আমি শ্রদ্ধাপরায়ণ যে য়ুরোপীয় তীর্থযাত্রীদিগকে দেখিয়াছি আমাদের দুর্গতি যে তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই তাহা নহে, কিন্তু সেই ধুলায় তাঁহাদিগকে অন্ধ করিতে পারে নাই; জীর্ণ আবরণের আড়ালেও ভারতবর্ষের অন্তরতম সত্যকে তাঁহারা দেখিয়াছেন।

য়ুরোপেও যে সত্যের কোনো আবরণ নাই তাহা নহে। সে আবরণ জীর্ণ নহে, তাহা সমুজ্জ্বল। এইজন্যই সেখানকার অন্তরতম সত্যটিকে দেখিতে পাওয়া হয়তো আরও কঠিন। বীর প্রহরীদের দ্বারা রক্ষিত, মণিমুক্তার ঝালরের দ্বারা খচিত, সেই পর্দাটাকেই সেখানকার সকলের চেয়ে মূল্যবান পদার্থ মনে করিয়া আমরা আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারি— তাহার পিছনে যে দেবতা বসিয়া আছেন তাঁহাকে হয়তো প্রণাম করিয়া আসা ঘটিয়া উঠে না।

সেই পর্দাটাই আছে আর তিনি নাই, এমন একটা অদ্ভুত অশ্রদ্ধা লইয়া যদি সেখানে যাই তবে এই পথ-খরচাটার মতো এতবড়ো অপব্যয় আর কিছুই হইতে পারে না।

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারি দিকে প্রচলিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, এইরূপ জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার আর সত্য হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। পাঁচজনে যাহা বলে ষষ্ঠ ব্যক্তির তাহা উচ্চারণ করিতে বাধে না এবং নানা কণ্ঠের আবৃত্তিই তখন যুক্তির স্থান গ্রহণ করিয়া বসে।

এ কথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার, মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে-কোনো মঙ্গল দেখি-না কেন, তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ, মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। য়ুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে— কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

য়ুরোপে মানুষ মানবাত্মাকে প্রকাশ করিতেছে না, কেবল জড়বস্তুকেই স্তূপাকার করিতেছে, এ কথাও যা আর যদি বলি 'বনস্পতি কেবল শুকনো পাতা ঝরাইয়া মাটি ছাইয়া ফেলে, সে আপনার জীবনকে প্রকাশ করে না'— তবে সেও তেমনি। বস্তুত, বনস্পতির প্রবল প্রাণশক্তিই প্রচুর পল্লব বর্ষণ করে, অবিশ্রাম পরিত্যক্ত মৃত পত্রে তাহার মৃত্যু প্রমাণ করে না। জীবনই প্রতি মুহূর্তে মরিতে পারে— মৃত্যু যখন বন্ধ হইয়া যায় তখনই যথার্থ মৃত্যু।

য়ুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্তনের পথে চলিতেছে— আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চুপ করিয়া থাকিতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে।

বিশ্বজগতেও আমরা কেবলই পরিবর্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি। তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই যে, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত-কিছু উৎপন্ন হইতেছে। অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যু-উৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না।

বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে।

য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব— তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।

যে কথাটা আমি বলিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা সহজে বুঝিবার মতো একটা ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে। দুই হাজার যাত্রী লইয়া আট্লান্টিক সমুদ্রে এক জাহাজ পাড়ি দিতেছিল; সেই জাহাজ অর্ধরাত্রে চলমান হিমশৈলে ঠেকিয়া যখন ডুবিবার উপক্রম করিল তখন অধিকাংশ য়ুরোপীয় ও আমেরিকান যাত্রী নিজের জীবন-রক্ষার প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রকাণ্ড অপমৃত্যুর অভিঘাতে য়ুরোপের বাহিরের আবরণ সরিয়া যাওয়াতে আমরা এক মুহূর্তে তাহার অন্তরতর মানবাত্মার একটি সত্য মূর্তি দেখিতে পাইয়াছি।

যেমনি দেখিয়াছি অমনি তাহার কাছে মাথা প্রণত করিতে আমাদের আর লজ্জা হয় নাই। অমনি আত্মার পরিচয়ে আত্মার আনন্দ উদারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই ঘটনার অনতিকালের মধ্যে আমাদের কয়েকজন বন্ধু ঢাকা হইতে স্টিমারে করিয়া ফিরিতেছিলেন। স্টিমারের আঘাতে পদ্মার মাঝখানে একটা নৌকা ডুবিয়া গেল, তাহার তিনজন আরোহী জলের মধ্যে পড়িল। অনতিদূরে পাশ দিয়া আর-একখানা নৌকা চলিয়া যাইতেছিল— জাহাজের সকল লোকে মিলিয়া চীৎকার করিয়া উদ্ধারের জন্য তাহার মাঝিকে বিস্তর ডাকাডাকি করিল, সে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া চলিয়া গেল; বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না, নিকটেও সে ছিল, কাজটাকে কোনো-মতেই দুঃসাধ্য বলা চলে না।

আমার আর-একদিনের কথা মনে পড়িল। রাত্রে প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে। সকালবেলা বাতাসের বেগ কমিয়া গেছে, কিন্তু নদী চঞ্চল। গোরাই নদীর তীরে আমার বোট বাঁধা; হঠাৎ মনে হইল, নদীর মাঝখান দিয়া স্ত্রীলোকের দেহ ভাসিয়া চলিয়াছে, জলের উপরে চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, আর কিছুই দেখা যায় না। ঘাটের কাছে যাহারা ছিল আমি সকলকেই ডাকিয়া বলিলাম, 'আমার ছোটো লাইফ-বোটটি বাহিয়া উহাকে উদ্ধার করিয়া আনো, কী জানি হয়তো বাঁচিয়া আছে।' কেহই অগ্রসর হইল না। আমি বলিলাম, 'যে-কেহ যাইবে প্রত্যেককে আমি পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব।' তখনি কয়েকজন লোক নৌকা ভাসাইয়া দিয়া তাহাকে তুলিয়া আনিল, এবং মূর্ছিত স্ত্রীলোকটি ক্রমশ চেতনা লাভ করিল। পুরস্কারের আশা না থাকিলে কেহই যাইত না।

আর-একদিন আমি বোটে করিয়া একটা বড়ো বিল দিয়া আসিতেছিলাম। বিলের জল যেখানে নদীতে আসিয়া পড়ে সেখানে মাছ ধরিবার সুবিধা করিবার জন্য জেলেরা বড়ো বড়ো খোঁটা পুঁতিয়া জলের নির্গমনপথকে সংকীর্ণ করিয়া দেয়, তাহাতে জলধারার বেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে; এইরূপ স্থানে অনেক বোঝাই নৌকাকে বিপন্ন হইতে দেখিয়াছি। এই সংকীর্ণ পথ পার হইবার কালে আমার বোট কোনোমতে খোঁটার আঘাত বাঁচাইতে গিয়া ভারি একটি সংকটের জায়গায় আটকাইয়া পড়িল। আট-দশ হাত দূরেই জেলেরা মাছ ধরিতেছিল। আমাদের সাহায্য করিবার জন্য তাহাদিগকে ডাকাডাকি করা গেল, তাহারা তাকাইয়াও দেখিল না। বোটের মাঝি পুরস্কার কবুল করিল। তাহারা ডাক বাড়াইবার প্রত্যাশায় বধিরতার ভাণ করিল। ডাক বাড়িয়া যখন বেশ একটা মোটা অঙ্কে উঠিয়াছে তখন জেলেদের শ্রবণশক্তির বাধা হঠাৎ সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল। অথচ তাহাদেরই কৃতকর্মের ফল আমরা ভোগ করিতে বসিয়াছিলাম; আমাদের দেশের কোনো পাঠককে এ কথা বলা বাহুল্য, যদি হাকিমের বোট হইত তাহা হইলে ইহাদের শ্রুতিশক্তির পরীক্ষায় অন্যরূপ ফল দেখা যাইত।

বোলপুরের বাজারে একটা দোকানে যখন আগুন লাগিয়াছিল তখন তোমাদের মনে আছে, আগুন নিবাইবার কাজে চারজন বিদেশী কাবুলি তোমাদের সাহায্য করিয়াছে; পাড়ার লোককে ডাকিয়া সাড়া পাও নাই। মনে আছে, যাহাদের নিকট কলসী চাহিতে গিয়াছিলে তাহারা, পাছে তাহাদের কলস অপবিত্র হইয়া নষ্ট হয়, এজন্য দিতে চাহিল না।

আমরা আমাদের চারি দিকে এই-যে আত্মত্যাগের কার্পণ্য দেখিতে পাই, দৃষ্টান্ত-বাহুল্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। কেননা, আমরা মুখে যে যাহাই বলি-না কেন, অন্তত মনে মনে আমাদের চরিত্রের এই দৈন্য সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি।

আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই। এটা কি ধর্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে। আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে। আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীর্য দান করে না।

টাইটানিক জাহাজ ডোবার ঘটনায়[১] আমরা এক মুহূর্তে অনেকগুলি মানুষকে মৃত্যুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইয়াছি। ইহাতে কোনো-একজন মাত্র মানুষের অসামান্যতা প্রকাশ হইয়াছে এমন নহে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, যাহারা

১ 'টাইটানিক'-ডুবি: ১৪ এপ্রিল ১৯১২

লক্ষ্মীর ক্রোড়ে লালিত ক্রোড়পতি, যাহারা টাকার জোরে চিরকাল নিজেকে অন্য-সকলের চেয়ে বেশি বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে, ভোগে যাহারা বাধা পায় নাই এবং রোগে বিপদে যাহারা আপনাকে বাঁচাইবার সুযোগ অন্য-সকলের চেয়ে সহজে লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া দুর্বলকে অক্ষমকে বাঁচিবার পথ ছাড়িয়া দিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। এরূপ ক্রোড়পতি এ জাহাজে কেবল এক-আধজন মাত্র ছিল না।

আকস্মিক উৎপাতে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিই সভ্য সমাজের সংযম ছিন্ন করিয়া দেখা দিতে চায়, ভাবিবার সময় হাতে পাইলে মানুষ আত্মসম্বরণ করিতে পারে। টাইটানিক জাহাজে অন্ধকার রাত্রে কেহ বা নিদ্রার মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া, কেহ বা আমোদ প্রমোদের মধ্য হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া, সম্মুখে অপঘাতমৃত্যুর কালো মূর্তি দেখিতে পাইল। তখন যদি ইহাই দেখা যায়, মানুষ পাগলের মতো হইয়া অক্ষমকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে না, তবে বুঝিতে হইবে, এই বীরত্ব আকস্মিক নয়, ব্যক্তিগত নয়; সমস্ত জাতির বহুদিনের তপস্যার সহিত আধ্যাত্মিক শক্তি ভীষণ পরীক্ষায় মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করিল।

এই জাহাজডুবিতে একসঙ্গে নিবিড় করিয়া যে শক্তিকে দেখিয়াছি, য়ুরোপে সেই শক্তিকেই কি নানা দিকে নানা আকারে দেখি নাই। দেশহিতের ও লোকহিতের জন্য সর্বস্বত্যাগ ও প্রাণবিসর্জনের দৃষ্টান্ত কি সেখানে প্রত্যহই হাজার হাজার দেখা যায় না। সেই অজস্রসঞ্চিত পুঞ্জীভূত ত্যাগের দ্বারাই কি য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রবাল-দ্বীপের মতো মাথা তুলিয়া উঠে নাই।

কোনো সমাজে যথার্থ কোনো উন্নতিই হইতে পারে না যাহার ভিত্তি দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এই দুঃখকে তাহারাই বরণ করিতে পারে না যাহারা মেটেরিয়ালিস্ট্, যাহারা জড়বস্তুর দাস। বস্তুতেই যাহাদের চরম আনন্দ, বস্তুকে তাহারা ত্যাগ করিবে কেন। কল্যাণকে তাহারা আপনার প্রাণের চেয়ে কেন বড়ো করিয়া স্বীকার করিবে। শাস্ত্রবিহিত যে পুণ্যকে মানুষ পারলৌকিক বিষয়সম্পত্তির মতোই জানে সেই স্বার্থপর পুণ্যের জন্যও সে দুঃখস্বীকার করিতে পারে— কিন্তু যে পুণ্য শাস্ত্রবিধির সামগ্রী নহে, যাহা তীর্থযাত্রার দুঃখ নহে, যাহা শুভনক্ষত্রযোগের দান নহে, যাহা হৃদয়ের স্বাধীন প্ররোচনা, সেই দুঃখ, সেই মৃত্যুকে কি কখনো কোনো বস্তু-উপাসক গ্রহণ করিতে পারে।

য়ুরোপে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে, সেই দুঃখকে, সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিয়াছি।

ইহার মধ্যে সমস্তটাই খাঁটি নহে, ইহার মধ্যে অনেকটা আছে যাহা বাহাদুরি, কিন্তু সেই অপবাদ দিয়া সত্যকে খর্ব করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। কোনো কোনো রাত্রে চন্দ্রের চারি দিকে একটা জ্যোতির চক্র দেখা যায়। আমরা জানি, তাহা চন্দ্র নহে, তাহা ছায়া, তাহা মিথ্যা। কিন্তু, চন্দ্র মাঝখানে না থাকিলে সেই চন্দ্রের ভাণটুকুও থাকিতে পারে না। সকল সমাজেই যেটি শ্রেষ্ঠ পদার্থ তাহাকে ঘিরিয়া, তাহার আলোক ধার করিয়া লইয়া, একটা ভাণের মণ্ডল সৃজিত হইয়া থাকে। কিন্তু, সেই নকলটা আসলের প্রতিবাদ করে না, তাহারই সমর্থন করে। ভণ্ড সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমাদের দেশের সাধুসন্ন্যাসীকে অবিশ্বাস করিয়া বসিলে ঠকিতে হইবে।

য়ুরোপের যাঁহারা অসামান্য লোক তাঁহাদের কথা আমরা বইয়ে পড়িয়াছি, তাঁহাদিগকে কাছে দেখি নাই। কাছে যে দুই-একজনকে দেখিয়াছি য়ুরোপের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহারা স্থান পান নাই। অনেক দিন হইল একটি সুইডেনের মানুষকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার নাম হ্যামারগ্রেন[১]। তিনি সেই দূরদেশে বসিয়া দৈবক্রমে রামমোহন রায়ের কি একটুকু পরিচয় কোনো একটা বইয়ে পাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে এমন একটি ভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার দারিদ্র্য সত্ত্বেও দেশ ছাড়িয়া তিনি বহু কষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই বাংলাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার ভাষা জানিতেন না, মানুষকে চিনিতেন না, তবু বাঙালির বাড়িতেই আশ্রয় লইয়া এই রামমোহন রায়ের দেশকেই তিনি বরণ করিয়া লইলেন। যে অল্প কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন, কী দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া, কী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে, অথচ কী সম্পূর্ণ নম্রতার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তিনি এই দেশের হিতের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনোই ভুলিতে পারিবেন না। নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল; তদুপলক্ষ্যে, হিন্দুর শ্মশান কলুষিত করা হইল বলিয়া, আমাদের কোনো সাপ্তাহিক পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল।

ভগিনী নিবেদিতা[২] স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তি বহন করিয়া কিরূপ অদ্ভুত আত্মত্যাগের দ্বারা ভারতবর্ষের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য'

২ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাদশ খণ্ডে 'ভগিনী নিবেদিতা'

এই দুই দৃষ্টান্তেই আমরা দেখিয়াছি, এই দুটি ভক্ত এমন স্থানে এমন অবস্থার মধ্যে আত্মদান করিয়াছেন যেখানে তাঁহাদের জীবনের কোনো পূর্বাভ্যস্ত সহজ পথ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না; যেখানে তাঁহাদের হৃদয়মনের আজন্মকালের সংস্কার পদে পদে কঠোর বাধা পাইয়াছে; যেখানে কেবল যে তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহা নহে, পদে পদে আত্মোৎসর্গের পথ তাঁহাদের নিজেকে খনন করিয়া চলিতে হইয়াছে— কেননা, তাঁহাদের প্রবেশ চারি দিকেই অবরুদ্ধ।

সত্যকে ভক্তি করিবার এই ক্ষমতা, এবং সত্যের জন্য দুর্গম বাধা লঙ্ঘন করিয়া দিনের পর দিন আপনাকে অকুণ্ঠিতভাবে নিঃশেষে দান করিবার এই শক্তি, এ যে তাঁহাদের জাতীয় সাধনা হইতেই তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এই আশ্চর্য শক্তি কি বস্তু-উপাসনার সাধনা হইতে কেহ কোনোদিন লাভ করিতে পারে। ইহা কি যথার্থই আধ্যাত্মিক নহে। এবং জিজ্ঞাসা করি, এই শক্তি কি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাই।

কিন্তু, তাই বলিয়া আমাদের দেশে কি আধ্যাত্মিকতা নাই। আমি তাহা বলি না। এখানেও আধ্যাত্মিকতার একটা দিক প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের যাঁহারা সাধক তাঁহারা কেহ বা জ্ঞানে, কেহ বা ভক্তিতে অখণ্ডস্বরূপকে সমস্ত খণ্ড-পদার্থের মধ্যে সহজেই স্বীকার করিতে পারেন। এইখানে জ্ঞানের দিকে এবং ভাবের দিকে, অনেক কালের চিন্তায় এবং সাধনায়, তাঁহাদের বাধা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য আমাদের দেশের যাঁহারা সাধুপুরুষ তাঁহারা চিৎলোকে বা হৃদয়ধামে অনন্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমাদের দেশের মানবপ্রকৃতিতে এই শক্তিটি দেখিবার জন্য যদি কোনো বিদেশী শ্রদ্ধা ও দৃষ্টিশক্তি লইয়া আসেন তবে নিশ্চয়ই তিনি কৃতার্থ হইবেন, এবং সম্ভবত তিনি আপনার প্রকৃতির ভিতরকার একটা অভাব পূরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

আমার বলিবার কথা এই যে, আমাদের মধ্যেও তেমনি পূরণ করিবার মতো একটা অভাব আছে, এবং সেই অভাবই আমাদিগকে দুর্বলতার অবসাদের মধ্যে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে।

এ কথা শুনিলেই আমাদের দেশাভিমানীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকতার নহে, তাহা বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বুদ্ধির— য়ুরোপ তাহারই জোরে পৃথিবীর অন্য-সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না। কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপরে কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বুদ্ধির জোরে

কোনো জাতিই বললাভ করে না। প্রদীপে অজস্র তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জ্বলে না এবং সলিতা পাকাইবার নৈপুণ্যে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেও দীপ জ্বলে না— যেমন করিয়াই হউক, আগুন ধরাইতেই হইবে।

আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহই ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না।

বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনি আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উত্তম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

য়ুরোপের যে শক্তি, তাহার বাহ্যরূপ যাহাই হউক-না কেন, তাহার আন্তর রূপ যে ধর্মবল সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহমাত্র নাই।

এই তাহার ধর্মবল অত্যন্ত সচেতন। তাহা মানুষের কোনো দুঃখ কোনো অভাবকেই উদাসীনভাবে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের সর্বপ্রকার দুর্গতি মোচন করিবার জন্য নিত্যনিয়তই তাহা দুঃসাধ্য চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে। এই চেষ্টার কেন্দ্রস্থলে যে একটি স্বাধীন শুভবুদ্ধি আছে, যে বুদ্ধি মানুষকে স্বার্থত্যাগ করাইতেছে, আরাম হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে এবং অকুণ্ঠিত মৃত্যুর মুখে ডাক দিতেছে, তাহাকে শক্তি জোগাইতেছে কে। কোথায় সেই অমৃত আছে যাহা এই উদার মঙ্গলকামনাকে এমন করিয়া সতেজ রাখিয়াছে।

খৃস্টের জীবনবৃক্ষ হইতে যে ধর্মবীজ য়ুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে, সেটি কী। সেটি দুঃখকে পরম ধন বলিয়া গ্রহণ করা।

স্বর্গের দয়া যে মানুষের প্রেমে মানুষের সমস্ত দুঃখকে আপনার করিয়া লয়, এই কথাটি আজ বহু শত বৎসর ধরিয়া নানা মন্ত্রে অনুষ্ঠানে সংগীতে য়ুরোপ শুনিয়া আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর মর্মস্থানকে

অধিকার করিয়া বসিয়াছে যাহা চেতনারও অন্তরালবর্তী অতিচেতনার দেশ— সেইখানকার গোপন নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে মানুষের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে— সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই মানুষের সমস্ত ঐশ্বর্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সেইজন্য আজ য়ুরোপে সর্বদা এই একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাই, যাহারা মুখে খৃস্টধর্মকে অমান্য করে এবং জড়বাদের জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহারাও সময় উপস্থিত হইলে ধনে প্রাণে আপনাকে এমন করিয়া ত্যাগ করে, নিন্দাকে দুঃখকে এমন বীরের মতো বহন করে যে, তখনি বুঝা যায়, তাহারা নিজের অজ্ঞাতসারেও মৃত্যুর উপরে অমৃতকে স্বীকার করে এবং সুখের উপরে মঙ্গলকেই সত্য বলিয়া মানে।

টাইটানিক জাহাজে যাঁহারা নিজের প্রাণকে নিশ্চিতভাবে অবজ্ঞা করিয়া পরের প্রাণকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই যে নিষ্ঠাবান ও উপাসনারত খৃস্টান তাহা নহে। এমন-কি তাঁহাদের মধ্যে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়িকও কেহ কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র মতান্তরগ্রহণের দ্বারা সমস্ত জাতির ধর্মসাধনা হইতে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবেন কী করিয়া। কোনো জাতির মধ্যে যাঁহারা তাপস তাঁহারা সে জাতির সকলের হইয়া তপস্যা করেন। এইজন্য সেই জাতির পনেরো-আনা মূঢ়ও যদি সেই তাপসদের গায়ে ধুলা দেয় তথাপি তাহারাও তপস্যার ফল হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

ভগবানের প্রেমে মানুষের ছোটো বড়ো সমস্ত দুঃখ নিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্তভাবে দেখিতে পাই না, এ কথা যতই অপ্রিয় হউক, তথাপি ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা, তাহা আমাদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে দুঃখস্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা বীর্যের দ্বারাই সাধ্য, তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা দুঃখপীড়িত মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের দুঃখলীলাকে স্বীকার করি নাই।

দুঃখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই; দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা। কৃপণ ধনসঞ্চয়ের যে দুঃখ ভোগ করে, পারলৌকিক সম্পত্তির লোভে পুণ্যকামী যে দুঃখব্রত গ্রহণ করে, মুক্তিলোলুপ মুক্তির জন্য যে দুঃখসাধন করে এবং ভোগী ভোগের জন্য যে দুঃখকে বরণ করে তাহা কোনোমতেই পরিপূর্ণতার সাধনা নহে। তাহাতে আত্মার অভাবকেই দৈন্যকেই

প্রকাশ করে। প্রেমের জন্য যে দুঃখ তাহাই যথার্থ ত্যাগের ঐশ্বর্য; তাহাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে ও আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের ঊর্ধ্বে মহীয়ান করিয়া তুলে।

এই দুঃখলীলার ক্ষেত্রেই আমরা আপনাকে ছাড়িয়া বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে পারি। সত্যের মূল্যই এই দুঃখ। এই দুঃখসম্পদই মানবাত্মার প্রধান ঐশ্বর্য। এই দুঃখের দ্বারাই তাহার বল প্রকাশ হয় এবং এই দুঃখের দ্বারাই সে আপনাকে এবং অন্যকে লাভ করে। তাই শাস্ত্রে বলে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অর্থাৎ, দুঃখস্বীকার করিবার বল যাহার নাই সে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।

ইহার একটা প্রমাণ এই, আমরা নিজের দেশকে নিজে লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের দেশের লোক কেহ কাহারও আপন হইল না, দেশ যাহাকে চায় সে সাড়া দেয় না। এখানকার জনসংখ্যা বড়ো কম নয়, কিন্তু সেই সংখ্যাবহুলতায় তাহার শক্তি প্রকাশ না করিয়া তাহার দুর্বলতাই ব্যক্ত করে।

তাহার প্রধান কারণ এই, আমরা দুঃখের দ্বারা পরস্পরকে আপন করিতে পারি নাই। আমরা দেশের মানুষকে কোনো মূল্য দিই নাই— মূল্য না দিয়া পাইব কী করিয়া। মা আপন গর্ভের সন্তানকেও অহরহ সেবাদুঃখের মূল্য দিয়া লাভ করেন। যাহাকেই আমরা সত্য বলিয়া মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করি তাহাকেই এই মূল্য আমরা স্বভাবতই দিয়া থাকি, কাহাকেও তাগিদ করিতে হয় না। চারি দিকের মানুষকে আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাই আপনাকে আনন্দের সহিত ত্যাগ করিতেও পারিলাম না।

মানুষকে এইরূপ সত্য বলিয়া দেখা, ইহা আত্মার সত্যদৃষ্টি অর্থাৎ প্রেমের দ্বারাই ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে 'সর্বভূতই এক', সে একটা বাক্যমাত্র; সেই তত্ত্বকথার দ্বারা সর্বভূতকে আত্মবৎ করা যায় না। প্রেম-নামক আত্মার যে চরম শক্তি, যাহার ধৈর্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যাহার স্বাভাবিক আনন্দ, সেই সেবাতৎপর প্রেম নহিলে আর-কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না; এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন, মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

য়ুরোপের ধর্ম য়ুরোপকে সেই দুঃখপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে দুঃখতপস্যার হোমাগ্নি নিবিতেছে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত তাপস আত্মাহুতির যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন।

সেই দুঃসহ যজ্ঞহুতাশন হইতে যে অমৃতের উদ্ভব হইতেছে তাহার দ্বারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজ্য রাষ্ট্রনীতির এমন বিরাট বিস্তার হইতেছে ; ইহা কোনো কারখানাঘরে লোহার যন্ত্রে তৈরি হইতেই পারে না ; ইহা তপস্যার সৃষ্টি, এবং সেই তপস্যার অগ্নিই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি, মানুষের ধর্মবল।

সেইজন্য দেখিতে পাই, বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনি সমাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা য়ুরোপে সম্প্রতি দেখিতেছি। রোগীদের জন্য ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা, এমন-কি পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং জীবের দুঃখ-নিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল ; তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া ধর্মাচার্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় ও বর্বরজাতীয়দের সদ্‌গতির জন্য দলে দলে এবং অকাতরে দুঃখ বহন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্যবান মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা দান করিয়াছিল। সেইজন্যই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল। তখন য়ুরোপের খৃস্টান সভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল। ভারতবর্ষের সেই দুঃখব্রত আত্মত্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জ্বল দীপ্তি কৃত্রিমতা ও ভাবরসাবেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নির্বাপিত হইয়াছে। বাহিরে যদি কোথাও তাহার উদ্‌বোধন দেখিতে পায় তবে আপনাকে কি তাহার আবার আপনি মনে পড়িবে না। আজ যাহা পরের ঘরে বিরাজ করিতেছে তাহাকেই কি তাহার আপনার সামগ্রী বলিয়া চেতনা হইবে না। শক্তির আগুন যেখানে প্রচুর পরিমাণে জ্বলে সেখানে ছাইভস্মও প্রভূত হইয়া উঠে, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। নির্জীবতার উত্তাপ অল্প, তাহার দায় সামান্য, তাহার দুর্গতির মূর্তিও অতি প্রশান্ত। অশান্তির ক্ষোভ এবং পাপের প্রচণ্ডতা য়ুরোপীয় সমাজে যেমন প্রত্যক্ষ হয় এমন আমাদের দেশে নহে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু, তাহাকে তাহারা উদাসীনভাবে মানিয়া লয় নাই। তাহা তাহাদের চিত্তকে অভিভূত করে নাই, বরঞ্চ নিয়তই জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। ম্যালেরিয়ার বাহন মশা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের ভিতরকার পাপ পর্যন্ত সকল অসুরের সঙ্গেই সেখানে হাতাহাতি লড়াই চলিতেছে, অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়া কেহ বসিয়া নাই ; নিজের প্রাণকেও সংকটাপন্ন করিয়া বীরের দল সংগ্রাম করিতেছে। সম্প্রতি London Police Courts -নামক একটি আশ্চর্য বই পড়িতেছিলাম। সেই গ্রন্থে

লণ্ডন-রাজধানীর নীচের অন্ধকার তলায় দারিদ্র্যের মালিন্য ও পাপের পঙ্কিলতা উদ্‌ঘাটিত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই চিত্র যতই নিদারুণ হউক, খৃস্টান তাপসের অদ্ভুত ধৈর্য বীর্য ও করুণাপরায়ণ প্রেম সমস্ত বীভৎসতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। গীতায় একটি আশার বাণী আছে, স্বল্পপরিমাণ ধর্মও মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে। কোনো সমাজে সেই ধর্মকে যতক্ষণ সজীব দেখা যায় ততক্ষণ সেখানকার ভূরিপরিমাণ দুর্গতির অপেক্ষাও তাহাকে বড়ো করিয়া জানিতে হইবে।

য়ুরোপে দুর্বল জাতির প্রতি ন্যায়ধর্মের ব্যভিচার দেখা যাইতেছে না এমন নহে, কিন্তু তাহাই একান্ত হইয়া নাই। সেই সঙ্গেই সেই নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত লুব্ধতার মধ্য হইতেই ধিক্কার ও ভর্ৎসনা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। প্রবলের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং প্রতিকার করিতে চাহেন এমন সাহসিক বীরও সেখানে অনেক আছেন। দূরবর্তী পরজাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া নির্যাতন সহ্য করিতে কুণ্ঠিত নহেন, এমন দৃঢ়নিষ্ঠ সাধুব্যক্তির সেখানে অভাব নাই। ভারতবাসীরা স্বদেশের রাজ্যশাসনে প্রশস্ত অধিকার লাভ করেন, সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত গুটিকয়েক ভারতবর্ষীয় আমাদের দেশে আছেন— কিন্তু দীক্ষা তাঁহারা কাহাদের কাছে পাইয়াছেন এবং যথার্থ সহায় তাঁহাদের কে। যাঁহারা আত্মীয়দের বিদ্রূপ ও প্রতিকূলতা স্বীকার করিয়া স্বজাতির স্বার্থপরতার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করিবার জন্য দেশের লোককে ধর্মের দোহাই দিতেছেন, তাঁহারা কোন্ দেশের মানুষ। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু সত্যদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে, তাঁহারা সংখ্যায় অল্প নহেন। কেননা, তাঁহাদের মধ্যেই তাঁহাদের শেষ নহে। দেশের মধ্যে গোচর এবং অগোচর তাঁহাদের একটি পরম্পরা আছে; তাঁহারা সকলেই এক কাজ করিতেছেন বা এক সময়ে আছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারাই সমাজের ভিতরকার ন্যায়শক্তি। তাঁহারাই ক্ষত্রিয়; পৃথিবীর সমস্ত দুর্বলকে ক্ষয় হইতে ত্রাণ করিবার জন্য তাঁহারা সহজ কবচ ধারণ করিয়াছেন। দুঃখ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য যিনি দুঃখ বহন করিয়াছিলেন, মৃত্যু হইতে মানুষকে অমৃতলোকে লইয়া যাইবার জন্য যিনি মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন, সেই তাঁহাদের স্বর্গীয় গুরুর অপমানিত রক্তাক্ত দুর্গম পথে তাঁহারা সারি সারি চলিয়াছেন। সমস্ত জাতির চিত্তপ্রান্তরের মাঝখান দিয়া তাঁহারাই অমৃতমন্দাকিনীর ধারা।

আমরা সর্বদাই নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া থাকি যে, আমরা ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক জাতি, বাহিরের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই; এইজন্যই বহির্বিষয়েই আমরা দুর্বল হইয়াছি। বাহিরের দৈন্য সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাকে এমনি করিয়া আমরা

খর্ব করিতে চাই। আমাদের অনেকেই মুখে আস্ফালন করিয়া বলিয়া থাকেন, দারিদ্র্যই আমাদের ভূষণ।

ঐশ্বর্যকে অধিকার করিবার শক্তি যাহাদের আছে দারিদ্র্য তাহাদেরই ভূষণ। যে ভূষণের কোনো মূল্য নাই তাহা ভূষণই নহে। এইজন্য ত্যাগের দারিদ্র্যই ভূষণ, অভাবের দারিদ্র্য ভূষণ নহে; শিবের দারিদ্র্যই ভূষণ, অলক্ষ্মীর দারিদ্র্য কদর্য। যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া নিয়ত অবসাদে মলিন, যাহারা কোনোমতে প্রাণ বাঁচাইতে চায় অথচ প্রাণ বাঁচাইবার কঠিন উপায় গ্রহণ করিবার শক্তি নাই বলিয়া যাহারা বারবার ধুলায় লুটাইয়া পড়ে, দরিদ্র বলিয়াই যাহারা সুযোগ পাইলে অন্য দরিদ্রকে শোষণ করে এবং অক্ষম বলিয়াই ক্ষমতা পাইলে যাহারা অন্য অক্ষমকে আঘাত করে, কখনোই দারিদ্র্য তাহাদের ভূষণ নহে।

আমাদের এই-যে দুঃখ দারিদ্র্য অপমান ইহাকে কোনোমতেই আমাদের ধর্মপ্রাণতার পুরস্কার বলিয়া আমরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে পারি নাই; তাহাকে ব্যক্তিগত ভক্তিসাধনার মধ্যে বদ্ধ করিয়াছি, তাহার আহ্বানে সমস্ত মানুষকে একত্র করি নাই; যেখানে সমাজশাসনের অন্ধ উৎপাতের দ্বারা বিধিবিধানের পাথরের জাঁতায় মানুষের বিচারশক্তি ও স্বাধীন মঙ্গলবুদ্ধিকে পিষিয়া সমস্তকে একাকার করিয়াছি সেইখানেই ধর্মবোধের সংকীর্ণতা ও অচেতনতাই আমাদিগকে জড়পিণ্ড করিয়া দাসত্বের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এখনো মনে করিতেছি, আইনের দ্বারা আমাদের দুর্গতির প্রতিকার হইবে, রাষ্ট্রশাসনসভায় আসন লাভ করিলে আমরা মানুষ হইয়া উঠিব— কিন্তু জাতীয় সদ্‌গতি কলের সামগ্রী নহে, এবং মানুষের আত্মা যতক্ষণ আপনার ভিতর হইতে তাহার পুরা মূল্য চুকাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে না পারিবে ততক্ষণ, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

তাই বলিতেছিলাম, তীর্থযাত্রার মানস করিয়াই যদি য়ুরোপে যাইতে হয় তবে তাহা নিষ্ফল হইবে না। সেখানেও আমাদের গুরু আছেন; সে গুরু সেখানকার মানবসমাজের অন্তরতম দিব্যশক্তি। সর্বত্রই গুরুকে শ্রদ্ধার গুণে সন্ধান করিয়া লইতে হয়; চোখ মেলিলেই তাঁহাকে দেখা যায় না। সেখানেও সমাজের যিনি প্রাণপুরুষ, অন্ধতা ও অহংকার -বশত তাঁহাকে না দেখিয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব নহে; এবং এমন একটা অদ্ভুত ধারণা লইয়া আসাও আশ্চর্য নহে যে— ইংলণ্ডের প্রতাপ পার্লামেণ্টের দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে— য়ুরোপের ঐশ্বর্য কারখানাঘরে প্রস্তুত হইতেছে এবং পাশ্চাত্য মহাদেশের সমস্ত মাহাত্ম্য যুদ্ধের অস্ত্র, বাণিজ্যের জাহাজ এবং বাহ্যবস্তুপুঞ্জের দ্বারা সংঘটিত। নিজের মধ্যে শক্তির সত্য অনুভূতি যাহার নাই অতি সহজেই সে মনে

করিয়া বসে, শক্তি বাহিরেই আছে এবং যদি কোনো সুযোগে আমরাও কেবলমাত্র ঐ জিনিসগুলা দখল করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের অভাবপূরণ হয়। কিন্তু, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্— এ কথাটি য়ুরোপেরও অন্তরের কথা। য়ুরোপও নিশ্চয়ই জানে, রেলে টেলিগ্রাফে কলে কারখানায় সে বড়ো নহে। এইজন্যই য়ুরোপ বীরের ন্যায় সত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে; বীরের ন্যায় সত্যের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে; এবং যতই ভুল করিতেছে, যতই ব্যর্থ হইতেছে, ততই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নূতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছে— কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না। মাঝে মাঝে অমঙ্গল দেখা দিতেছে, সংঘাতে সংঘর্ষে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে, সমুদ্রমন্থনে মাঝে মাঝে বিষও উদ্গীর্ণ হইতেছে, কিন্তু মন্দকে তাহারা কোনোমতেই মানিয়া লইতেছে না। অস্ত্র তাহাদের প্রস্তুত, সৈন্যদল তাহাদের নির্ভীক, এবং সত্যের দীক্ষায় তাহারা মৃত্যুঞ্জয়ী বল লাভ করিয়াছে। সত্যের সম্মুখীন হইতে আমরা আলস্য করিয়াছি, সত্যের সাধনায় আমরা উদাসীন, আমরা ঘরগড়া বাঁধা-বাঁধনের মধ্যে আপাদমস্তক আপনাকে জড়াইয়া তাহাকেই সত্য আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছি। সেইজন্য বিপদের দিন যখন আসন্ন হয়, সত্য পন্থা ব্যতীত যখন আমাদের আর গতি নাই, তখন আমরা কিছুতেই আপনাকে জাগ্রত করিতে পারি না, আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। তখনো খেলা করাকেই কাজ করা মনে করি, নকল করিয়াই আসলের ফল প্রত্যাশা করি, কৃত্রিম উৎসাহকে উদ্দীপ্ত রাখিতে পারি না, আরব্ধ কর্মকে শেষ করিতে পারি না এবং ভূরিপরিমাণ তাত্ত্বিকতা ও ভাবুকতার জালে জড়িত হইয়া বারম্বার ব্যর্থ হইতে থাকি। সেইজন্য সত্যের দায়িত্বকে বীরের ন্যায় সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিবার দীক্ষা, সেই সত্যের প্রতি অবিচলিত প্রাণান্তিক নিষ্ঠা, জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদকে প্রাণপণ দুঃখের মূল্য দিয়া অর্জন করিবার সাধনা, এবং বুদ্ধি হৃদয় ও কর্মে সকল দিক দিয়া মানুষের কল্যাণসাধন ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা ভগবানের দুঃসাধ্য সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য তীর্থযাত্রীর পক্ষে য়ুরোপে যাত্রা কখনোই নিষ্ফল হইতে পারে না। অবশ্য, যদি তাহার মনে শ্রদ্ধা থাকে এবং সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতাকেই যদি সে আধ্যাত্মিক সাফল্যের সত্য পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করে।

আমি জানি, য়ুরোপের সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে এবং সেই সংঘাতে আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে অনেক স্থলে গভীর বেদনা পাইতে হইতেছে। সে বেদনা আমাদের আধ্যাত্মিক দৈন্যেরই দুঃখ এবং আমাদের সঞ্চিত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইলেও তাহা বেদনা। আমাদের পক্ষে এই বেদনার উপলক্ষ্য যাহারা তাহাদের ক্ষুদ্রতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় আমরা নানা আকারে পাইয়া থাকি।

ইহাও আমরা প্রতিদিন দেখিয়াছি, তাহারা নিজের নীচতাকে উদ্ধত কপটতার দ্বারা গোপন করিয়াছে ও পরজাতীয়ের মাহাত্ম্যকে অন্ধতা ও অহংকারের দ্বারা অস্বীকার করিয়াছে। এই কারণেই আমাদের সেই ক্ষতবেদনা লইয়া য়ুরোপের সত্যকে দেখিতে ও তাহাকে গ্রহণ করিতে আমরা অন্তরের মধ্যে বাধা পাইয়া থাকি। তাহাদের ধর্মকেও আমরা অবিশ্বাস করি ও তাহাদের সভ্যতাকে আমরা বস্তুজালজড়িত স্থূল-পদার্থ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। শুধু তাহাই নহে, আমাদের ভয় আছে, পাছে প্রবলের প্রবলতাকেই আমরা সত্যের আসন দিয়া তাহার পূজা করি ও তাহার কাছে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে অপবিত্র করি; পাছে অন্যের গৌরবকে নিজের গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতে না পারি; পাছে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদে নিজের সত্যকে বিসর্জন দিয়া অনুকরণের শূন্যতার মধ্যে পরের কায়ার ছায়া ও পরের ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইয়া জগৎ-সংসারে নিজেকে একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিই; পাছে এইরূপ একটা অদ্ভুত ভ্রম করিয়া বসি যে, অন্যকে স্বীকার করিতে গিয়া নিজেকে অস্বীকার করিয়া বসাই যথার্থ ঔদার্যের পন্থা।

এই-সমস্ত বিঘ্নবিপদ আছে; সেইজন্যই এই পথে সত্যসন্ধানের যাত্রা তীর্থযাত্রা। সমস্ত অসত্যকে উত্তীর্ণ হইয়াই চলিতে হইবে; বাধার দুঃখকে সহ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে; আত্ম-অভিমানের ব্যর্থ বোঝাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হইবে, অথচ আত্মগৌরবের পাথেয়কে একান্ত যত্নে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। বস্তুত, অত্যন্ত বিঘ্নের দ্বারাই আমরা এই তীর্থযাত্রার পূর্ণ ফললাভের আশা করিতে পারি; কারণ যাহা সহজে পাই তাহা সচেতন হইয়া গ্রহণ করি না; অথচ কোনো মহৎ লাভের যথার্থ সফলতাই চেতনার পূর্ণতর বিকাশ, অর্থাৎ, আমরা যাহা-কিছু সত্যভাবে লাভ করি তাহার দ্বারা আপনাকেই সত্যতররূপে উপলব্ধি করি— তাহা যদি না করি, যদি বাহিরের বস্তুকেই বাহিরে পাই, তবে তাহা মায়া, তাহা মিথ্যা।

বোম্বাই শহর

বোম্বাই শহরটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া আসিবার জন্য কাল বিকালে বাহির হইয়াছিলাম। প্রথম ছবিটা দেখিয়াই মনে হইল, বোম্বাই শহরের একটা বিশেষ চেহারা আছে; কলিকাতার যেন কোনো চেহারা নাই, সে যেন যেমন-তেমন করিয়া জোড়াতাড়া দিয়া তৈরি হইয়াছে।

আসল কথা, সমুদ্র বোম্বাই শহরকে আকার দিয়াছে, নিজের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেলাভূমি দিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। সমুদ্রের আকর্ষণ বোম্বাইয়ের সমস্ত রাস্তা-গলির ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন সমুদ্রটা একটা প্রকাণ্ড হৃৎপিণ্ড, প্রাণধারাকে বোম্বাইয়ের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া টানিয়া লইতেছে এবং ভরিয়া দিতেছে। সমুদ্র চিরদিন এই শহরটিকে বৃহৎ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কলিকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল গঙ্গা। এই গঙ্গার ধারাই সুদূরের বার্তাকে সুদূর রহস্যের অভিমুখে বহিয়া লইয়া যাইবার খোলা পথ ছিল। শহরের এই একটি জানালা ছিল যেখানে মুখ বাড়াইলে বোঝা যাইত, জগৎটা এই লোকালয়ের মধ্যেই বদ্ধ নহে। কিন্তু, গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমা আর রহিল না, তাহাকে দুই তীরে এমনি আঁটাসাঁটা পোশাক পরাইয়াছে, এবং তাহার কোমরবন্ধ এমন কষিয়া বাঁধিয়াছে যে, গঙ্গাও লোকালয়েরই পেয়াদার মূর্তি ধরিয়াছে, গাধাবোট বোঝাই করিয়া পাটের বস্তা চালান করা ছাড়া তাহার যে আর-কোনো বড়ো কাজ ছিল তাহা আর বুঝিবার জো নাই। জাহাজের মাস্তুলের কণ্টকারণ্যে মকরবাহিনীর মকরের শুঁড় কোথায় লজ্জায় লুকাইল।

সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করিয়া দেয় কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না। পাটের কারবার তাহার বিশাল বক্ষের নীলকান্ত মণিটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। তাই এই শহরের ধারে সমুদ্রের মূর্তিটি অক্লান্ত; যেমন এক দিকে সে মানুষের কাজকে পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতেছে তেমনি আর-এক দিকে সে মানুষের শ্রান্তি হরণ করিতেছে, ঘোরতর কর্মের সম্মুখেই বিরাট একটি অবকাশকে মেলিয়া রাখিয়াছে।

তাই আমার ভারি ভালো লাগিল যখন দেখিলাম, শত শত নরনারী সাজসজ্জা করিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়াছে। অপরাহ্নের অবসরের সময় সমুদ্রের ডাক কেহ অমান্য করিতে পারে নাই। সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের কাজ, এবং সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের আনন্দ। আমাদের কলিকাতায় শহরে এক ইডেন-গার্ডেন আছে, কিন্তু সে কৃপণের ঘরের মেয়ে, তাহার কণ্ঠে আহ্বান নাই। সেই রাজপুরুষের তৈরি বাগান— সেখানে কত শাসন, কত নিষেধ। কিন্তু, সমুদ্র তো কাহারও তৈরি নহে, ইহাকে তো বেড়িয়া রাখিবার জো নাই। এইজন্য সমুদ্রের ধারে বোম্বাই শহরের এমন নিত্যোৎসব। কলিকাতায় কোথাও তো সেই অসংকোচ আনন্দের একটুকু স্থান নাই।

সবচেয়ে যাহা দেখিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যায় তাহা এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবর্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া দেখি, এইজন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সেই না-দেখার একটা দণ্ড আছে।

নিশ্চয়ই তাহা মানুষের মনকে সংকীর্ণ করিতেছে, তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। অপরাহ্ণে স্ত্রীপুরুষ ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হইয়াছে, সত্যের এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মতো ভাগ্যহীনতা মানুষের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। যে দুঃখ আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদিগকে অচেতন করিয়া রাখে, কিন্তু তাহার ক্ষতি প্রত্যহই জমা হইতে থাকে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি, কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ। বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইবে না।

আমাদের গাড়ি ম্যাথেরান পাহাড়ের উপরে একটা বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোটো বাগানটিকে বেষ্টন করিয়া চারি দিকে বেঞ্চ পাতা। সেখানেও দেখি কুলস্ত্রীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কেবল পার্সি রমণী নহে, কপালে-সিঁদুরের-ফোঁটা-পরা মারাঠি মেয়েরাও বসিয়া আছেন— মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসন্নতা। নিজের অস্তিত্বটা যে একটা বিষম বিপদ, সেটাকে চারি দিকের দৃষ্টি হইতে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায়, এ ভাবনা লেশমাত্র তাঁহাদের মনে নাই। মনে মনে ভাবিলাম, সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কত বড়ো একটা সংকোচের বোঝা নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কত দিকে সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে মানুষ নিজেই নিজের পক্ষে কিরূপ একটা অস্বাভাবিক বিঘ্ন হইয়া উঠে, তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্বদা সসংকোচ অসহায়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। রেলোয়ে স্টেশনে আমাদের মেয়েদের দেখিলে, তাহাদের প্রতি সমস্ত দেশের বহুকালের নিষ্ঠুরতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। ম্যাথেরানের এই বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের বীডন-পার্ক্ ও গোলদিঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম— তাহার সে কী লক্ষ্মীছাড়া কৃপণতা।

প্রজাপতির দল যখন ফুলের বনে মধু খুঁজিয়া ফেরে তখন তাহারা যে বাবুয়ানা করিয়া বেড়ায় তাহা নহে, বস্তুত তখন তাহারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা

আপিসে যাইবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতায় বেশভূষায় যখন নানা রঙের সমাবেশ দেখি তখন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজকর্মের ব্যস্ততাকে গায়ে পড়িয়া শ্রীহীন করিয়া তুলিবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে আমার তো তাহা মনে হয় না। ইহাদের পাগড়িতে, পাড়ে, মেয়েদের শাড়িতে, যে বর্ণচ্ছটা দেখিতে পাই তাহাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে জাগ্রত করে। বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে কিন্তু তাহার মাথায় পাগড়ি এবং গায়ে একটা মেরজাই পরা। মেয়েদের তো কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামান্য বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না; পরিচ্ছন্নতা দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এটুকু মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য; এইটুকু আবরণ, এইটুকু সজ্জা প্রত্যেকের না থাকিলে মানুষের রিক্ততা অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া দেখা দেয়। আপনার সমাজকে কদৃশ্য দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে তবে কত বড়ো একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে, তাহা অভ্যাসের অসাড়তা-বশতই আমরা বুঝিতে পারি না।

আর-একটা জিনিস বোম্বাই শহরে অত্যন্ত বড়ো করিয়া চোখে পড়িল। সে এখানকার দেশী লোকের ধনশালিতা। কত পার্সি মুসলমান ও গুজরাটি বণিকদের নাম এখানকার বড়ো বড়ো বাড়ির গায়ে খোদা দেখিলাম। এত নাম কলিকাতায় কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারিতে; এইজন্য তাহা বড়ো ম্লান। জমিদারির সম্পদ বদ্ধ জলের মতো; তাহা কেবলই ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হইতে থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির প্রকাশ দেখি না; তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই। এইজন্য আমাদের দেশে যেটুকু ধনসঞ্চয় আছে তাহার মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীরুতা দেখি। মাড়োয়ারি পার্সি গুজরাটি পাঞ্জাবিদের মধ্যে দানে মুক্তহস্ততা দেখিতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে। আমাদের দেশের চাঁদার খাতা আমাদের দেশের গোরুর মতো— তাহার চরিবার স্থান নাই বলিলেই হয়। ধন জিনিসটাকে আমাদের দেশ সচেতনভাবে অনুভব করিতেই পারিল না, এইজন্য আমাদের দেশের কৃপণতাও কুশ্রী, বিলাসও বীভৎস। এখানকার ধনীদের জীবনযাত্রা সরল অথচ ধনের মূর্তি উদার, ইহা দেখিয়া আনন্দবোধ হয়।

জলস্থল

আমরা ডাঙার মানুষ, কিন্তু আমাদের চারি দিকে সমুদ্র। জল এবং স্থল এই দুই বিরোধী শক্তির মাঝখানে মানুষ। কিন্তু, মানুষের প্রাণের মধ্যে এ কী সাহস। যে জলের কূল দেখিতে পাই না মানুষ তাহাকেও বাধা বলিয়া মানিল না, তাহার মধ্যে ভাসিয়া পড়িল।

যে জল মানুষের বন্ধু সেই জল ডাঙার মাঝখান দিয়াই বহে। সেই নদীগুলি ডাঙার ভগিনীদের মতো। তাহারা কত দূরের পাথর-বাঁধা ঘাট হইতে কাঁখে করিয়া জল লইয়া আসে; তাহারাই আমাদের তৃষ্ণা দূর করে, আমাদের অন্নের আয়োজন করিয়া দেয়। কিন্তু, আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের এ কী বিষম বিরোধ। তাহার অগাধ জলরাশি সাহারার মরুভূমির মতোই পিপাসায় পরিপূর্ণ। আশ্চর্য, তবু সে মানুষকে নিরস্ত করিতে পারিল না। সে যমরাজের নীল মহিষটার মতো কেবলই শিঙ তুলিয়া মাথা ঝাঁকাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই মানুষকে পিছু হঠাইতে পারিল না।

পৃথিবীর এই দুইটা ভাগ— একটা আশ্রয়, একটা অনাশ্রয়; একটা স্থির, একটা চঞ্চল; একটা শান্ত, একটা ভীষণ। পৃথিবীর যে সন্তান সাহস করিয়া এই উভয়কেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছে সেই তো পৃথিবীর পূর্ণ সম্পদ লাভ করিয়াছে। বিঘ্নের কাছে যে মাথা হেঁট করিয়াছে, ভয়ের কাছে যে পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, লক্ষ্মীকে সে পাইল না। এইজন্য আমাদের পুরাণকথায় আছে, চঞ্চলা লক্ষ্মী চঞ্চল সমুদ্র হইতে উঠিয়াছেন, তিনি আমাদের স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বীরকে তিনি আশ্রয় করিবেন, লক্ষ্মীর এই পণ। এইজন্যই মানুষের সামনে তিনি প্রকাণ্ড এই ভয়ের তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন। পার হইতে পারিলে তবে তিনি ধরা দিবেন। যাহারা কূলে বসিয়া কলশব্দে ঘুমাইয়া পড়িল, হাল ধরিল না, পাল মেলিল না, পাড়ি দিল না, তাহারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হইল।

আমাদের জাহাজ যখন নীল সমুদ্রের ক্রুদ্ধ হৃদয়কে ফেনিল করিয়া, সগর্বে পশ্চিম-দিগন্তের কূলহীনতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন এই কথাটাই আমি ভাবিতে লাগিলাম। স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, য়ুরোপীয় জাতিরা সমুদ্রকে যেদিন বরণ করিল সেইদিনই লক্ষ্মীকে বরণ করিয়াছে। আর, যাহারা মাটি কামড়াইয়া পড়িল তাহারা আর অগ্রসর হইল না, এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া গেল।

মাটি যে বাঁধিয়া রাখে। সে অতি স্নেহশীলা মাতার মতো সন্তানকে কোনোমতে দূরে যাইতে দেয় না। শাক-ভাত তরি-তরকারি দিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ায়, তাহার

পরে ঘনছায়াতলে শ্যামল অঞ্চলের উপর ঘুম পাড়াইয়া দেয়। ছেলে যদি একটু ঘরের বাহির হইতে চায় তবে তাহাকে অবেলা অযাত্রা প্রভৃতি জুজুর ভয় দেখাইয়া শান্ত করিয়া রাখে।

কিন্তু, মানুষের যে দূরে যাওয়া চাই। মানুষের মন এত বড়ো যে, কেবল কাছটুকুর মধ্যে তাহার চলাফেরা বাধা পায়। জোর করিয়া সেইটুকুর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গেলেই, তাহার অনেকখানি বাদ পড়ে। মানুষের মধ্যে যাহারা দূরে যাইতে পাইয়াছে তাহারাই আপনাকে পূর্ণ করিতে পারিয়াছে। সমুদ্রই মানুষের সম্মুখবর্তী সেই অতিদূরের পথ; দুর্লভের দিকে, দুঃসাধ্যের দিকে সেই তো কেবলই হাত তুলিয়া তুলিয়া ডাক দিতেছে। সেই ডাক শুনিয়া যাহাদের মন উতলা হইল, যাহারা বাহির হইয়া পড়িল, তাহারাই পৃথিবীতে জিতিল। ঐ নীলাম্বুরাশির মধ্যে কৃষ্ণের বাঁশি বাজিতেছে, কূল ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য ডাক।

পৃথিবীর একটা দিকে সমাপ্তির চেহারা, আর-একটা দিকে অসমাপ্তির। ডাঙা তৈরি হইয়া গিয়াছে; এখনো তাহার মধ্যে যেটুকু ভাঙাগড়া চলিতেছে তাহার গতি মৃদুমন্দ, চোখে পড়েই না। সেটুকু ভাঙাগড়ারও প্রধান কারিগর জল। আর, সমুদ্রের গর্ভে এখনো সৃষ্টির কাজ শেষ হয় নাই। সমুদ্রের মজুরি করে যে-সকল নদনদী তাহারা দূর দূরান্তর হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি কাদা বালি মাথায় করিয়া আনিতেছে। আর, কত লক্ষ লক্ষ শামুক ঝিনুক প্রবালকীট এই রাজমিস্ত্রির সৃষ্টির উপকরণ অহোরাত্র জোগাইয়া দিতেছে। ডাঙার দিকে দাঁড়ি পড়িয়াছে, অন্তত সেমিকোলন; কিন্তু সমুদ্রের দিকে সমাপ্তির চিহ্ন নাই। দিগন্তব্যাপী অনিশ্চয়তার চিরচঞ্চল রহস্যান্ধকারের মধ্যে কী যে ঘটিতেছে, তাহার ঠিকানা কে জানে। অশান্ত এবং অশ্রান্ত এই সমুদ্র; অনন্ত তাহার উদ্যম।

পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি এই সমুদ্রকে বিশেষভাবে বরণ করিয়াছে তাহারা সমুদ্রের এই কূলহীন প্রয়াসকে আপন চরিত্রের মধ্যে পাইয়াছে। তাহারাই এমন কথা বলিয়া থাকে, কোনো-একটা চরম পরিণাম মানবজীবনের লক্ষ্য নহে; কেবল অবিশ্রাম-ধাবমান গতির মধ্যেই আপনাকে প্রসারিত করিয়া চলাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাহারা অনিশ্চিতের মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কেবলই নব নব সম্পদকে আহরণ করিয়া আনিতেছে। তাহারা কোনো-একটা কোণে বাসা বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। দূর তাহাদিগকে ডাকে; দুর্লভ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। অসন্তোষের ঢেউ দিবারাত্রি হাজার হাজার হাতুড়ি পিটাইয়া তাহাদের চিত্তের মধ্যে কেবলই ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত আছে। রাত্রি আসিয়া যখন সমস্ত জগতের চোখে পলক টানিয়া দেয় তখনো তাহাদের

কারখানাঘরের দীপচক্ষু নিমেষ ফেলিতে জানে না। ইহারা সমাপ্তিকে স্বীকার করিবে না; বিশ্রামের সঙ্গেই ইহাদের হাতাহাতি লড়াই।

আর, ডাঙায় যাহারা বাসা বাঁধিয়াছে তাহারা কেবলই বলে, 'আর নহে, আর দরকার নাই।' তাহারা যে কেবল ক্ষুধার খাদ্যটাকে সংকীর্ণ করিতে চাহে তাহা নহে, তাহারা ক্ষুধাটাকে সুদ্ধ মারিয়া নিকাশ করিয়া দিতে চায়। তাহারা যেটুকু পাইয়াছে তাহাকেই কোনোমতে স্থায়ী করিবার উদ্দেশে কেবলই চারি দিকে সুনিশ্চিতের সনাতন বেড়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। তাহারা মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছে, 'আর যাই কর, কোনোমতে সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করিয়ো না। কেননা সমুদ্রের হাওয়া যদি লাগে, অনিশ্চিতের স্বাদ যদি পাও, তবে মানুষের মনের মধ্যে অসন্তোষের যে একটা নেশা আছে তাহাকে আর কে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে।' সেই অপরিচিত নূতনের রাগিণী লইয়া কালো সমুদ্রের বাঁশির ডাক কোনো-একটা উতলা হাওয়ায় যাহাতে ঘরের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিতে না পারে, সেইজন্য কৃত্রিম প্রাচীরগুলাকে যত সমুচ্চ করা সম্ভব সেই চেষ্টাই কেবল চলিতেছে।

কিন্তু, এই সমুদ্র ও ডাঙার স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া, তাহার বিরোধ ঘুচাইবার দিন আসিয়াছে বলিয়া মনে করি। এই দুয়ে মিলিয়াই মানুষের পৃথিবী। এই দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদকে জাগাইয়া রাখিলেই, মানুষের যত-কিছু বিপদ। তবে এতদিন এই বিচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে কেন। সে কেবল ইহারা হরগৌরীর মতো তপস্যার দ্বারা পরস্পরকে পাইবে বলিয়াই। ঐ-যে এক দিকে স্থাণু দিগম্বরবেশে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন, আর-এক দিকে গৌরী নব নব বসন্তপুষ্পে আপনাকে সাজাইয়া তুলিতেছেন— স্বর্গের দেবতারা ইহাদেরই শুভযোগের অপেক্ষা করিয়া আছেন, নহিলে কোনো মঙ্গল-পরিণাম জন্মলাভ করিবে না।

আমরা ডাঙার লোকেরা ভগবানের সমাপ্তির দিককেই সত্য বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি তাহাতে ক্ষতি হইত না; কিন্তু আমরা তাঁহার ব্যাপ্তির দিকটাকে একেবারেই মিথ্যা বলিয়া, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছি। সত্যকে এক অংশে মিথ্যা বলিলেই তাহাকে অপরাংশেও মিথ্যা করিয়া তোলা হয়। আমরা স্থিতিকে আনন্দকে মানিলাম, কিন্তু শক্তিকে দুঃখকে মানিলাম না। তাই আমরা রানীকে অপমান করাতে রাজার স্তব করিয়াও রক্ষা পাইলাম না; সত্য আমাদিগকে শত শত বৎসর ধরিয়া নানা আঘাতেই মারিতেছেন।

সমুদ্রের লোকেরা ভগবানের ব্যাপ্তির দিকটাকেই একেবারে একান্ত সত্য করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা সমাপ্তিকে কোনোমতেই মানিবে না, এই তাহাদের

পণ। এইজন্য বাহিরের দিকে তাহারা যেমন কেবলই আহরণ করিতেছে অথচ সন্তোষ নাই বলিয়া কিছুকেই লাভ করিতেছে না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের দিকেও তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, সত্যের মধ্যে গম্যস্থান বলিয়া কোনো পদার্থই নাই, আছে কেবল গমন। কেবলই হইয়া উঠা, কিন্তু কী যে হইয়া উঠা তাহার কোনো ঠিকানা কোনো-খানেই নাই। ইহা এমন একটি সমুদ্রের মতো যাহার কূলও নাই, তলও নাই, আছে কেবল ঢেউ— যাহা পিপাসাও মেটায় না, ফসলও ফলায় না, কেবলই দোলা দেয়।

আমরা দেখিলাম আনন্দকে, আর দুঃখকে বলিলাম মিথ্যা মায়া; উহারা দেখিল দুঃখকে, আর আনন্দকে বলিল মিথ্যা মায়া। কিন্তু, পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে তো কোনোটাই বাদ পড়িতে পারে না; পূর্ব পশ্চিম সেখানে না মিলিলে পূর্বও মিথ্যা হয় পশ্চিমও মিথ্যা হয়। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে— অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই সমস্ত-কিছু জন্মিতেছে— এ কথা যেমন সত্য, 'স তপোঽতপ্যত' অর্থাৎ তপস্যা হইতে, দুঃখ হইতেই সমস্ত-কিছু সৃষ্ট হইতেছে, এ কথা তেমনি সত্য। গায়কের চিত্তে দেশকালের অতীত গানের পূর্ণ আনন্দও যেমন সত্য আবার দেশকালের ভিতর দিয়া গান গাহিয়া প্রকাশ করিবার বেদনাও তেমনি সত্য। এই আনন্দ এবং দুঃখ, এই সমাপ্তি ও ব্যাপ্তি, এই চিরপুরাতন এবং চিরনূতন, এই ধনধান্যপূর্ণ ভূমি ও দুঃখাশ্রুচঞ্চল সমুদ্র, উভয়কে মিলিত করিয়া স্বীকার করাই সত্যকে স্বীকার করা।

এইজন্য দেখিতেছি, যাহারা চরমকে না মানিয়া কেবল বিকাশকেই মানিতেছে তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া অপঘাতমৃত্যুর অভিমুখে ছুটিতেছে, পদে পদেই তাহাদের জাহাজ কেবল আকস্মিক বিপ্লবের চোরা পাহাড়ের উপর গিয়া ঠেকিতেছে। আর যাহারা বিকাশকে মিথ্যা বলিয়া কেবলমাত্র চরমকেই মানিতে চায়, তাহারা নির্বীর্য ও জীর্ণ হইয়া এক শয্যায় পড়িয়া অভিভূত হইয়া মরিতেছে।

কিন্তু, চলিতে চলিতে একদিন ঐ ডাঙার গাড়ি এবং সমুদ্রের জাহাজ যখন একই বন্দরে আসিয়া পৌঁছিবে এবং দুই পক্ষের মধ্যে পণ্যবিনিময় হইবে তখনি উভয়ে বাঁচিয়া যাইবে। নহিলে কেবলমাত্র আপনার পণ্য দিয়া কেহ আপনার দারিদ্র্য ঘুচাইতে পারে না; বিনিময় না করিতে পারিলে বাণিজ্য চলে না এবং বাণিজ্য না চলিলে লক্ষ্মীর দেখা পাওয়া যায় না।

এই বাণিজ্যের যোগেই মানুষ পরস্পর মিলিবে বলিয়াই, পৃথিবীতে ঐশ্বর্য দিকে দিকে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একদা জীবরাজ্যে স্ত্রীপুরুষের বিভাগ ঘটাতেই যেমন দেখিতে দেখিতে বিচিত্র সুখদুঃখের আকর্ষণের ভিতর দিয়া প্রাণীদের প্রাণসম্পদ আজ আশ্চর্যরূপে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তেমনি মানুষের প্রকৃতিও কেহ বা স্থিতিকে কেহ

বা গতিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করাতেই আজ আমরা এমন একটি মিলনকে আশা করিতেছি, মানুষের সত্যতাকে যাহা বিচিত্রভাবে সার্থক করিয়া তুলিবে।

আরব্য-সমুদ্র
১৬ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩১৯

সমুদ্রপাড়ি

বন্দর পার হইয়া জাহাজে গিয়া উঠিলাম। আরও অনেকবার জাহাজে চড়িয়াছি। প্রত্যেক বারেই প্রথমটা কেমন মনের মধ্যে একটা সংকোচ উপস্থিত হয়। সে সংকোচ অপরিচিত স্থানে অপরিচিত মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিবার সংকোচ নহে। জাহাজটার সঙ্গে নিজের জীবনের বিচ্ছেদ অত্যন্ত বেশি করিয়া অনুভব করি। এ জাহাজ যাহারা গড়িয়াছে, যাহারা চালাইতেছে, তাহারাই এ জাহাজের প্রভু— আমি টাকা দিয়া টিকিট কিনিয়া এখানে স্থান পাইয়াছি। এই সমুদ্রের চিহ্নহীন পথের উপর দিয়া কত বংশ ধরিয়া ইহাদের কত নাবিক আপনার জীবনের অদৃশ্য রেখা রাখিয়া গিয়াছে; বারম্বার কত শত মৃত্যুর দ্বারা তবে এই পথ ক্রমে সরল হইয়া উঠিতেছে। আমি যে আজ এই জাহাজে দিনে নির্ভয়ে আহার বিহার করিতেছি ও রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছি, এই নির্ভয়তা কি শুধু টাকা দিয়া কিনিবার জিনিস। ইহার পশ্চাতে স্তরে স্তরে কত চিন্তা কত সাহসের সঞ্চয় সমুচ্চ হইয়া রহিয়াছে; সেখানে আমাদের কোনো অর্ঘ জমা হয় নাই।

যখন এই ইংরেজ স্ত্রীপুরুষদের দেখি, তাহারা ডেকের উপর খেলিতেছে, ঘুমাইতেছে, হাস্যালাপ করিতেছে, তখন আমি দেখিতে পাই— ইহারা তো কেবলমাত্র জাহাজের উপরে নাই, ইহারা স্বজাতির শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আছে। ইহারা নিশ্চয় জানে যাহা করিবার তাহা করা হইয়াছে এবং যাহা করিবার তাহা করা হইবে, সেজন্য ইহাদের সমস্ত জাতি জামিন রহিয়াছে। যদি প্রাণসংশয়-সংকট উপস্থিত হয় তবে কেবল যে কাপ্তেন আছে তাহা নহে, ইহাদের সমস্ত জাতির প্রকৃতিগত উদ্যম ও নিরলস সতর্কতা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা সেই দৃঢ় ক্ষেত্রের উপর এমন প্রফুল্লমুখে প্রসন্নচিত্তে সঞ্চরণ করিতেছে, চারি দিকের তরঙ্গের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। এই জায়গায় ইহারা নিজেরা যাহা দিয়াছে তাহাই পাইতেছে— আর আমরা যাহা দিই নাই তাহাই লইতেছি; সুতরাং সমুদ্র পার হইতে হইতে দেনা রাখিয়া রাখিয়া যাইতেছি। তাই জাহাজে

ডেকের উপরে ইংরেজ যাত্রীদের সঙ্গে একত্র মিলিয়া বসিতে আমার মন হইতে কিছুতে সংকোচ ঘুচিতে চায় না।

ডাঙায় বসিয়া অনেক বিলাতি জিনিস ব্যবহার করিয়া থাকি, সেজন্য মনের মধ্যে এমনতরো দৈন্য বোধ হয় না; জাহাজে আমরা আরও যেন কিছু বেশি লইতেছি। এ তো শুধু কলকারখানা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আছে। জাহাজ যাহারা চালাইতেছে তাহারা নিজের সাহস দিয়া, শক্তি দিয়া পার করিতেছে; তাহাদের যে মনুষ্যত্বের উপর ভর দিয়া আছি নিজেদের মধ্যে তাহারই যদি কোনো পরিচয় থাকিত তবে যে টাকাটা দিয়া টিকিট কিনিয়াছি তাহার ঝমুঝমানির সঙ্গে অন্য মূল্যের আওয়াজটাও মিশিয়া থাকিত। আজ মনের মধ্যে এই বড়ো একটা বেদনা বাজে যে, উহারা প্রাণ দিয়া চালাইতেছে আর আমরা টাকা দিয়া চলিতেছি, ইহার মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র পড়িয়া রহিল তাহা আমরা কবে কোন্ কালে পার হইতে পারিব! এখনো আরম্ভ করা হয় নাই, এখনো অকাতরে কত প্রাণ দেওয়া বাকি রহিয়াছে— এখনো কত বন্ধন ছিঁড়িতে হইবে, কত সংস্কার দলিতে হইবে, সে কথা যখন ভাবি তখন বুঝিতে পারি, আজ গোটাকয়েক খবরের কাগজের নৌকা বানাইয়া তাহারই খেলার পালের উপর আমরা যে বক্তৃতার ফুঁ লাগাইতেছি তাহাতে আমাদের কিছুই হইবে না।

কূলকিনারার বন্ধন ছাড়াইয়া একেবারে নীল সমুদ্রের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। ভয় ছিল, ডাঙার জীব সমুদ্রের দোলা সহিতে পারিব না— কিন্তু, আরব-সমুদ্রে এখনো মৈসুমের মাতামাতি আরম্ভ হয় নাই। কিছু চঞ্চলতা নাই তাহা নহে, কারণ, পশ্চিমের উজান হাওয়া বহিয়াছে, জাহাজের মুখের উপর ঢেউয়ের আঘাত লাগিতেছে, কিন্তু এখনো তাহাতে আমার শরীরের অন্তর্বিভাগে কোনো আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে নাই। তাই সমুদ্রের সঙ্গে আমার প্রথম সম্ভাষণটা প্রণয়সম্ভাষণ দিয়াই শুরু হইয়াছে। মহাসাগর কবির কবিত্বটুকুকে ঝাঁকানি দিয়া নিঃশেষ করিয়া দেন নাই, তিনি যে ছন্দে মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন আমার রক্তের নাচ তাহার সঙ্গে দিব্য তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে। যদি হঠাৎ খেয়াল যায় এবং একবার তাঁহার সহস্র উদ্যত হস্তে তাণ্ডবনৃত্যের রুদ্র বোল বাজাইতে থাকেন, তাহা হইলে আর মাথা তুলিতে পারিব না। কিন্তু, ভাবখানা দেখিয়া মনে হইতেছে, ভীরু ভক্তের উপর এ যাত্রায় তাঁহার সেই অট্টহাস্যের তুমুল পরিহাস প্রয়োগ করিবেন না।

তাই জাহাজের রেলিং ধরিয়া জলের দিকে তাকাইয়া আমার দিন কাটিতেছে। শুক্লপক্ষের শেষ দিকে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। যেমন সমুদ্র তেমনি সমুদ্রের

উপরকার রাত্রি ; স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দুই অন্তহীনের সুন্দর মিলনটি দেখিতে থাকি ; স্তব্ধের সঙ্গে চঞ্চলের, নীরবের সঙ্গে মুখরের, দিগন্তব্যাপী আলাপ চুপ করিয়া শুনিয়া লই। জাহাজের দুই ধারে জলন্ত ফেনরাশি কাটিয়া কাটিয়া পড়ে, তাহার ভঙ্গীটি আমার দেখিতে বড়ো সুন্দর লাগে। ঠিক মনে হয়, যেন জাহাজটাকে ফুলের বীজকোষের মতো করিয়া তাহার দুই পাশে সাদা পাপড়ি মুহূর্তে মুহূর্তে বিকশিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সম্মুখে আমার নিস্তব্ধ রাত্রে এই মহাসমুদ্রের সুগম্ভীর কললীলা, আর পশ্চাতে আমার এই জাহাজের যাত্রীদের অবিশ্রাম হাস্যালাপ আমোদ আহ্লাদ। যতবার আমি জাহাজে আসিয়াছি প্রত্যেক বারেই আমার এই কথাটি মনে হইয়াছে যে, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনটুকুর চারি দিকেই যে-একটি অক্ষুব্ধ অনন্ত রহিয়াছেন, তাঁহার দিকে এই যাত্রীদের এক মুহূর্তও তাকাইবার অবকাশ নাই। জীবনের প্রতি ইহাদের আসক্তি এত অত্যন্ত বেশি যে, জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার নিকট হইতে যতটুকু দূরে যাওয়া আবশ্যক ইহারা এক মুহূর্তের জন্যও ততটুকু দূরে যাইতে পারে না। এইজন্য ইহাদের ধর্মোপাসনা যেন একটা বিশেষ আয়োজনের ব্যাপার, নিজেকে যেন এক জায়গা হইতে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষণকালের জন্য আর-এক জায়গায় লইয়া যাইতে হয়। এ জাহাজ যদি ভারতবাসী যাত্রীদের জাহাজ হইত তাহা হইলে দিনের সমস্ত কাজকর্ম-আমোদ-আহ্লাদের অত্যন্ত মাঝখানেই দেখিতে পাইতাম মানুষ অসংকোচে অনন্তকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছে ; সমস্ত হাসিগল্পের মাঝে মাঝেই নিতান্ত সহজেই ধর্মসংগীত ধ্বনিত হইয়া উঠিত। সসীমের সঙ্গে অসীম, জীবের সঙ্গে শিব যে একেবারে মিলিয়া আছেন। দুইয়ের সহযোগেই যে সত্য সর্বত্র পরিপূর্ণ, এই চিন্তাটা আমাদের চিত্তের মধ্যে এত সহজ হইয়া আছে যে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো সংকোচমাত্র নাই। কিন্তু, এই ইংরেজ যাত্রীরা তাহাদের হাস্যালাপের কোনো-একটা ছেদে ধর্মসংগীত গাহিতেছে, এ কথা মনে করিতেই পারি না এবং ইহারা যদি ডেকের উপর জুয়া খেলিতে খেলিতে হঠাৎ কোনো-এক সময়ে চোখ তুলিয়া দেখিতে পায় যে ইহাদের স্বজাতীয় কেহ চৌকিতে বসিয়া উপাসনা করিতেছে, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে পাগল বলিয়া মনে করিবে এবং সকলেই মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিবে। এইজন্যই ইহাদের জীবনের মধ্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতার একটি সহজ সুনম্র শ্রী দেখিতে পাই না— ইহাদের কাজকর্ম-হাস্যালাপের মধ্যে কেবলই এক-দিক-ঘেঁষা একটা তীব্রতা প্রকাশ পায়।

এই জাহাজটার মধ্যে কী আশ্চর্য আয়োজন। এই-যে জাহাজ দেশকালের সঙ্গে

অহরহ লড়াই করিতে করিতে চলিয়াছে, তাহার সমস্ত রহস্যটা আমাদের গোচর নহে। তাহার লৌহকঠিন হৃৎপিণ্ড উঠিতেছে পড়িতেছে, দিনরাত সেই ধুক্‌ধুক্ স্পন্দন অনুভব করিতেছি। যেখানে তাহার জঠরানল জ্বলিয়াছে এবং তাহার নাড়ির মধ্যে উত্তপ্ত বাষ্পের বেগ আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে, সেখানকার প্রচণ্ড শক্তির সমস্ত উদ্যোগ আমাদের চোখের আড়ালে রহিয়াছে। আমাদের উপরিতলে এই প্রচুর অবকাশ ও আলস্যের মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি স্নানাহারের সময় জ্ঞাপন করিতেছে। এই-যে দেড়শো-দুইশো যাত্রীর আহারবিহারের আয়োজন— এ কোথায় হইতেছে সেই কথা ভাবি। সেও চোখের আড়ালে। তাহারও শব্দমাত্র শুনি না, গন্ধমাত্র পাই না। আহারের টেবিলে গিয়া যখন বসি, সমস্ত সুসজ্জিত, প্রস্তুত। ভোজ্যসামগ্রীর পরিবেষণের ধারা যেন নদীর প্রবাহের মতো অনায়াসে চলিতে থাকে।

ইহার মধ্যে যেটা বিশেষ করিয়া ভাবিবার কথা সেটা এই যে, ইহারা লেশমাত্র অসুবিধাকেও মানিয়া লইতে চায় না; এতবড়ো একটা সমুদ্রে পাড়ি— নাহয় আহারবিহারে কিছু টানাটানিই হইল, নাহয় মোটামুটি রকমেই কাজ সারিয়া লওয়া গেল। কিন্তু তা নয়; ইহারা কোনো ওজরকেই ওজর বলিয়া গণ্য করিবে না; ইহারা সকল অবস্থাতেই আপনার সকল রকমের দাবিকে সর্বোচ্চ সীমায় টানিয়া রাখিতে চায়। তাহার ফল হয় যে, অবশেষে সেই অসম্ভব দাবিও মেটে। দাবি করিবার সাহস যাহাদের নাই তাহারাই কোনোমতে অভাবের সঙ্গে আপোষ করিয়া দিন কাটায়— তাহারাই বলে, অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। তাহাতে হয় এই যে, সেই অর্ধের মধ্য হইতেও কেবলই অর্ধ বাদ পড়িয়া যায় এবং পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের মধ্যেই ক্রমাগত পণ্ড হইতে থাকেন।

কিন্তু, সমস্ত সুবিধাই লইব, এ দাবি করিয়া বসিয়া কী প্রকাণ্ড ভার বহন করিতে হয়! প্রত্যেক সামান্য আরামের ব্যবস্থা কত মস্ত জায়গা জুড়িয়া বসে! এই ভার বহন করিবার শক্তি ইহাদের আছে, সেখানে ইহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। এই উপলক্ষে আমার মনে পড়ে আমাদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। সেখানেও দুশো লোকের জন্য চার বেলাকার খাওয়া জোগাড় করিতে হয়। কিন্তু প্রয়াসের সীমা নাই, ভোর চারটে হইতে রাত্রি একটা পর্যন্ত হাঁকডাকের অবধি দেখি না। অথচ, ইহার মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নাই বলিলেও হয়। আয়োজনের ভার যথাসাধ্য কম করা গিয়াছে, কিন্তু আবর্জনার ভার কিছুমাত্র কমে না। গোলমাল বাড়িয়া চলে, ময়লা জমিতে থাকে— ভাতের ফেন, তরকারির খোসা এবং উচ্ছিষ্টাবশেষ লইয়া কী করা যায় তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ক্রমে সে সম্বন্ধে ভাবনা পরিহার করিয়া জড়

প্রকৃতির উপর বরাত দিয়া কোনোক্রমে দিন কাটানো যায়। এ কথা কিছুতেই আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, ইহা কিছুতেই চলিবে না। কারণ, তাহা বলিতে গেলেই ভার বহন করিতে হয়। শেষকালে গোড়ায় গিয়া দেখি, সেই ভার বহন করিবার ভরসা এবং শক্তি আমাদের নাই, এইজন্য আমরা কেবলই দুঃখ এবং অসুবিধা বহন করি কিন্তু দায়িত্ব বহন করিতে চাই না।

একজন উচ্চপদস্থ রেলোয়ে ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সহযাত্রী আছেন ; তিনি আমাকে বলিতেছিলেন, 'চাবি তালা প্রভৃতি নানা ছোটোখাটো প্রয়োজনের জিনিস আমি রেলোয়েবিভাগের জন্য এই দেশ হইতেই সংগ্রহ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু, বরাবর দেখিতে পাই, তাহার মূল্য বেশি অথচ জিনিস তেমন ভালো নয়।' এ দিকে পণ্যদ্রব্যের দাম এবং বেতনের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে অথচ এখানে যে-সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে পৃথিবীর বাজারদরের সঙ্গে তাহা তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না। তিনি বলিলেন, য়ুরোপীয় কর্তৃত্বে এ দেশে যে-সমস্ত কারখানা চলিতেছে এ দেশের লোকের উপর তাহার প্রভাব অতি সামান্য। আর, দেশীয় কর্তৃত্বে যেখানে কাজ চলে সেখানে দেখিতে পাই, পুরা কাজ আদায় হয় না— মানুষের যতখানি শক্তি আছে তাহার অধিকাংশকেই খাটাইয়া লইবার যেন তেজ নাই। এইজন্যই মজুরির পরিমাণ অল্প হওয়া সত্ত্বেও মূল্য কমিতে চায় না। কেননা, মানুষ যতগুলি খাটিতেছে শক্তি ততটা খাটিতেছে না।

এ কথাটা শুনিতে অপ্রিয় লাগে, কিন্তু দেশের দিকে তাকাইয়া দেখিলে সর্বত্রই এইটেই চোখে পড়ে। আমাদের দেশে সকল কাজই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একটিমাত্র কারণ, ষোলো-আনা মানুষকে আমরা পাই না। এইজন্য আমাদিগকে বেশি লোক লইয়া কারবার করিতে হয়, অথচ বেশি লোককে ঠিক ব্যবস্থামতে চালনা করা এবং তাহাদের পেট ভরাইয়া দেওয়া আমাদের শক্তির অতীত। এইজন্য কাজের চেয়ে কাজের উৎপাত অনেকগুণ বেশি হইয়া উঠে, আয়োজনের চেয়ে আবর্জনাই বাড়ে এবং তরণীতে ছিদ্র ক্রমে এত দেখা দেয় যে দাঁড়-টানার চেয়ে জল-ছেঁচাতেই বেশি শক্তি ব্যয় করিতে হয়— আমাদের দেশে যে-কেহ যে-কোনো কাজে হাত দিয়াছে তাহাকে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

আমি সেই ইঞ্জিনিয়ারটিকে বলিলাম, 'তোমাদের দেশে যৌথ কারবার ও কল-কারখানার গুণেই কি জিনিসের মূল্য কম হইতেছে না।' তিনি বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কিন্তু কোনো দেশে যৌথ কারবার আগে এবং উন্নতি তাহার পরে, এমন কথা বলা যায় না। মানুষ যখন যৌথ কারবারে মিলিবার উপযুক্ত হয় তখনি যৌথ

কারবার আপনিই ঘটিয়া উঠে। তিনি কহিলেন, 'আমি মাদ্রাজের দিকে দক্ষিণ ভারতে অনেক দেশীয় যৌথ কারবারের উৎপত্তি ও বিলুপ্তি দেখিয়াছি। দেখিতে পাই, অনুষ্ঠানটার প্রতি যে লয়াল্‌টি অর্থাৎ যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার প্রয়োজন তাহা কাহারও নাই, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে নিজের দিকে তাকায়। ইহাতে কখনোই কোনো জিনিস বাঁধিতে পারে না। এই দৃঢ়নিষ্ঠ প্রাণপণ লয়াল্‌টি যদি জাতীয় চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তবে সমস্ত সম্মিলিত শুভানুষ্ঠান সম্ভবপর হয়।'

কথাটা আমার মনে লাগিল। অনুষ্ঠানের দ্বারা মঙ্গলসাধন করা যায়, এ কথাটা সত্য নহে— গোড়াতেই মানুষ আছে। আমাদের দেশে একজন মানুষকে আশ্রয় করিয়া এক-একটা কাজ জাগিয়া উঠে; তাহার পরে সেই কাজকে যাহারা গ্রহণ করে তাহারা তাহাকে যতটা আশ্রয় করে ততটা আশ্রয় দেয় না। কারণ, তাহারা কাজের দিকে তেমন করিয়া তাকায় না যেমন করিয়া নিজের দিকে তাকায়। কথায় কথায় তাহাদের মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়ে, বাধাকে তাহারা অতিক্রমের চেষ্টা না করিয়া বাধাকে ত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়, এবং কেবলই মনে করিতে থাকে, ইহার চেয়ে আর কোনোরূপ অবস্থা হইলে ইহার চেয়ে আরও ভালো ফল পাওয়া যাইত। এমনি করিয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়— একটা হইতে পাঁচটা টুকরা দাঁড়ায় এবং পাঁচটাই ব্যর্থ হয়। ভালোমন্দ বাধাবিপত্তি সমস্তটাকে বীরের মতো স্বীকার করিয়া আরব্ধ কর্মকে একান্ত লয়াল্‌টির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বহন করিবার অধ্যবসায় যতদিন আমাদের সাধারণের চিত্তে না জাগিবে ততদিন সম্মিলিত হিতানুষ্ঠান ও যৌথ বাণিজ্য আমাদের দেশে একেবারে অসম্ভব হইবে।

এই লয়াল্‌টি, ইহা বুদ্ধিগত নহে, ইহা হৃদয়গত, জীবনগত। সমস্ত অপূর্ণতার ভিতর দিয়া মানুষ নিজেকে কিসের জোরে বহন করে। একটা জীবনের গভীর আকর্ষণে। লাভ-লোকসানের সমস্ত হিসাব সেই জীবনের টানের কাছে লঘু। এমনটা যদি না হইত তবে কথায় কথায় সামান্য কারণে, সামান্য ক্ষতিতে, সামান্য অসন্তোষে, মানুষ আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি লইত। সেইরূপ যে কর্মে আমরা জীবনকে নিয়োগ করিয়াছি তাহার প্রতি যদি আমাদের জীবনগত নিষ্ঠা না থাকে, তাহার প্রতি যদি আমাদের একটা বেহিসাবি আকর্ষণ না থাকে, তাহার প্রতি অপরাহত শ্রদ্ধা লইয়া আমরা যদি পরাভবের দলেও দাঁড়াইতে না পারি, যদি মৃত্যুর মুখেও তাহার জয়-পতাকাকে সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরিবার বল না পাই, যদি অভিমন্যুর মতো ব্যূহের মধ্য হইতে বাহির হইবার বিদ্যাটাকে আমরা একেবারে অগ্রাহ্য না করি, তাহা হইলে আমরা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারিব না, রক্ষা করিতেও পারিব না। 'ইহা

আমাদের অতএব ইহা আমারই' এই কথাটাকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লাভক্ষতি, সমস্ত হারজিতের মধ্যে প্রাণপণে বলিবার শক্তি সর্বাগ্রে আমাদের চাই ; তাহার পরে যে-কোনো অনুষ্ঠানকেই আশ্রয় করি-না কেন, একদিন না একদিন বিঘ্নসমুদ্র পার হইতে পারিব।

নিরতিশয় কর্মের প্রয়াসের দ্বারা য়ুরোপের জীবন জীর্ণ হইতেছে, এই কথাটা আজকাল পশ্চিমদেশেও শোনা যায় এবং এই কথাটা একেবারে মিথ্যাও নহে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপ কোনো অভাব কোনো অসুবিধাকেই কিছুমাত্র মানিবে না, এই তাহার পণ। নিজের শক্তির উপরে তাহার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস থাকাতেই তাহার শক্তি পূর্ণ গৌরবে কাজ করিতেছে এবং অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু, তবুও শক্তির সীমা আছে। বাতিও খুব বড়ো করিয়া জ্বালাইব অথচ সলিতাও ক্ষয় করিব না, এ তো কোনোমতেই হয় না।

এইজন্য পাশ্চাত্যদেশে জীবনযাত্রার দাবি এক দিকে যত বাড়িতেছে আর-এক দিকে ততই সে দাহ করিতেছে। আরামকে সুবিধাকে কোথাও খর্ব করিব না পণ করিয়া বসাতে তাহার বোঝা কেবলই প্রকাণ্ড বড়ো হইয়া উঠিতেছে। এই বোঝা তো কোনো-একটা জায়গায় চাপ দিতেছে। যেখানে সেই চাপ পড়িতেছে সেখানে যে পরিমাণে দুঃখ জন্মিতেছে সে পরিমাণে ক্ষতিপূরণ হইতেছে না। এইজন্য ভার-সামঞ্জস্যের প্রয়াস আগ্নেয় ভূমিকম্পের আকারে সমস্ত পীড়িত সমাজের ভিতর হইতে ক্ষণে ক্ষণে মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছে। মানুষের সুবিধাকে সৃষ্টি করিবার জন্য কল কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে এবং মানুষের জায়গা কল জুড়িয়া বসিতেছে। কোথায় ইহার অন্ত ? মানুষ আপনাকে আপনার অভাবপূরণের যন্ত্র করিয়া তুলিতেছে— কিন্তু, সেই আপনাকে সে পাইবে কোন্ অবসরে ? যেমন করিয়াই হউক, এক জায়গায় তাহাকে দাঁড়ি টানিয়া দিয়া বলিতেই হইবে, 'এই রহিল আমার উপকরণ, এখন আমাকে আমার উদ্ধার করা চাই। যাহাতে আমার আবশ্যক তাহা আমাকে অবশ্য জোগাইতে হইবে, কিন্তু এ-সমস্তে আমার আবশ্যক নাই।'

অর্থাৎ, মানুষের উদ্যম যখন কেবলই একটানা চলিতে থাকে তখন সে একটা জায়গায় আসিয়া আপনাকে আপনি ব্যর্থ করিয়া বসে। পূর্ণতার পথ সোজা পথ নহে। সেইজন্য আজ য়ুরোপের যাহা বেদনা আমাদের বেদনা কখনোই তাহা নহে। য়ুরোপ তাহার দেহকে সম্পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। আমাদের আত্মা দেহ হারাইয়া প্রেতের মতো পৃথিবীতে নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেছে। সেই আত্মার বাহ্য প্রতিষ্ঠা কোথায় ? তাহার মধ্যে যে ঈশ্বরের সাধর্ম্য আছে, সে

আপনার ঐশ্বর্য বিস্তার না করিয়া বাঁচে না। সে যে আপনাকে নানা দিকে প্রকাশ করিতে চায়— রাজ্যে, বাণিজ্যে, সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে— এখানে সেই প্রকাশের উপকরণ কই? সেই উপকরণের প্রতি তাহার কর্তৃত্ব কোথায়? দেখিতেছি, তাহার কলেবর এক জায়গায় যদি বাঁধে তো আর-এক জায়গায় আলগা হইয়া পড়ে— ক্ষণকালের জন্য যদি তাহা নিবিড় হইয়া দাঁড়ায় তবে পরক্ষণেই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। তাই আজ যেমন করিয়াই হউক, আমাদিগকে এই দেহতত্ত্ব সাধন করিতে হইবে; যেমন করিয়া হউক, আমাদিগকে এই কথাটা বুঝিতে হইবে যে, কলেবরহীন আত্মা কখনোই সত্য নহে— কেননা, কলেবর আত্মারই একটা দিক। তাহা গতির দিক, শক্তির দিক, মৃত্যুর দিক— কিন্তু তাহারই সহযোগে আত্মার স্থিতি, আনন্দ, অমৃত। এই কলেবরসৃষ্টির অসম্পূর্ণতাতেই আমাদের দেশের শ্রীহীন আত্মা শতাব্দীর পর শতাব্দী হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। বাহিরের সত্যকে দূরে ফেলিয়া আমাদের অন্তরাত্মা কেবলই অবাধে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। সে আপনার ওজন হারাইয়া ফেলিতেছে, এইজন্য তাহার অন্ধ বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ নাই, কোনো পরিমাণ নাই; এইজন্য কোথাও বা সত্যকে লইয়া সে মায়ার মতো খেলা করিতেছে, কোথাও বা মায়াকে লইয়া সে সত্যের মতো ব্যবহার করিতেছে।

আরব-সমুদ্র
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

যাত্রা

একদিন মানুষ ছিল বুনো, ঘোড়াও ছিল বনের জন্তু। মানুষ ছুটিতে পারিত না, ঘোড়া বাতাসের মতো ছুটিত। কী সুন্দর তাহার ভঙ্গী, কী অবাধ তাহার স্বাধীনতা। মানুষ চাহিয়া দেখিত, আর তাহার ঈর্ষা হইত। সে ভাবিত, 'ঐরকম বিদ্যুৎগামী চারটে পা যদি আমার থাকিত তাহা হইলে দূরকে দূর মানিতাম না, দেখিতে দেখিতে দিগ্‌দিগন্তর জয় করিয়া আসিতাম।' ঘোড়ার সর্বাঙ্গে যে-একটি ছুটিবার আনন্দ দ্রুত তালে নৃত্য করিত সেইটের প্রতি মানুষের মনে মনে ভারি একটা লোভ হইল।

কিন্তু, মানুষ শুধু-শুধু লোভ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে। 'কী করিলে ঘোড়ার চারটে পা আমি পাইতে পারি' গাছের তলায় বসিয়া এই কথাই সে ভাবিতে

লাগিল। এমন অদ্ভুত ভাবনাও মানুষ ছাড়া আর-কেহ ভাবে না। 'আমি দুই-পা-ওয়ালা খাড়া জীব, আমার চার পায়ের সংস্থান কি কোনোমতেই হইতে পারে। অতএব, চিরদিন আমি এক-এক পা ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিব আর ঘোড়া তড়্‌বড় করিয়া ছুটিয়া চলিবে, এ বিধানের অন্যথা হইতেই পারে না।' কিন্তু, মানুষের অশান্ত মন এ কথা কোনোমতেই মানিল না।

একদিন সে ফাঁস লাগাইয়া বনের ঘোড়াকে ধরিল। কেশর ধরিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া নিজের দেহের সঙ্গে ঘোড়ার চার পা জুড়িয়া লইল। এই চারটে পাকে সম্পূর্ণ নিজের বশ করিতে তাহার বহুদিন লাগিয়াছে, সে অনেক পড়িয়াছে, অনেক মরিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই দমে নাই। ঘোড়ার গতিবেগকে সে ডাকাতি করিয়া লইবেই এই তাহার পণ। তাহারই জিত হইল। মন্দগামী মানুষ দ্রুতগমনকে বাঁধিয়া ফেলিয়া আপনার কাজে খাটাইতে লাগিল।

ডাঙার চলিতে চলিতে মানুষ এক জায়গায় আসিয়া দেখিল সম্মুখে তাহার সমুদ্র, আর তো এগোইবার জো নাই। নীল জল, তাহার তল কোথায়, তাহার কূল দেখা যায় না। আর, লক্ষ লক্ষ ঢেউ তর্জনী তুলিয়া ডাঙার মানুষদের শাসাইতেছে; বলিতেছে, 'এক পা যদি এগোও তবে দেখাইয়া দিব, এখানে তোমার জারিজুরি খাটিবে না।' মানুষ তীরে বসিয়া এই অকূল নিষেধের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু, নিষেধের ভিতর দিয়া একটা মস্ত আহ্বানও আসিতেছে। তরঙ্গগুলা অট্টহাস্যে নৃত্য করিতেছে— ডাঙার মাটির মতো কিছুতেই তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ লক্ষ ইস্কুলের ছেলে যেন ছুটি পাইয়াছে— চীৎকার করিয়া, মাতামাতি করিয়া, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটিতেছে না; পৃথিবীটাকে তাহারা যেন ফুট্‌বলের গোলার মতো লাথি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া আকাশে উড়াইয়া দিতে চায়। ইহা দেখিয়া মানুষের মন তীরে বসিয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। সমুদ্রের এই মাতুনি মানুষের রক্তের মধ্যে করতাল বাজাইতে থাকে। বাধাহীন জলরাশির এই দিগন্তবিস্তৃত মুক্তিকে মানুষ আপন করিতে চায়। সমুদ্রের এই দূরত্বজয়ী আনন্দের প্রতি মানুষ লোভ দিতে লাগিল। ঢেউগুলার মতো করিয়াই দিগন্তকে লুঠ করিয়া লইবার জন্য মানুষের কামনা।

কিন্তু, এমন অদ্ভুত সাধ মিটিবে কী করিয়া; এই তীরের রেখাটা পর্যন্ত মানুষের অধিকারের সীমা— তাহার সমস্ত ইচ্ছাটাকে এই দাঁড়ির কাছে আসিয়া শেষ করিতে হইবে। কিন্তু, মানুষের ইচ্ছাকে যেখানে শেষ করিতে চাওয়া যায় সেইখানেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কোনোমতেই সে বাধাকে চরম বলিয়া মানিতে চাহিল না।

অবশেষে একদিন বুনো ঘোড়াটার মতোই সমুদ্রের ফেনকেশর ধরিয়া মানুষ তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিল। ক্রুদ্ধ সাগর পিঠ নাড়া দিল ; মানুষ কত ডুবিল, কত মরিল, তাহার সীমা নাই। অবশেষে একদিন মানুষ এই অবাধ্য সাগরকেও আপনার সঙ্গে জুড়িয়া লইল। তাহার এক কূল হইতে আর-এক কূল পর্যন্ত মানুষের পায়ের কাছে আসিয়া মাথা হেঁট করিয়া দিল।

বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষটা যে কিরকম, আজ আমরা জাহাজে চড়িয়া তাহাই অনুভব করিতেছি। আমরা তো এই একটুখানি জীব, তরণীর এক প্রান্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু দূর দূর বহুদূর পর্যন্ত সমস্ত আমার সঙ্গে মিলিয়াছে। যে দূরকে আজ রেখামাত্রও দেখিতে পাইতেছি না তাহাকেও আমি এইখানে স্থির দাঁড়াইয়া অধিকার করিয়া লইয়াছি। যাহা বাধা তাহাই আমাকে পিঠে করিয়া লইয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছে। সমস্ত সমুদ্র আমার, যেন আমারই বিরাট শরীর, যেন তাহা আমার প্রসারিত ডানা। যাহা-কিছু আমাদের বাধা তাহাকেই আমাদের চলিবার পথ, আমাদের মুক্তির উপায় করিয়া লইতে হইবে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ আছে। যাহারা এই আদেশ মানিয়াছে তাহারাই পৃথিবীতে ছাড়া পাইয়াছে। যাহারা মানে নাই এই পৃথিবীটা তাহাদের পক্ষে কারাগার। নিজের গ্রামটুকু তাহাদিগকে বেড়িয়াছে, ঘরের কোণটুকু তাহাদিগকে বাঁধিয়াছে, প্রত্যেক পা ফেলিতেই তাহাদের শিকল ঝম্‌ঝম্‌ করে।

মনের আনন্দে চলিতেছি। ভয় ছিল, সমুদ্রের দোলা আমার শরীরে সহিবে না। সে ভয় কাটিয়া গেছে। যেটুকু নাড়া খাইতেছি তাহাতে আঘাত করিতেছে না, যেন আদর করিতেছে। সমুদ্র আমাকে কোলে করিয়া বহিয়া চলিয়াছে— রুগ্‌ণ বালককে তাহার পিতা যেমন করিয়া লইয়া যায় তেমনি সাবধানে। এই জন্য এ যাত্রায় এখন পর্যন্ত আমার চলিবার কোনো পীড়া নাই, চলিবার আনন্দই ভোগ করিতেছি।

কেবলমাত্র এই চলিবার আনন্দটুকুই পাইব বলিয়া আমি বাহির হইয়াছি। অনেক দিন হইতে এই চলিবার, এই বাহির হইয়া পড়িবার, একটা বেগ আমাকে উতলা করিয়া তুলিতেছিল। অনেক দিন আমাদের আশ্রমের বাড়িতে দোতলার বারান্দায় একলা বসিয়া যখন আমাদের সামনের শালগাছগুলার উপরের আকাশের দিকে তাকাইয়াছি তখন সেই আকাশ দূরের দিকে তাহার তর্জনী বাড়াইয়া দিয়া আমাকে সংকেত করিয়াছে। যদিও সেই আকাশটি নীরব তবু দেশদেশান্তরের যত অপরিচিত গিরিনদী-অরণ্যের আহ্বান কত দিগ্‌দিগন্তর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া এই আকাশের নীলিমাকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। নিঃশব্দ আকাশ বহুদূরের সেই-সমস্ত মর্মরধ্বনি,

সেই-সমস্ত কলগুঞ্জন, আমার কাছে বহন করিয়া আনিত। আমাকে কেবলই বলিত, 'চলো, চলো, বাহির হইয়া এসো।' সে কোনো প্রয়োজনের চলা নহে, চলার আনন্দেই চলা।

প্রাণ আপনি চায় চলিতে ; সেই তাহার ধর্ম। না চলিলে সে যে মৃত্যুতে গিয়া ঠেকে। এইজন্য নানা প্রয়োজনের ও খেলার ছুতায় সে কেবল চলে। পদ্মার চরে শরতের সময়ে তো হাঁসের দল দেখিয়াছ। তাহারা কোন্ দুর্গম হিমালয়ের শিখরবেষ্টিত নির্জন সরোবরতীরের নীড় ছাড়িয়া কত দিনরাত্রি ধরিয়া উড়িতে উড়িতে এই পদ্মার বালুতটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। শীতের দিনে বাষ্পে বরফে ভীষণ হইয়া উঠিয়া হিমালয় তাহাদিগকে তাড়া লাগাইয়া দেয়— তাহারা বাসা বদল করিতে চলে। সুতরাং সেই সময়ে হাঁসেদের পক্ষে দক্ষিণপথে যাত্রার একটা প্রয়োজন আছে বটে। কিন্তু, তবু সেই প্রয়োজনের অধিক আর-একটা জিনিস আছে। এই-যে বহু দূরের গিরি নদী পার হইয়া উড়িয়া যাওয়া, ইহাতে এই পাখিদের ভিতরকার প্রাণের বেগ আনন্দলাভ করে। ক্ষণে ক্ষণে বাসা বদল করিবার ডাক পড়ে, তখনি সমস্ত জীবনটা নাড়া খাইয়া আপনাকে আপনি অনুভব করিবার সুযোগ পায়।

আমার ভিতরেও বাসা বদল করিবার ডাক পড়িয়াছিল। যে বেষ্টনের মধ্যে বসিয়া আছি সেখান হইতে আর-একটা কোথাও যাইতে হইবে। চলো, চলো, চলো। ঝরনার মতো চলো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলো, প্রভাতের পাখির মতো চলো, অরুণোদয়ের আলোর মতো চলো। সেইজন্যই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ, জগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম। সেইজন্যই তো বিশ্ব জুড়িয়া অণু পরমাণু নৃত্য করিতেছে এবং অগণ্য নক্ষত্রলোক আপন-আপন আলোকের শিবির লইয়া প্রান্তরচারী বেদুয়িনদের মতো আকাশের ভিতর দিয়া যে কোথায় চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। চিরকালের মতো কোনো একই জায়গায় বাসা বাঁধিয়া বসিব, বিশ্বের এমন ধর্মই নহে। সেইজন্যই মৃত্যুর ডাক আর কিছুই নহে, সেই বাসাবদলের ডাক। জীবনকে কোনোমতেই সে কোনো সনাতন প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে দিবে না— জীবনকে সেই জীবনের পথে অগ্রসর করিবে বলিয়াই মৃত্যু।

তাই আমি আজ চলিয়াছি ; রূপকথার রাজপুত্র যেমন হঠাৎ একদিন অকারণে সাত সমুদ্র পার হইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িত, তেমনি করিয়া আমি আজ বাহিরে চলিয়াছি। রাজকন্যা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে ঘুম ভাঙে না ; সোনার কাঠি চাই। একই জায়গায় একই প্রথার মধ্যে বসিয়া বসিয়া জীবনের মধ্যে জড়তা আসে ; সে অচেতন হইয়া পড়ে ; সে কেবল আপনার শয্যাটুকুকেই আঁকড়িয়া থাকে ;

এই বৃহৎ পৃথিবীকে বোধ করিতেই পারে না; তখন সোনার কাঠি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; তখনি দূরে পাড়ি দেওয়া চাই; তখন এমন একটা চেতনার দরকার যাহা আমাদের চোখের কানের মনের রুদ্ধ দ্বারে কেবলই নূতন-নূতন নূতনের আঘাত দিতে থাকিবে— যাহা আমাদের জীর্ণ পর্দাটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া চিরনূতনকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কী বৃহৎ, কী সুন্দর, কী উন্মুক্ত এই জগৎ! কী প্রাণ, কী আলোক, কী আনন্দ! মানুষ এই পৃথিবীকে ঘিরিয়া ফেলিয়া কত রকম করিয়া দেখিতেছে, ভাবিতেছে, গড়িতেছে! তাহার প্রাণের, তাহার মনের, তাহার কল্পনার লীলাক্ষেত্র কোনোখানে ফুরাইয়া গেল না। পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া মানুষের এই-যে মনোলোক ইহার কী অফুরান ও অদ্ভুত বৈচিত্র্য। সেই-সমস্তকে লইয়াই যে আমার এই পৃথিবী। এইজন্যই এই-সমস্তটিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য মনের মধ্যে আহ্বান আসে।

এই বিপুল বৈচিত্র্যকে তন্ন তন্ন করিয়া নিঃশেষে দেখিবার সাধ্য ও অবকাশ কাহারও নাই। বিশ্বকে দর্শন করিব বলিয়া তাহার সম্মুখে বাহির হইতে পারিলেই দর্শনের ফল পাওয়া যায়। যদিও এক হিসাবে বিশ্ব সর্বত্রই আছে তবু আলস্য ছাড়িয়া, অভ্যাস কাটাইয়া, চোখ মেলিয়া, যাত্রা করিলে তবেই আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়িমা কাটিয়া যায় এবং আমাদের প্রাণ উদ্‌বোধিত হইয়া বিশ্বপ্রাণের স্পর্শ উপলব্ধি করে। যে নিশ্চল, যে নিরুদ্যম, সে লোক সেই জিনিসকেই হারাইয়া বসে যাহা একেবারেই হাতের কাছে আছে। তাই নিকটের ধনকে দুঃখ করিয়া দূরে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই তাহাকেই অত্যন্ত নিবিড় করিয়া পাওয়া যায়। আমাদের সমস্ত ভ্রমণেরই ভিতরকার আসল উদ্দেশ্যটি এই— যাহা আছেই, যাহা হারাইতে পারেই না, তাহাকেই, কেবলই প্রতি পদে 'আছে আছে আছে' বলিতে বলিতে চলা— পুরাতনকে কেবলই নূতন নূতন নূতন করিয়া সমস্ত মন দিয়া ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাওয়া।

লোহিত সমুদ্র

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

আনন্দরূপ

আজ সকালে জাহাজের ছাদের উপর রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। 'আকাশের পাণ্ডুর নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার মাঝখান দিয়া পশ্চিম দিগন্ত হইতে মৃদুশীতল বাতাস আসিতেছিল। আমার ললাট মাধুর্যে অভিষিক্ত হইল। আমার মন বলিতে লাগিল, 'এই তো তাঁহার প্রসাদসুধার প্রবাহ।'

সকল সময় মন এমন করিয়া বলে না। অনেক সময় বাহিরের সৌন্দর্যকে আমরা বাহিরে দেখি— তাহাতে চোখ জুড়ায়, কিন্তু তাহাকে অন্তরে গ্রহণ করি না। ঠিক যেন অমৃতফলকে আঘ্রাণ করি, তাহার স্বাদ লই না।

কিন্তু সৌন্দর্য যেদিন অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেইদিন তাহার মধ্য হইতে অসীম একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনি সমস্ত মন এক মুহূর্তে গান গাহিয়া উঠে, 'নহে, নহে, এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে— এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধারা।'

আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে প্রভাতের আলোকে এই-যে অনির্বচনীয় মাধুর্য স্তরে স্তরে দিকে দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আছে কোন্‌খানে। ইহা কি জলে। ইহা কি বাতাসে। এই ধারণার অতীতকে কে ধারণ করিতে পারে।

ইহাই আনন্দ, ইহাই প্রসাদ। ইহাই দেশে দেশে, কালে কালে, অগণ্য প্রাণীর প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে, মন হরণ করিতেছে— ইহা আর কিছুতেই ফুরাইল না। ইহারই অমৃতস্পর্শে কত কবি কবিতা লিখিল, কত শিল্পী শিল্প রচনা করিল, কত জননীর হৃদয় স্নেহে গলিল, কত প্রেমিকের চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উঠিল— সীমার বক্ষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেদ করিয়া এই অসীমের অমৃত-ফোয়ারা কত লীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার আর অন্ত দেখি না— অন্ত দেখি না। তাহা আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য।

ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্‌। রূপ এখানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নহে। এই-যে রূপের মধ্য দিয়া আনন্দ, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত। শুধুই রূপের মধ্যে আসিয়া মন ঠেকিল, মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া চিন্তা ফুরাইল, তবে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কী পাইলাম! বস্তুকে দেখিলাম, সত্যকে দেখিলাম না!

আমার কি কেবলই চোখ আছে, কান আছে। আমার মধ্যে কি সত্য নাই, আনন্দ নাই। সেই আমার সত্য দিয়া আনন্দ দিয়া যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতের দিকে চাহিয়া

দেখি তখনি দেখিতে পাই, সম্মুখে আমার এই তরঙ্গিত সমুদ্র— এই প্রবাহিত বায়ু— এই প্রসারিত আলোক— বস্তু নহে, ইহা সমস্তই আনন্দ, সমস্তই লীলা, ইহার সমস্ত অর্থ একমাত্র তাঁহারই মধ্যে আছে ; তিনি এ কী দেখাইতেছেন, কী বলিতেছেন, আমি তাহার কীই বা জানি ! এই আকাশপ্লাবী আনন্দের সহস্রলক্ষ ধারা যেখানে এক মহাস্রোতে মিলিয়া আবার তাঁহারই এই হৃদয়ের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে সেইখানে মুহূর্তকালের জন্ম দাঁড়াইতে পারিলে এই সমস্ত-কিছুর মহৎ অর্থ, ইহার পরম পরিণামটিকে দেখিতে পাইতাম। এই-যে অচিন্তনীয় শক্তি, এই-যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, এই-যে অপরিসীম সত্য, এই-যে অপরিমেয় আনন্দ, ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল বলিয়া জানিয়া গেলাম তবে সে কী ভয়ানক ব্যর্থতা, কী মহতী বিনষ্টি। নহে নহে, এই তো তাঁহার প্রসাদ, এই তো তাঁহার প্রকাশ, এই তো আমাকে স্পর্শ করিতেছে, আমাকে বেষ্টন করিতেছে, আমার চৈতন্যের তারে তারে সুর বাজাইতেছে, আমাকে বাঁচাইতেছে, আমাকে জাগাইতেছে, আমার মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়া ডাক দিতেছে, আমাকে পলে পলে যুগযুগান্তরে পরিপূর্ণ করিতেছে ; শেষ নাই, কোথাও শেষ নাই, কেবলই আরও আরও আরও ; তবু সেই এক, কেবলই এক, সেই আনন্দময় অমৃতময় এক ! সেই অতল অকূল অখণ্ড নিস্তব্ধ নিঃশব্দ সুগম্ভীর এক— কিন্তু, কত তাহার ঢেউ, কত তাহার কলসংগীত !

প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ !
তব ভুবনে, তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান !
আরো আলো আরো আলো
মোর নয়নে, প্রভু, ঢালো !
সুরে সুরে বাঁশি পুরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান !
আরো বেদনা, আরো বেদনা,
মোরে আরো আরো দাও চেতনা !
দ্বার ছুটায়ে, বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ !
আরো প্রেমে, আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে !

স্নধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান।

লোহিত সমুদ্র
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

কেবল মানুষই বলে, আশার অন্ত নাই। পৃথিবীর আর-কোনো জীব এমন কথা বলে না। আর-সকল প্রাণী প্রকৃতির একটা সীমার মধ্যে প্রাণ ধারণ করে এবং তাহার মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাও সেই সীমাকে মানিয়া চলে। জন্তুদের আহার বিহার নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সীমাকে লঙ্ঘন করিতে চায় না। এক জায়গায় তাহাদের সাধ মেটে এবং সেখানে তাহারা ক্ষান্ত হইতে জানে। অভাব পূর্ণ হইলে তাহাদের ইচ্ছা আপনি থামিয়া যায়, তাহার পরে আবার সেই ইচ্ছাকে তাড়না করিয়া জাগাইবার জন্ত তাহাদের দ্বিতীয় আর-একটা ইচ্ছা নাই।

মানুষের প্রকৃতিতে আশ্চর্য এই দেখা যায়, একটা ইচ্ছার উপর সওয়ার হইয়া আর-একটা ইচ্ছা চাপিয়া আছে। পেট ভরিয়া গেলে খাইবার ইচ্ছা যখন আপনি মিটিয়া যায়, তখনো সেই ইচ্ছাকে জোর করিয়া জাগাইয়া রাখিবার জন্য মানুষের আর-একটা ইচ্ছা তাগিদ করিতে থাকে। সে কোনোমতে চাটনি খাইয়া, ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, আহারের অবসন্ন ইচ্ছাকে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বেও চালনা করিতে থাকে।

ইহাতে মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কারণ, ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা নহে। স্বাভাবিক ইচ্ছা সহজেই আপন প্রাকৃতিক স্বভাবের সীমার মধ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। আর, মানুষের এই অস্বাভাবিক ইচ্ছা কিছুতেই তৃপ্তি মানিতে চায় না। তাহার মধ্যে একটা কী আছে যে কেবলই বলিতেছে— আরও, আরও, আরও!

কিন্তু, যাহাতে মানুষের ক্ষতি করিতে পারে সে ইচ্ছা মানুষের থাকে কেন। নিজের এই দুরন্ত ইচ্ছাটার দিকে তাকাইয়াই মানুষ বিশ্বব্যাপারে একটা শয়তানের কল্পনা করিয়াছে। য়িহুদি পুরাণের প্রথম নরনারী যখন স্বর্গোদ্যানে ছিল তখন ঈশ্বর তাহাদের ইচ্ছাকে প্রকৃতির সীমার মধ্যে বাঁধিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহার মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকিয়ো। প্রাণের রাজ্যই তোমাদের রহিল, জ্ঞানের রাজ্যে লোভ দিয়ো না।' স্বর্গোদ্যানের প্রত্যেক জীবজন্তুই সেই সন্তোষের সীমার মধ্যেই বদ্ধ রহিল; কেবল

মানুষই বলিল, 'যাহা পাওয়া গেছে তাহার চেয়ে আরও পাওয়া চাই।' এই-যে আরো'র দিকে সে পা বাড়াইল এ বড়ো বিষম রাজ্য। এখানে স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির কোনো সীমা কোথাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই, এইজন্য কোন্ দিকে কত দূর পর্যন্ত যে যাওয়া যায় তাহার পরামর্শদাতা পাওয়া শক্ত। এইজন্য এই অতৃপ্তির পথহীন রাজ্যে মরিবার আশঙ্কা চারি দিকেই বিকীর্ণ। এমন ভয়ানক ক্ষেত্রে মানুষকে দুর্নিবার বেগে যে টানিয়া আনিল মানুষ তাহাকে গালি দিয়া বলিল 'শয়তান'।

কিন্তু, রাগই করি আর যাই করি, জগতে শয়তানকে তো মানিতে পারি না। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, মানুষের এই-যে ইচ্ছার উপরে আরো'র জন্য আরও একটা ইচ্ছা ইহা তাহার বাহিরের দিক হইতে একটা শত্রুর আক্রমণ নহে। ইহাকে মানুষ রিপু বলে বলুক, কিন্তু এই ইচ্ছাই তাহার যথার্থ মানবস্বভাবগত ইচ্ছা। সুতরাং যতক্ষণ এই ইচ্ছাকে সে জয়ী করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার কিছুতেই শান্তি নাই— ততক্ষণ তাহাকে কেবলই আঘাত খাইয়া খাইয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে।

কিন্তু, এই আরো'র ইচ্ছাকে সে জয়ী করিবে কেমন করিয়া। আহার করিলে পেট তাহার ভরিবেই, ভোগ করিলে এক জায়গায় তাহার নিবৃত্তিতে আসিয়া ঠেকিতেই হইবে— আরো'র ইচ্ছাকে সেখানে কোনো-একটা সীমায় আসিয়া হার মানিতেই হইবে। শুধু হার মানা নয়, সে জায়গায় সে দুঃখ পাইবে এবং দুঃখ ঘটাইবে। ব্যাধি আসিবে, বিকৃতি আসিবে, সে নিজেকে এবং অন্যকে বাধা দিতে থাকিবে। কেননা, প্রকৃতি যেখানে সীমা টানিয়াছেন তাহাকে লঙ্ঘন করিতে গেলেই শাস্তি আছে।

শুধু তাই নয়। প্রকৃতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের এই আরো'র ইচ্ছাকে দৌড় করাইতে গেলেই পরস্পরের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে হয়। যেটুকু আমার আছে তাহার চেয়ে বেশি লইতে গেলেই যেটুকু তোমার আছে তাহার উপর হাত দিতে হয়। তখন, হয় গোপনে ছলনা নয় প্রকাশ্যে গায়ের জোর আশ্রয় করিতে হয়। তখন দুর্বলের মিথ্যাচার ও প্রবলের দৌরাত্ম্যে সমাজ লণ্ডভণ্ড হইতে থাকে।

এমনি করিয়াই পাপ আসে, বিনাশ আসে। কিন্তু, এই পাপ যদি না আসিত তবে মানুষ পথ দেখিতে পাইত না। এই আরো'র অতৃপ্তি যেখানে তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় সেখানে যদি পাপের আগুন জ্বলে, তবে ঘোড়াটাকে কোনোমতে বাগ মানাইয়া ফিরাইয়া আনিবার কথা মনে আসে। এইজন্য মনুষ্যলোকে অন্যান্য সকল শিক্ষার উপরে সেই সাধনাটা প্রচলিত যাহাতে ঐ আরো'র ইচ্ছাটাকে বশে আনা যায়। কেননা, মানুষকে ঈশ্বর ঐ একটা ভয়ংকর বাহন দিয়াছেন, ও আমাদের কোথায় লইয়া গিয়া যে ফেলে তাহার ঠিকানা নাই। উহার মুখে লাগাম পরাও, উহাকে চালাইতে

শিখ। কিন্তু তাই বলিয়া উহার দানাপানি একেবারে বন্ধ করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিলে চলিবে না। কেননা, এই আরো'র ইচ্ছাই মানুষের যথার্থ বাহন।

প্রয়োজনসাধনের ইচ্ছা জন্তুদের বাহন। এইটে না থাকিলে তাহাদের জীবনযাত্রা একেবারেই চলিত না। এই ইচ্ছাটাই প্রাকৃতিক জীবনের মূল ইচ্ছা। ইহাই দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যেখানে বাধা পায় সেইখানেই জন্তুদের দুঃখ, যেখানে তাহার পূরণ হয় সেইখানেই তাহাদের সুখ। তাই দেখা যায়, জন্তুদের সুখ দুঃখ আছে কিন্তু পাপপুণ্য নাই।

কিন্তু, মানুষের মধ্যে এই-যে আরো'র ইচ্ছা ইহা আরামের ইচ্ছা নহে, সুখের ইচ্ছা নহে, বস্তুত ইহা দুঃখেরই ইচ্ছা। মানুষ যে কেবলই প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আপন জ্ঞান প্রেম ও শক্তি -রাজ্যের উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করিবার জন্য বারম্বার বাহির হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহার সুখের সাধনা নহে। ইহা তাহার কোনো বর্তমান প্রয়োজন -সাধনের ইচ্ছা নহে।

বস্তুত মানুষের মধ্যে এই-যে দুই স্তরের ইচ্ছা আছে ইহার মধ্যে একটা প্রয়োজনের ইচ্ছা, আর-একটা অপ্রয়োজনের ইচ্ছা। একটা যাহা না হইলে কিছুতেই চলে না তাহার ইচ্ছা, এবং অন্যটা যাহা না হইলে অনায়াসেই চলে তাহার ইচ্ছা। আশ্চর্য এই যে মানুষের মনে এই দ্বিতীয় ইচ্ছাটার শক্তি এমন প্রবল যে, সে যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই প্রথম ইচ্ছাটাকে একেবারে ছারখার করিয়া দেয়। তখন সে সুখ-সুবিধা-প্রয়োজনের কোনো দাবিতেই একেবারে কর্ণপাত করে না। তখন সে বলে, 'আমি সুখ চাহি না, আমি আরো'কেই চাই ; সুখ আমার সুখ নহে, আরো'ই আমার সুখ।' তখন সে বলে, 'ভূমৈব সুখম্।'

সুখ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ভূমা নহে। ভূমা সুখ নহে, আনন্দ। সুখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে, সুখের বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নহে। শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, আনন্দ তেমনি করিয়া দুঃখকে অনায়াসেই গ্রহণ করে। এমন-কি, দুঃখের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সার্থক করে, আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই দুঃখের তপস্যাই আনন্দের তপস্যা।

তাই দেখিতেছি, অন্যান্য জন্তুদের ন্যায় মানুষের নীচের ইচ্ছাটা দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা, আর উপরের ইচ্ছাটা দুঃখকে আত্মসাৎ করিয়া আনন্দলাভের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই কেবলই আমাদিগকে বলিতেছে, 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।'

তাই প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে আপন সহজ বোধটুকু লইয়া জন্তু দুঃখনিবৃত্তিচেষ্টার সনাতন গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিল। মানুষ তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞান প্রেম শক্তির কোনো

সীমাতেই বদ্ধ হইতে চাহিল না ; সে বলিল, 'অভ্যাসকে নহে, সংস্কারকে নহে, প্রথাকে নহে, আমি ভূমাকে জানিব।'

তাই যদি হয় তবে এই আরো'র ইচ্ছাকে, এই আনন্দের ইচ্ছাকে, এত করিয়া বশে আনিবার জন্য মানুষের এমন প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন কী ছিল। এই প্রকাণ্ড ইচ্ছার প্রবল স্রোতে চোখ বুজিয়া আত্মসমর্পণ করিলেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব সার্থক হইত।

ইচ্ছাকে বল্‌গাবদ্ধ করিবার প্রধান কারণ এই যে, দুটা ইচ্ছার অধিকারনির্ণয় লইয়া মানুষকে বিষম সংকটে পড়িতে হইয়াছে। আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের একটা ক্ষেত্র আছে, সেখানে আমরা সীমাবদ্ধ। সেখানে আমাদের বাসনাকে তাহার সহজ সীমার চেয়ে জোর করিয়া টানিয়া বাড়াইতে গেলেই বিপদ ঘটিবে। এই সীমানার বেড়াটা কিছু পরিমাণে স্থিতিস্থাপক, এইজন্য কিছু দূর পর্যন্ত তাহা টান সয়। দুঃসাহসে ভর করিয়া সেই টান কেবলই বাড়াইতে গেলে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হয়, ব্যাবিলনের সৌধচূড়া ভাঙিয়া পড়ে ; আমাদের আরো-ইচ্ছার মন্থনদণ্ডকে ঐ দিকেই পাক দিতে গেলে ব্যাধি বিকৃতি ও পাপের বিষ মথিত হইয়া উঠে।

দেখা যাইতেছে, মানুষের অহমের দিকটাই সংকীর্ণ। সেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে যাহাই গ্রহণ করিতে চাও তাহাই বোঝা হইয়া উঠে। নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ, নিজের ক্ষমতাকে অপরিসীম করিবার চেষ্টা আত্মহত্যার চেষ্টা। ও জায়গায় ভূমার ভর একেবারেই সয় না। আহারে বিহারে স্বার্থসাধনে ভূমা অতি বীভৎস।

এই কারণে মানুষের এই আরো'র ইচ্ছাটা যখন মত্ত হস্তীর মতো তাহার ক্ষণভঙ্গুর অহমের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহার বিষম বিপদ। কেবল যদি তাহাতে নিজের ও অন্যের দুঃখ আনিত তাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু, ইহার দুর্গতি তাহার চেয়ে আরও অনেক বেশি। ইহাতে পাপ আনে ; দুঃখের পরিমাপে তাহার পরিমাপ নহে। কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি, কেবলমাত্র দুঃখের দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয় না— এমন-কি, দুঃখের দ্বারা মানুষের মঙ্গল হইতে পারে— কিন্তু, পাপই মানুষের পরম ক্ষতি।

ইহার উল্টা দিকটাও দেখো। মানুষের প্রয়োজনের ইচ্ছা, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ সাংসারিক ইচ্ছা যখন স্বার্থের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পরমার্থের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন সেও বড়ো কুৎসিত। তখন সে কেবলই পুণ্যের হিসাব রাখিতে থাকে। যাহা পূর্ণ-আনন্দ, যাহা সকল ফলাফলের অতীত, তাহাকে ফলাফলের অঙ্কে গুণভাগ করিয়া গণনা করিতে থাকে। এবং সেই গণনার উপর নির্ভর করিয়া মানুষ অহংকৃত হইয়া উঠে, কেবলই বাহ্যিকতার জালে জড়াইয়া পড়ে এবং স্বার্থপর শুচিতাকে কৃপণের

ধনের মতো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অত্যন্ত সাবধানে জমা করিয়া তুলিতে থাকে। তখন সে ভূমার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সাংসারিকের মতো নিজের একটা বেড়া তুলিয়া দিয়া বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। ইহাও পাপের আর-এক মূর্তি। ইহা আধ্যাত্মিককে বাহ্যিক ও পরমার্থকে স্বার্থ করিয়া তোলা।

মানুষের মনে এই-যে একটা পাপের বোধ আসে সে জিনিসটা কী তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমাদের যে মহতী ইচ্ছা আমাদিগকে ভূমার দিকে লইয়া যাইবে তাহাকে ঠিক বিপরীত পথে ক্ষুদ্র অহমের অভিমুখে টানিয়া আনিলে কেবল যে দুঃখ ঘটে তাহা নহে— এমন-কি, স্থলবিশেষে দুঃখ না ঘটিতেও পারে— তাহাতে আমরা ভূমাকে হারাই। আমাদের বড়োর দিক, আমাদের সত্যের দিক, নষ্ট হইয়া যায়; জন্তুর পক্ষে তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু মানুষের পক্ষে তেমন বিনাশ আর-কিছু নাই। এই বিনাশের বোধ সকলের চিত্তে সমান নহে, এমন-কি কারও কারও চিত্তে অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু, মোটের উপর সমগ্র মানবের মনে এই পাপের বোধ দুঃখ-বোধের চেয়ে অনেক বড়ো হইয়া আছে। এতই বড়ো যে বহু দুঃখের দ্বারা মানুষ এই পাপকে ক্ষয় করিতে চায়। পাপ-নামক শব্দের দ্বারা মানুষ নিজের যে-একটি গভীরতম দুর্গতিকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, ইহার দ্বারাই মানুষ আপনার সত্যতম পরিচয় দিয়াছে।

সে পরিচয়টি এই যে, সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র নহে, অনন্তের মধ্যেই মানুষের আনন্দ; অহমের দিকই মানুষের চরম সত্যের দিক নহে, ব্রহ্মের দিকেই তাহার সত্য। মানুষ আপনার মধ্যে যে-একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে ইচ্ছা কোনোমতেই অল্পকে মানিতে চায় না, তাহা দুঃসহ তপস্যার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মানুষের চিত্তকে আনন্দময় মুক্তির অভিমুখে কেবলই প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেমভক্তি ও পবিত্রতায় মানুষের সমস্ত চেতনাধারাকে এক অপরিসীম অতলস্পর্শ অমৃতপারাবারের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মানুষের সেই পরম গতিকে যাহা-কিছু বাধা দেয়, যাহা তাহাকে বিপরীত দিকে টানে, তাহাই পাপ, তাহাই দুর্গতি, তাহাই তাহার মহতী বিনষ্টি।

লোহিত সমুদ্র
২৩ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩১৯

অন্তর বাহির

ভোরে ক্যাবিনে বিছানায় যখন প্রথম ঘুম ভাঙিয়া গেল গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিলাম, সমুদ্রে আজ ঢেউ দিয়াছে; পশ্চিম দিক হইতে বেগে বাতাস বহিতেছে। কান পাতিয়া তরঙ্গের কলশব্দ শুনিতে শুনিতে এক সময় মনে হইল, কোন্-একটা অদৃশ্যযন্ত্রে গান বাজিয়া উঠিতেছে। সে গানের শব্দ যে মেঘগর্জনের মতো প্রবল তাহা নহে, তাহা গভীর এবং বিলম্বিত; কিন্তু, যেমন মৃদঙ্গ-করতালের বলবান শব্দের ঘটার মধ্যে বেহালার একটি তারের একটানা তান সকলকে ছাপাইয়া বুকের ভিতরে বাজিতে থাকে, তেমনি সেই ধীর গম্ভীর সুরের অবিরাম ধারা সমস্ত আকাশের মর্মস্থলকে পূর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল। শেষকালে এমন হইল, আমার মনের মধ্যে যে সুর শুনিতেছিলাম তাহাই কণ্ঠে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু, এরূপ চেষ্টা একটা দৌরাত্ম্য; ইহাতে সেই বড়ো সুরটির শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়; তাই আমি চুপ করিলাম।

একটা কথা আমার মনে হইল, প্রভাতে মহাসমুদ্র আমার মনের যন্ত্রে এই-যে গান জাগাইল তাহা তো বাতাসের গর্জন ও তরঙ্গের কলধ্বনির প্রতিধ্বনি নহে। তাহাকে কিছুতেই এই আকাশব্যাপী জলবাতাসের শব্দের অনুকরণ বলিতে পারি না। তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহা একটি গান; তাহাতে সুরগুলি ফুলের পাপড়ির মতো একটির পরে আর-একটি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটিত হইতেছিল।

অথচ আমার মনে হইতেছিল, তাহা স্বতন্ত্র কিছুই নহে, তাহা এই সমুদ্রের বিপুল শব্দোচ্ছ্বাসেরই অন্তরতর ধ্বনি; এই গানই পূজামন্দিরের সুগন্ধি ধূপের ধূমের মতো আকাশকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ণ করিয়া কেবলই উপরে উঠিতেছে। সমুদ্রের নিশ্বাসে নিশ্বাসে যাহা উচ্ছ্বসিত হইতেছে তাহার বাহিরে শব্দ, তাহার অন্তরে গান।

বাহিরের সঙ্গে ভিতরের একটা যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ অনুরূপতার যোগ নহে; বরঞ্চ দেখিতে পাই, সে যোগ সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যের যোগ। দুই মিলিয়া আছে, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে মিল যে কোন্‌খানে তাহা ধরিবার জো নাই। তাহা অনির্বচনীয় মিল; তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য মিল নহে।

চোখে লাগিতেছে স্পন্দনের আঘাত, আর মনে দেখিতেছি আলো; দেহে ঠেকিতেছে বস্তু, আর চিত্তে জাগিতেছে সৌন্দর্য; বাহিরে ঘটিতেছে ঘটনা, আর অন্তরে ঢেউ খেলাইয়া উঠিতেছে সুখদুঃখ। একটার আয়তন আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায়; আর-একটার আয়তন নাই, তাহা অখণ্ড। এই-যে 'আমি' বলিতে যাহাকে

বুঝি তাহা বাহিরের দিকে কত শব্দ গন্ধ স্পর্শ, কত মুহূর্তের চিন্তা ও অনুভূতি, অথচ এই-সমস্তেরই ভিতর দিয়া যে-একটি জিনিস আপন সমগ্রতায় প্রকাশ পাইতেছে তাহাই আমি এবং তাহা তাহার বাহিরের রূপের প্রতিরূপ মাত্র নহে, বরঞ্চ বাহিরের বৈপরীত্যের দ্বারাই সে ব্যক্ত হইতেছে।

বিশ্বরূপের অন্তরতর এই অপরূপকে প্রকাশ করিবার জন্তই শিল্পীদের গুণীদের এত ব্যাকুলতা। এইজন্ত তাঁহাদের সেই চেষ্টা অনুকরণের ভিতর দিয়া কখনোই সফল হইতে পারে না। অনেক সময়ে অভ্যাসের মোহে আমাদের বোধের মধ্যে জড়তা আসে। তখন, আমরা যাহাকে দেখিতেছি কেবলমাত্র তাহাকেই দেখি। প্রত্যক্ষ রূপ যখন নিজেকেই চরম বলিয়া আমাদের কাছে আত্মপরিচয় দেয় তখন যদি সেই পরিচয়টাকেই মানিয়া লই তবে সেই জড় পরিচয়ে আমাদের চিত্ত জাগে না। তখন পৃথিবীতে আমরা চলি, ফিরি, কাজ করি, কিন্তু পৃথিবীকে আমরা চিত্তদ্বারা গ্রহণ করি না। কারণ, এই পৃথিবীর অন্তরতর অপরূপতাই আমাদের চিত্তের সামগ্রী। অভ্যাসের আবরণ মোচন করিয়া সেই অপরূপতাকে উদ্‌ঘাটিত করিবার কাজেই কবিরা গুণীরা নিযুক্ত।

এইজন্ত তাঁহারা আমাদের অভ্যস্ত রূপটির অনুসরণ না করিয়া তাহাকে খুব একটা নাড়া দিয়া দেন। তাঁহারা এক রূপকে আর-এক রূপের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার চরমতার দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া দেন। চোখে দেখার সামগ্রীকে তাঁহারা কানে শোনার জায়গায় দাঁড় করান, কানে শোনার সামগ্রীকে তাঁহারা চোখে দেখার রেখার মধ্যে রূপান্তরিত করিয়া ধরেন। এমনি করিয়া তাঁহারা দেখাইয়াছেন জগতে রূপ জিনিসটা ধ্রুব সত্য নহে, তাহা রূপকমাত্র; তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি, তবেই আনন্দের মধ্যে পরিত্রাণ।

আমাদের গুণীরা ভেরোঁতে টোড়িতে সুর বাঁধিয়া বলিলেন, ইহা সকালবেলাকার গান। কিন্তু, তাহার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুমাত্র না। তবে ভেরোঁকে টোড়িকে সকালবেলার রাগিণী বলিবার কী মানে হইল। তাহার মানে এই, সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সংগীতটিকে গুণীরা তাঁহাদের অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন। সকালবেলাকার কোনো বহিরঙ্গের সঙ্গে এই সংগীতকে মিলাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

আমাদের দেশের সংগীতের এই বিশেষত্বটি আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে। আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ সায়াহ্ন অর্ধরাত্রি ও বর্ষাবসন্তের রাগিণী রচিত

হইয়াছে। সে রাগিণীর সবগুলি সকলের কাছে ঠিক লাগিবে কি না জানি না। অন্তত আমি সারঙ রাগকে মধ্যাহ্নকালের সুর বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। তা হউক, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবতখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে-একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাহাই জানাইতেছে।

য়ুরোপের বড়ো বড়ো সংগীতরচয়িতারা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিক দিয়া তাঁহাদের গানে বিশ্বের সেই অন্তরের বার্তাই প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহাদের রচনার সঙ্গে যদি তেমন করিয়া পরিচয় হয় তবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। আপাতত য়ুরোপীয় সংগীতসভার বাহির-দেউড়িতে বাজে লোকের ভিড়ের মধ্যে যেটুকু শোনা যায় তাহার সম্বন্ধে দুই-একটা কথা আমার মনে উঠিয়াছে।

আমাদের জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ধ্যার সময় গান-বাজনা করিয়া থাকেন। যখনি সেরূপ বৈঠক বসে আমিও সেই ঘরের এক কোণে গিয়া বসি। বিলাতি গান আমার স্বভাবত ভালো লাগে বলিয়াই যে আমাকে টানিয়া আনে তাহা নহে। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, ভালো জিনিস ভালো লাগার একটা সাধনা আছে। বিনা সাধনায় যাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে তাহা অনেক সময়েই মোহ এবং যাহা নিরন্ত করে তাহাই যথার্থ উপাদেয়। সেইজন্য য়ুরোপীয় সংগীত আমি শুনিবার অভ্যাস করি। যখন আমার ভালো না লাগে তখনো তাহাকে অশ্রদ্ধা করিয়া চুকাইয়া দিই না।

এ জাহাজে একজন যুবক ও দুই-একজন মহিলা আছেন, তাঁহারা বোধ হয় মন্দ গান করেন না। দেখিতে পাই, শ্রোতারা তাঁহাদের গানে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। যেদিন সভা বিশেষ রূপে জমিয়া উঠে সেদিন একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি গান চলিতে থাকে। কোনো গান বা ইংলণ্ডের গৌরবগর্ব, কোনো গান বা হতাশ প্রণয়িনীর বিদায়সংগীত, কোনো গান বা প্রেমিকের প্রেমনিবেদন। সবগুলির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আমি এই দেখি, গানের সুরে এবং গায়কের কণ্ঠে পদে পদে খুব একটা জোর দিবার চেষ্টা। সে জোর সংগীতের ভিতরকার শক্তি নহে, তাহা যেন বাহিরের দিক হইতে প্রয়াস। অর্থাৎ, হৃদয়াবেগের উত্থানপতনকে সুরের ও কণ্ঠস্বরের ঝোঁক দিয়া খুব করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া দিবার চেষ্টা।

ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের হৃদয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের কণ্ঠস্বরের বেগ কখনো মৃদু কখনো প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু, গান তো স্বভাবের নকল নহে; কেননা, গান আর অভিনয় তো এক জিনিস নয়। অভিনয়কে যদি গানের

সঙ্গে মিলিত করি তবে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। তাই জাহাজের সেলুনে বসিয়া যখন ইহাদের গান শুনি তখন আমার কেবলই মনে হইতে থাকে, হৃদয়ের ভাবটাকে ইহারা যেন ঠেলা দিয়া, চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে চায়।

কিন্তু, সংগীতে তো আমরা তেমন করিয়া বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে চাই না। প্রেমিক ঠিকটি কেমন করিয়া অনুভব করিতেছে তাহা তো আমার জানিবার বিষয় নহে। সেই অনুভূতির অন্তরে অন্তরে যে সংগীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই। বাহিরের প্রকাশের সঙ্গে এই অন্তরের প্রকাশ একেবারে ভিন্নজাতীয়। কারণ, বাহিরের দিকে যাহা আবেগ, অন্তরের দিকে তাহাই সৌন্দর্য। ঈথরের স্পন্দন ও আলোকের প্রকাশ যেমন স্বতন্ত্র, ইহাও তেমনি স্বতন্ত্র।

আমরা অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাঁদি ও হাস্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করি, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু, দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের ও সুখের গানে হাস্য-ধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তাহাতে সংগীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয় সন্দেহ নাই। বস্তুত যেখানে অশ্রুর ভিতরকার অশ্রুটি ঝরিয়া পড়ে না এবং হাস্যের ভিতরকার হাস্যটি ধ্বনিয়া উঠে না, সেইখানেই সংগীতের প্রভাব। সেইখানে মানুষের হাসিকান্নার ভিতর দিয়া এমন একটা অসীমের মধ্যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয় যেখানে আমাদের সুখদুঃখের সুরে সমস্ত গাছপালা নদীনির্ঝরের বাণী ব্যক্ত হইয়া উঠে এবং আমাদের হৃদয়ের তরঙ্গকে বিশ্বহৃদয়সমুদ্রেরই লীলা বলিয়া বুঝিতে পারি।

কিন্তু, সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝোঁক দিয়া, হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার মতো সংগীতের নিজের একটা ওঠানামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস; কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ; তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলনাচের খেলা নহে।

অভিনয়-জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা-

সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু, এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিঙের হ্যাম্‌লেট ও ব্রাইড অফ লামার্‌মুর দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।

আর্ট-জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। কারণ, সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। মানবজীবনের সাধনাতেও, যাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান তাঁহারাও বাহ্য উপকরণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সংযমকে আশ্রয় করেন। এইজন্য আত্মার সাধনায় এমন একটি অদ্ভুত কথা বলা হইয়াছে: ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। আর্টেরও চরম সাধনা ভূমার সাধনা। এইজন্য প্রবল আঘাতের দ্বারা হৃদয়কে মাদকতার দোলা দেওয়া আর্টের সত্য ব্যবসায় নহে। সংযমের দ্বারা তাহা আমাদিগকে অন্তরের গভীরতার মধ্যে লইয়া যাইবে, এই তাহার সত্য লক্ষ্য। যাহা চোখে দেখিতেছি তাহাকেই নকল করিবে না, কিম্বা তাহারই উপর খুব মোটা তুলির দাগা বুলাইয়া তাহাকেই অতিশয় করিয়া তুলিয়া আমাদিগকে ছেলে-ভুলাইবে না।

এই প্রবলতার ঝোঁক দিয়া আমাদের মনকে কেবলই ধাক্কা মারিবার চেষ্টা য়ুরোপীয় আর্টের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর য়ুরোপ বাস্তবকে ঠিক বাস্তবের মতো করিয়া দেখিতে চায়। এইজন্য যেখানে ভক্তির ছবি আঁকা দেখি সেখানে দেখিতে পাই, হাত দুখানি জোড় করিয়া মাথা আকাশে তুলিয়া চোখের তারা দুটি উল্টাইয়া ভক্তির বাহ্য ভঙ্গিমা নিরতিশয় পরিস্ফুট করিয়া আঁকা। আমাদের দেশে যে-সকল ছাত্র বিলাতি আর্টের নকল করিতে যায় তাহারা এইপ্রকার ভঙ্গিমার পশ্চাতে ছুটিয়াছে। তাহারা মনে করে, বাস্তবের উপর জোরের সঙ্গে ঝোঁক দিলেই যেন আর্টের কাজ সুসিদ্ধ হয়। এইজন্য নারদকে আঁকিতে গেলে তাহারা যাত্রার দলের নারদকে আঁকিয়া বসে— কারণ, ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখা তো তাহাদের সাধনা নহে; যাত্রার দলে ছাড়া আর তো কোথাও তাহারা নারদকে দেখে নাই।

আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে একদা গ্রীক শিল্পীরা তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল। তাহা উপবাসজীর্ণ কৃশ শরীরের যথাযথ প্রতিরূপ; তাহাতে পাঁজরের প্রত্যেক হাড়টির

হিসাব গণিয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় শিল্পীও তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপবাসের বাস্তব ইতিহাস নাই। তাপসের আন্তর মূর্তির মধ্যে হাড়গোড়ের হিসাব নাই; তাহা ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইবার জন্য নহে। তাহা বাস্তবকে কিছুমাত্র আমল দেয় নাই বলিয়াই সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। ব্যবসায়ী আর্টিস্ট্ বাস্তবের সাক্ষী, আর গুণী আর্টিস্ট্ সত্যের সাক্ষী। বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখি আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাত্ম্যকে খর্ব করিতেই হইবে; বাহিরের রূপটাকে সাহসের সঙ্গে বলিতেই হইবে, 'তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষ্যমাত্র।'

আরব-সমুদ্র
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

খেলা ও কাজ

ভূমধ্য-সাগরের প্রথম ঘাট পোর্ট-সৈয়দ। এইখান হইতে আমাদিগকে য়ুরোপের পারে পাড়ি দিতে হইবে। সন্ধ্যার সময় আমরা বন্দরে পৌঁছিলাম। শহরের বাতায়নগুলিতে তখন আলো জ্বলিয়াছে। আরোহীদিগকে ডাঙায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ছোটো ছোটো নৌকা এবং মোটর-বোট ঝাঁকে ঝাঁকে চারি দিকে আসিয়া আমাদের জাহাজ ঘিরিয়াছে। পোর্ট-সৈয়দের দোকান-বাজার ঘুরিবার জন্য অনেকেই সেখানে নামিলেন। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে নামিলাম না। জাহাজের রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকার সমুদ্র এবং অন্ধকার আকাশ—দুইয়ের সংগমস্থলে অল্প একটুখানি জায়গায় মানুষ আপনার আলো কয়টি জ্বালাইয়া রাত্রিকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে।

পোর্ট-সৈয়দে অনেকগুলি নূতন আরোহী উঠিবার কথা। পুরাতনের দল এই সংবাদে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আর-সমস্ত নূতনকে মানুষ খুঁজিয়া বাহির করে, কিন্তু নূতন মানুষ! এমন উদ্‌বেগের বিষয় আর-কিছুই নাই। সে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে ভিতরে বাহিরে বোঝাপড়া করিয়া লইতেই হইবে। সে তো কেবলমাত্র কৌতূহলের বিষয় নহে। তাহার মন লইয়া সে অন্যের মনকে ঠেলাঠেলি করে। মানুষের ভিড়ের মতো এমন ভিড় আর নাই।

পোর্ট-সৈয়দে যাহারা জাহাজে চড়িল তাহারা প্রায় সকলেই ফরাসি। আমাদের ডেক এখন মানুষে মানুষে ভরিয়া গিয়াছে। এখন পরস্পরের দেহতরী বাঁচাইয়া চলিতে হইলে রীতিমত মাঝিগিরির প্রয়োজন হয়।

সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ডেকের উপর য়ুরোপীয় নরনারীদের প্রতিদিনের কালযাপন আমি আরও কয়েকবার দেখিয়াছি, এবারও দেখিতেছি। প্রথমটাই চোখে পড়ে, ইহারা সর্বদাই চঞ্চল হইয়া আছে। এতটা চাঞ্চল্য আমাদের অভ্যস্ত নহে। আমাদের গরম দেশে আমরা কোনোমতে ঠাণ্ডা থাকিতে চাই— চোখের সামনে অন্য কেহ অস্থিরতা প্রকাশ করিলেও আমাদের গরম বোধ হয়। 'চুপ করো, স্থির থাকো, মিছামিছি কাজ বাড়াইয়ো না' ইহাই আমাদের সমস্ত দেশের অনুশাসন। আর, ইহারা কেবলই বলে, 'একটা-কিছু করা যাক।' এইজন্য ইহারা ছেলে বুড়া সকলে মিলিয়া কেবলই দাপাদাপি করিতেছে। হাসি গল্প খেলা আমোদের বিরাম নাই, অবসান নাই।

অভ্যাসের বাধা সরাইয়া দিয়া আমি যখন এই দৃশ্য দেখি আমার মনে হয়, আমি যেন বাহ্য প্রকৃতির একটা লীলা দেখিতেছি। যেন ঝরনা ঝরিতেছে, যেন নদী চলিতেছে, যেন গাছপালা বাতাসে মাতামাতি করিতেছে। আপনার সমস্ত প্রয়োজন সারিয়াও প্রাণের বেগ আপনাকে নিঃশেষ করিতে পারিতেছে না; তখন সে আপনার সেই উদ্‌বৃত্ত প্রাচুর্যের দ্বারা আপনাকেই আপনি প্রকাশ করিতেছে।

আমরা যখন ছোটো ছেলেকে কোথাও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই তখন কিছু খেলনার আয়োজন রাখি; নহিলে তাহাকে শান্ত রাখা শক্ত হয়। কেননা, তাহার প্রাণের স্রোত তাহার প্রয়োজনের সীমাকে ছাপাইয়া চলিয়াছে। সেই উচ্ছলিত প্রাণের বেগ আপনার লীলার উপকরণ না পাইলে অধীর হইয়া উঠে। এইজন্যই ছেলেদের বিনা কারণে ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহারা যে চেঁচামেচি করে তাহার কোনো অর্থই নাই এবং তাহাদের খেলা দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তির হাসি আসে এবং কাহারও কাহারও বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু, তাহাদের এই খেলার উৎপাত আমাদের পক্ষে যত বড়ো উপদ্রব হউক, খেলা বন্ধ করিলে উপদ্রব আরও গুরুতর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই।

এই-যে য়ুরোপীয় যাত্রীরা জাহাজে চড়িয়াছে, ইহাদের জন্যও কতরকম খেলার আয়োজন রাখিতে হইয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই। আমাদের যদি জাহাজ থাকিত তাহা হইলে তাস পাশা প্রভৃতি অত্যন্ত ঠাণ্ডা খেলা ছাড়া এ-সমস্ত দৌড়ধাপের খেলার ব্যবস্থা করার দিকে আমরা দৃক্‌পাতমাত্র করিতাম না। বিশেষত কয় দিনের জন্য পথ

চলার মুখে এ-সমস্ত অনাবশ্যক বোঝা নিশ্চয়ই বর্জন করিতাম এবং কেহ তাহাতে কিছু মনেও করিত না।

কিন্তু, য়ুরোপীয় যাত্রীদিগকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য খেলা চাই। তাহাদের প্রাণের বেগের মধ্যে প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতিরিক্ত মস্ত একটা পরিশিষ্ট ভাগ আছে, তাহাকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিবে কে। তাহাকে নিয়ত ব্যাপৃত রাখা চাই। এইজন্য খেলনার পর খেলনা জোগাইতে হয় এবং খেলার পর খেলা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখার প্রয়োজন।

তাই দেখি, ইহারা ছেলেবুড়ো কেবলই ছট্‌ফট্ এবং মাতামাতি করিতেছে। সেটা আমাদের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক বলিয়া প্রথমটা কেমন অদ্ভুত ঠেকে। মনে ভাবি, বয়স্ক লোকের পক্ষে এ-সমস্ত ছেলেমানুষি নিরর্থক অসংযমের পরিচয়মাত্র। ছেলেদের খেলার বয়স বলিয়াই খেলা তাহাদিগকে শোভা পায়; কাজের বয়সে এতটা খেলার উৎসাহ অত্যন্ত অসংগত।

কিন্তু, যখন নিশ্চয় বুঝিতে পারি য়ুরোপীয়ের পক্ষে এই চাঞ্চল্য এবং খেলার উদ্যম নিতান্তই স্বভাবসংগত, তখন ইহার একটি শোভনতা দেখিতে পাই। ইহা যেন বসন্ত-কালের অনাবশ্যক প্রাচুর্যের মতো। যত ফল ধরিবে তাহার চেয়ে অনেক বেশি মুকুল ধরিয়াছে। কিন্তু, এই অনাবশ্যক ঐশ্বর্য না থাকিলে আবশ্যকে পদে পদে কৃপণতা ঘটিত।

ইহাদের খেলার মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় নাই। কেননা, এই খেলা অলসের কালযাপন নহে; কেননা, আমরা দেখিয়াছি, ইহাদের প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উদ্যম, ইহার অপ্রতিহত প্রভাব। কী আশ্চর্য ক্ষমতার সঙ্গে ইহারা সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া বিপুল কর্মজাল বিস্তার করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার পশ্চাতে শরীর ও মনের কী অপরিমিত অধ্যবসায় নিযুক্ত। সেখানে কোথাও কিছুমাত্র জড়ত্ব নাই, শৈথিল্য নাই; সতর্কতা সর্বদা জাগ্রত; সুযোগের তিলমাত্র অপব্যয় দেখা যায় না।

যে শক্তি কর্মের উদ্যোগে আপনাকে সর্বদা প্রবাহিত করিতেছে সেই শক্তিই খেলার চাঞ্চল্যে আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছে। শক্তির এই প্রাচুর্যকে বিজ্ঞের মতো অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহা নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অজস্র ত্যাগ করিতেছে, সেইজন্যই নিজেকে বহুগুণে ফিরিয়া পাইতেছে। ইহাই সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না, দুর্লঙ্ঘ্যের রুদ্ধ দ্বারে অহোরাত্র প্রবল বেগে আঘাত করিতেছে।

এই-যে উদ্যত শক্তি, যাহার এক দিকে ক্রীড়া ও অন্য দিকে কর্ম, ইহাই যথার্থ সুন্দর। রমণীর মধ্যে যেখানে আমরা লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখিতে পাই সেখানে আমরা এক দিকে দেখি সাজসজ্জা লীলামাধুর্য, আর-এক দিকে দেখি অক্লান্ত কর্মপরতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুশ্রী। বস্তুত, শক্তিই সৌন্দর্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করে, আর শক্তিহীনতাই শৈথিল্য ও অব্যবস্থার মধ্য দিয়া কেবলই কদর্যতার পঙ্কের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। কদর্যতাই মানুষের শক্তির পরাভব; এইখানেই অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অন্ধ সংস্কার; এইখানেই মানুষ বলে, 'আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম, এখন অদৃষ্টে যাহা করে।' এইখানেই পরস্পরে কেবল বিচ্ছেদ ঘটে, আরব্ধ কর্ম শেষ হয় না, এবং যাহাই গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। শক্তিহীনতাই যথার্থ শ্রীহীনতা।

আমি জাহাজের ডেকের উপরে ইহাদের প্রচুর আমোদ-আহ্লাদের মধ্যেও ইহাই দেখিতে পাই। ইহাদের সমস্ত খেলাধুলার ভিতরে ভিতরে স্বভাবতই একটি বিধান দেখা দেয়। এইজন্য ইহাদের আমোদ-প্রমোদও কোনোমতে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে না। যথাসময়ে যথাবিহিত ভদ্রবেশ প্রত্যেককেই পরিয়া আসিতে হয়। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের ভিতরে ভিতরে নিয়ম প্রচ্ছন্ন আছে; সেই নিয়মের সীমা লঙ্ঘন করিবার জো নাই। বিধানের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়াই ইহাদের আমোদ-আহ্লাদ এমন উচ্ছ্বসিত প্রবল বেগে বিপত্তি বাঁচাইয়া প্রবাহিত হইতে পারে।

এই ডেকের উপরে আর কেহ নহে, কেবল আমাদের দেশের লোকে মিলিত হইয়াছে, সে দৃশ্য আমি মনে মনে কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথমেই দেখা যাইত, কোনো একই ব্যবস্থা দুইজনের মধ্যে খাটিত না। আমাদের অভ্যাস ও আচরণ পরস্পরের সঙ্গে আপনার মিল করিতে জানে না। য়ুরোপীয়দের মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র, আর-একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা সকলের। যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র সে জায়গাটা ইহাদের প্রাইভেট। সেখানটা প্রচ্ছন্ন। সেখানে সকলের অবারিত অধিকার নাই এবং সেই অনধিকারকে সকলেই সহজেই মানিয়া চলে। সেখানে তাহারা নিজের ইচ্ছা ও অভ্যাস অনুসারে আপনার ব্যক্তিগত জীবন বহন করে। কিন্তু, যখনই সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসে তখনই সকলের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়— সে জায়গায় কোনোমতেই তাহারা আপনার প্রাইভেট্‌কে টানিয়া আনে না। এই দুই বিভাগ সুস্পষ্ট থাকাতেই পরস্পর মেলামেশা ইহাদের পক্ষে এত সহজ ও সুশৃঙ্খল। আমাদের মধ্যে এই বিভাগ নাই বলিয়া সমস্ত এলোমেলো হইয়া যায়, কেহ কোনোখানে সীমা মানিতে চায় না। আমরা এই ডেক পাইলে নিজের

প্রয়োজন-মত চলিতাম। পোঁটলা-পুঁটলি যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখিতাম। কেহ বা দাঁতন করিতাম, কেহ বা যেখানে খুশি বিছানা পাতিয়া পথ রোধ করিয়া নিদ্রা দিতাম, কেহ বা হুঁকার জল ফিরাইতাম ও কলিকাটা উপুড় করিয়া ছাই ও পোড়া তামাক যেখানে হোক একটা জায়গায় ঢালিয়া দিতাম, কেহ বা চাকরকে দিয়া শরীর দলাইয়া সশব্দে তেল মাখিতে থাকিতাম। ঘটিবাটি জিনিসপত্র কোথায় কী পড়িয়া থাকিত তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইত না, এবং ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির অন্ত থাকিত না। ইহার মধ্যে যদি কেহ নিয়ম ও শৃঙ্খলা আনিতে চেষ্টামাত্র করিত তাহা হইলে অত্যন্ত অপমান বোধ করিতাম এবং মহা রাগারাগির পালা পড়িয়া যাইত। তাহার পরে অন্য লোকের যে লেখাপড়া কাজকর্ম থাকিতে পারে, কিম্বা মাঝে মাঝে সে তাহার অবসর ইচ্ছা করিতে পারে, সে সম্বন্ধে কাহারও চিন্তামাত্র থাকিত না— হঠাৎ দেখা যাইত, যে বইটা পড়িতেছিলাম সেটা আর-একজন টানিয়া লইয়া পড়িতেছে; আমার দূরবীনটা পাঁচ জনের হাতে হাতে ফিরিতেছে, সেটা আমার হাতে ফিরাইয়া দিবার কোনো তাগিদ নাই; অনায়াসেই আমার টেবিলের উপর হইতে আমার খাতাটা লইয়া কেহ টানিয়া দেখিতেছে, বিনা আহ্বানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গল্প জুড়িয়া দিতেছে, এবং রসিক ব্যক্তি সময় অসময় বিচার না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছে, কণ্ঠে স্বরমাধুর্যের অভাব থাকিলেও কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেছে না। যেখানে যেটা পড়িত সেখানে সেটা পড়িয়াই থাকিত। যদি ফল খাইতাম তবে তাহার খোসা ও বিচি ডেকের উপরেই ছড়ানো থাকিত, এবং ঘটিবাটি চাদর মোজা গলাবন্দ হাজার বার করিয়া খোঁজাখুঁজি করিতে করিতেই দিন কাটিয়া যাইত।

ইহাতে যে কেবল পরস্পরের অসুবিধা ঘটিত তাহা নহে, সুখ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য চারি দিক হইতে অন্তর্ধান করিত। ইহাতে আমোদ-আহ্লাদও অব্যাহত হইত না এবং কাজকর্মের তো কথাই নাই। যে শক্তি কর্মের মধ্যে নিয়মকে মানিয়া সফল হয় সেই শক্তিই আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে নিয়মকে রক্ষা করিয়া তাহাকে সরস ও সুন্দর করিয়া তোলে। যোদ্ধা যেমন স্বভাবতই আপনার তলোয়ারকে ভালোবাসিয়া ধারণ করে, শক্তিমান তেমনি স্বভাবতই নিয়মকে আন্তরিক প্রীতির সহিত রক্ষা করে। কারণ, ইহাই তাহার অস্ত্র; শক্তি যদি নিয়মকে না মানে তবে আপনাকেই ব্যর্থ করে।

শক্তি এই-যে নিয়মকে মানে সে কেবল নিয়মকে মানিবার জন্য নহে, আপনাকেই মানিবার জন্য। আর, শক্তিহীনতা যখন নিয়মকে মানে তখন সে নিয়মকেই মানে; তাহা সে ভয়ে হোক, লোভে হোক, বা কেবলমাত্র চিরাভ্যাসের জড়ত্ব-বশত হোক,

নিয়মকে নতশিরে হইয়া শিরোধার্য করিয়া লয়। কিন্তু, যেখানে সে বাধ্য নয়, যেখানে কেবল নিজের খাতিরেই নিয়ম স্বীকার করিতে হয়, দুর্বলতা সেইখানেই নিয়মকে ফাঁকি দিয়া নিজেকে ফাঁকি দেয়। সেখানেই তাহার সমস্ত কুশ্রী ও যদৃচ্ছাকৃত।

যে দেশে মানুষকে বাহিরের শাসন চালনা করিয়া আসিয়াছে, যেখানেই মানুষের স্বাধীন শক্তিকে মানুষ শ্রদ্ধা করে নাই এবং রাজা গুরু ও শাস্ত্র বিনা যুক্তিতে মানুষকে তাহার হিতসাধনে বলপূর্বক প্রবৃত্ত করিয়াছে, সেখানেই মানুষ আত্মশক্তির আনন্দে নিয়মপালনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মানুষকে বাঁধিয়া কাজ করানো একবার অভ্যাস করাইলেই, বাঁধন কাটিয়া আর তাহার কাছে কাজ পাওয়া যায় না। এইজন্য যেখানে আমরা নিয়ম মানি সেখানে দাসের মতো মানি, যেখানে মানি না সেখানে দাসের মতোই ফাঁকি দিই। সেইজন্য যখন আমাদের সমাজের শাসন ছিল তখন জলাশয়ে জল, চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা, পান্থশালায় আশ্রয় সহজে মিলিত; যখন সামাজিক বাহ্য শাসন শিথিল হইয়াছে তখন আমাদের রাস্তা নাই, ঘাট নাই, জলাশয়ে জল নাই, সাধারণের অভাব দূর ও লোকের হিতসাধন করিবার কোনো স্বাভাবিক শক্তি কোথাও উদ্‌বোধিত হইয়া কাজ করিতেছে না। হয় আমরা দৈবকে নিন্দা করিতেছি নয় সরকার-বাহাদুরের মুখ চাহিয়া আছি।

কিন্তু, এ-সকল বিষয়ে কোন্‌টা যে কার্য এবং কোন্‌টা কারণ তাহা ঠাহর করিয়া বলা শক্ত। যাহারা বাহিরে নিয়মকে অবাধে শৃঙ্খল করিয়া পরে বাহিরের নিয়ম তাহাদিগকেই বাঁধে; যাহারা নিজের শক্তির প্রাবল্যে সে নিয়মকে কোনোমতেই অন্ধভাবে স্বীকার করিতে পারে না তাহারাই আপনার আনন্দে আপনার নিয়মকে উদ্ভাবিত করিবার অধিকার লাভ করে। নতুবা, এই অধিকারকে হাতে তুলিয়া দিলেই ইহাকে ব্যবহার করা যায় না। স্বাধীনতা বাহিরের জিনিস নহে ভিতরের জিনিস, সুতরাং তাহা কাহারও কাছ হইতে চাহিয়া পাইবার জো নাই। যতক্ষণ নিজের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা আমরা সেই স্বাধীনতাকে লাভ না করি ততক্ষণ নানা আকারে বাহিরের শাসন আমাদের চোখে ঠুলি দিয়া ও গলায় দড়ি বাঁধিয়া চালনা করিবেই। ততক্ষণ আমরা মুখে যাহাই বলি, কাজের বেলায় আপনি আপনা হইতেই যেখানে সুযোগ পাইব সেখানেই অন্যের প্রতি অনুশাসন প্রবর্তিত করিতে চাহিব। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার-লাভের বেলায় য়ুরোপীয় ইতিহাসের বচন আওড়াইব, আর সমাজনৈতিক গৃহনৈতিক ক্ষেত্রে কেবলই জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি কনিষ্ঠের ও প্রবল যিনি তিনি দুর্বলের অধিকারকে সংকুচিত করিতে থাকিব। আমরা যখন কাহারও ভালো করিতে চাহিব সে আমারই নিজের মতে, আমারই নিজের নিয়মে; যাহার ভালো

করিতে চাই তাহাকে তাহার নিজের নিয়মে ভালো হইতে দিতে আমরা সাহস করি না। এমনি করিয়া দুর্বলতাকে আমরা অস্থিমজ্জার মধ্যে পোষণ করিতে থাকি, অথচ সবলের অধিকারকে আমরা বাহিরের দিক হইতে স্বপ্নলব্ধ দৈবসম্পত্তির মতো লাভ করিতে চাই।

এইজন্যই পরম বেদনার সহিত দেখিতেছি, যেখানেই আমরা সম্মিলিত হইয়া কোনো কাজ করিতে গিয়াছি, যেখানেই নিজেদের নিয়মের দ্বারা নিজেদের কোনো প্রতিষ্ঠানকে চালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি, সেখানেই পদে পদে বিচ্ছেদ ও শৈথিল্য প্রবেশ করিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দিতেছে। বাহিরের কোনো শত্রুর হাত হইতে নহে, কিন্তু অন্তরের এই শক্তিহীনতা শ্রীহীনতা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা, ইহাই আমাদের একটিমাত্র সমস্যা। যে নিয়ম মানুষের গলার হার তাহাকে পায়ের বেড়ি করিয়া পরিব না, এই কথা একদিন আমাদিগকে সমস্ত মনের সঙ্গে বলিতে হইবে। এই কথা স্পষ্ট করিয়া জানিতে হইবে যে, সত্যকে যেমন করিয়া হউক মানিতেই হইবে— কিন্তু সত্যকে যখন অন্তরের মধ্যে মানি তখনি তাহা আনন্দ, বাহিরে যখন মানি তখনি তাহা দুঃখ। অন্তরে সত্যকে মানিবার শক্তি যখন না থাকে তখনি বাহিরে তাহার শাসন প্রবল হইয়া উঠে। সেজন্য যেন বাহিরকেই ধিক্কার দিয়া নিজেকে অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দিবার চেষ্টা না করি।

লণ্ডনে

সমুদ্রের পালা শেষ হইল। শেষ দুই দিন প্রবল বেগে বাতাস উঠিল; তাহাতে সমুদ্রের আন্দোলনের সমতালে আমাদের আভ্যন্তরিক আলোড়ন চলিতে লাগিল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, ইহাতে সমুদ্রের অপরাধ নাই, কাপ্তেনেরই দোষ। যেদিন পৌঁছিবার কথা ছিল তাহার দুই দিন পরে পৌঁছিয়াছি। বরুণদেব নিশ্চয়ই এই দুর্বলান্তঃকরণ যাত্রীটির জন্য ঠিকমত হিসাব করিয়া ঝড়-বাতাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন— কিন্তু, মানুষের হিসাব ঠিক রহিল না।

মার্সেল্‌স্ হইতে এক দৌড়ে পারিসে আসিয়া এক দিনের মতো হাঁপ ছাড়িলাম। শরীর হইতে সমুদ্রের নিমক সাফ করিয়া ফেলিয়া ডাঙার হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম। আনাহারের পর একটা মোটর-গাড়িতে চড়িয়া পারিসের রাস্তায় রাস্তায় একবার হুহু করিয়া ঘুরিয়া আসিলাম।

বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, পারিস সমস্ত য়ুরোপের খেলাঘর। এখানে রঙ্গশালার প্রদীপ আর নেবে না। চারি দিকে আমোদ-আহ্লাদের বিরাট আয়োজন। মানুষকে খুশি করিবার জন্য সুন্দরী পারিস-নগরীর কতই সাজসজ্জা। এই কথাই কেবল মনে হয়, মানুষকে খুশি করাটা সহজে সারিবার কোনো চেষ্টা নাই।

যখন পৃথিবীতে রাজাদের একাধিপত্যের দিন ছিল তখন প্রমোদের চূড়ান্ত ছিল কেবল রাজারই ঘরে। এখন সমস্ত মানুষ রাজা। এই সমগ্র মানুষের বিলাসভবনটি কী প্রকাণ্ড ব্যাপার। ইহার জন্য কত দাস যে অহোরাত্র খাটিয়া মরিতেছে তাহার সীমা নাই। ইহার জন্য প্রত্যহ কত জাহাজ, কত রেলগাড়ি বোঝাই করিয়া পৃথিবীর কত দুর্গম দেশ হইতে উপকরণ আসিতেছে তাহার ঠিকানা কে রাখে।

এই মানুষ-রাজার আমোদ এমন প্রকাণ্ড, এমন বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাকে অলস বিলাসীর প্রমোদের সঙ্গে তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা প্রবল চিত্তের প্রবল আমোদ ; যে সহজে সন্তুষ্ট হইতে চায় না তাহাকে খুশি করিবার দুঃসাধ্য সাধন। বহু লোক ভোগ করিতে করিতে এবং বহু লোক ভোগ জোগাইতে জোগাইতে এই প্রমোদ-পারাবারের মধ্যে তলাইয়া মরিতেছে, কিন্তু তবুও মোটের উপরে ইহার ভিতর হইতে মানুষের যে একটা বিজয়ী শক্তির মূর্তি দেখা যাইতেছে তাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না।

রবিবারের দিন ক্যালে হইতে সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ডোভারে পৌঁছিলাম। সেখানে ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে যখন রেলগাড়িতে চড়িয়া বসিলাম তখন মনের মধ্যে ভারি একটি আরাম বোধ হইল। মনে হইল, আত্মীয়দের মধ্যে আসিয়াছি। ইংরেজের যে ভাষা জানি। মানুষের ভাষা যে আলোর মতো। এই ভাষা যত দূর ছড়ায় তত দূর মানুষের হৃদয় আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলে। ইংরেজের ভাষা যখনি পাইয়াছি তখনি ইংরেজের মন পাইয়াছি। যাহা জানা যায় তাহাতেই আনন্দ। ফ্রান্সে আমার পক্ষে কেবল চোখের জানা ছিল, কিন্তু হৃদয়ের জানা হইতে বঞ্চিত ছিলাম— সেইজন্যই আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। ডোভারে পা দিতেই আমার মনে হইল, সেই ব্যাঘাত আমার কাটিয়া গেল ; যেখানে দাঁড়াইলাম সেখানে কেবল যে মাটির উপর দাঁড়াইলাম তাহা নহে, মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

অনেক কাল পরে লণ্ডনে আসিলাম। তখনো লণ্ডনের রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় দেখিয়াছি, কিন্তু এখন মোটর-গাড়ির একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। তাহাতে শহরের ব্যস্ততা আরও প্রবলভাবে মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। মোটর-রথ, মোটর-বিশ্ববহ (অম্নিবাস), মোটর-মালগাড়ি লণ্ডনের নাড়ীতে নাড়ীতে শতধারায় ছুটিয়া

চলিতেছে। আমি ভাবি, লণ্ডনের সমস্ত রাস্তার ভিতর দিয়া কেবলমাত্র এই চলিবার বেগ পরিমাণে কী ভয়ানক প্রকাণ্ড! যে মনের বেগের ইহা বাহ্যমূর্তি তাহাই বা কী ভীষণ! দেশ-কালকে লইয়া কী প্রচণ্ড বলে ইহারা টানাটানি করিতেছে। পথ দিয়া পদাতিক যাহারা চলিতেছে প্রতিদিন তাহাদের সতর্কতা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। মন অন্য যে-কোনো ভাবনাই ভাবুক-না কেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের এই বিচিত্র গতিবিধির সঙ্গে তাহাকে প্রতিনিয়ত আপোষ করিয়া চলিতে হইবে। হিসাবের ভুল হইলেই বিপদ। হিংস্র পশুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রয়াসে হরিণের সতর্কতাবৃত্তি যেমন প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে ব্যস্ততার তাড়া খাইয়া খাইয়া এখানকার মানুষের সাবধানতা তেমনি অসামান্য তীক্ষ্ণতা লাভ করিতেছে। দ্রুত দেখা, দ্রুত শোনা ও দ্রুত চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবার শক্তি কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতে শুনিতে ও ভাবিতে যাহার সময় লাগে সেই এখানে হটিয়া যাইবে।

ক্রমে বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটিতেছে। যে যত্ন ও প্রীতি পাইতেছি তাহা বিদেশীর হাত হইতে পাইতেছি বলিয়া আমার কাছে দ্বিগুণ মূল্যবান হইয়া উঠিতেছে; মানুষ যে মানুষের কত নিকটের তাহা দূরত্বের মধ্য দিয়াই নিবিড়তর করিয়া অনুভব করা যায়।

ইতিমধ্যে একদিন আমি 'নেশন' পত্রের মধ্যাহ্নভোজে আহূত হইয়াছিলাম। নেশন এখানকার উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। ইংলণ্ডে যে-সকল মহাত্মা স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার ঝুঁটা বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অন্যায়কে যাঁহারা কোনো ছুতায় কোথাও আশ্রয় দিতে চান না, যাঁহারা সমস্ত মানবের অকৃত্রিম বন্ধু, নেশন তাঁহাদেরই বাণী বহন করিবার জন্য নিযুক্ত।

নেশন পত্রের সম্পাদক ও লেখকেরা সপ্তাহে একদিন মধ্যাহ্নভোজে একত্র হন। এখানে তাঁহারা আহার করিতে করিতে আলাপ করেন ও আহারান্তে আগামী সপ্তাহের প্রবন্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের লেখকেরা সকলেই পাণ্ডিত্যে ও দক্ষতায় অসামান্য ব্যক্তি। সেদিন ইঁহাদের আলোচনা-ভোজে স্থান পাইয়া আমি বড়োই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

ইঁহাদের মধ্যে বসিয়া আমার বারম্বার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, ইঁহারা সকলেই জানেন ইঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি সত্যকার দায়িত্ব আছে। ইঁহারা কেবল বাক্য রচনা করিতেছেন না, ইঁহাদের প্রত্যেক প্রবন্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতরীর হালটাকে ডাইনে বা বাঁয়ে কিছু-না-কিছু টান দিতেছেই। এমন অবস্থায় লেখক

লেখার মধ্যে আপনার সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের দেশে খবরের কাগজে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই ; আমরা লেখকের কাছে কোনো দায়িত্ব দাবি করি না, এই কারণে লেখকের শক্তি সম্পূর্ণ আলস্য ত্যাগ করে না ও ফাঁকি দিয়া কাজ সারিয়া দেয়। এইজন্য আমাদের সম্পাদকেরা লেখকদের শিক্ষা ও সতর্কতার কোনো প্রয়োজন দেখেন না, যে-সে লোক যাহা-তাহা লেখেন এবং পাঠকেরা তাহা নির্বিচারে পড়িয়া যান। আমরা সত্যক্ষেত্রে চাষ করিতেছি না বলিয়াই আমাদের মঞ্জরীতে শস্য-অংশ অতি সামান্য দেখা যায়— মনের খাদ্য পুরাপুরি জন্মিতেছে না।

আমাদের দেশে রাজ্যনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনাসভা আমি দেখিয়াছি ; তাহাতে কথার চেয়ে কণ্ঠের জোর কত বেশি! এখানে কিরূপ প্রশান্ত ভাবে এবং কিরূপ প্রণিধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। মতের অনৈক্যের দ্বারা বিষয়কে বাধা না দিয়া তাহাকে অগ্রসরই করিয়া দিল। অনেকে মিলিয়া কাজ করিবার অভ্যাস ইহাদের মধ্যে কত সহজ হইয়াছে তাহা এই ক্ষণকালের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম। ইহাদের কাজ গুরুতর, অথচ কাজের প্রণালীর মধ্যে অনাবশ্যক সংঘর্ষ ও অপব্যয় লেশমাত্র নাই। ইহাদের রথ প্রকাণ্ড, তাহার গতিও দ্রুত, কিন্তু তাহার চাকা অনায়াসে ঘোরে এবং কিছুমাত্র শব্দ করে না।

বন্ধু

লণ্ডনে আসিয়া একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম ; মনে হইল, এখানকার লোকালয়ের দেউড়িতে আনাগোনার পথে আসিয়া বসিলাম। ভিতরে কী হইতেছে খবর পাই না, লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হয় না— কেবল দেখি, মানুষ যাইতেছে আর আসিতেছে। এইটুকুই চোখে পড়ে, মানুষের ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা নাই ; এত অত্যন্ত বেশি দরকার কিসের তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই প্রচণ্ড ব্যস্ততার ধাক্কাটা কোন্‌খানে গিয়া লাগিতেছে, তাহাতে ক্ষতি করিতেছে কি বৃদ্ধি করিতেছে তাহার কোনো হিসাব কেহ রাখিতেছে কি না কিছুই জানি না। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজে, আহারের স্থানে গিয়া দেখি— এক-একটা ছোটো টেবিল ঘেরিয়া দুই-তিনটি করিয়া স্ত্রীপুরুষ নিঃশব্দে আহার করিতেছে ; পাত্র হাতে দীর্ঘকায় পরিবেশক গম্ভীরমুখে দ্রুতপদে ক্ষিপ্রহস্তে পরিবেষণ করিয়া চলিয়াছে ; কেহ কেহ বা খাইতে খাইতেই খবরের কাগজ পড়া সারিয়া লইতেছে ; তাহার পরে ঘড়িটা খুলিয়া একবার

তাকাইয়া, টুপিটা মাথায় চাপিয়া দিয়া, হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে; ঘর শূন্য হইতেছে। কেবল আহারের সময় বারকয়েক কয়েকজন মানুষ একত্র হয়, তাহার পরে কে কোথায় যায় কেহ তাহার ঠিকানা রাখে না। আমার কোনো প্রয়োজন নাই; সকলের দেখাদেখি মিথ্যা এক-একবার ঘড়ি খুলিয়া দেখি, আবার ঘড়ি বন্ধ করিয়া পকেটে রাখি। যখন আহারেরও সময় নয়, নিদ্রারও সময় নহে, তখন হোটেল যেন ডাঙায় বাঁধা নৌকার মতো— তখন যদি সেখানে থাকিতে হয় তবে কেন যে আছি তাহার কোনো কৈফিয়ত ভাবিয়া পাওয়া যায় না। যাহাদের বাসস্থান নাই, কেবল কর্মস্থানই আছে, তাহাদেরই পক্ষে হোটেল মানায়। যাহারা আমার মতো নিতান্ত অনাবশ্যক লোক তাহাদের পক্ষে বাসের আয়োজনটা এমনতরো পাইকারি রকমের হইলে পোষায় না। জানলা খুলিয়া দেখি, জনস্রোত নানা দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনে মনে ভাবি, ইহারা যেন কোন্-এক অদৃশ্য কারিগরের হাতুড়ি। যে জিনিসটা গড়িয়া উঠিতেছে সেটাও মোটের উপর অদৃশ্য; মস্ত একটা ইতিহাসের কারখানা; লক্ষ লক্ষ হাতুড়ি দ্রুত প্রবল বেগে লক্ষ লক্ষ জায়গায় আসিয়া পড়িতেছে। আমি সেই এঞ্জিনের বাহিরে দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকি— ক্ষুধার স্টীমে চালিত সজীব হাতুড়িগুলা দুর্নিবার বেগে ছুটিতেছে, ইহাই দেখিতে পাই।

যাহারা বিদেশী, প্রথম এখানে আসিয়া এখানকার ইতিহাসবিধাতার এই অতি-বিপুল মানুষ-কলের চেহারাটাই তাহাদের চোখে পড়ে। কী দাহ, কী শব্দ, কী চাকার ঘূর্ণি। এই লণ্ডন শহরের সমস্ত গতি, সমস্ত কর্মকে একবার চোখ বুজিয়া ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করি— কী ভয়ঙ্কর অধ্যবসায়। এই অবিশ্রাম বেগ কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে আঘাত করিতেছে এবং কোন্ অব্যক্তকে প্রকাশের অভিমুখে জাগাইয়া তুলিতেছে।

কিন্তু, মানুষকে কেবল এই যন্ত্রের দিক হইতে দেখিয়া তো দিন কাটে না। যেখানে সে মানুষ সেখানে তাহার পরিচয় না পাইলে কী করিতে আসিলাম! কিন্তু, মানুষ যেখানে কল সেখানে দৃষ্টি পড়া যত সহজ, মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তত সহজ নহে। ভিতরকার মানুষ আপনি আসিয়া সেখানে ডাকিয়া না লইয়া গেলে প্রবেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু, সে তো থিয়েটারের টিকিট কেনার মতো নহে; সে দাম দিয়া মেলে না, সে বিনা মূল্যের জিনিস।

আমার সৌভাগ্যক্রমে একটি সুযোগ ঘটিয়া গেল— আমি একজন বন্ধু[১]র দেখা

১ উইলিয়ম রোটেন্স্টাইন (William Rothenstein)

পাইলাম। বাগানের মধ্যে গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ। এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বন্ধু হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। মানুষকে সঙ্গদান করিবার শক্তি তাঁহাদের অসামান্য এবং স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৃথিবীতে কাহাকেও না কাহাকেও ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসিলেও বন্ধু হইবার শক্তি আমাদের সকলের নাই। বন্ধু হইতে গেলে সঙ্গদান করিতে হয়। অন্যান্য সকল দানের মতো এ দানেরও একটা তহবিল দরকার, কেবলমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট নহে। রত্ন হইতে জ্যোতি যেমন সহজেই ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি বিশেষ ক্ষমতাশালী মানুষের জীবন হইতে সঙ্গ আপনি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। প্রীতিতে প্রসন্নতাতে সেবাতে শুভ-ইচ্ছাতে এবং করুণাপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে জড়িত এই-যে সহজ সঙ্গ, ইহার মতো দুর্লভ সামগ্রী পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। কবি যেমন আপনার আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করেন, তেমনি যাঁহারা স্বভাববন্ধু তাঁহারা মানুষের মধ্যে আপন আনন্দকে প্রতিদিনের জীবনে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমি এখানে যে বন্ধুটিকে পাইলাম তাঁহার মধ্যে এই আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়ার অবারিত ক্ষমতা আছে। এইরূপ বন্ধুত্বধনে ধনী লোককে লাভ করার সুবিধা এই যে, একজনকে পাইলেই অনেককে পাওয়া যায়। কেননা, ইহাদের জীবনের সকলের চেয়ে প্রধান সঞ্চয় মনের মতো মানুষ-সঞ্চয়।

ইনি একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর; ইনি অল্পকাল পূর্বে অল্পদিনের জন্য ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। সেই অল্পকালের মধ্যে ইনি ভারতবর্ষের মর্মস্থানটি দেখিয়া লইয়াছেন। হৃদয় দিয়া দেখা চোখে দেখারই মতো— ইহা বিশ্লেষণের ব্যাপার নহে, সুতরাং ইহাতে বেশি সময় লাগে না। হৃদয়দৃষ্টি সম্বন্ধে কত জন্মান্ধ ভারতবর্ষে জীবন কাটাইয়া দিতেছে; তাহারা আমাদের দেশের সেই আলোকটিকেই দেখিল না যাহাকে দেখিলে আর সমস্তকেই অনায়াসে দেখা যায়। যাহাদের দেখিবার চোখ আছে তাহাদের অল্পকালের পরিচয় অন্ধের চিরজীবনের পরিচয়ের চেয়ে বেশি।

ভারতবর্ষে ইহার সঙ্গে আমার ক্ষণকালের জন্য আলাপ হইয়াছিল। ইহার সহৃদয়তা সর্বদাই এমন অবাধে প্রকাশ পায় যে তখনি আমার চিত্ত ইহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারিব এই লোভটি য়ুরোপে যাত্রার সময় আমাকে সকলের চেয়ে টানিয়াছিল।

ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিবা মাত্র এক মুহূর্তে হোটেলের দেউড়ি পার হইয়া গেলাম— কেহ আর বাধা দিবার রহিল না। ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে যেখানে তামাসা ভালো

করিয়া দেখা যায় না, সেখানে বাপ যেমন ছোটো ছেলেকে নিজের কাঁধের উপর চড়িয়া বসিবার জায়গা করিয়া দেন, তেমনি লণ্ডন শহর দুই-এক জায়গায় আপনার উচ্চ কাঁধের উপর ফাঁকা জায়গা রাখিয়া দিয়াছে; তাহার যে-সব ছেলেরা ভিড়ের লোকের মাথা ছাড়াইয়া আরও দূরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে চায় তাহাদের পক্ষে এই জায়গাগুলির বিশেষ প্রয়োজন আছে। লণ্ডনের হ্যাম্পস্টেড্-হীথ্ সেই জাতের একটি উচ্চ পাহাড়ে প্রান্তর; লণ্ডন এইখানে আপনার হইতে আপনাকে যেন তুলিয়া ধরিয়াছে। এখানে শহরের পাষাণহৃদয়ের একটি প্রান্ত এখনো নবীন ও শ্যামল আছে, এবং তাহার ভয়ংকর আপিসের ভিড়ের মধ্যে এই জায়গাটিতে এখনো তাহার খোলা আকাশের জানলার ধারে একলা বসিবার আসন পাতা আছে।

আমার বন্ধুর বাড়িটির পিছন দিকে ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোটো একটুকরা বাগান আছে। ঐটুকু বাগান আনন্দিত ছোটো ছেলের আঁচলটির মতো ফুলের সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই বাগানের দিকে মুখ করিয়া তাঁহাদের বৈঠকখানা-ঘরের সংলগ্ন একটি লম্বা বারান্দা অপর্যাপ্ত ফুলের স্তবকে আমোদিত গোলাপের লতায় অর্ধপ্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই বারান্দায় আমি যখন খুশি একখানা বই হাতে করিয়া বসি, তাহার পরে আর বই পড়িবার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। ইহার দুটি ছোটো ছেলে ও ছোটো মেয়ের মধ্যে বাল্যবয়সের চিরানন্দময় নবীনতার উচ্ছ্বাস দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগে। আমাদের দেশের ছেলেদের সঙ্গে ইহাদের আমি একটা গভীর প্রভেদ দেখিতে পাই। আমার মনে হয়, যেন আমরা অত্যন্ত পুরাতন যুগের মানুষ; আমাদের দেশের শিশুরাও যেন কোথা হইতে সেই পুরাতনত্বের বোঝা পিঠে করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা ভালোমানুষ, তাহাদের গতিবিধি সংযত, তাহাদের বড়ো বড়ো কালো চোখদুটি করুণ— তাহারা বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, আপনার মনেই যেন তাহার মীমাংসা করিতে থাকে। আর এই-সব ছেলেরা পৃথিবীর নবীনযুগের মহলে জন্মিয়াছে; তাহারা জীবনের নবীনতার আস্বাদে মাতিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের সমস্তই ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিয়া-কর্মিয়া লইতে হইবে, এইজন্য সব জায়গাতেই তাহাদের চঞ্চল পা ছুটিতে চায় এবং সকল জিনিসেই তাহাদের চঞ্চল হাত গিয়া পড়ে। আমাদের দেশের ছেলেদেরও একটা স্বাভাবিক চঞ্চলতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অচঞ্চলতার ভারাকর্ষণ তাহাকে সর্বদাই যেন অনেকটা পরিমাণে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সেই অদৃশ্য ভারটা নাই বলিয়া ইহাদের জীবন তরুণ ঝরনার মতো কলশব্দে নৃত্য করিতে করিতে কেবলই যেন ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে।

আমাদের বন্ধুর গৃহিণীও বন্ধুবৎসলা। তাঁহার স্বামীর বিস্তৃত বন্ধুমণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহাকে স্ত্রীর কর্তব্য পালন করিতে হয়। তাহাদের সেবা যত্ন করা, তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধকে সর্বাংশে সুন্দররূপে স্তম্ভ করিয়া তোলা, রোগে শোকে তাহাদের সংবাদ লওয়া ও সান্ত্বনা করা, ইহা তাঁহার সাংসারিক কর্তব্যের একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা তো কেবল স্বজনসমাজের আত্মীয়তা নহে, ইহা বন্ধুসমাজের আত্মীয়তা— এই বৃহৎ আত্মীয়তার মর্মস্থলে সাধ্বী স্ত্রীর যে আসন তাহা এ দেশে শূন্য নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বন্ধুটি স্বভাববন্ধু— তাঁহার বন্ধুত্বের প্রতিভা অসামান্য। ইঁহার পক্ষে বন্ধুত্ব জিনিসটি সত্য বলিয়াই ইঁহাকে বিশেষ যত্নে বন্ধু বাছিয়া লইতে হয়। যে লোক খাঁটি আর্টিস্ট্ নয় সে যেমন কেবলমাত্র দস্তুর রক্ষার জন্য ঘর সাজাইবার উপলক্ষ্যে যেমন-তেমন ছবি বাঁধাইয়া দেয়ালে টাঙাইয়া কোনোমতে শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারে কিন্তু যে লোক খাঁটি আর্টিস্ট্, ছবি যাহার পক্ষে সত্যবস্তু, সে স্বভাবতই বাজে ছবি দিয়া ঘর ভরিতে পারে না, সে আপনার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা ছবি বাছিয়া লয়— ইনিও তেমনি কেবলমাত্র বাজে পরিচিতবর্গের সামাজিক ভাবের দ্বারা আপনাকে আক্রান্ত করেন নাই। ইঁহার সঙ্গে যাঁহাদের সম্বন্ধ আছে সকলেই ইঁহার বন্ধু এবং সকলেই গুণী এবং বিশেষভাবে সমাদরের যোগ্য।

এমনতরো বরেণ্য বন্ধুমণ্ডলীকে যিনি আপনার চার দিকে ধরিয়া রাখিতে পারেন তাঁহার যে বিশেষ গুণের দরকার সে কথা বলাই বাহুল্য। ইনি রসজ্ঞ। মৌমাছি যেমন ফুলের মধুকোষের গোপন রাস্তাটি অনায়াসে বাহির করিতে পারে ইনিও তেমনি রসের পথে অনায়াসে প্রবেশ করেন; ভালো জিনিসকে একেবারেই দ্বিধাবিহীন জোরের সঙ্গে ধরিতে পারেন। ভালো লাগা এবং ভালো বলার সম্বন্ধে অনেক লোকেরই একটা ভীরুতা আছে, 'পাছে ভুল করিয়া অপদস্থ হই' এ ভয় তাহারা ছাড়িতে পারে না। এইজন্য ভালোকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার বেলায় তাহারা বরাবর অন্য লোকের পিছনে পড়িয়া যায়। ইঁহার বোধশক্তির মধ্যে একটি যথার্থ প্রবলতা আছে বলিয়াই ইঁহার সেই ভয় নাই। এমনি করিয়া তিনি যে মৌমাছির মতো কেবলমাত্র মধু-রসটিকেই আহরণ করিতে জানেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে ফুলটিকেও ভালোবাসিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। তিনি ভোগী নহেন, তিনি প্রেমিক। এইজন্য তিনি গ্রহণও করেন, তিনি দানও করেন।

অপরিচয় হইতে পরিচয়ের পথ অতি দীর্ঘ। সেই দুঃসাধ্য পথ অতিক্রম করিবার মতো সময় আমার ছিল না। আমার শক্তিও অল্প। বরাবর কোণে থাকা অভ্যাস বলিয়া নিজের জোরে ভিড় ঠেলিয়া-ঠুলিয়া ইপ্সিত জায়গাটিতে পৌঁছানোর চেষ্টা

করিতেও আমি পারি না। তা ছাড়া ইংরেজি ভাষার সদর দরজার চাবিটা আমার হাতে নাই ; আমাকে কেবলই বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে হয়— তেমন করিয়া পথ চলা একটা ব্যায়াম, তেমনভাবে আপনার স্বভাবকে রক্ষা করিয়া চলা যায় না। নিজেকে অবাধে পরিচিত করিবার শক্তি না থাকিলে অন্যের সহজ পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কিছুকাল এখানকার মোটর-গাড়ির দানবরথের চাকা বাঁচাইবার চেষ্টায় শ্রান্ত হইয়া অবশেষে এখানকার পথ হইতেই ফিরিতাম, আমার সেই নদী-বাহুপাশে-ঘেরা বাংলাদেশের শরৎরৌদ্রালোকিত আমন-ধানের খেতের ধারে। এমন সময় প্রবেশ করিলেন বন্ধু, পর্দা তুলিয়া দিলেন। দেখিলাম আসন পাতা, দেখিলাম আলো জ্বলিতেছে ; বিদেশীর অপরিচয়ের মস্ত বোঝাটা বাহিরে রাখিয়া, পথিকের ধূলিলিপ্ত বেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া, এক মুহূর্তেই ভিড়ের মধ্য হইতে নিভৃতে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।

কবি য়েট্‌স্‌

ভিড়ের মাঝখানেও কবি য়েট্‌স্‌[1] চাপা পড়েন না, তাঁহাকে একজন বিশেষ কেহ বলিয়া চেনা যায়। যেমন তিনি তাঁহার দীর্ঘ শরীর লইয়া মাথায় প্রায় সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, ইঁহার যেন সকল বিষয়ে একটা প্রাচুর্য আছে, এক জায়গায় সৃষ্টিকর্তার সৃজনশক্তির বেগ প্রবল হইয়া ইঁহাকে যেন ফোয়ারার মতো চারি দিকের সমতলতা হইতে বিপুলভাবে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য দেহে মনে প্রাণে ইঁহাকে এমন অজস্র বলিয়া বোধ হয়।

ইংলণ্ডের বর্তমান কালের কবিদের কাব্য যখন পড়িয়া দেখি তখন ইঁহাদের অনেককেই আমার মনে হয়, ইঁহারা বিশ্বজগতের কবি নহেন। ইঁহারা সাহিত্যজগতের কবি। এ দেশে অনেক দিন হইতে কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি চলিতেছে, হইতে হইতে কাব্যের ভাষা উপমা অলংকার ভঙ্গী বিস্তর জমিয়া উঠিয়াছে। শেষকালে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, কবিত্বের জন্য কাব্যের মূল প্রস্রবণে মানুষের না গেলেও চলে। কবিরা যেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে ; অর্থাৎ, প্রাণ হইতে গান করিবার প্রয়োজনবোধই তাহাদের চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল গান হইতেই গানের উৎপত্তি চলিতেছে। যখন ব্যথা হইতে কথা আসে না, কথা হইতেই কথা আসে, তখন কথার কারুকার্য ক্রমশ

১ ডব্‌লিউ. বি. য়েট্‌স্‌ (W. B. Yeats)

জটিল ও নিপুণতর হইয়া উঠিতে থাকে ; আবেগ তখন প্রত্যক্ষ ও গভীর ভাবে হৃদয়ের সামগ্রী না হওয়াতে সে সরল হয় না ; সে আপনাকে আপনি বিশ্বাস করে না বলিয়াই বলপূর্বক অতিশয়ের দিকে ছুটিতে থাকে ; নবীনতা তাহার পক্ষে সহজ নহে বলিয়াই আপনার অপূর্বতা-প্রমাণের জন্য কেবলই তাহাকে অদ্ভুতের সন্ধানে ফিরিতে হয়।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের সঙ্গে সুইন্‌বর্নের তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথাটা বোঝা সহজ হইবে। যাঁহারা জগতের কবি নহেন, কবিদের কবি, সুইন্‌বর্ন্‌ তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভায় অগ্রগণ্য। কথার নৃত্যলীলায় ইঁহার এমন অসাধারণ নৈপুণ্য যে, তাহারই আনন্দ তাঁহাকে মাতোয়ারা করিয়াছে। ধ্বনি-প্রতিধ্বনির নানাবিধ রঙিন সুতায় তিনি চিত্রবিচিত্র করিয়া ঘোরতর টকটকে রঙের ছবি গাঁথিয়াছেন ; সে-সমস্ত আশ্চর্য কীর্তি, কিন্তু বিশ্বের উপর তাহার প্রশস্ত প্রতিষ্ঠা নহে।

বিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংঘাতে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্যসংগীত বাজিয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য তাহা এমন সরল। সরল বলিয়া সহজ নহে। পাঠকেরা সহজে তাহা গ্রহণ করে নাই। কবি যেখানে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে কাব্য লেখেন সেখানে তাঁহার লেখা গাছের ফুলফলের মতো আপনি সম্পূর্ণ হইয়া বিকাশ পায়। সে আপনাকে ব্যাখ্যা করে না ; অথবা নিজেকে মনোরম বা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুলিবার জন্য সে নিজের প্রতি কোনো জবরদস্তি করিতে পারে না। সে যাহা সে তাহা হইয়াই দেখা দেয় ; তাহাকে গ্রহণ করা, তাহাকে ভোগ করা পাঠকেরই গরজ।

নিজের অনুভূতি ও সেই অনুভূতির বিষয়ের মাঝখানে কোনো মধ্যস্থ-পদার্থের প্রয়োজন ও ব্যবধান না রাখিয়া কোনো কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, বিশ্বজগৎ ও মানবজীবনের রসকে তাঁহারা নিঃসংশয় ভরসার সহিত নিজের হৃদয়ের ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন ; তাঁহারাই নিজের সমসাময়িক কাব্যসাহিত্যের সমস্ত কৃত্রিমতাকে সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করিয়া থাকেন।

একদিন ইংরেজি সাহিত্যের কৃত্রিমতার যুগে বার্‌ন্‌স্‌ জন্মিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমগ্র হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজন্য তখনকার বাঁধা দস্তুরের বেড়া ভেদ করিয়া কোথা হইতে যেন স্কট্‌লণ্ডের অবারিত হৃদয় কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে আসিয়া অসংকোচে আসন গ্রহণ করিল।

এখনকার কাব্যসাহিত্যের যুগে কবি য়েট্‌স্‌ যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছেন, তাহারও গোড়াকার কথাটা ঐ। তাঁহার কবিতা তাঁহার সমসাময়িক কাব্যের প্রতিধ্বনির পন্থায় না গিয়া কবির নিজের হৃদয়কে প্রকাশ করিয়াছে। ঐ-যে 'নিজের হৃদয়' বলিলাম ও কথাকে একটু বুঝিয়া লইতে হইবে। হীরার টুকরা যেমন আকাশের

আলোককে প্রকাশ করার দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করে তেমনি মানুষের হৃদয় কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সত্তায় প্রকাশই পায় না, সেখানে সে অন্ধকার। যখনি সে আপনাকে দিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে প্রতিফলিত করিতে পারে তখনি সেই আলোকে সে প্রকাশ পায় ও সেই আলোককে সে প্রকাশ করে। কবি য়েট্সের কাব্যে আয়র্লণ্ডের হৃদয় ব্যক্ত হইয়াছে।

এ কথাটাকেও আর-একটু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। একই সূর্যের আলো নানা মেঘের উপর পড়িয়াছে কিন্তু মেঘখণ্ডগুলির অবস্থা ও অবস্থান অনুসারে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ ফলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, এই রঙের ভিন্নতা পরস্পরের বিরুদ্ধ নহে; তাহারা আপন আপন বৈচিত্র্যের দ্বারাই সকলের সঙ্গে সকলে মিলিতে পারিয়াছে। রঙ-করা তুলা প্রাণপণে মেঘের নকল করিয়াও মিলিতে পারিত না।

তেমনি আয়র্লণ্ডই বলো, স্কট্‌লণ্ডই বলো, বা অন্য যে-কোনো দেশই বলো, সেখানকার জনসাধারণের চিত্তে বিশ্বজগতের আলো এমন করিয়া পড়ে যাহাতে সে একটা বিশেষ রঙ ফলাইয়া তুলে। বিশ্বমানবের চিদাকাশ এমনি করিয়াই বর্ণবৈচিত্র্যে সুন্দর হইয়া উঠিতেছে।

কবি ভাবের আলোককে কেবল প্রকাশ করেন তাহা নহে, তিনি যে দেশের মানুষ সেই দেশের হৃদয়ের রঙ দিয়া তাহাকে একটু বিশেষ ভাবে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করেন। সকলেই যে করিতে পারেন তাহা বলি না, কিন্তু যিনি পারেন তিনি ধন্য। আমাদের দেশে বৈষ্ণব-পদাবলি বাঙালি-কাব্য রূপেই বিশ্বকাব্য। তাহা বিশ্বের জিনিস বিশ্বকে দিতেছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে নিজের একটা রস যোগ করিয়া দিতেছে; নিজের একটি রূপের পাত্রে তাহাকে ভরিয়া দিতেছে।

সংসারের রণক্ষেত্রে লড়াই করা যাহার ব্যবসায় তাহাকে কবচ পরিতে হয়; তাহাকে সংসারের সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে পদে পদে চারি দিক হইতে তাহাকে আঘাত লাগে। কিন্তু, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যাহার কাজ, আবরণের অভাবই তাহার যথার্থ সজ্জা। কবি য়েট্সের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার ঐ কথাই মনে হইতেছিল। এই একটি মানুষ, ইনি নিজের চিত্তের অবারিত স্পর্শশক্তি দিয়া জগৎকে গ্রহণ করিতেছেন। মানুষ নানা শিক্ষার ভিতর দিয়া, অভ্যাসের ভিতর দিয়া, অনুকরণের ভিতর দিয়া, যেমন করিয়া চারি দিককে দেখে এ দেখা তেমন দেখা নহে।

যখনি কোনো মানুষ এইপ্রকার অব্যবহিত ভাবে জগৎকে দেখে ও তাহার খবর দেয় তখন দেখিতে পাই মানুষের পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার একটা মিল আছে;

তাহা খাপছাড়া নহে। যাহারা সরল চক্ষে দেখিয়াছে সকলেই এমনি করিয়া দেখিয়াছে। বৈদিক কবিরাও জলে স্থলে প্রাণকে দেখিয়াছেন, হৃদয়কে দেখিয়াছেন। নদী মেঘ উষা অগ্নি ঝড়, বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে নহে, ইচ্ছাময় মূর্তিরূপে তাঁহাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মানুষের জীবনের মধ্যে সুখদুঃখের যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় তাহাই যেন নানা অপরূপ ছদ্মবেশে ভূলোকে ও দ্যুলোকে আপন লীলা বিস্তার করিয়াছে। যেমন আমাদের চিত্তে তেমনি সমস্ত প্রকৃতিতে। হাসিকান্নার বেদনা, চাওয়া পাওয়া এবং হারানোর খেলা, যেমন আমাদের এই ছোটো হৃদয়টিতে তেমনি তাহাই খুব প্রকাণ্ড করিয়া এই মহাকাশের আলোক-অন্ধকারের রঙ্গমঞ্চে। তাহা এত বৃহৎ যে তাহাকে আমরা একসঙ্গে দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা জল দেখি, মাটি দেখি, কিন্তু সমস্তটার ভিতরকার বিপুল খেলাটাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু, মানুষ যখন শিক্ষা ও অভ্যাসের ঠুলির ভিতর দিয়া দেখে না, যখন সে আপনার সমস্ত হৃদয় মন জীবন দিয়া দেখে, তখন সে এমন একটা বেদনার লীলাকে সব জায়গাতেই অনুভব করে যে, তাহাকে গল্পের মধ্য দিয়া, রূপকের মধ্য দিয়া ছাড়া প্রকাশ করিতে পারে না। মানুষ যখন জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে আপনারই খুব একটা বড়ো পরিচয় পাইতেছিল— এইটে একরকম করিয়া বুঝিতেছিল যে, সমস্ত জগতের মধ্যে যাহা নাই তাহা তাহার নিজের মধ্যেও নাই, যাহা তাহার মধ্যে আছে তাহাই বিপুল আকারে বিশ্বের মধ্যে আছে— তখনি সে কবির দৃষ্টি অর্থাৎ হৃদয়ের দৃষ্টি জীবনের দৃষ্টিতে সমস্তকে দেখিতে পাইয়াছিল ; তাহা অক্ষিগোলক ও স্নায়ুশিরা ও মস্তিষ্কের দৃষ্টি নহে। তাহার সত্যতা তথ্যগত নহে ; তাহা ভাবগত, বেদনাগত। তাহার ভাষাও সেইরূপ ; তাহা সুরের ভাষা, রূপের ভাষা। এই ভাষাই মানবসাহিত্যে সকলের চেয়ে পুরাতন ভাষা। অথচ, আজও যখন কোনো কবি বিশ্বকে আপনার বেদনা দিয়া অনুভব করেন তখন তাঁহার ভাষার সঙ্গে মানুষের পুরাতন ভাষার মিল পাওয়া যায়। এই কারণে বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের পৌরাণিক কাহিনী আর-কোনো কাজে লাগে না ; কেবল কবির ব্যবহারের পক্ষে তাহা পুরাতন হইল না। মানুষের নবীন বিশ্বানুভূতি ঐ কাহিনীর পথ দিয়া আনাগোনা করিয়া ঐখানে আপন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। অনুভূতির সেই নবীনতা যাহার চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে সে ঐ পুরাতন পথটাকে স্বভাবতই ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

কবি য়েট্‌স্‌ আয়র্লণ্ডের সেই পৌরাণিক পথ দিয়া নিজের কাব্যধারাকে প্রবাহিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছিল বলিয়াই এই পথে তিনি এমন অসামান্য খ্যাতি উপার্জন করিতে পারিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনের দ্বারা

এই জগৎকে স্পর্শ করিতেছেন ; চোখের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা নহে। এইজন্য জগৎকে তিনি কেবল বস্তুজগৎ রূপে দেখেন না ; ইহার পর্বতে প্রান্তরে ইনি এমন একটি লীলাময় সত্তাকে অনুভব করেন যাহা ধ্যানের দ্বারাই গম্য। আধুনিক সাহিত্যে অভ্যস্ত প্রণালীর মধ্য দিয়া তাহাকে প্রকাশ করিতে গেলে তাহার রস ও প্রাণ নষ্ট হইয়া যায় ; কারণ, আধুনিকতা জিনিসটা আসলে নবীন নহে, তাহা জীর্ণ ; সর্বদা ব্যবহারে তাহাতে কড়া পড়িয়া গেছে, সর্বত্র তাহা সাড়া দেয় না ; তাহা ছাই-চাপা আগুনের মতো। এই আগুন জিনিসটা ছাইয়ের চেয়ে পুরাতন অথচ তাহা নবীন ; ছাইটা আধুনিক বটে কিন্তু তাহাই জরা। এইজন্য সর্বত্রই দেখিতে পাই, কাব্য আধুনিক ভাষাকে পাশ কাটাইয়া চলিতে চায়।

সকলেই জানেন, কিছুকাল হইতে আয়র্লণ্ডে একটা স্বাদেশিকতার বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসন সকল দিক হইতেই আয়র্লণ্ডের চিত্তকে অত্যন্ত চাপা দিয়াছিল বলিয়াই এই বেদনা এক সময়ে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন হইতে এই বেদনা প্রধানত পোলিটিকাল বিদ্রোহ-রূপেই আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অবশেষে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা চেষ্টা দেখা দিল। আয়র্লণ্ড আপনার চিত্তের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়া তাহাই প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল।

এই উপলক্ষ্যে আমাদের নিজের দেশের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশেও অনেক দিন হইতে পোলিটিকাল অধিকার-লাভের একটা চেষ্টা শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দেখা গিয়াছে, এই চেষ্টার যাঁহারা নেতা ছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই দেশের ভাষাসাহিত্য-আচারব্যবহারের সহিত সংস্রব ছিল না। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ ছিল না বলিলেই হয়। দেশের উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহাদের যাহা-কিছু কারবার সমস্তই ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি গবর্মেন্টের সঙ্গে। দেশের লোককে লইয়া যে দেশের কোনো কাজ করিতে হইবে, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিমাত্রই ছিল না।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, অন্তত বাংলাদেশে, আমরা সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিজের চিত্তকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান গৌরব এই যে, তিনি বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন যখন বাঙালি আপনার কথা আপনার ভাষায় বলিয়া আনন্দ ও গর্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তাহার আগে আমরা স্কুলের বালক ছিলাম ; অভিধান ও ব্যাকরণ মিলাইয়া ইংরেজি ইস্কুলের এক্সেরসাইজ লিখিতাম ; নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞা করিতাম। হঠাৎ বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা ক্ষমতা দেখিতে পাইলাম। আমাদেরও যে একটা

সাহিত্য হইতে পারে এবং তাহাতেই যে যথার্থভাবে আমাদের মনের ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে পারে ইহা আমরা অনুভব করিলাম। এই-যে শুরু হইল এইখানেই ইহার শেষ হইল না। ইহার আগে চোখ বুজিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, আমাদের কিছুই নাই ; এখন হইতে খোঁজ পড়িয়া গেল আমাদের কী আছে। বঙ্গদর্শনেই গোড়ার দিকে যাঁহারা কঁৎ ও মিল্‌কে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন তাঁহারাই অবশেষে দেশের ধর্মকেই সেই রাজাসন দিবার জন্য দলে-বলে উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই উদ্যমের স্রোত নানা শাখা-প্রশাখায় এখনো অগ্রসর হইতেছে। রাজসভায় ভারতবর্ষীয় অমাত্যসংখ্যা বাড়াইতে হইবে, আমাদের এ ইচ্ছা সাধন হওয়া রাজার হাতে ; কিন্তু আমাদের মন স্বাধীন হইয়া আপনার পথে আপন সফলতার অভিমুখে অগ্রসর হইবে, এই ইচ্ছা সফল হওয়া আমাদের নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে। আমরা যে-কেহ যে-কোনো দিকে নিজের চেষ্টায় নিজের শক্তিকে সার্থক করিতে পারিব, সেই লোকই দেশের আত্মশক্তি-উপলব্ধিকে প্রশস্ত করিয়া দিব। সেই উপলব্ধির আনন্দই আমাদের উন্নতিপথযাত্রার একমাত্র সম্বল।

শক্তি-উপলব্ধির গোড়ায় যে প্রবল অহংকার জাগিয়া উঠে তাহাতে সত্য-উপলব্ধির যথেষ্ট ব্যাঘাত করে। তাহা আমাদের আপনাকে শিখাইবার চেয়ে আপনাকে ভুলাইবার দিকেই বেশি ঝোঁক দেয়। তাহা সাঁচ্চার সঙ্গে ঝুঁটাকে সমান মূল্য দিয়া সাঁচ্চাকে অপমানিত করে। সে এ কথা ভুলিয়া যায় যে, কী আমার নাই এইটে সুনির্দিষ্ট করিয়া জানার দ্বারাতেই কী আমার কাছে সেইটে সুস্পষ্ট করিয়া জানা যায়। সেই সুস্পষ্ট করিয়া জানাই আমাদের শক্তিলাভের একমাত্র পন্থা। অহংকার আত্ম-উপলব্ধির সীমাকে ঝাপসা করিয়া দিয়াই আমাদিগকে দুর্বলতা ও ব্যর্থতার দিকে লইয়া যায়। আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা সত্যের উপর। সুতরাং অহংকারের দ্বারা তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। সত্যের দুর্গপ্রাচীরে ঠেকিয়া ঠেকিয়া অহংকার যতই পরাস্ত হইতে থাকে ততই আমরা আপনাকে জানিতে থাকি।

আমাদের দেশের মতো আয়র্লণ্ডেও আপনার চিত্তশক্তিকে স্বাতন্ত্র্য দিবার জন্য একটা উদ্যম কিছুকাল হইতে কাজ করিতেছে। সেই উদ্যমের প্রথম প্রকাশের মধ্যে স্বভাবতই বিস্তর ফেনিলতা দেখা দেয় ; তাহা অনেকসময় ওজন রাখিতে না পারিয়া অদ্ভুতরূপে হাস্যকর হইয়া উঠে ; আয়র্লণ্ডেও যে সেরূপ ঘটিয়াছিল তাহা আইরিশ বিখ্যাত লেখক জর্জ্‌ মুরের Hail and Farewell -নামক বই পড়িলে কতকটা বুঝা যায়।

যাহা হউক, আয়র্লণ্ড্ নিজের চিত্তবাত্ম্য প্রকাশ করিবার চেষ্টায় নিজের ভাষা কথা কাহিনী ও পৌরাণিকতাকে অবলম্বন করিবার যে উদ্যোগ করিয়াছে সেই উদ্যোগের মধ্যে এক-একজন অসামান্য লোকের প্রতিভা আপনার যথার্থ ক্ষেত্র পাইয়াছে। কবি য়েট্‌স্ তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। ইনি আয়র্লণ্ডের বাণীকে বিশ্বসাহিত্যে জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছেন।

য়েট্‌স্ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আয়র্লণ্ডের জয়পতাকা বহন করিয়া আনিলেন তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতে আয়র্লণ্ডে সাহিত্যের উদ্যম দুর্বল হইয়াছিল। তখন আয়র্লণ্ডে পোলিটিকাল বিদ্রোহের দিন ঘুচিয়া গিয়া পোলিটিকাল বাঁকা চালের কাল আসিয়াছিল; তখন দেশে ভাবের শক্তিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কূটবুদ্ধিরই প্রাধান্য ঘটিয়াছিল।

য়েট্‌সের কোনো একজন সমালোচক লিখিতেছেন—

এমন সময়ে রণদূত আর-একবার আসিয়া দেখা দিল; এবার দুর্দাম হৃদয়াবেগের বিদ্যুদ্‌বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোনো সামাজিক প্রলয়যুগের বজ্রধ্বনি শুনা গেল না। যে সর্বজয়ী মানবাত্মা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, এবং মানুষের জগতে যাহার গোপন অঙ্গুলি সমস্ত বড়ো বড়ো ভাঙাগড়ার রহস্যকে গিয়া স্পর্শ করিতেছে, সেই আত্মতৃপ্ত মানবাত্মার বিরাট বিপুল শান্তি আকাশকে অধিকার করিল। নিজের মধ্যে মানবহৃদয়ের পূর্ণতর বন্ধনমোচন প্রকাশ করিয়া য়েট্‌স্ আর-একবার গভীরতর ও সূক্ষ্মতর শক্তির সহিত বিদ্রোহের বাণীকে জাগ্রত করিলেন। এবার বাহিরের কোলাহল নহে, এবার কবি মানবাত্মার অন্তরের কথা বলিলেন—তাহাই আয়র্লণ্ডের কথা এবং সমস্ত মানুষের কথা। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিলেন এবং পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে কবিত্বরীতি প্রচলিত ছিল তাহা পরিহার করিলেন। কিন্তু, তিনি রচনার যে প্রণালীকে অবশেষে সম্পূর্ণতা দান করিলেন তাহা পুরাতন কবিদিগের রচনারীতিরই উৎকর্ষসাধন। তাঁহার কবিত্ব প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়াছে এবং ধ্বনিমাধুর্যের অন্তরতর সংগীতটিকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। যে-সকল চিন্তাসামগ্রীকে তিনি তাঁহার প্রথম কালের অতুলনীয় গীতি-কাব্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন তাহা তাঁহার পূর্বতন ঋষি-পিতামহদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার; তাহা এই প্রকাশমান বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতি মানুষ ও দেবতার পরম ঐক্যটিকে উদ্ধার করিয়াছে।

সমালোচক লিখিতেছেন—

It was with the publication of *The Wanderings of Oisin*—in

1889, if I remember aright,— that Yeats sprang into the front rank of contemporary poets, and threatened to add to the august company of the immortals. In the qualities by which he succeeded— an exquisitely delicate music, intensity of imaginative conviction, intimacy with natural and (dare I say ?) supernatural manifestations— he was typically Celtic.

এই imaginative conviction কথাটা য়েট্‌স্‌ সম্বন্ধে অত্যন্ত সত্য। কল্পনা তাঁহার পক্ষে কেবল লীলার সামগ্রী নহে, কল্পনার আলোকে তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহার সত্যতাকে তিনি জীবনে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহার হাতে কল্পনা-জিনিসটি কেবলমাত্র কবিত্বব্যবসায়ের একটা হাতিয়ার নহে, তাহা তাঁহার জীবনের সামগ্রী ; ইহার দ্বারাই বিশ্বজগৎ হইতে তিনি তাঁহার আত্মার খাদ্য পানীয় আহরণ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে নিভৃতে যতবার আমার আলাপ হইয়াছে ততবার এই কথাই আমি অনুভব করিয়াছি। তিনি যে কবি তাহা তাঁহার কবিতা পড়িয়া জানিবার সুযোগ এখনো আমার সম্পূর্ণরূপে ঘটে নাই, কিন্তু তিনি যে কল্পনালোকিত হৃদয়ের দ্বারা তাঁহার চতুর্দিককে প্রাণবান্‌রূপে স্পর্শ করিতেছেন তাহা তাঁহার কাছে আসিয়াই আমি অনুভব করিতে পারিতেছি।

৩৭ আল্‌ফ্রেড প্লেস
সাউথ কেন্সিংটন, লণ্ডন
১৯ ভাদ্র ১৩১৯

স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুক

আমার কোনো রচনা পড়িয়া লোকের ভালো লাগিয়াছে, ইহাতে খুশি হওয়া লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করি না। বস্তুত, খুশি হই নাই এ কথা বলার মতো অহংকার আর কিছুই নাই। যখনি কোনো বই ছাপাইয়াছি তখনি তাহার মধ্যে একটা আশা প্রচ্ছন্ন আছে যে, এ বই লোকের ভালো লাগিবে। যদি সেটাকে অহংকার বলা যায় তবে সেই বই-ছাপানোটাই অহংকার।

আমি কোনো-একটা অবকাশের কালে নিজের কতকগুলি কবিতা ও গান ইংরেজি গদ্যে তর্জমা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইংরেজি লিখিতে পারি এ অভিমান

আমার কোনোকালেই নাই ; অতএব ইংরেজি রচনায় বাহবা লইবার প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু, নিজের আবেগকে বিদেশী ভাষার মুখ হইতে আবার একটুখানি নূতন করিয়া গ্রহণ করিবার যে সুখ তাহা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। আমি আর-এক বেশ পরাইয়া নিজের হৃদয়ের পরিচয় লইতেছিলাম।

আমি বিলাতে আসার পর এই তর্জমাগুলি যখন আমার বন্ধুর হাতে পড়িল, তিনি বিশেষ সমাদর করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিলেন। এবং তাহার কয়েক খণ্ড কপি করাইয়া এখানকার কয়েকজন সাহিত্যিককে পড়িতে দিলেন। আমার এই বিদেশী হাতের ইংরেজিতে আমার এই লেখাগুলি তাঁহাদের ভালো লাগিয়াছে। বোধ হয় তাহার একটা কারণ এই যে, ইংরেজি রচনার শক্তি আমার এতটা প্রবল নহে যাহাতে আমার তর্জমা হইতে বিদেশী রসটুকুকে আমি একেবারে নিঃশেষে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি।

স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুকের হাতে আমার এই তর্জমাগুলির একটি কপি পড়িয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে তিনি একদিন আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ, বোধ করি তাঁহার বয়স সত্তর বছর পার হইয়া গিয়াছে। তাঁহার একটা পায়ের রক্ত-প্রণালীতে প্রদাহের মতো হইয়াছে, চলা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর ; সেই পা একটা চৌকির উপর তিনি তুলিয়া বসিয়া আছেন। বার্ধক্য কোনো কোনো মানুষকে পরাভূত করিয়া পদানত করে, আবার কোনো কোনো মানুষের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুর মতো বাস করে। ইঁহার শরীরমনে বার্ধক্য তাহার জয়পতাকা তুলিতে পারে নাই। আশ্চর্য ইঁহার নবীনতা। আমার বার বার মনে হইতে লাগিল, বৃদ্ধের মধ্যে যখন যৌবনকে দেখা যায় তখনি তাহাকে সকলের চেয়ে ভালো করিয়া দেখা যায়। কেননা, সেই যৌবনই সত্যকার জিনিস ; তাহা শরীরের রক্তমাংসের সহিত জীর্ণ হইতে জানে না ; তাহা রোগতাপকে আপনার জোরেই উপেক্ষা করিতে পারে। তাঁহার দেহের আয়তন বিপুল, তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ; কেবল তাঁহার পীড়িত পায়ের দিকে তাকাইয়া মনে হইল, অর্জুন যখন দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন প্রণামনিবেদনের স্বরূপ প্রথম তীর তাঁহার পায়ের তলায় ফেলিয়াছিলেন, তেমনি বার্ধক্য তাহার যুদ্ধ-আরম্ভের প্রথম তীরটা ইঁহার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করিয়াছে।

বিধাতা যে জীবনটা ইঁহাকে দান করিয়াছেন সেটাকে সকল দিক হইতে আনন্দের সামগ্রী করিয়া দিয়াছেন ; ছবি কবিতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য, এবং লোকালয়ে মানব-জীবনের বিচিত্র লীলা, সকলের প্রতিই তাঁহার চিত্তের ঔৎসুক্য প্রবল। চারি দিকের জগতের এই স্পর্শানুভূতি, এই রসগ্রহণের শক্তি তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কমিয়া আসে নাই। এই গ্রহণের শক্তিই তো যৌবন।

ইহার ধর্মোপদেশ ও কাব্যসমালোচনা আমি পূর্বেই পড়িয়াছি। সেদিন দেখিলাম, ছবি আঁকাতেও ইহার বিলাস। ইহার আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ঘরের কোণে অনেক জমা হইয়া আছে। এগুলি সব মন হইতে আঁকা। আমার চিত্রশিল্পী বন্ধু এই ছবিগুলি দেখিয়া বিশেষ করিয়া প্রশংসা করিলেন। এ ছবিগুলি যে প্রদর্শনীতে দিবার বা লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাহা নহে, ইহা নিতান্তই মনের লীলা মাত্র। সেই কথাই আমি ভাবিতেছিলাম— ইহার বয়স অনেক হইয়াছে, লেখাও অনেক লিখিতে হয়, শরীরও সম্পূর্ণ সুস্থ নহে, কিন্তু ইহাতেও ইহার উদ্যমের শেষ হয় নাই। জীবনীশক্তির প্রবলতা এত কাজের সঙ্গে খেলা করিবারও অবকাশ পায়! বস্তুত এই খেলার দ্বারাই প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কাজের চারি দিকে একটা মুক্তির ক্ষেত্রেই মানুষের ঐশ্বর্য। এ দেশে যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই সেইটে লক্ষ্য করি। তাঁহারা যেটা লইয়া প্রধানত নিযুক্ত আছেন সেইটেতেই তাঁহাদের জীবনের সমস্ত জায়গা একেবারে ঠাসিয়া ধরে নাই; চারি দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে, সেইখানে তাঁহাদের বিহার। খুব বড়ো বৈজ্ঞানিককে দেখিয়াছি, তাঁহার প্রধান শখ চীনদেশের চিত্রকলা। ইহাদের জীবনের তহবিলে বাড়তির ভাগ অনেকটা থাকে। ব্যবসায় ইহাদের অনেকের পক্ষেই একটা অংশমাত্র। আপিসঘর ইহাদের বাসগৃহের একটামাত্র ঘর।

অনেক সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরের তলার একটি ছোটো কামরায় ইহার সঙ্গে দেখা হইল। অনেকক্ষণ আমাদের দুইজনের নিভৃত আলাপের অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা হইতে আমি এইটে বুঝিলাম যে, খৃস্টানধর্মের বাহ্য কাঠামো, যেটাকে ইংরেজি ভাষায় বলে creed, কোনোকালে তাহার যেমনই প্রয়োজন থাক্, এখন তাহাতে ধর্মের বিশুদ্ধ রসপ্রবাহের বাধা ঘটাইতেছে। মানুষের মন যখনি আপনার আশ্রয়কে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠে তখন সেই আশ্রয়ের মতো শত্রু তাহার আর কেহ নাই। এ দেশে ধর্মের প্রতি অনেকের মন যে বিমুখ হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ, ধর্মের এই বাহিরের আয়তনটা। তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার এই কবিতাগুলিতে কোনো ধর্মের কোনো creedএর কোনো গন্ধ নাই; ইহাতে এগুলি আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি।'

কথায় কথায় তিনি এক সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি কি না। আমি বলিলাম, আমাদের বর্তমান জন্মের বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু, যখন চিন্তা করিয়া দেখি তখন মনে হয়, ইহা কখনো হইতেই

পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানবজন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিস— ইহার আগেও এমন কখনো ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনো হইবে না, যে কারণ-বশত জীবনটা বিশেষ দেহ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হইয়া এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। শরীরী জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছে, এইটেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, পূর্বজন্মে কোনো মানুষ পশু ছিল এবং পরজন্মেই সে পশুদেহ ধরিবে এ কথাও আমি মনে করিতে পারি না। কেননা, প্রকৃতির মধ্যে একটা অভ্যাসের ধারা দেখা যায়; সেই ধারার হঠাৎ অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটা অসংগত। স্টপ্‌ফোর্ড্ ব্রুক বলিলেন, তিনিও জন্মান্তরে বিশ্বাসটাকে সংগত মনে করেন। তাঁহার বিশ্বাস, নানা জন্মের মধ্য দিয়া যখন আমরা একটা জীবনচক্র সমাপ্ত করিব, তখন আমাদের পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণ হইয়া জাগ্রত হইবে। এ কথাটা আমার মনে লাগিল। আমার মনে হইল, একটা কবিতা পড়া যখন আমরা শেষ করিয়া ফেলি তখনি তাহার সমস্তর ভাবটা পরস্পরগ্রথিত হইয়া আমাদের মনে উদিত হয়; শেষ না করিলে সকল সময় সেই সূত্রটি পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে একটা অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়া এক-একটা জন্মমালা গাঁথিয়া চলিয়াছি; গাঁথা শেষ হইলেই যে একেবারেই ফুরাইয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু একটা পালা শেষ হইয়া যায়। তখনি সমস্তটাকে স্পষ্ট করিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

এখানকার যে-সকল চিন্তাশীল ও ভাবুক লোকদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে সকলেরই মধ্যে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহারা অন্যায় ও অবিচারকে সত্যই ঠেলিয়া ফেলিতে চান। এ কথা বলা বাহুল্য মনে হইতে পারে, কিন্তু বাহুল্য নহে। যে জাতি বহুদূরবিস্তৃত অধীন দেশকে শাসন করে এবং সেই-সকল অধীন দেশের সহিত যাহাদের নানাবিধ স্বার্থের সম্বন্ধ জড়িত, পরজাতির সম্বন্ধে তাহাদের ন্যায়-অন্যায়ের বোধ ম্লান না হইয়া থাকিতে পারে না। অন্য জাতিকে যতদিন সম্ভব অধীনস্থ করিয়া রাখা নানা কারণে যাহার নিজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, মানবস্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহার ধর্মবোধ কখনোই অক্ষুণ্ণ থাকে না। যে শুভবুদ্ধি-দ্বারা মানুষ স্বজাতির স্বাধীনতাকে শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়া থাকে, অন্যকে অধীন রাখিবার ইচ্ছা যতই প্রবল হয় ততই সেই শুভবুদ্ধিকেই মানুষ দুর্বল করিয়া ফেলে। অথচ, এই শুভবুদ্ধিই জাতীয় উন্নতির পক্ষে মানুষের চরম সম্বল।

এমন অবস্থায় যখন এখানকার মনীষীসম্প্রদায়ের মধ্যে এক দলকে দেখিতে পাই যাঁহারা জাতীয় স্বার্থপরতা অপেক্ষা জাতীয় ন্যায়পরতাকেই সমাদর করিয়া থাকেন,

তখন বুঝিতে পারি, দেহের মধ্যে এক দিকে ব্যাধির প্রবেশদ্বারও যেমন খোলা আছে তেমনি আর-এক দিকে স্বাস্থ্যতত্ত্বও উদ্যমের সহিত কাজ করিতেছে। যতক্ষণ এই জিনিসটি আছে ততক্ষণ আশা আছে। এই শুভবুদ্ধিটিকে এখানকার ভাবুক লোকদের অনেকের মধ্যে অনুভব করা যায়।

এখানে ভাবের ক্ষেত্র এবং কাজের কারখানা পাশাপাশি আছে। এখানে রাষ্ট্রনীতির সিংহাসন ও ধর্মনীতির বেদী পরস্পর নিকটবর্তী। এইজন্য উভয়ের সহযোগে এখানকার দুই চাকার রথ চলিতেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা সময় আসে যখন কাজের ধোঁওয়া ভাবের হাওয়াকে একেবারে কালো করিয়া তোলে; তখন এখানে কাব্যে সাহিত্যেও পালোয়ানি আস্ফালনে তাল ঠুকিবার আওয়াজটাই সমস্ত সংগীতকে ঢাকিয়া ফেলিতে চায়; হঠাৎ তখন দেশের রক্তের মধ্যে Jingo-বিষ প্রবল হইয়া উঠে এবং সেই চোখরাঙানির দিনে লোকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সাধনাকে ধর্মভীরু দুর্বলের কাপুরুষতা বলিয়াই গণ্য করে। কিন্তু, সেই উন্মত্ত বিকারের সময়েও ধর্মবুদ্ধি একেবারে হাল ছাড়িয়া দেয় না; সেইজন্য বোয়ার-যুদ্ধের দিনেও এখানেও একদল লোক ছিলেন যাঁহারা সমস্ত দেশের আক্রোশকে বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াও ন্যায়ের জয়ধ্বজাকে উপরে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহারাই দেশের হাতে মার খাইয়াও, দেশবিদ্বেষী অপবাদ সহ্য করিয়াও, দেশের পাপক্ষালনের কাজে অপরাজিতচিত্তে নিযুক্ত আছেন।

কিন্তু, ভারতবর্ষে ইংরেজের যে শাসনতন্ত্র আছে সেটা একেবারে ঘোরতর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে। সেই কাজের বিষকে শোধিত করিতে পারে এমনতরো ভাবের হাওয়া সেখানে প্রবল নহে। এই কারণে এই বিষ ভিতরে ভিতরে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। যে ইংরেজ অল্পবয়সে কোনোমতে একটা কঠিন পরীক্ষা পাস করিয়া সেখানে রাজ্য চালনা করিতে যান তিনি একেবারে সেখানকার বিষাক্ত তপ্ত হাওয়ার ভিতরে গিয়া প্রবেশ করেন। সেখানে ক্ষমতার মদ অত্যন্ত কড়া, সেলামের মোহ মজ্জার মধ্যে জড়িত হইয়া যায়, এবং প্রেস্টিজের অভিমান ধর্মের কাছেও মাথা হেঁট করিতে চায় না। অথচ, সেইখানেই ইংলণ্ডের সেই ভাবুকমণ্ডলীর সংসর্গ নাই যাঁহারা বিকৃতিনিবারণের বড়ো মন্ত্রগুলিকে সর্বদা আবৃত্তি করিতে পারেন। এইজন্য ভারতবর্ষীয় ইংরেজ আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া ঠেলিয়া রাখে; এইজন্য ভারতবর্ষের বড়ো পরিচয়টা কোনোমতেই ভারতবর্ষের ইংরেজ লাভ করে না। আমরা তাহাদের কাছে অত্যন্ত ছোটো; আমাদের সাহিত্য, আমাদের ধর্মান্দোলন, আমাদের স্বদেশহিতৈষিতার সাধনা তাহাদের কাছে একেবারেই নাই। আমরা তাহাদের বাজারের খরিদ্দার, আপিসের কেরানি, বারিস্টারের বাবু, আদালতের আসামি ফরিয়াদি। তাহারা পূর্ণ

মানবচিত্ত দিয়া আমাদের দেখে না, আমাদেরও পূর্ণ মানবপরিচয় তাহারা পায় না। এ অবস্থায় শাসনসংরক্ষণ কাজের ব্যবস্থা সমস্তই খুব পাকা হইতে পারে, কিন্তু তাহার চেয়ে বড়ো জিনিসটা নষ্ট হয়। কারণ, মঙ্গল তো শৃঙ্খলা নহে ; এবং মানুষের কাছ হইতে কোনো ভালো জিনিস পাইলে সেই সঙ্গে যদি মানুষকেও না পাই তবে সে দান আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারি না ; সুতরাং সে দান না দাতাকে ধন্য করে, না গ্রহীতাকে পরিতৃপ্ত করিয়া তোলে।

ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ

বাহিরের ভিড়ের মধ্য হইতে আমি যেন অন্তরের ভিড়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিলাম, এইরূপ আমার মনে হইল। এ দেশের যাঁহারা লেখক, যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহাদের সংস্রবে যতই আসিলাম ততই অনুভব করিতে লাগিলাম, ইঁহাদের চিন্তার পথে ভাবের ঠেলাঠেলি অত্যন্ত প্রবল।

ইহাদের সমাজ সকলের শক্তিকে যে পূর্ণবেগে আকর্ষণ করিতেছে, বাহিরে লোকের ছুটাছুটি, মোটর-যানের হুড়াহুড়িতে তাহা স্পষ্টই চোখে পড়ে। কাহারও সময় নাই ; তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে হইবে ; এ সমাজ কাহাকেও পিছাইয়া পড়িয়া থাকিতে দিবে না ; যে একটু পিছাইয়া পড়িবে তাহাকেই হার মানিতে হইবে। এই সম্মুখে ছুটিবার ভয়ংকর ব্যগ্রতা যখন দেখি তখন মনে মনে ভাবি, সম্মুখে সে কে বসিয়া আছে। সে ডাক দেয় কিন্তু দেখা দেয় না। নীল সমুদ্রের মতো বহুদূরে তাহার ঢেউয়ের উপর ঢেউ নিশিদিন হাত তুলিতেছে, কিন্তু কোথায় কোন্ পর্বতশিখরের গুহাগহ্বর হইতে ঝরনাগুলি পাগলের মতো ব্যস্ত হইয়া, ডাহিনে বাঁয়ে নুড়ি পাথরগুলাকে কোনোমতে ঠেলিয়াঠুলিয়া, কাহাকেও কোনো ঠিকানা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাহিরের কাজের ক্ষেত্রে এই যেমন হাঁকাহাঁকি দৌড়াদৌড়ি, চিন্তার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনিই। কত হাজার হাজার লোক যে ঊর্ধ্বশ্বাসে চিন্তা করিয়া চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। দৈনিক কাগজে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, ত্রৈমাসিকে, বক্তৃতাসভায়, শিক্ষা-শালায়, পার্লামেণ্টে, পুঁথিতে, চটিতে মনের ধারা অবিশ্রাম বহিয়া চলিয়াছে। মানসিক শক্তি যাহার যে রকমের এবং যে পরিমাণে আছে তাহার সমস্তটার উপর টান পড়িয়াছে। 'চাই আরও চাই', দেশের মর্মস্থান হইতে এই একটা ডাক সর্বদা সর্বত্র পৌঁছিতেছে। এত বড়ো একটা ডাকে কাহারও সবুর সহে না, ক্ষণকাল চুপ করিয়া

থাকিতে হইলে মন উতলা হইয়া উঠে। দেশের এই মানসভাণ্ডারে যে লোক একবার একটা কিছু জোগাইয়াছে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই ; সে লোকের উপর আরো'র তাগিদ পড়িল ; খেজুরগাছের মতো বৎসরের পর বৎসরে কাটের পর কাট চলিতে থাকে ; কোনো বারে রসের একটু কমতি বা বিরাম পড়িলে সে পাড়াসুদ্ধ লোকের প্রশ্নের বিষয় হইয়া উঠে।

কাজেই এখানকার মনোরাজ্যটা যদি চোখে দেখিবার হইত তবে দেখিতাম, সদর রাস্তায় এবং গলিতে, আপিস-পাড়ায় এবং বারোয়ারি-তলায় হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেছে ; ভিড় ঠেলিয়া চলা দায়। সেখানেও কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া চলে, কেহ বা মোটরগাড়ি হাঁকায় ; কেহ বা মজুরি করে, কেহ বা মহাজনি করিয়া থাকে ; কিন্তু সকলেই বিষম ব্যস্ত। ভোরবেলা হইতে রাত দুপুর পর্যন্ত চলাচলের অন্ত নাই।

কথাটা নূতন নহে। আমাদের দেশের তন্দ্রালস নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নেও আমরা অর্ধেক চোখ বুজিয়া আন্দাজ করিতে পারি, এ দেশের চিন্তার হাটে কী ভয়ংকর কোলাহল এবং ঠেলাঠেলি। কিন্তু, সেই ভিড়ের চাপটা নিজের মনের উপর যখন ঠেলা দেয় তখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি তাহার বেগ কতখানি। এ দেশে যাঁহারা মনের কারবার করেন তাঁহাদের কাছে আসিলে সেই বেগটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ইহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনেরও নয়, খুব অন্তরঙ্গও নয়, ক্ষণকালের দেখাসাক্ষাৎ মাত্র। কিন্তু, সেই সময়টুকুর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বারম্বার বিস্মিত হইয়াছি, সেটা ইহাদের মনের ক্ষিপ্রহস্ততা। মন ইলেক্‌ট্রিক আলোর তারের মতো সর্বদা যেন প্রস্তুত হইয়াই আছে, বোতামটি টিপিবা মাত্র তখনি জ্বলিয়া উঠে। আমাদের প্রদীপের আলোর ব্যবহার ; সলিতা পাকাইয়া, তেল ঢালিয়া, চক্‌মকি ঠুকিয়া কাজ চালাইয়া থাকি— বিশেষ কোনো তাগিদ নাই, সুতরাং দেরি হইলে কিছুই আসে যায় না। অতএব, আমাদের যেরূপ অভ্যাস তাহাতে আমার পক্ষে এই ইলেক্‌ট্রিক আলোর ক্ষিপ্রতা সম্পূর্ণ নূতন।

এখনকার কালের সুবিখ্যাত লেখক ওয়েল্‌স্[১] সাহেবের দুই একখানি নভেল ও আমেরিকার সভ্যতা সম্বন্ধে একখানা বই পূর্বেই পড়িয়াছিলাম। তাহাতেই জানিতাম, ইহার চিন্তাশক্তি ইস্পাতের তরবারির মতো যেমন ঝক্‌মক্ করে তেমনি তাহা খরধার। আমার বন্ধু যেদিন ইহার সঙ্গে এক-ডিনারে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন সেদিন আমার মনের মধ্যে কেমন একটু ভয় ছিল। আমার মনে ছিল, সংসারে খরতর বুদ্ধি

১ এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ (H. G. Wells)

জিনিসটাতে নিশ্চয়ই অনেক কাজ হয়, কিন্তু তাহার সংস্রব হয়তো আরামের নহে।

যাহা হউক, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ইহার সঙ্গে অনেক ক্ষণের জন্ত আলাপ-পরিচয় হইল। প্রথমেই আশ্বস্ত হইলাম যখন দেখা গেল মানুষটি সজারুজাতীয় নহে, সম্পূর্ণ মোলায়েম। দেখিতে পাইলাম, ইহার প্রখরতা চিন্তায়, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। আসল কথা, মানুষের প্রতি ইহার আন্তরিক দরদ আছে, অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং মানুষের সার্বজনীন উন্নতির প্রতি অনুরাগ আছে ; সেইটে থাকিলেই মানুষের মন কেবলমাত্র চিন্তার তুবড়িবাজি করিয়া সুখ পায় না। এই দেশে সেইটে একটা মস্ত জিনিস, মানুষ এখানে সর্বদা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া আছে ; মানুষের সম্বন্ধে এখানে ঔৎসুক্যের অন্ত নাই। মানুষের প্রতি উদাসীনতার অভাবেই ইহাদের মন এমন প্রচুরশস্তশালী হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, শুধু বীজে ও মাটিতে ফসল ভালো হয় না, জমিতে সর্বদা রস থাকা চাই ; মানুষের প্রতি মানুষের টানই সেই চিরন্তন রস যাহাতে করিয়া মনের সকলরকম ফসল একেবারে অপর্যাপ্ত হইয়া ফলিয়া উঠে। আমাদের দেশে আমি অনেক শক্তিশালী লোক দেখিয়াছি, মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের সংস্রব সুগভীর ও সর্বদা বিদ্যমান নহে বলিয়াই তাঁহারা আপনার সাধ্যকে পূর্ণভাবে সাধিত করিয়া তুলিতে পারেন না। মানুষ তাঁহাদের কাছে তেমন করিয়া চাহিতেছে না বলিয়াই মানুষের ধন তাঁহারা পুরা পরিমাণ বাহির করিতে পারিতেছেন না। বিরল-বসতি লোকালয়ে মানুষ নিজের নিতান্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু ফলায় না এবং তাহারও অনেক নষ্ট হয়, ফেলা যায়। আমাদের সেইরূপ বিরলে বাস ; মানুষ ছাঁকিয়া বাঁকিয়া আমাদের হৃদয়মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। সেইজন্ত আমরা অনেকে চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু সে চিন্তা আলস্ত ঘুচাইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; অনেকের হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয় ছেলেপুলে ভাইপো ভাগনের বাহিরে খাটিবার ক্ষেত্র পায় না।

যাহাই হউক, ওয়েল্‌সের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া এইটে বুঝিতে পারিলাম, ইহাদের চিন্তাশীলতা ও রচনাশক্তির অবলম্বন মানুষ ; এইজন্ত তাহা শিকারীর শিকার-ইচ্ছার মতো কেবলমাত্র শক্তির খেলা নহে। এইজন্ত ইহাদের চিন্তার যে তীক্ষ্ণতা তাহা ছুরির তীক্ষ্ণতার মতো নহে—তাহা সজীব তীক্ষ্ণতা, তাহা দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ; তাহার সঙ্গে হৃদয় আছে, জীবন আছে।

আর-একটা জিনিস দেখিয়া বারবার বিস্মিত হইলাম, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সে ইহাদের চিন্তার ক্ষিপ্রতা। আমার বন্ধুর সঙ্গে ওয়েল্‌সের যতক্ষণ কথা চলিল

ততক্ষণ পদে পদে কথাবার্তার প্রবাহ উজ্জ্বল চিন্তার কণায় ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। কথার সঙ্গে কথার স্পর্শে আপনি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে, মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় না। ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মন প্রস্তুত হইয়াই আছে। ইহারা যে চিন্তা করিতেছেন তাহা নহে, চারি দিকের ঠেলায় ইহাদের নিয়ত চিন্তা করাইতেছে; তাই ইহাদের মন ছুটিতে ছুটিতেও ভাবিতে পারে এবং ভাবিতে ভাবিতেও কথা কহিয়া যায়। ইহাদের ব্যক্তিগত মনের পশ্চাতে সমস্ত দেশের মন জাগিয়া আছে; চিন্তার ঢেউ, কথার কল্লোল কেবলই নানা দিক হইতে নানা আকারে পরস্পরের চিত্তকে আঘাত করিতেছে। ইহাতে মনকে জাগ্রত ও মুখরিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আমার বন্ধু চিত্রশিল্পী, কথার কারবার তাঁহার নহে। তাঁহার সঙ্গে আমার অনেকদিন অনেক আলাপ হইয়াছে; সর্বদা ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি, যে কথাটাই ইহার সম্মুখে উপস্থিত হয় তৎক্ষণাৎ সেটাকে ইনি জোরের সঙ্গে ভাবিতে পারেন ও জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন। সে জোর কিছুমাত্র গায়ের জোর নহে, তাহা চিন্তার জোর। ইহার অনুভূতিশক্তিও দ্রুত এবং প্রবল। যেটা ভালো লাগিবার জিনিস সেটাকে ভালো লাগিতে ইহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না, সে সম্বন্ধে ইহাকে আর-কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হয় না; যেটাকে গ্রহণ করিতে হইবে সেটাকে ইনি একেবারেই অসংশয়ে গ্রহণ করেন। মানুষকে ও মানুষের শক্তিকে গ্রহণ করিবার সহজ ক্ষমতা ইহার এমন প্রবল বলিয়াই ইনি ইহার দেশের নানা শক্তিশালী নানা শ্রেণীর লোককে এমন করিয়া বন্ধুত্বপাশে বাঁধিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কেহ বা কবি, কেহ সমালোচক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ দার্শনিক, কেহ গুণী, কেহ জ্ঞানী, কেহ রসিক, কেহ রসজ্ঞ; তাঁহারা সকলেই বিনা বাধায় এক ক্ষেত্রে মিলিবার মতো লোক নহেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সকলেই মিলিতে পারিয়াছেন।

আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া আমার ইহাই মনে হইতে থাকে, অনেক বিষয়েই ইহাদিগকে এখন আর গোড়া হইতেই ভাবিতে হয় না; ইহারা অনেক কথা অনেক দূর পর্যন্ত ভাবিয়া রাখিয়াছেন। ভাবনার প্রথম ধাক্কাতেই যত বিলম্ব, তখনি জড়ত্ব ভাঙিতে সময় লাগে; কিন্তু যখন তাহা কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তখন তাহার পক্ষে চলা সহজ। ইহাদের দেশে ভাবনা জিনিসটা চলার মুখেই আছে; তাহার চাকা আপনিই সরে। মানুষের চিন্তার অধিকাংশ বিষয়ই মাঝ-রাস্তায়। এইজন্য ইহাদের কোনো শিক্ষিত লোকের সঙ্গে যখন আলাপ করা যায় তখন একেবারেই সুচিন্তিত কথার ধারা পাওয়া যায়, এবং সেই ধারা দ্রুতগতিশীল।

যেখানে চিন্তার এমন একটা বেগ আছে সেখানে চিন্তার আনন্দ যে কতখানি তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। সেই আনন্দ এখানকার শিক্ষিতসমাজের সামাজিকতার একটি প্রধান অঙ্গ। এখানকার সামাজিক মেলামেশার মধ্যে চিত্তের লীলা আপনার বিহারক্ষেত্র রচনা করিতেছে। চিন্তার সঞ্চার কেবল বক্তৃতায় এবং বই লেখায় নহে, তাহা মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা-সাক্ষাতে। অনেক সময় ইঁহাদের আলাপ শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইয়াছে, এ-সব কথা লিখিয়া রাখিবার জিনিস, ছড়াইয়া ফেলিবার নহে। কিন্তু, মানুষের মন কৃপণতা করিয়া কোনো বড়ো ফল পাইতে পারে না। যেখানে ছড়াইয়া ফেলিবার যোগ্যতা নাই সেখানে ভালো করিয়া কাজে লাগাইবার যোগ্যতাও নাই। প্রত্যেক বীজের হিসাব রাখিয়া টিপিয়া টিপিয়া পুঁতিতে গেলে বড়ো রকমের চাষ হয় না। দরাজ হাতে ছড়াইয়া ছড়াইয়া চলিতে হয়, তাহাতে অনেকটা নিষ্ফল হইয়াও মোটের উপর লাভ দাঁড়ায়। এইজন্য চিন্তার চর্চায় সেই আনন্দ থাকা চাই যাহাতে সে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হইয়া জন্মিতে পারে। আমাদের দেশে চিত্তের সেই আনন্দলীলার অভাবটাই সকল দৈন্যের চেয়ে বেশি বলিয়া ঠেকে।

কেম্‌ব্রিজের কলেজ-ভবনে একজন অধ্যাপকের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়া আমি দিন দুয়েক বাস করিয়াছিলাম। ইঁহার নাম লোয়েস ডিকিন্সন। ইনিই 'জন্‌ চীনাম্যানের পত্র' বইখানির লেখক। সে বইখানি যখন প্রথম বাহির হয় তখন আমাদের দেশে প্রাচ্যদেশাভিমানের একটা প্রবল হাওয়া দিয়াছিল। সমস্ত য়ুরোপের চিত্ত যেমন একই সভ্যতাসূত্রের চারি দিকে দানা বাঁধিয়াছে তেমনি করিয়া একদিন সমস্ত এসিয়া এক সভ্যতার বৃন্তের উপর একটি শতদলপদ্ম হইয়া বিশ্ববিধাতার চরণতলে নৈবেদ্যরূপে জাগিয়া উঠিবে, এই কল্পনা ও কামনা আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছিল। সেই সময়ে এই 'চীনাম্যানের পত্র' বইখানি অবলম্বন করিয়া আমি এক মস্ত প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পাঠ করিয়াছিলাম।[১] তখন জানিতাম, সে বইখানি সত্যই চীনাম্যানের লেখা। যিনি লেখক তাঁহাকে দেখিলাম; তিনি চীনাম্যান নহেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু, তিনি ভাবুক, অতএব তিনি সকল দেশের মানুষ। যে দুইদিন ইঁহার বাসায় ছিলাম ইঁহার সঙ্গে প্রায় নিয়ত আমার কথাবার্তা হইয়াছে। স্রোতের সঙ্গে স্রোত যেমন অনায়াসে মেশে তেমনি অশ্রান্ত আনন্দে তাঁহার চিত্তবেগের টানে আমার চিত্ত ধাবিত হইয়া চলিতেছিল। ইহা বিশেষ কোনো উপার্জন বা লাভের ব্যাপার নহে; ইহা

১ চীনেম্যানের চিঠি: বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ আষাঢ়, পৃ. ১৫১-৬২। প্রবন্ধটি "মজুমদার লাইব্রেরির সংসৃষ্ট 'আলোচনা সমিতি'র বিশেষ অধিবেশনে" রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিয়াছিলেন।

কোনো বিশেষ বিষয়ের বই পড়া বা কলেজের বক্তৃতা শোনার কাজ করে না; ইহা মনের চলার আনন্দ। যেমন বসন্তে সমস্তই কেবল ফল ও ফুল নহে, তাহার সঙ্গে দক্ষিণের হাওয়া আছে, সেই হাওয়ার উত্তাপে ও আন্দোলনে ফুলের আনন্দবিকাশ সম্পূর্ণ হইতে থাকে, তেমনি এখানকার মনোবিকাশের চারি দিকে যে একটা আলাপের বসন্তহাওয়া বহিতেছে, যাহাতে গন্ধ ব্যাপ্ত হইতেছে ও বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে, যাহাতে প্রাণের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের উৎসব দিগ্‌দিগন্তরকে মাতাইয়া তুলিতেছে, এই সহৃদয় চিন্তাশীল অধ্যাপকের গ্রন্থমণ্ডিত বাসাটুকুর মধ্যে আমি তাহারই একটা প্রবল স্পর্শ পাইলাম। ইহার সঙ্গে এক সময়ে যখন এখানকার একজন বিখ্যাত গণিত-অধ্যাপক রাসেল সাহেব[1] আসিয়া মিলিত হইলেন তখন তাঁহাদের আলাপের আন্দোলন আমার মনকে পদে পদে অভিহত করিয়া আনন্দিত করিয়া তুলিল। গণিতের তেজে কাহারও মন দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়, কাহারও মন আলোকিত হইয়া উঠে। রাসেল সাহেবের মন যেন প্রখর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্যাপ্ত হাস্যরশ্মি মিলিত হইয়া আছে, সেইটে আমার কাছে সবচেয়ে সরস লাগিল। রাত্রে আহারের পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়া বসিতাম সেখানে একদিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত প্রাচীন তরুসভার গভীর নীরবতার মধ্যে এই দুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম। আলাপের বিষয় বহুদূরব্যাপী। তাহার মধ্যে সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, সকলরকম জিনিসই ছিল। আমার কাছে সেই রাত্রির স্মৃতিটি বড়ো রমণীয়। এক দিকে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির আকাশ-জোড়া নিস্তব্ধতা, আর এক দিকে তাহারই মাঝখান দিয়া মানুষের চঞ্চল মন আপনার তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্বকে বাহুবন্ধনে বাঁধিবার জন্য অভিসারে চলিয়াছে। যেন পর্বতমালা স্থির নিশ্চল গাম্ভীর্যের সহিত আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহারই পায়ের কাছটা ঘিরিয়া ঘিরিয়া নির্ঝরিণী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে কেহই থামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না; তাহার কলোচ্ছ্বাস কেবলই প্রশ্ন করিতেছে, এবং গভীর গিরিকন্দরগুলা তাহারই ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি এবং চিত্ত এই দুইয়ের যোগ আমি সেই প্রাচীন বিদ্যালয়ের পুরাতন বাগানে বসিয়া অনুভব করিতেছিলাম। বৃহৎ বিশ্বের নীরবতা মানুষের মধ্যেই বাণী-আকারে আপনাকে অবিশ্রাম প্রকাশ করিতেছে; এই বাণীস্রোতেই বিশ্বের আত্মোপলব্ধি, তাহার নিরন্তর আনন্দ, ইহাই আমি সেদিন নিবিড়রূপে উপলব্ধি করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, জগতে অন্ধকারের মহাসত্তা অতিবিপুল। অনন্ত আকাশে সেই

১ বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel)

মহান্ধকার আপনাকে আলোকের লীলায় ব্যক্ত করিতেছে; সেই আলোকের আবর্ত চঞ্চল, তাহা সর্বদা কম্পমান; তাহা কোথাও বা শিখায়, কোথাও বা স্ফুলিঙ্গে, কোথাও বা ক্ষণকালের জন্য, কোথাও বা দীর্ঘকালের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু এই চঞ্চল আলোকমালাই অবিচলিত মহৎ অন্ধকারের বাণী। মানুষের চিত্তের চঞ্চল ধারাটিও তেমনি বিশাল বিশ্বের এক প্রান্ত দিয়া নানা পথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেবলই বিশ্বকে প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। যেখানে সেই প্রকাশ পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থতা আনন্দে ও ঐশ্বর্যের সমারোহে উৎসবময় হইয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর মৃদু কণ্ঠের কথাবার্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ, সেই ঐশ্বর্য অনুভব করিতেছিলাম।

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি

সকল সময়েই মানুষ যে নিজের যোগ্যতা বিচার করিয়া বৃত্তি অবলম্বন করিবার সুযোগ পায় তাহা নহে— সেইজন্য পৃথিবীতে কর্মরথের চাকা এমন কঠোর স্বরে আর্তনাদ করিতে করিতে চলে। যে মানুষের মুদির দোকান খোলা উচিত ছিল সে ইস্কুল-মাস্টারি করে, পুলিসের দারোগা হওয়ার জন্য যে লোক সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে পাদ্রির কাজ চালাইতে হয়। অন্য ব্যবসায়ে এইরূপ উল্‌টাপাল্‌টাতে খুব বেশি ক্ষতি করে না, কিন্তু ধর্মব্যবসায়ে ইহাতে বড়োই অঘটন ঘটাইয়া থাকে। কারণ, ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ যথাসম্ভব সত্য হইতে না পারিলে তাহাতে কেবল যে ব্যর্থতা আনে তাহা নহে, তাহাতে অমঙ্গলের সৃষ্টি করে।

খৃস্টানধর্মের আদর্শের সঙ্গে এ দেশের মানবপ্রকৃতির এক জায়গায় খুব একটা অসামঞ্জস্য আছে, খৃস্টানশাস্ত্রোপদিষ্ট একান্ত নম্রতা ও দাক্ষিণ্য এ দেশের স্বভাব-সংগত নহে। প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে লড়াই করিয়া নিজেকে জয়ী করিবার উত্তেজনা ইহাদের রক্তে প্রাচীনকাল হইতে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে; সেইজন্য সৈন্যদলে যাহাদের ভর্তি হওয়া উচিত ছিল তাহারা যখন পাদ্রির কাজে নিযুক্ত হয় তখন ধর্মের রঙ শুভ্রতা ত্যাগ করিয়া লাল টক্‌টকে হইয়া উঠে। সেইজন্য য়ুরোপে আমরা সকল সময়ে পাদ্রিদিগকে শান্তির পক্ষে, সার্বজাতিক ন্যায়পরতার পক্ষে দেখিতে পাই না। যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইহারা বিশেষভাবে ঈশ্বরকে

নিজেদের দলপতি করিয়া দাঁড় করায় এবং ঈশ্বরোপাসনাকে রক্তপাতের ভূমিকারূপে ব্যবহার করে।

অনেক সময়েই দেখা যায়, ইহারা যাহাদিগকে হীদেন বলে তাহাদের প্রতি সত্যবিচার করিতে ইহারা অক্ষম। যেন তাহারা খৃস্টানের ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী আর-কোনো দেবতার সৃষ্টি, সুতরাং তাহাদিগকে নিন্দিত করিতে পারিলে যেন নিজের ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়, এই রকমের একটা ভাব তাহাদের মনে আছে। এই বিরুদ্ধতা, এই উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা পাদ্রি অন্য ধর্মের লোককে সর্বদা পীড়া দিয়াছে। তাহারা অস্ত্রধারী সৈন্যদলের মতো অন্যকে আঘাত করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছে।

তাই ভারতবর্ষে পাদ্রিদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা এই বিরুদ্ধতার ধারণা। তাহারা যে আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত পৃথক, এইটেই আমরা অনুভব করিয়াছি। তাহারা আমাদিগকে খৃস্টান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজেদের সঙ্গে আমাদিগকে মিলাইয়া লইতে প্রস্তুত নহে। তাহারা আমাদিগকে জয় করিবে, কিন্তু এক করিবে না। এক জাতির সঙ্গে আর-এক জাতিকে মিলাইবার ভার ইহাদেরই লওয়া উচিত ছিল। যাহাতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া সুবিচার করিতে পারে, সেই সেতু বাঁধিয়া দেওয়া তো ইহাদেরই কাজ। কিন্তু, তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। খৃস্টান পাদ্রিরা অখৃস্টান জাতির ধর্ম সমাজ ও আচার-ব্যবহারকে যতদূর সম্ভব কালিমালিপ্ত করিয়া দেশের লোকের কাছে চিত্রিত করিয়াছে। এমন কোনো জাতি নাই যাহার হীনতা বা শ্রেষ্ঠতাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখানো যায় না। অথচ ইহাই নিশ্চিত সত্য যে, সকল জাতিকেই তাহার শ্রেষ্ঠতার দ্বারা বিচার করিলেই তাহাকে সত্যরূপে জানা যায়। হৃদয়ে প্রেমের অভাব এবং আত্মগরিমাই এই বিচারের বাধা। যাঁহারা ভগবানের প্রেমে জীবনকে উৎসর্গ করেন তাঁহারা এই বাধাকে অতিক্রম করিবেন, ইহাই আশা করা যায়। কিন্তু, অন্য জাতিকে হীন করিয়া দেখাইয়া পাদ্রিরা খৃস্টান অখৃস্টানের মধ্যে যতবড়ো প্রবল ভেদ ঘটাইয়াছে এমন বোধ হয় আর-কেহই করে নাই। অন্যকে দেখিবার বেলায় তাহারা ধর্মব্যবসায়ের সাম্প্রদায়িক কালো চশমা পরিয়াছে। বিজেতা ও বিজিত জাতির মাঝখানে একটা প্রচণ্ড অভিমান স্বভাবতই আছে, তাহা শক্তির অভিমান— সুতরাং পরস্পরের মধ্যে মানুষোচিত মিলনের সেই একটা মস্ত অন্তরায়— পাদ্রিরা সেই অভিমানকে ধর্ম ও রাজনীতির দিক হইতেও বড়ো করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই খৃস্টানধর্মও নানা প্রকারে আমাদের মিলনের একটা বাধা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের পরস্পরের শ্রেষ্ঠ পরিচয় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু, এমন সাধারণভাবে কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোনো কথা বলা চলে না, তাহার

প্রমাণ পাইয়াছি। এখানে আসিয়া একজন খৃস্টান পাদ্রির সহিত আমার আলাপ হইয়াছে যিনি পাদ্রির চেয়ে খৃস্টান বেশি— ধর্ম যাঁহার মধ্যে ব্যবসায়িক মূর্তি ধরিয়া উগ্ররূপে দেখা দেয় নাই, সমস্ত জীবনের সহিত সুসম্মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এমন মানুষকে কেহ মনে করিতে পারে না যে 'ইনি আমাদের পক্ষের লোক নহেন, ইনি অন্য দলের'। ইহাই অত্যন্ত অনুভব করি, ইনি মানুষ— ইনি সত্যকে মঙ্গলকে সকল মানুষের মধ্যে দেখিতে আনন্দ বোধ করেন— তাহা খৃস্টানেরই বিশেষ সম্পত্তি মনে করিয়া ঈর্ষা করেন না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, ইঁহার কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে। সেখানে খৃস্টানের পক্ষে যথার্থ খৃস্টান হইবার মস্ত একটা বাধা আছে— কারণ, সেখানে তিনি রাজা। সেখানে রাষ্ট্রনীতি ধর্মনীতির সপত্নী। অনেক সময়ে তিনিই সুয়োরানী। এইজন্য ভারতবর্ষের পাদ্রি ভারতবাসীর সমগ্র জীবনের সঙ্গে সমবেদনার যোগ রাখিতে পারেন না। একটা মস্ত জায়গায় আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের জাতীয় স্বার্থের সংঘাত আছে এবং এক জায়গায় তাঁহারা তাঁহাদের গুরুর উপদেশ শিরোধার্য করিয়া শির নত করিতে পারেন না। তিনি নম্রতা দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সেটা স্বর্গরাজ্যের নীতি। ইঁহারা মর্তরাজ্যের অধীশ্বর।

আমি যাঁহার কথা বলিতেছি ইনি রেভারেণ্ড্ এণ্ড্রুস। ভারতবর্ষের লোকের কাছে ইঁহার পরিচয় আছে। তিনি আপনার মধ্যে যে ইংরেজ রাজা আছে তাহাকে একেবারে হার মানাইয়াছেন এবং আমাদের আপন হইবার পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছেন। খৃস্টানধর্ম যেখানে সমগ্র জীবনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে সেখানে যে কী মাধুর্য এবং উদারতা তাহা ইঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়াকে আমি বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করি।

ইনিই একদিন আমাকে বলিলেন, 'দেশে ফিরিবার পূর্বে এখানকার গৃহস্থবাড়ি তোমাকে দেখিয়া যাইতে হইবে। শহরে তাহার অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে— পল্লীগ্রামে না গেলে তাহার ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।' ইঁহার একজন বন্ধু স্টাফোর্ড্‌শিয়রে এক পল্লীতে পাদ্রির কাজ করিয়া থাকেন; তাঁহারই বাড়িতে এণ্ড্রুস সাহেব কিছুদিন আমাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অগস্ট্ মাস এ দেশে গ্রীষ্ম-ঋতুর অধিকারের মধ্যে গণ্য। সে সময়ে শহরের লোক পাড়াগাঁয়ে হাওয়া খাইয়া আসিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এমন অবারিতভাবে আমরা প্রকৃতির সঙ্গ পাই, সেখানে আকাশ এবং আলোক এমন প্রচুররূপে আমাদের পক্ষে সুলভ যে, তাহার সঙ্গে যোগসাধনের জন্য বিশেষ ভাবে আমাদিগের কোনো আয়োজন করিতে হয় না। কিন্তু এখানে প্রকৃতিকে

তাহার ঘোমটা খুলিয়া দেখিবার জন্য লোকের মনের ঔৎসুক্য কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। ছুটির দিনে ইহারা যেখানে একটু খোলা মাঠ আছে সেইখানেই দলে দলে ছুটিয়া যায়— বড়ো ছুটি পাইলেই শহর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এমনি করিয়া প্রকৃতি ইহাদিগকে চলাচলের মুখে রাখিয়াছে, ইহাদিগকে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দেয় না। ছুটির ট্রেনগুলি একেবারে লোকে পরিপূর্ণ। বসিবার জায়গা পাওয়া যায় না। সেই শহরের উড়ুক্কু মানুষের ঝাঁকের সঙ্গে মিশিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

গম্যস্থানের স্টেশনে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা তাঁহার খোলা গাড়িটি লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গাড়িতে যখন চড়িলাম তখন আকাশে মেঘ। ছায়াচ্ছন্ন প্রভাতের আবরণে পল্লীপ্রকৃতি ম্লানমুখে দেখা দিল। অল্প কিছুদূর যাইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

বাড়িতে গিয়া যখন পৌঁছিলাম গৃহস্বামিনী তাঁহার আগুন-জ্বালা বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। বাড়িটি পুরাতন পাদ্রিনিবাস নহে। ইহা নূতন-তৈরি। গৃহসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে বৃদ্ধ তরুশ্রেণী বহুদিনের ধারাবাহিক মানবজীবনের বিলুপ্ত স্মৃতিকে পল্লব-পুঞ্জের অস্ফুট ভাষায় মর্মরিত করিতেছে না। বাগানটি নূতন, বোধ হয় ইহারাই প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘন সবুজ তৃণক্ষেত্রের ধারে ধারে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটিয়া কাঙাল চক্ষুর কাছে অজস্র সৌন্দর্যের অবারিত অন্নসত্র খুলিয়া দিয়াছে। গ্রীষ্ম-ঋতুতে ইংলণ্ডে ফুলপল্লবের যেমন সরসতা ও প্রাচুর্য এমন তো আমি কোথাও দেখি নাই। এখানে মাটির উপরে ঘাসের আস্তরণ যে কী ঘন ও তাহা কী নিবিড় সবুজ তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাড়িটির ঘরগুলি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন; লাইব্রেরি সুপাঠ্য গ্রন্থে পরিপূর্ণ; ভিতরে বাহিরে কোথাও লেশমাত্র অযত্নের চিহ্ন নাই। এখানকার ভদ্র গৃহস্থ-ঘরে এই জিনিসটাই বিশেষ করিয়া আমার মনে লাগিয়াছে। ইহাদের ব্যবহারের আরামের ও গৃহসজ্জার উপকরণ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, অথচ ঘরের প্রত্যেক সামান্য জিনিসটির প্রতি গৃহস্থের চিত্ত সতর্কভাবে জাগ্রত আছে। নিজের চারি দিকের প্রতি শৈথিল্য যে নিজেরই অবমাননা তাহা ইহারা খুব বুঝে। এই জাগ্রত আত্মাদরের ভাবটি ছোটোবড়ো সকল বিষয়েই কাজ করিতেছে। ইহারা নিজের মনুষ্যগৌরবকে খাটো করিয়া দেখে না বলিয়াই নিজের ঘরবাড়িকে যেমন সর্বপ্রযত্নে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি নিজের প্রতিবেশকে সমাজকে দেশকে সকল বিষয়ে সকল দিক হইতে সম্মার্জন করিয়া তুলিবার জন্য ইহাদের প্রয়াস অহরহ উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। ত্রুটি

জিনিসটাকে ইহারা কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই খাপ করিতে চায় না।

বিকালের দিকে আমাকে লইয়া গৃহস্বামী উট্রম সাহেব বেড়াইতে বাহির হইলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে, কিন্তু আকাশে মেঘের অবকাশ নাই। এখানকার পুরুষেরা যেমন কালো টুপি মাথায় দিয়া মলিন বর্ণের কোর্তা পরিয়া বেড়ায়, এখানকার দেবতাও সেইরকম অত্যন্ত গম্ভীর ভদ্রবেশে আচ্ছন্ন হইয়া দেখা দিলেন। কিন্তু, এই ঘনগাম্ভীর্যের ছায়াতলেও এখানকার পল্লীশ্রীর সৌন্দর্য ঢাকা পড়িল না। গুল্মশ্রেণীর বেড়ায় দ্বারা বিভক্ত ঢেউ-খেলানো প্রান্তরের প্রগাঢ় শ্যামলিমা দুই চক্ষুকে স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত করিয়া দিল। জায়গাটা পাহাড়ে বটে কিন্তু পাহাড়ের উগ্র বন্ধুরতা কোথাও নাই— আমাদের দেশের রাগিণীতে যেমন সুরের গায়ে সুর মিড়ের টানে ঢলিয়া পড়ে, এখানকার মাটির উচ্ছ্বাসগুলি তেমনি ঢালু হইয়া পরস্পর গায়ে গায়ে মিলিয়া রহিয়াছে; ধরিত্রীর সুরবাহারে যেন কোন্ দেবতা নিঃশব্দ রাগিণীতে মেঘমল্লারের গৎ বাজাইতেছেন। আমাদের দেশের যে-সকল প্রদেশ পার্বত্য, সেখানকার যেমন একটা উদ্ধত মহিমা আছে এখানে তাহা দেখা যায় না। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, বন্য প্রকৃতি এখানে সম্পূর্ণ পোষ মানিয়াছে। যেন মহাদেবের বাহন বৃষ— শরীরটি নধর চিক্কণ, নন্দীর তর্জনী-সংকেত মানিয়া তাহার পায়ের কাছে শিঙ নামাইয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া আছে, প্রভুর তপোবিঘ্নের ভয়ে হাম্বাধ্বনিও করিতেছে না।

পথে চলিতে চলিতে উট্রম সাহেব একজন পথিকের সঙ্গে কিছু কাজের কথা আলাপ করিয়া লইলেন। ব্যাপারটা এই— স্থানীয় চাষী গৃহস্থদিগকে নিজেদের ভিটার চারি দিকে খানিকটা করিয়া বাগান করিতে উৎসাহ দিবার জন্য, ইহারা একটি কমিটি করিয়া উৎকর্ষ অনুসারে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অল্পদিন হইল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই পথিকটি পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছে। উট্রম সাহেব আমাকে কয়েকটি চাষী গৃহস্থের বাড়ি দেখাইতে লইয়া গেলেন। তাহারা প্রত্যেকেই নিজের কুটীরের চারি দিকে বহু যত্নে খানিকটা করিয়া ফুলের ও তরকারির বাগান করিয়াছে। ইহারা সমস্ত দিন মাঠের কাজে খাটিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া এই বাগানের কাজ করে। এমনি করিয়া গাছপালার প্রতি ইহাদের এমন একটা আনন্দের টান হয় যে, এই অতিরিক্ত পরিশ্রম ইহাদের গায়ে লাগে না। ইহার আর-একটি সুফল এই যে, এই উৎসাহ মদের নেশাকে খেদাইয়া রাখে। বাহিরকে রমণীয় করিয়া তুলিবার এই চেষ্টায় নিজের অন্তরকেও ক্রমশ সৌন্দর্যের সুরে বাঁধিয়া তোলা হয়। এখানকার পল্লীবাসীর সঙ্গে উট্রম সাহেবের হিতানুষ্ঠানের সম্বন্ধ আরও নানা দিক হইতে দেখিয়াছি। এইপ্রকার মঙ্গলব্রতে-নিরত-উৎসর্গ-করা জীবন যে কী সুন্দর তাহা ইহাকে দেখিয়া অনুভব করিয়াছি।

ভগবানের সেবার অমৃতরসে ইহার জীবন পরিপক্ক মধুর ফলের মতো নম্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ঘরের মধ্যে ইনি একটি পুণ্যের প্রদীপ জালিয়া রাখিয়াছেন; অধ্যয়ন ও উপাসনার দ্বারা ইহার গার্হস্থ্য প্রতিদিন ধৌত হইতেছে; ইহার আতিথ্য যে কিরূপ সহজ ও সুন্দর তাহা আমি ভুলিতে পারিব না।

এই-যে এক-একটি করিয়া পাদ্রি কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্র হইয়া বসিয়া আছেন, ইহার সার্থকতা এবার আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই সর্বদেশব্যাপী বৃহবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা নিতান্ত গণ্ডগ্রামগুলির মধ্যে একটা উন্নতির প্রয়াস জাগ্রত হইয়া আছে। এইরূপে ধর্ম এ দেশে শুভকর্ম-আকারে চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। একটি বৃহৎ ব্যবস্থার সূত্রে এ দেশের সমস্ত লোকালয় মালার মতো গাঁথা হইয়াছে। আমাদের মতো যাহারা এইপ্রকার সর্বজনীন ব্যবস্থার অভাবে পীড়িত হইতেছে তাহারাই জানে ইহা কতবড়ো একটি কল্যাণ।

মানুষ এমন কোনো নিখুঁত ব্যবস্থা চিরকালের মতো পাকা করিয়া গড়িয়া রাখিতে পারে না যাহার মধ্যে কোনো ভণ্ডামি, কোনো অনর্থ, কোনো কালে প্রবেশ করিবার পথ না পায়। এ দেশের ধর্মমত ও ধর্মতন্ত্রের সঙ্গে এখনকার উন্নতিশীল কালের কিছু কিছু অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে, এ কথা সকলেই জানে। আমি এখানকার অনেক ভালো লোকের মুখে শুনিয়াছি, ভজনালয়ে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। যে-সকল কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব তাহাকে অন্ধভাবে স্বীকার করিবার পাপে তাঁহারা লিপ্ত হইতে চান না। এইরূপে দেশপ্রচলিত ধর্মমত নানা স্থানে জীর্ণ হইয়া পড়াতে ধর্মের আশ্রয়কে তাঁহারা সর্বাংশেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ সময়েই নানা কপটাচার বৃদ্ধ ধর্ম-মতকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে আরও রোগাতুর করিয়া তোলে। আজকালকার দিনে নিঃসন্দেহই চার্চের মধ্যে এমন অনেক পাদ্রি আসন গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন না তাহা প্রচার করেন, এবং যাহা প্রচার করেন তাহাকে কায়ক্লেশে বিশ্বাস করিবার জন্য নিজেকে ভোলাইবার আয়োজন করিতে থাকেন। এই মিথ্যা যে সমাজকে নানা প্রকারে আঘাত করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরদিনই গোঁড়ামি ধর্মের সিংহদ্বারকে এমন সংকীর্ণ করিয়া ধরে যাহাতে করিয়া ক্ষুদ্রতাই প্রবেশ করিবার পথ পায়, মহত্ত্ব বাহিরে পড়িয়া থাকে। এইরূপে য়ুরোপে যাঁহারা জ্ঞানে প্রাণে হৃদয়ে মহৎ তাঁহারা অনেকেই য়ুরোপের ধর্মতন্ত্রের বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন। এ অবস্থা কখনোই কল্যাণকর হইতে পারে না।

কিন্তু, য়ুরোপকে তাহার প্রাণশক্তি রক্ষা করিতেছে। তাহা কোনো একটা জায়গায় আটকা পড়িয়া বসিয়া থাকে না। চলা তাহার ধর্ম— গতির বেগে সে

আপনার বাধাকে কেবলই আঘাত করিয়া ক্ষয় করিতেছে। খৃস্টান-ধর্মমত যে পরিমাণে সংকুচিত হইয়া এই স্রোতের বেগকে বাধা দিতেছে সেই পরিমাণে ঘা খাইয়া তাহাকে প্রশস্ত হইতে হইবে। সেই প্রক্রিয়া প্রত্যহই চলিতেছে; অবশেষে এখনকার মনীষীরা যাহাকে খৃস্টানধর্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন তাহা নিজের স্থূল আবরণ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে। তাহা ত্রিত্ববাদ মানে না, যিশুকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে না, খৃস্টানপুরাণ-বর্ণিত অতিপ্রাকৃত ঘটনায় তাহার আস্থা নাই, তাহা মধ্যস্থবাদীও নহে। য়ুরোপের ধর্মপ্রকৃতির মধ্যে একটা খুব আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ইহা নিশ্চিত, য়ুরোপ কখনোই আপনার সনাতন ধর্মমতকে আপনার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেয়ে নীচে ঝুলিয়া পড়িতে দিয়া নিজেকে এত বড়ো একটা বোঝায় চিরকাল ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিবে না।

যাহাই হউক, পাদ্রিরা এই-যে ধর্মমতের জাল দিয়া সমস্ত দেশকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে, ইহাতে সময়ে সময়ে দেশের উন্নতিকে কিছু কিছু বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মোটের উপর ইহাতে যে দেশের ভিতরকার উচ্চ সুরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের এই কাজ ছিল। কিন্তু, ব্রাহ্মণের কর্তব্য বর্ণগত হওয়াতে তাহা স্বভাবতই আপন কর্তব্যের দায়িত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্তব্যের আদর্শ যতই উচ্চ হইবে ততই তাহা বিশেষ যোগ্য ব্যক্তির বিশেষ শিক্ষা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিবে—যখনি সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে এই দায়িত্বকে বংশগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তখনি আদর্শকে যতদূর সম্ভব খর্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণের দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ হইতে পারে, এই নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ মিথ্যার বোঝা আমাদের সমাজ চোখ বুজিয়া বহন করিয়া আসাতেই তাহার ধর্ম প্রাণহীন ও প্রথাগত অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতেছে। যে ব্রাহ্মণকে সমাজ ভক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে সে ব্রাহ্মণ চরিত্রে ও ব্যবহারে ভক্তিভাজন হইবার জন্য নিজেকে বাধ্য মনে করে না; সে কেবলমাত্র পৈতার লাগামের দ্বারা সমাজকে চালনা করিয়া তাহাকে নানা দিকে কিরূপ হীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে, তাহা অভ্যাসের অন্ধতা-বশতই আমরা বুঝিতে পারি না। এখানে প্রত্যেক পাদ্রিই যে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সহিত খৃস্টানধর্মের আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ করিয়াছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু ইহারা বংশগত পাদ্রি নহে, সমাজের কাছে ইহাদের জবাবদিহি আছে, নিজের চরিত্রকে আচরণকে ইহারা কলুষিত করিতে পারে না—সুতরাং আর-কিছুই না হোক, সেই নির্মল চরিত্রের, সেই ধর্মনৈতিক সাধনার সুরটিকে যথাসাধ্য দেশের কাছে ইহারা ধরিয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রে যাহাই বলুক, ব্যবহারতঃ

অধার্মিক ব্রাহ্মণকে দিয়া ধর্মকর্ম করাইতে আমাদের সমাজের কিছুমাত্র লজ্জা সংকোচ নাই। ইহাতে ধর্মের সঙ্গে পুণ্যের আন্তরিক বিচ্ছেদ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না— ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বকে আমরা প্রত্যহ অবমানিত করিতেছি। এখানে অধার্মিক পাদ্রিকে সমাজ কখনোই ক্ষমা করিবে না; সে পাদ্রি হয়তো ভক্তিমান না হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে চরিত্রবান হইতেই হইবে— এই উপায়েই সমাজ নিজের মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান রক্ষা করিতেছে এবং নিঃসন্দেহই চরিত্রসম্পদে তাহার পুরস্কার লাভ করিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম, এখানকার পাদ্রির দল সমস্ত দেশের জন্য একটা ধর্মনৈতিক মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু, সেইটুকুতেই তো সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নহে। সমস্ত দেশের সামনে ক্ষণে ক্ষণে যে বড়ো বড়ো ধর্মসমস্যা উপস্থিত হয় খৃস্টের বাণীর সঙ্গে সুর মিলাইয়া পাদ্রিরা তো তাহার মীমাংসা করেন না। দেশের চিত্তের মধ্যে খৃস্টকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার যে ভার তাঁহারা লইয়াছেন, এইখানে পদে পদে তাহার ব্যত্যয় দেখিতে পাই। যখন বোয়ার-যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তখন সমস্ত দেশের পাদ্রিরা তাহার কিরূপ বিচার করিয়াছিলেন। এই-যে পারস্যকে দুই টুকরা করিয়া কুটিয়া ফেলিবার জন্য য়ুরোপের দুই মোটা মোটা গৃহিণী বঁটি পাতিয়া বসিয়াছেন— পাদ্রিরা চুপ করিয়া আছেন কেন। ভারতবর্ষে কুলিসংগ্রহ ব্যাপারে, কুলি খাটাইবার ব্যবস্থায়, সেখানকার শাসনতন্ত্রে, সেখানে দেশীয়দের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে এমন কি কোনো অবিচার ঘটে না যাহাতে খৃস্টের নাম লইয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া দুর্বল অপমানিতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন। তেমন স্বর্গীয় দৃশ্য কি আমরা দেখিয়াছি। ইংরেজিতে 'পয়সার বেলায় পাকা টাকার বেলায় বোকা' বলিয়া একটা চলতি কথা আছে, বড়ো বড়ো খৃস্টানদেশের ধর্মনৈতিক আচরণে আমরা তাহার পরিচয় প্রতিদিন পাইতেছি; তাঁহারা ব্যক্তিগত নৈতিক আদর্শকে আঁট করিয়া রাখিতে চান অথচ সমস্ত জাতি ব্যূহবদ্ধ হইয়া এমন-সকল প্রকাণ্ড পাপাচরণে নির্লজ্জভাবে প্রবৃত্ত হইতেছেন যাহাতে সুদূরব্যাপী দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়া দুর্বিষহ দুঃখদুর্গতির সৃষ্টি করিতেছে; এমন দুর্দিনে অনেক মহাত্মাকে স্বজাতির এই সর্বজনীন সয়তানির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লড়িতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পাদ্রি কয়জন। এমন-কি, গণনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রচলিত খৃস্টানধর্মে আস্থাবান নহেন। অথচ চার্চের চিরপ্রথা-সম্মত কোনো বাহ্য পূজাবিধিতে সামান্য একটু নড়চড় ঘটাইলে সমস্ত পাদ্রিসমাজে বিষম হলুস্থুল পড়িয়া যায়। এইজন্যই কি যিশু তাঁহার রক্ত দিয়াছিলেন। জগতের সম্মুখে ইহা কোন্ সুসমাচার প্রচার করিতেছে। খৃস্টানদেশের

পাদ্রির দল স্বজাতির ধর্ম-তহবিলের সিকিপয়সা আধপয়সা আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু বড়ো বড়ো 'কোম্পানির কাগজ' ফুঁকিয়া দিবার বেলায় তাঁহাদের হুঁশ নাই। তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাকে কড়ির মূল্যে সম্মান করেন ও মোহরের মূল্যে অপমানিত করিয়া থাকেন, ইহাই প্রতিদিন দেখিতেছি। পাদ্রিদের মধ্যে এমন মহদাশয় আছেন যাঁহারা অকৃত্রিম বিশ্ববন্ধু, কিন্তু সে তাঁহাদের ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য। কিন্তু, দলের দিকে তাকাইলে এই কথা মনে আসে যে, ধর্মকে দলের হাতে সমর্পণ করিলে তাহাকে খানিকটা পরিমাণে দলিত করা হয়ই। ইহাতেও একপ্রকার জাত তৈরি করা হয়, তাহা বংশগত জাতের চেয়ে অনেক বিষয়ে ভালো হইলেও তাহাতে জাতের বিষ খানিকটা থাকিয়া যায় ও তাহা জমিয়া উঠিতে থাকে। ধর্ম মানুষকে মুক্তি দেয়, এইজন্য ধর্মকে সকলের চেয়ে মুক্ত রাখা চাই; কিন্তু, ধর্ম যেখানে দলের বেড়ায় আটকা পড়ে সেখানেই ক্রমশ তাহার ছোটো দিকটাই বড়ো দিকের চেয়ে বড়ো হইয়া উঠে, বাহিরের জিনিস অন্তরের জিনিসকে আচ্ছন্ন করে ও যাহা সাময়িক তাহা নিত্যকে পীড়া দিতে থাকে। এইজন্যই সমস্ত দেশ জুড়িয়া পাদ্রির দল বসিয়া থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ দস্যুবৃত্তি ও কসাইবৃত্তি করিতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিনায়কদের লেশমাত্র সংকোচ বোধ হয় না; তাঁহাদের সেই পুণ্যজ্যোতি নাই যাহার সম্মুখে এই-সকল বিরাট পাপের কলঙ্ককালিমা সর্বসমক্ষে বীভৎসরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়।

সংগীত

আমরা গ্রীষ্ম-ঋতুর অবসানের দিকে এ দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এখন এখানে সংগীতের আসর ভাঙিবার মুখে। কোনো বড়ো ওস্তাদের গান বা বাজনার বৈঠক এখন আর নাই। এখানকার নিকুঞ্জে গ্রীষ্মকালে পাখিরা নানা সমুদ্র পার হইয়া আসে, আবার তাহারা সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়। মানুষের সংগীতও এখানে সকল ঋতুতে বাজে না; তাহার বিশেষ কাল আছে, সেই সময়ে পৃথিবীর নানা ওস্তাদ নানা দিক হইতে আসিয়া এখানে সংগীতসরস্বতীর পূজা করিয়া থাকে।

আমাদের দেশেও একদিন এইরূপ গীতবাদ্যের পরব ছিল। পূজাপার্বণের সময় বড়ো বড়ো ধনীদের বাড়িতে নানা দেশের গুণীরা আসিয়া জুটিত। সেই-সকল সংগীতসভায় দেশের সাধারণ লোকের প্রবেশ অবারিত ছিল। তখন লক্ষ্মী সরস্বতী একত্র মিলিতেন এবং সংগীতের ব্যাকসমীরণ সমস্ত দেশের হৃদয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত

হইত। সকল দেশেই একদিন বুনিয়াদি ধনীরাই দেশের শিল্প সাহিত্য সংগীতকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছে। য়ুরোপে এখন গণসাধারণ সেই বুনিয়াদি বংশের স্থান অধিকার করিয়াছে; আমাদের দেশে বারোয়ারি-দ্বারা যেটা ঘটিয়া থাকে সেইটে য়ুরোপের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বারোয়ারিই এখানে ওস্তাদ আনাইয়া গান শোনে; বারোয়ারির কৃপাতেই নিরন্ন কবির দৈন্য মোচন হয়, এবং চিত্রকর ছবি আঁকিয়া লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করে। কিন্তু, আমাদের দেশে বর্তমান কালে ধনীদের ধনের কোনো দায়িত্ব নাই; সে ধনের দ্বারা কেবল ল্যাজারাস অস্‌লার হ্যামিল্‌টন হার্‌মান এবং মাকিণ্টশ-বার্‌ন্‌ কোম্পানিরই মুনফা বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এ দিকে গণসাধারণেরও না আছে শক্তি, না আছে রুচি। আমাদের দেশে কলাবধূকে লক্ষ্মীও ত্যাগ করিয়াছেন, গণেশের ঘরেও এখনও তাঁহার স্থান হয় নাই।

আমার ভাগ্যক্রমে এবারে আমি লণ্ডনে আসার কয়েক সপ্তাহ পরেই ক্রিস্টল-প্যালাসের গীতশালায় হ্যাণ্ডেল-উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সংগীতরচয়িতা হ্যাণ্ডেল জর্মান ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডেই তিনি অধিকাংশ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বাইবেলের কোনো কোনো অংশ ইনি সুরে বসাইয়াছিলেন, সেগুলি এ দেশে বিশেষ আদর পাইয়াছে। এই গীতগুলিই বহুশত যন্ত্রযোগে বহুশত কণ্ঠে মিলিয়া হ্যাণ্ডেল-উৎসবে গাওয়া হইয়া থাকে। চারি হাজার যন্ত্রী ও গায়কে মিলিয়া এবারকার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই উৎসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। বিরাট সভাগৃহের গ্যালারিতে স্তরে স্তরে গায়ক ও বাদক বসিয়া গিয়াছে। এত বৃহৎ ব্যাপার যে দুর্বিনের সাহায্য ব্যতীত স্পষ্ট করিয়া কাহাকে দেখা যায় না, মনে হয় যেন পুঞ্জ পুঞ্জ মানুষের মেঘ করিয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ গায়কেরা উদারা মুদারা ও তারা সুরের কণ্ঠ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বসিয়াছে। একই রঙের একই রকমের কাপড়; সবসুদ্ধ মনে হয়, প্রকাণ্ড একটা পটের উপর কে যেন লাইনে লাইনে পশমের বুনানি করিয়া গিয়াছে।

চার হাজার কণ্ঠে ও যন্ত্রে সংগীত জাগিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে একটি সুর পথ ভুলিল না। চার হাজার সুরের ধারা নৃত্য করিতে করিতে একসঙ্গে বাহির হইল, তাহারা কেহ কাহাকেও আঘাত করিল না। অথচ সমতান নহে, বিচিত্র তানের বিপুল সম্মিলন। এই বহুবিচিত্রকে এমনতরো অনিন্দনীয় সুসম্পূর্ণতায় এক করিয়া তুলিবার মধ্যে যে একটা বৃহৎ শক্তি আছে, আমি তাহাই অনুভব করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। এত বড়ো বৃহৎ ক্ষেত্রে অন্তরে বাহিরে এই জাগ্রত শক্তির কোথাও কিছুমাত্র ঔদাস্য নাই, জড়ত্ব নাই। আসন বসন হইতে আরম্ভ করিয়া গীতকলার

পারিপাট্য পর্যন্ত সর্বত্র তাহার অমোঘ বিধান প্রত্যেক অংশটিকে সমগ্রের সঙ্গে মিলাইয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

মাঝে মাঝে ছাপানো প্রোগ্রাম খুলিয়া গানের কথার সঙ্গে সুরকে মিলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু, মিল যে দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এতবড়ো একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার গড়িয়া তুলিলে সেটা যে একটা যন্ত্রের জিনিস হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহিরের আয়তন বৃহৎ বিচিত্র ও নির্দোষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভাবের রসটি চাপা পড়িয়াছে। আমার মনে হইল, বৃহৎ বৃহবদ্ধ সৈন্যদল যেমন করিয়া চলে এই সংগীতের গতি সেইরূপ; ইহাতে শক্তি আছে, কিন্তু লীলা নাই।

কিন্তু, তাই বলিয়া সমস্ত য়ুরোপীয় সংগীত পদার্থটাই যে এই শ্রেণীর, তাহা বলিলে সত্য বলা হইবে না। অর্থাৎ, য়ুরোপীয় সংগীতে আকারের নৈপুণ্যই প্রধান, ভাবের রস প্রধান নহে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, সংগীতের রসসুধায় য়ুরোপকে কিরূপ মাতাইয়া তোলে। ফুলের প্রতি মৌমাছির আগ্রহ দেখিলেই বুঝা যাইবে ফুলে মধু আছে, সে মধু আমার গোচর না হইতেও পারে।

য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের সংগীতের এক জায়গায় মূলতঃ প্রভেদ আছে, সে কথা সত্য। হার্মনি বা স্বরসংগতি য়ুরোপীয় সংগীতের প্রধান বস্তু, আর রাগরাগিণীই আমাদের সংগীতের মুখ্য অবলম্বন। য়ুরোপ বিচিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, আমরা একের দিকে। বিশ্বসংগীতে আমরা দেখিতেছি বিচিত্রের তান সহস্রধারায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে, একটি আর-একটির প্রতিধ্বনি নহে, প্রত্যেকেরই নিজের বিশেষত্ব আছে অথচ সমস্তই এক হইয়া আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হার্মনি, জগতের সেই বহু রূপের বিরাট নৃত্যলীলাকে সুর দিয়া দেখাইতেছে। কিন্তু, নিশ্চয়ই মাঝখানে একটি এক-রাগিণীর গান চলিতেছে; সেই গানের তানলয়টিকেই ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য আপনার বিচিত্র গতিকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশের সংগীত সেই মাঝখানের গানটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই গভীর, গোপন, সেই এক— যাহাকে ধ্যানে পাওয়া যায়, যাহা আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছে। চিরধাবমান বিচিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়া তাল রাখিয়া চলা, ইহাই য়ুরোপীয় প্রকৃতি; আর চিরনিস্তব্ধ একের দিকে কান পাতিয়া, মন রাখিয়া, আপনাকে শান্ত করা, ইহাই আমাদের স্বভাব।

আমাদের দেশের সংগীতে কি ইহাই আমরা অনুভব করি না। য়ুরোপের সংগীতে দেখিতে পাই, মানুষের সমস্ত ঢেউ-খেলার সঙ্গে তাহার তাল-মানের যোগ আছে,

মানুষের হাসিকান্নার সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। আমাদের সংগীত মানুষের জীবন-লীলার ভিতর হইতে উঠে না, তাহার বাহির হইতে বহিয়া আসে। য়ুরোপের সংগীতে মানুষ আপনার ঘরের আলো, উৎসবের আলো, নানা রঙের ঝাড়ে লণ্ঠনে বিচিত্র করিয়া জ্বালাইয়াছে; আমাদের সংগীতে দিগন্ত হইতে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য বারবার ইহা অনুভব করিয়াছি, আমাদের সংগীত আমাদের সুখদুঃখকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আমাদের বিবাহের রাত্রে রশনচৌকিতে সাহানা বাজে। কিন্তু, সেই সাহানার তানের মধ্যে প্রমোদের ঢেউ খেলে কোথায়। তাহার মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র নাই, তাহা গম্ভীর, তাহার মিড়ের ভাঁজে ভাঁজে করুণা। আমাদের দেশে আধুনিক বিবাহে সানাইয়ের সঙ্গে বিলাতি ব্যাণ্ড্ বাজানো বড়োমানুষি বর্বরতার একটা অঙ্গ। উভয়ের প্রভেদ একেবারে সুস্পষ্ট। বিলাতি ব্যাণ্ডের সুরে মানুষের আমোদ-আহ্লাদের সমারোহ ধরণী কাঁপাইয়া তুলিতেছে; যেমন লোকজনের ভিড়, যেমন হাস্যালাপ, যেমন সাজসজ্জা, যেমন ফুলপাতা-আলোকের ঘটা, ব্যাণ্ডের সুরের উচ্ছ্বাসও ঠিক তেমনি। কিন্তু, বিবাহের প্রমোদসভাকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া যে অন্ধকার রাত্রি নিস্তব্ধ হইয়া আছে, যেখানে লোকলোকান্তরের অনন্ত উৎসব নীরব নক্ষত্রসভায় প্রশান্ত আলোকে দীপ্যমান, সাহানার সুর সেইখানকার বাণী বহন করিয়া প্রবেশ করে। আমাদের সংগীত মানুষের প্রমোদশালার সিংহদ্বারটা ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয় এবং জনতার মাঝখানে অসীমকে আহ্বান করিয়া আনে। আমাদের সংগীত একের গান, একলার গান— কিন্তু তাহা কোণের এক নহে, তাহা বিশ্বব্যাপী এক।

হার্মনি অতিমাত্র প্রবল হইলে গীতটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং গীত যেখানে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে চায় সেখানে হার্মনিকে কাছে আসিতে দেয় না। উভয়ের মধ্যে এই বিচ্ছেদটা কিছুদিন পর্যন্ত ভালো। প্রত্যেকের পূর্ণপরিণত রূপটিকে পাইবার জন্য কিছুকাল প্রত্যেকটিকে স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ দেওয়াই উচিত। কিন্তু, তাই বলিয়া চিরকালই তাহাদের আইবুড় থাকাটাকে শ্রেয় বলিতে পারি না। বর ও কন্যা যতদিন যৌবনের পূর্ণতা না পায় ততদিন তাহাদের পৃথক হইয়া বাড়িতে দেওয়াই ভালো, কিন্তু তার পরেও যদি তাহারা মিলিতে না পারে তবে তাহারা অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। গীত ও হার্মনির যে মিলিবার দিন আসিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সেই মিলনের আয়োজনও শুরু হইয়াছে।

গ্রামে হপ্তায় বিশেষ একদিন হাট বসে, বৎসরে বিশেষ একদিন মেলা হয়। সেইদিন পরস্পরের পণ্যবিনিময় করিয়া মানুষের যাহার যাহা অভাব আছে তাহা

মিটাইয়া লয়। মানুষের ইতিহাসেও তেমনি এক-একটা যুগে হাটের দিন আসে; সেদিন যে যার আপন আপন সামগ্রী ঝুড়িতে করিয়া আনিয়া পরের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আসে। সেদিন মানুষ বুঝিতে পারে, একমাত্র নিজের উৎপন্ন জিনিসে মানুষের দৈন্য দূর হয় না; বুঝিতে পারে, নিজের ঐশ্বর্যের একমাত্র সার্থকতা এই যে, তাহাতে পরের জিনিস পাইবার অধিকার জন্মে। এইরূপ যুগকে য়ুরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁসের যুগ বলিয়া থাকে। পৃথিবীতে বর্তমান যুগে যে রেনেসাঁসের হাট বসিয়া গেছে এত বড়ো হাট ইহার আগে আর-কোনোদিন বসে নাই। তাহার প্রধান কারণ, আজ পৃথিবীতে চারি দিকের রাস্তা যেমন খোলসা হইয়াছে এমন আর-কোনোদিন ছিল না।

কিছুদিন পূর্বে একজন মনীষী আমাকে বলিয়াছিলেন, য়ুরোপে ভারতবর্ষীয় রেনেসাঁসের একটা কাল আসন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে যে সম্পদ সঞ্চিত আছে হঠাৎ তাহা য়ুরোপের নজরে পড়িতেছে এবং য়ুরোপ অনুভব করিতেছে, সেগুলিতে তাহার প্রয়োজন আছে। এতদিন ভারতবর্ষের চিত্রশিল্প ও স্থাপত্য য়ুরোপের অবজ্ঞাভাজন হইয়াছিল; এখন তাহার বিশেষ একটি মহিমা য়ুরোপ দেখিতে পাইয়াছে।

অতি অল্পকাল হইল ভারতবর্ষীয় সংগীতের উপরও য়ুরোপের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমি ভারতবর্ষে থাকিতেই দেখিয়াছি, য়ুরোপীয় শ্রোতা তন্ময় হইয়া সুরবাহারে বাগেশ্রী রাগিণীর আলাপ শুনিতেছেন। একদিন দেখিলাম, একজন ইংরেজ শ্রোতা একটি সভায় বসিয়া দুইজন বাঙালি যুবকের নিকট সামবেদের গান শুনিতেছেন। গায়ক দুইজন বেদমন্ত্রে ইমনকল্যাণ ভৈরবী প্রভৃতি বৈঠকি সুর যোগ করিয়া তাঁহাকে সামগান বলিয়া শুনাইতেছেন। তাঁহাকে আমার বলিতে হইল, এ জিনিসটাকে সামগান বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে না। দেখিলাম, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত বাহুল্য; কারণ, তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। আমাকে তিনি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতে বলিলে আমি অল্প যেটুকু জানি সেই অনুসারে আবৃত্তি করিলাম। তখনি তিনি বলিলেন, এ তো যজুর্বেদের আবৃত্তির প্রণালী। বস্তুত আমি যজুর্বেদের মন্ত্রই আবৃত্তি করিয়াছিলাম। বেদগান হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রুপদ-খেয়ালের রাগ মান লয় তিনি তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছেন— তাঁহাকে সহজে ফাঁকি দিবার জো নাই। ইনি ভারতবর্ষীয় সংগীত সম্বন্ধে বই লিখিতেছেন।

শ্রীমতী মড মেকার্থির লেখা মডার্ন্‌-রিভিয়ু পত্রিকায় মাঝে মাঝে বাহির হইয়াছে। শিশুকাল হইতেই সংগীতে ইহার অসামান্য প্রতিভা। নয় বৎসর বয়স হইতেই ইনি প্রকাণ্ড সভায় বেহালা বাজাইয়া শ্রোতাদিগকে বিস্মিত করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে

ইঁহার হাতে স্নায়ুঘটিত পীড়া হওয়াতে ইঁহার বাজনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইনি ভারতবর্ষে থাকিয়া কিছুকাল বিশেষভাবে দক্ষিণভারতের সংগীত আলোচনা করিয়াছেন; ইনিও সে সম্বন্ধে বই লিখিতে প্রবৃত্ত আছেন।

একদিন ডাক্তার কুমারস্বামীর এক নিমন্ত্রণপত্রে পড়িলাম, তিনি আমাকে রতন দেবীর গান শুনাইবেন। রতন দেবী কে বুঝিতে পারিলাম না; ভাবিলাম কোনো ভারতবর্ষীয় মহিলা হইবেন। দেখিলাম তিনি ইংরেজ মেয়ে, যেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছি সেইখানকার তিনি গৃহস্বামিনী।

মেজের উপর বসিয়া কোলে তম্বুরা লইয়া তিনি গান ধরিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। এ তো 'হিলিমিলি পনিয়া' নহে; রীতিমত আলাপ করিয়া তিনি কানাড়া মালকোষ বেহাগ গান করিলেন। তাহাতে সমস্ত দুরূহ মিড় এবং তান লাগাইলেন, হাতের ইঙ্গিতে তাল দিতে লাগিলেন; বিলাতি সম্মার্জনী বুলাইয়া আমাদের সংগীত হইতে তাহার ভারতবর্ষীয়ত্ব বারো-আনা পরিমাণ ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিলেন না। আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে প্রভেদ এই যে ইঁহার কণ্ঠস্বরে কোথাও যেন কোনো বাধা নাই; শরীরের মুদ্রায় বা গলার সুরে কোনো কষ্টকর প্রয়াসের লক্ষণ দেখা গেল না। গানের মূর্তি একেবারে অক্ষুণ্ণ অক্লান্ত হইয়া দেখা দিতে লাগিল।

এ দেশে এই যাঁহারা ভারতবর্ষীয় সংগীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন, ইঁহারা যে কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছেন তাহা নহে; ইঁহারা ইহার মধ্যে একটা অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছেন— সেই রসটিকে গ্রহণ করিবার জন্য, এমন-কি, সম্ভবমত আপনাদের সংগীতের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার জন্য ইঁহারা উৎসুক হইয়াছেন। ইঁহাদের সংখ্যা এখনো নিতান্তই অল্প সন্দেহ নাই, কিন্তু আগুন একটা কোণেও যদি লাগে তবে আপনার তেজে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

এখানকার লণ্ডন একাডেমি অফ ম্যুজিকের অধ্যক্ষ ডাক্তার ইয়র্ক্‌ট্রটারের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় সংগীতের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। যাহাতে লণ্ডনে এই সংগীত আলোচনার একটা উপায় ঘটে সেজন্য আমার নিকট তিনি বারম্বার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কোনো ভারতবর্ষীয় ধনী রাজা কোনো বড়ো ওস্তাদ বীণাবাদককে এখানে কিছুকাল রাখিতে পারেন তাহা হইলে, তাঁহার মতে, বিস্তর উপকার হইতে পারে।

উপকার আমাদেরই সবচেয়ে বেশি। কেননা, আমাদের শিল্পসংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারাইয়াছি। আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। নদীতে যখন ভাঁটা পড়ে তখন কেবল পাঁক বাহির হইয়া পড়িতে

থাকে ; আমাদের সংগীতের স্রোতস্বিনীতে জোয়ার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া, আমরা আজকাল তাহার তলদেশের পঙ্কিলতার মধ্যে লুটাইতেছি। তাহাতে মানের উল্‌টা কাজ হয়। আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামোফোনে যে-সকল সুর বাজিতেছে, থিয়েটার হইতে যে-সকল গান শিখিতেছি, তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারিব, আমাদের চিত্তের দারিদ্র্যে কদর্যতা যে কেবল প্রকাশমান হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, সেই কদর্যতাকেই আমরা অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ধারণ করিতেছি। সস্তা খেলো জিনিসকে কেহ একেবারে পৃথিবী হইতে বিদায় করিতে পারে না ; একদল লোক সকল সমাজেই আছে, তাহাদের সংগতি তাহার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না— কিন্তু, যখন সেই-সকল লোকেই দেশ ছাইয়া ফেলে তখনি সরস্বতী সস্তা দামের কলের পুতুল হইয়া পড়েন। তখনি আমাদের সাধনা হীনবল হয় এবং সিদ্ধিও তদনুরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং এখন গ্রামোফোন ও কন্সর্ট্‌পার্টির আগাছায় দেশ দেখিতে দেখিতে ছাইয়া যাইবে ; যে সোনার ফসলের চাষ দরকার সে ফসল মারা যাইতেছে।

একদিন আমাকে ডাক্তার কুমারস্বামী বলিয়াছিলেন, 'হয়তো এমন সময় আসিবে যখন তোমাদের সংগীতের পরিচয় লইতে তোমাদিগকে য়ুরোপে যাইতে হইবে।' আমাদের দেশের অনেক জিনিসকেই য়ুরোপের হাত হইতে পাইবার জন্য আমরা হাত পাতিয়া বসিয়াছি। আমাদের সংগীতকেও একবার সমুদ্রপার করিয়া তাহার পরে যখন তাহাকে ফিরিয়া পাইব তখনি হয়তো ভালো করিয়া পাইব। আমরা বহুকাল ঘরের কোণে কাটাইয়াছি, এইজন্য কোনো জিনিসের বাজারদর জানি না ; নিজের জিনিসকে যাচাই করিয়া লইব, কোন্‌খানে আমাদের গৌরব তাহা নিশ্চিত করিয়া বুঝিব, সে শক্তি আমাদের নাই।

যেখানে মানুষের সকল চেষ্টাই প্রচুর প্রাণশক্তি হইতে নিয়ত নানা আকারে উৎসারিত হইতেছে, যেখানে মানুষের সমস্ত সম্পদ জীবনের বৃহৎ কারবারে খাটিতেছে এবং মুনফায় বাড়িয়া চলিয়াছে, সেইখানে আপনাদের সামগ্রীকে না আনিলে, সেই চল্‌তি কারবারের সঙ্গে যোগ দিতে না পারিলে, আমরা আপনার পরিচয় পাইতে পারিব না ; সুতরাং আমাদের অনেক শক্তি কেবল নষ্ট হইতে থাকিবে। পাছে য়ুরোপের সংসর্গে আমরা আপনাকে বিস্মৃত হই, এই ভয়ের কথাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি ; কিন্তু তাহা সত্য নহে, তাহার উল্টা কথাই সত্য। এই প্রবল সজীব শক্তির প্রথম সংঘাতে কিছুকালের জন্য আমরা দিশা হারাইয়া থাকি, কিন্তু শেষকালে আমরা নিজের প্রকৃতিকেই জাগ্রততর করিয়া পাই। য়ুরোপের প্রাণবান সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের প্রয়াসকে জাগাইয়াছে। তাহা যতই বলবান হইয়া উঠিতেছে

ততই অনুকরণের হাত এড়াইয়া আমাদিগকে আত্মপ্রকাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্‌বোধন দেখা যাইতেছে তাহার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, সংগীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংস্রব প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাকে প্রাচীন দপ্তরের লোহার সিন্ধুক হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের হাটে ভাঙাইতে হইবে। য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সংগীতকে আমরা সত্য করিয়া, বড়ো করিয়া, ব্যবহার করিতে শিখিব। দুঃখের বিষয়, সংগীত আমাদের শিক্ষিত লোকের শিক্ষার অঙ্গ নহে; আমাদের কলেজ-নামক কেরানিগিরির কারখানাঘরে শিল্পসংগীতের কোনো স্থান নাই, এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, যে-সকল বিদ্যালয়কে আমরা ন্যাশন্যাল নাম দিয়া স্থাপন করিয়াছি সেখানেও কলাবিদ্যার কোনো আসন পাতা হইল না। মানুষের সামাজিক জীবনে ইহার প্রয়োজন যে কত বড়ো, নোট মুখস্থ করিতে করিতে, ডিগ্রি নিতে নিতে, সেই বোধটুকু পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ হারাইয়া বসিয়াছি। এইজন্য সংগীত আজ পর্যন্ত সেই-সকল অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই বদ্ধ যাহাদের সম্মুখে বিশ্বের প্রকাশ নাই; যাহারা অক্ষম স্ত্রীলোকের মতো নিজের সমস্ত ধনকে গহনা গড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহাকে কেবল বহন করিতেই পারে, সর্বতোভাবে ব্যবহার করিতে পারে না; এমন-কি, ব্যবহারের কথার আভাস দিলেই তাহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠে— মনে করে, ইহা তাহাদের সর্বস্ব খোওয়াইবার পন্থা।

অতএব, আমাদের ধন যখন আমরা ভালো করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলাম না তখন যাহারা পারে তাহারা একদিন ইহাকে নিজের ব্যবসায়ে খাটাইবে, ইহাকে বিশ্বের কাজে লাগাইবার পথে আনিবে। আমাদিগকে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পরে গর্ব করিব, আমাদের যাহা আছে জগতে এমন আর কাহারও নাই; সেই গর্ব করিবার উপকরণও অন্য লোককে জোগাইয়া দিতে হইবে।

সমাজভেদ

আমরা যখন বিলাতে যাত্রা করি তখন সেটা কেবল দেশ হইতে দেশান্তরে যাওয়া নয়, আমাদের পক্ষে সেটা একটা নূতন সংসারে প্রবেশ করা। জীবনযাত্রার বাহ্য প্রভেদগুলাতে বড়ো-একটা-কিছু আসে-যায় না। আমাদের সঙ্গে বসনে-ভূষণে আহারে-বিহারে বিদেশীর সাদৃশ্য থাকিবে না, সেটা তো ধরা কথা, সুতরাং সেখানে বিশেষ বাধে

না। কিন্তু, কেবল জীবনযাত্রায় নহে, জীবনতত্ত্বে একটা জায়গায় আমাদের গভীরতর অমিল আছে, সেইখানেই দিক্‌নির্ণয় করা হঠাৎ আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।

জাহাজে উঠিয়াই আমরা প্রথম সেটা অনুভব করিতে শুরু করি। বুঝিতে পারি, এখন হইতে আমাদিগকে আর-এক সংসারের নিয়মে চলিতে হইবে। হঠাৎ এতখানি পরিবর্তন মানুষের পক্ষে অপ্রিয়— এইজন্যই আমরা সেটাকে ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করি না, কোনোমতে মানিয়া চলি কিম্বা মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলি, ইহাদের চাল-চলনটা অত্যন্ত বেশি কৃত্রিম।

আসল কথা, ইহাদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক অবস্থার যে প্রভেদ আছে সেইটেই গুরুতর। পরিবার এবং পল্লীমণ্ডলীর সীমায় আসিয়া আমাদের সমাজ থামিয়াছে। সেই সীমার মধ্যেই পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলা বাঁধা নিয়ম আছে। সেই সীমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের কী করিতে আছে এবং কী করিতে নাই তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই নিয়মগুলির মধ্যে অনেক কৃত্রিমতাও আছে, অনেক স্বাভাবিকতাও আছে।

কিন্তু, যে সমাজের প্রতি লক্ষ করিয়া এই নিয়মগুলি তৈরি হইয়াছে সেই সমাজের পরিধি বড়ো নহে এবং সে সমাজ আত্মীয়সমাজ। সুতরাং আমাদের আদবকায়দাগুলি ঘোরো রকমের। বাবার সামনে তামাক খাইতে নাই, গুরুঠাকুরের পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য, ভাসুরকে দেখিলে মুখ আবৃত করা চাই এবং মামাশ্বশুরের নিকটসংস্রব বর্জনীয়। এই পরিবার বা পল্লীমণ্ডলীর বাহিরে যে নিয়মের ধারা চলিয়াছে তাহা মোটের উপর বর্ণভেদমূলক।

বলিতে গেলে বর্ণাশ্রমের সূত্র আমাদের পল্লীসমাজ ও পরিবারমণ্ডলীকে হারের মতো গাঁথিয়া তুলিয়াছে। আমরা একটা সমাপ্তিতে আসিয়াছি। ভারতবর্ষ তাহার সমাজে সমস্যার একটা সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া বসিয়াছে এবং মনে করিয়াছে, এই ব্যবস্থাকে চিরকালের মতো পাকা করিয়া রাখিতে পারিলেই তাহার আর-কোনো ভাবনা নাই। এইজন্য বর্ণাশ্রমসূত্রের দ্বারা পরিবার-সমাজকে বাঁধিয়া রাখিবার বিধানকে সকল দিক হইতে দৃঢ় করিবার দিকেই আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্ত চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে যে সমস্যা ছিল ভারতবর্ষ তাহার একটা-কোনো সমাধানে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিচিত্র জাতির বিরোধকে সে এক রকম করিয়া মিটাইয়াছে, বিচিত্র শ্রেণীর বিরোধকে সে এক রকম করিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছে; বৃত্তিভেদের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বযুদ্ধকে নিবৃত্ত

করিয়াছে এবং ধন ও ক্ষমতার পার্থক্য যে অভিমানকে সৃষ্টি করে জাতিভেদের বেড়ার দ্বারা তাহার সংঘাতকে সে ঠেকাইয়াছে। এক দিকে যদিও ভারতবর্ষ সমাজের নেতা ব্রাহ্মণদের সহিত অন্য বর্ণের স্বাতন্ত্র্যকে সর্বপ্রকার উপায়ে অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি সমস্ত সুখসুবিধা-শিক্ষাদীক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য নানাবিধ ছোটোবড়ো প্রণালী বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে। এইজন্য ভারতবর্ষে ধনী যাহা ভোগ করে নানা উপলক্ষ্যে সর্বসাধারণে তাহার অংশ পায় এবং জনসাধারণকে আশ্রয় দিয়া ও পরিতুষ্ট করিয়াই ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা খ্যাতিলাভ করে। আমাদের দেশে ধনী-দরিদ্রের প্রচণ্ড সংঘাতের কোনো কারণ নাই, এবং অক্ষমকে আইনের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবারও বিশেষ প্রয়োজন ঘটে নাই।

পাশ্চাত্যসমাজ পারিবারিক সমাজ নহে; তাহা জনসমাজ, তাহা আমাদের সমাজের চেয়ে ব্যাপ্ত। ঘরের মধ্যে ততটা পরিমাণে সে নাই যতটা পরিমাণে সে বাহিরে আছে। আমাদের দেশে পরিবার বলিতে যে জিনিস বোঝায় তাহা য়ুরোপে বাঁধে নাই বলিয়াই য়ুরোপের মানুষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই ছড়াইয়া-পড়া সমাজের স্বভাবই এই— এক দিকে তাহার বাঁধন যেমন আলগা আর-এক দিকে তাহা তেমনি বিচিত্র ও দৃঢ় হইয়া পড়ে। তাহা গদ্যরচনার মতো। পদ্য ছন্দের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া চলে বলিয়া তাহার বাঁধনটি সহজ; কিন্তু গদ্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এইজন্যই এক দিকে সে স্বাধীন বটে আর-এক দিকে তাহার পদক্ষেপ যুক্তির দ্বারা, চিন্তাবিকাশের বিচিত্র নিয়মের দ্বারা, বড়ো করিয়া বাঁধা।

ইংরেজি সমাজ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আছে বলিয়া এবং তাহার সমস্ত কারবারকে বাহিরে প্রসারিত করিয়া ফাঁদিতে হইয়াছে বলিয়াই, নানা সামাজিক বিধানের দ্বারা তাহাকে সকল সময়েই প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে। আটপৌরে কাপড় পরিবার সময় তাহার অল্প। তাহাকে সাজিয়া থাকিতে হয়, কেননা সে আত্মীয়সমাজে নাই। আত্মীয়েরা ক্ষমা করে, সহ্য করে, কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করা যায় না। প্রত্যেককে প্রত্যেক কাজে ঠিক সময়মত চলিতেই হয়, নহিলে পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। রেলের লাইন যদি আমার একলার হয় অথবা আমার গুটিকয়েক ভাইবন্ধুর অধিকারে থাকে, তাহা হইলে যেমন খুশি গাড়ি চালাইতে পারি এবং পরস্পরের গাড়িকে ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে যখন-তখন দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারি। কিন্তু, সাধারণের রেলের রাস্তায় যেখানে বিস্তর গাড়ির আনাগোনা সেখানে পাঁচ মিনিট সময়ের ব্যতিক্রম হইলেই নানা দিকে গোল বাধিয়া যায় এবং তাহা সহ্য করা শক্ত হয়। আমাদের অত্যন্ত ঘোরো সমাজ বলিয়াই অথবা সেই ঘোরো অভ্যাস

আমাদের মজ্জাগত বলিয়াই, পরস্পরের সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারে দেশকালের বন্ধন নিতান্তই আলগা— আমরা যথেচ্ছা জায়গা জুড়িয়া বসি, সময় নষ্ট করি, এবং ব্যবহারের বাঁধাবাঁধিকে আত্মীয়তার অভাব বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। ইংরেজি সমাজে ওইখানেই সব-প্রথমে আমাদের বাধে; সেখানে বাহ্য ব্যবহারে আপন ইচ্ছামত যাহা-তাহা করিয়া সকলের কাছ হইতে ক্ষমা প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারও নাই। গড়ে সকলের যাহাতে সুবিধা সেইটের অনুসরণ করিয়া ইহারা নানা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে। ইহাদিগকে দেখাসাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ বেশভূষা আদর-অভ্যর্থনার নিয়ম পাকা করিয়া রাখিতে হইয়াছে। যাহা বস্তুত আত্মীয়সমাজ নহে সেখানে আত্মীয়সমাজের ঢিলা নিয়ম চালাইতে গেলেই সমস্ত অত্যন্ত বীভৎস হইয়া পড়ে এবং জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠে।

য়ুরোপের এই ব্যাপক সমাজ এখনও কোনো সমাধানের মধ্যে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহা আচারে ব্যবহারে বাহিরের দিকে একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে আপনাকে সংযত ও শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সমাজের ভিতরকার শক্তিগুলি এখনও আপনাদিগকে কোনো একটা ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া পরস্পরের সংঘাত সম্পূর্ণ বাঁচাইয়া চলিবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। য়ুরোপ কেবলই পরীক্ষা পরিবর্তন এবং বিপ্লবের ভিতর দিয়া চলিতেছে। সেখানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের, ধর্মসমাজের সঙ্গে কর্মসমাজের, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির, কারবারী-দলের সঙ্গে মজুর-দলের কেবলই দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রমণ্ডলের মতো তাহার যাহা হইবার তাহা হইয়া যায় নাই— এখনও তাহার আগ্নেয়গিরি অগ্নি-উদ্গারের জন্য প্রস্তুত আছে।

কিন্তু, আমরাই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া, সমাজব্যবস্থা চিরকালের মতো পাকা করিয়া, মৃতদেহের মতো সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি, এ কথা বলিলে চলিবে কেন। সময় উত্তীর্ণ হইলেও ব্যবস্থাকে কিছুদিনের মতো খাড়া রাখিতে পারি, কিন্তু অবস্থাকে তো সেইসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমরা মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছি, এখন ঘোরো সমাজ লইয়া আর আমাদের চলিতেই পারে না— ইহারা কেবলমাত্র বাপ দাদা খুড়া নহে, ইহারা বাহিরের লোক, ইহারা দেশ-বিদেশের মানুষ; ইহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইলে সতর্ক ও সচেষ্ট হইতেই হইবে; অন্যমনস্ক হইয়া, ঢিলেঢালা হইয়া যদি চলিতে যাই তবে একদিন অচল হইয়া উঠিবেই।

আমরা সনাতন প্রথার দোহাই দিয়া গর্ব করি, কিন্তু এ কথা একেবারেই সত্য নহে যে, ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের মধ্য দিয়া উদ্ভিন্ন হয় নাই। ভারতবর্ষকেও

অবস্থাভেদে নব নব বিপ্লবের তাড়নায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই— এবং ইতিহাসে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু, তাহার চলা একেবারে শেষ হইয়াছে, এখন হইতে অনন্তকাল সে সনাতন হইয়া বসিয়া থাকিবে, এমন অদ্ভুত কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও চাই না। এক-একটা বড়ো বড়ো বিপ্লবের পর সমাজের ক্লান্তি আসে; সেই সময় সে দ্বার বন্ধ করিয়া, আলো নিভাইয়া, ঘুমের আয়োজন করে। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ভারতবর্ষ শক্ত নিয়মের হুড়কায় সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করিয়া একেবারে স্থির হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ঘুম আসিয়াছিল। কিন্তু ইহাকে অনন্ত ঘুম বলিয়া গর্ব করিলে সেটা হাস্যকর অথচ সকরুণ হইয়া উঠিবে। ঘুম ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ রাত্রি থাকে— বাহিরে যতক্ষণ লোকের ভিড় নাই, বড়ো বড়ো দোকান-বাজার যতক্ষণ বন্ধ। কিন্তু, সকালে যখন চারি দিকে হাঁকডাক পড়িয়া গেছে, তুমি চুপচাপ পড়িয়া থাকিলেও আর-কেহ যখন চুপ করিয়া নাই, তখন সনাতন দরজা আটে-ঘাটে বন্ধ করিয়া থাকিলে অত্যন্ত ঠকিতে হইবে।

রাত্রিকালের বিধান সাদাসিধা; তাহার আয়োজন স্বল্প; তাহার প্রয়োজন সামান্য। এইজন্য সমস্ত ব্যবস্থা বেশ সহজেই সম্পূর্ণ করিয়া, নিরুদ্‌বিগ্ন হইয়া চোখ বোজা সম্ভব হয়; তখন যেখানে যেটি রাখি সেখানে সেটি পড়িয়া থাকে, কারণ, নাড়া দিবার কেহ নাই। দিনের বেলাকার ব্যবস্থা তত সহজ নহে; এবং তাহা ভোরের বেলা একবারের মতো সারিয়া ফেলিয়া তাহার পর সমস্ত দিনটা নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক খাইতে থাকা চলে না। ঘাড়ের উপর কাজ আসিয়া পড়ে, নূতন নূতন চেষ্টা করিতেই হয়, এবং বাহিরের জীবনস্রোতের সঙ্গে নিজের জীবনযাত্রাকে বনাইতে না পারিলে খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম সমস্তেরই ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে।

কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষ অত্যন্ত বাঁধা নিয়মের নিশ্চল ব্যবস্থার মধ্যে স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করিয়াছে। সেই অবস্থাটা গভীর আরামের বলিয়াই সেটা যে চিরকালই আরামের হইবে তাহা নহে। আঘাত সবচেয়ে কঠিন বেদনাজনক যখন তাহা ঘুমন্ত শরীরের উপর আসিয়া পড়ে। দিনের বেলা সেই আঘাতের সময়। এইজন্য দিনে জাগিয়া থাকাই সবচেয়ে আরামের।

ইচ্ছা করি আর না করি, সর্বাঙ্গে আলস্য জড়াইয়া থাক্‌ আর না থাক্‌, আমাদের জাগিবার সময় আসিয়াছে। আমরা সমাজের ভিতর হইতে ও বাহির হইতে আঘাত পাইতেছি, দুঃখ পাইতেছি। আমরা দৈন্যে দুর্ভিক্ষে পীড়িত। সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছে; একান্নবর্তী পরিবার খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে; এবং সমাজে ব্রাহ্মণের পদ ক্রমশই এমন খাটো হইয়া আসিতেছে যে, 'ব্রাহ্মণসমাজ' প্রভৃতি সভা-

সমিতির সাহায্যে ব্রাহ্মণ চীৎকারশব্দে আপনাকে ঘোষণা করিয়া আপনার দুর্বলতা সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। পল্লীসমাজের পঞ্চায়েত-প্রথা গবর্মেন্টের চাপরাশ গলায় বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিয়া ভূত হইয়া পল্লীর বুকে চাপিতেছে; দেশের অন্নে টোলের আর পেট ভরিতেছে না, দুর্ভিক্ষের দায়ে একে একে তাহারা সরকারি অন্নসত্রের শরণাপন্ন হইতেছে; দেশের ধনী-মানীরা জন্মস্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতায় মোটরগাড়ি চড়িয়া ফিরিতেছে; এবং বড়ো বড়ো কুলশীল আপনার যথাসর্বস্ব এবং কন্যাটিকে লইয়া বি.এ.পাস-করা বরের পায়ে বৃথা মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। এই-সমস্ত দুর্লক্ষণের জন্য কলিযুগকে বিদেশীরাজাকে বা স্বদেশী ইংরেজিনবিশকে গালি দিয়া কোনো ফল নাই। আসল কথা, আমাদের দিনের বেলাকার প্রভু তাঁহার চাপরাশি পাঠাইয়াছেন; আমাদের সনাতন শয়নাগার হইতে সে আমাদিগকে টানিয়া বাহির না করিয়া ছাড়িবে না। জোর করিয়া চোখ বুজিয়া আমরা অকালে রাত্রি সৃজন করিতে পারিব না। যে পৃথিবী আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাকে আমাদের ঘরে আহ্বান করিয়া আনিতেই হইবে; যদি আদর করিয়া তাহাকে না আনি তবে সে আমাদের দ্বার ভাঙিয়া প্রবেশ করিবে। দ্বার কি এখনি ভাঙে নাই।

অতএব, আবার একবার আমাদিগকে নূতন করিয়া সমস্যাসমাধানের জন্য ভাবিতে হইবে। য়ুরোপের নকল করিয়া সে কাজ চলিবে না; কিন্তু, য়ুরোপের কাছ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষা করা এবং নকল করা একই কথা নহে। বস্তুত, ঠিকভাবে শিক্ষা করিলেই নকল করার ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অন্যকে সত্যরূপে না জানিলে নিজেকে কখনোই সত্যরূপে জানা যায় না।

কিন্তু, যাহা বলিতেছিলাম সে কথাটা এই যে, আমাদের ঘোরো ঢিলাঢালা অভ্যাস লইয়া য়ুরোপীয় সমাজে আমাদের অত্যন্ত বাধে। কোনোমতেই প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারি না। মনে হয়, সকলেই আমাকে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ আমার জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতেছে না। আমরা আদর-আবদারের জীব, আত্মীয়সমাজের বাহিরে আমাদের বড়ো বিপত্তি। আমি এখানে আসিয়া ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আমাদের ঘরের ছেলের পরের বাড়িতে প্রবেশের অভ্যাস নাই বলিয়াই আমাদের অধিকাংশ ছাত্র এখানে আসিয়া পড়া মুখস্থ করে, কিন্তু এখানকার সমাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এখানকার সমাজ বড়ো বলিয়াই এখানকার সমাজের দায় বেশি। সেই দায় স্বীকার করিলে তবে এখানকার লোকের সঙ্গে সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের মিল হইতে পারে। সেই মিল না ঘটিলে এখানকার সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। কারণ, এখানকার সবচেয়ে বড়ো সত্য এখানকার সমাজ।

বস্তুত, এখানকার সবচেয়ে বড়ো বীরত্ব বড়ো মহত্ব এখানকার সমাজের ক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে নহে। প্রশস্ত সমাজের উপযোগী ত্যাগ এবং আত্মসম্মান এখানে পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে; এইখানে ইহারা মানুষ হইতেছে এবং নানা পথে মানুষের কাজে আপনাকে দান করিবার জন্য ইহারা প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় নিজের দেশেও স্কুলের শিক্ষাকেই শিক্ষা বলিয়া গণ্য করে— বৃহৎ সমাজের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত; এখানেও আসিয়া যদি তাহারা স্কুলের কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেবলমাত্র কলের সামগ্রী হইয়া বাহির হইয়া যায়, এখানকার সমাজে প্রত্যক্ষ মনুষ্যত্বের জন্মস্থানে প্রবেশ না করে, তবে বিদেশে আসিয়াও বঞ্চিত হইবে।

সীমার সার্থকতা

এ কথা মাঝে মাঝে শুনিয়াছি যে, কবিত্বের মধ্যে জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতা নাই। ঈশ্বরের সাধনাকে কাব্যালংকারের ক্ষেত্র হইতে সংসারে কর্মের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না করিলে তাহা সত্যের দৃঢ়তা লাভ করে না।

মাঝে মাঝে অবসাদের দিনে নিজেও এ কথা ভাবিয়াছি। কিন্তু আমি জানি, এরূপ চিন্তা মনের মধ্যে মরীচিকা-বিস্তার মাত্র। মানুষের যে রিপু তাহার কানে মিথ্যামন্ত্র জপ করে, লোভ তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য। সে মানুষকে এই কথা বলে, 'তুমি যাহা তাহার মধ্যে সত্য নাই, তাহার বাহিরেই সত্য।'

কিন্তু, উপনিষৎ বলিয়াছেন: মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। কাহারও ধনে লোভ করিয়ো না। অর্থাৎ, তোমার সীমার বাহিরে যাহা আছে তাহার পশ্চাতে চিত্তকে ও চেষ্টাকে ধাবিত করিয়ো না।

কেন করিব না ওই শ্লোকে সে কথাটাও বলা আছে। উপনিষৎ বলিতেছেন, তিনিই সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন; অতএব, যাহার মধ্যে তিনি আছেন, যাহা তাঁহার দান, তাহার মধ্যে কোনো অভাবই নাই। নিজের মধ্যে যখন ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করি না তখনি মনে করি, ঐশ্বর্য পরের মধ্যেই আছে। কিন্তু, যে দীনতাবশত ঐশ্বর্যকে নিজের মধ্যে পাই নাই সেই দীনতাবশতই তাহাকে অন্যত্র পাইবার আশা নাই।

সীমা আছে এ কথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন এ কথা তেমনি সত্য। আমরা উভয়কে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তখনি আমরা মায়ার ফাঁদে পড়ি। তখনি আমরা

এমন একটা ভুল করিয়া বসি যে, আপনার সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই বুঝি আমরা অসীমকে পাইব— যেন আত্মহত্যা করিলেই অমরজীবন পাওয়া যায়। যেন আমি না হইয়া আর-কিছু হইলেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু, আমি হওয়াও যা আর-কিছু হওয়া যে তাহাই, সে কথা মনে থাকে না। আমার এই আমির মধ্যে যদি ব্যর্থতা থাকে তবে অন্য কোনো আমিত্ব লাভ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। আমার ঘটের মধ্যে ছিদ্র থাকাতে যদি জল বাহির হইয়া যায়, তবে সে জলের দোষ নহে। দুধ ঢালিলেও সেই দশা হইবে, এবং মধু ঢালিলেও তথৈবচ।

জীবনে একটিমাত্র কথা ভাবিবার আছে যে, আমি সত্য হইব। আমি কবি হইব কি কর্মী হইব কি আর-কিছু হইব, সেটা নিতান্তই ব্যর্থ চিন্তা। সত্য হইব এ কথার অর্থই এই, কোথায় আমার সীমা সেটা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিব। দুরাশার প্রলোভনে সেইটে সম্বন্ধে যদি মন স্থির না করি, তবে সত্য ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট হইব।

অহংকারকে যে আমরা রিপু বলি, লোভকে যে আমরা রিপু বলি, তাহার কারণ এই— আমাদের সীমা সম্বন্ধে সে আমাদিগকে ঠিকটা বুঝিতে দেয় না। সে আমাদের আপনাকে জানার তপস্যায় বাধা দিয়া কেবলই বলিতে থাকে, 'তুমি যাহা তুমি তাহার চেয়ে আরও বেশি অথবা অন্য-কিছু।' ইহা হইতে পৃথিবীতে যত দুঃখ, যত বিদ্বেষ, যত কাড়াকাড়ি-হানাহানির সৃষ্টি হইতে থাকে এমন আর কিছুতেই না। যাহা মিথ্যা তাহাকেই গায়ের জোরে সত্য করিতে গিয়া পৃথিবীতে যত-কিছু অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়।

সীমাহীনতার প্রতি আমাদের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণই আমাদের জীবনকে গতিদান করে। সেই আকর্ষণকে অবহেলা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে মঙ্গল নাই। ভূমাকে আমাদের পাইতেই হইবে, সেই পাওয়াতেই আমাদের সুখ।

কিন্তু, নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে হইবে, ইহা ছাড়া গতি নাই। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আমরা অসীমকে খর্ব করিয়া থাকি। এ কথা সত্য, এক সীমার মধ্যে অন্য সীমাবদ্ধ পদার্থ সম্পূর্ণ স্থান পায় না। কিন্তু, অসীমের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তিনি একটি বালুকণার মধ্যেও অসীম। এইজন্য একটি বালুকণাকেও যখন সম্পূর্ণরূপে সর্বতোভাবে আয়ত্ত করিতে যাই তখন দেখি, বিশ্বকে আয়ত্ত না করিলে তাহাকে পাইবার জো নাই; কারণ, এক জায়গায় নিখিলের সঙ্গে সে অবিচ্ছেদ্য, তাহার এমন একটা দিক আছে যে দিকটাতে কিছুতেই তাহাকে শেষ করা যায় না।

আমরা নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের সাধনা। কারণ, সেই অসীমেরই আনন্দ আমার মধ্যে সীমা রচনা করিয়াছেন; সেই সীমার মধ্যেই তাঁহার বিলাস, তাঁহার বিহার। তাঁহার সেই নিকেতনকে ভাঙিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বেশি করিয়া পাইব, এমন কথা মনে করাই ভুল।

গোলাপ-ফুলের মধ্যে সৌন্দর্যের একটি অসীমতা আছে তাহার কারণ, সে সম্পূর্ণরূপেই গোলাপ-ফুল— সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ, কোনো অনির্দিষ্টতা নাই। এইজন্যই গোলাপ-ফুলের মধ্যে এমন একটি আবির্ভাব সুস্পষ্ট হইয়াছে যাহা চন্দ্রসূর্যের মধ্যে, যাহা জগতের সমস্ত সুন্দরের মধ্যে। সে সুনিশ্চিত সত্যরূপে গোলাপ-ফুল বলিয়াই সমস্ত জগতের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা সত্য।

বস্তুত অস্পষ্টতাই ব্যর্থতা; সুতরাং সেইখানেই ভূমার প্রকাশ প্রতিহত, ভূমার আনন্দ প্রচ্ছন্ন। তাঁহার আনন্দ রূপগ্রহণের দ্বারাই সার্থক। অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর। এইজন্য জগৎসৃষ্টির ইতিহাসে রূপের বিকাশ কেবলই সুব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে; সীমা হইতে সীমার অভিমুখে চলিয়াছে অসীমের অভিসারযাত্রা। কুঁড়ি হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, কেবলই রূপ হইতে ব্যক্ততর রূপ।

এইজন্যই আপনাকে স্পষ্ট করিয়া পাওয়াই মানুষের সাধনা। স্পষ্ট করিয়া পাওয়ার অর্থ ই সীমাবদ্ধ করিয়া পাওয়া। যখনি নানা পথে নানা দুরাশার বিক্ষিপ্ততা হইতে নিজেকে সংহৃত করিয়া সীমার মধ্যে আপনাকে স্পষ্ট করিয়া দাঁড় করানো যায়, তখনি জীবনের সার্থকতাকে লাভ করি।

সাঁতার যতক্ষণ না শিখি ততক্ষণ এলোমেলো হাত পা ছোঁড়া চলে। ভালো সাঁতার যেমনি শিখি অমনি আমাদের চেষ্টা সীমাবদ্ধ হইয়া আসে এবং তাহা সুন্দর হইয়া প্রকাশ পায়। পাখি যখন ওড়ে তখন সুন্দর দেখিতে হয়, কারণ, তাহার ওড়ার মধ্যে দ্বিধা নাই, তাহা সুনিয়ত অর্থাৎ তাহা আপনার নিশ্চিত সীমাকে পাইয়াছে। এই সীমাকে পাওয়াই সৃষ্টি অর্থাৎ সত্য; এবং সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য অর্থাৎ আনন্দ। সীমা হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই কদর্যতা, তাহাই নিরানন্দ, তাহাই বিনাশ।

কাব্যালংকার তখনি ব্যর্থ যখনি তাহা মিথ্যা, অর্থাৎ যখনি তাহা আপনার সীমাকে না পাইয়া আর-কিছু হইবার চেষ্টা করিতেছে। তখনি সে ভাণ করে; তখনি সে ছোটোকে বড়ো করিয়া দেখায়, বড়োকে ছোটো করিয়া আনে। তখনি তাহা কথার কথামাত্র, তাহা সৃষ্টি নহে। কিন্তু, কবি যেখানে সত্য, যেখানে সে আপনার অসীমকে আপনার সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, আপনার আনন্দকে আপনার শক্তির মধ্যে মূর্তিদান করে, সেখানে সে সৃষ্টি করে। জগতের সকল সৃষ্টির মধ্যেই

তাহার স্থান। সত্যকর্মী যে কর্মের সৃষ্টি করে, সত্যসাধক যে জীবনের সৃষ্টি করে, সকলেরই সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আসন লইবার অধিকার তাহার। কার্লাইল প্রভৃতি বাক্যরচকেরা বাক্যের চেয়ে কাজকে যে বড়ো স্থান দিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় তাহার অর্থ এই যে, তাঁহারা মিথ্যা বাক্যের চেয়ে সত্য কাজকে গৌরব দান করিতে চান। সেইসঙ্গে এ কথাও বলা উচিত, মিথ্যা কাজের চেয়ে সত্য বাক্য অনেক বড়ো।

আসল কথাই এই, সত্য যে-কোনো আকারেই প্রকাশ পাক্‌-না কেন তাহা একই; তাহাই মানুষের চিরসম্পদ। যেমন টাকা যেখানে সত্য, অর্থাৎ শক্তি যেখানে টাকা-আকারে প্রকাশ পায়, সেখানে সে টাকা কেবলমাত্র টাকা নহে, তাহা অন্নও বটে, বস্ত্রও বটে, শিক্ষাও বটে, স্বাস্থ্যও বটে; তখন সে টাকা সত্য মূল্যের সীমায় সুনির্দিষ্টরূপে বদ্ধ বলিয়াই আপনার নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ সে আপনার সত্য মূল্যের দ্বারাই আপনার বাহিরের বিবিধ সত্য পদার্থের সহিত যোগযুক্ত হয়। তেমনি সত্য কবিতার সঙ্গে মানুষের সকলপ্রকার সত্য সাধনার যোগ ও সমতুল্যতা আছে। সত্য কবিতা কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্যের মধ্যে কবিতা আকারেই থাকে না। তাহা মানুষের প্রাণের মধ্যে মিলিত হইয়া কর্মীর কর্ম ও তাপসের তপস্যার সহিত যুক্ত হইতে থাকে। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, কবির কবিতা যদি পৃথিবীতে না থাকিত তবে মানবজীবনের সকলপ্রকার কর্মই অন্যপ্রকার হইত। কারণ, মানুষের সত্য বাক্য চিরদিনই মানুষের সত্য কর্মের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, তাহাকে শক্তি দিতেছে, মূর্তি দিতেছে, তাহার পথকে লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে।

অতএব, এই কথাটি আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য সীমাকে পাওয়াই সত্য অসীমকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা। নিজের সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই নিজের অসীমকে লঙ্ঘন করা হয়। পৃথিবীতে কবিতায় বা কর্মে বা ধর্মসাধনায় যে-কোনো মানুষ সত্য হইয়াছে তাহার সহিত অপর সাধারণের প্রভেদ এই যে, সে অসীমের সীমাকে স্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিয়াছে, অন্য সকলে সীমাভ্রষ্ট অস্পষ্টতার মধ্যে যেমন-তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অস্পষ্টতাই তুচ্ছ। নদী যখন আপন তটসীমাকে পায় তখনি সে অসীম সমুদ্রের অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারে; যদি সে আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আরও বড়ো হইবার জন্য আপনার তটকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলেই তাহার গতি বন্ধ হইয়া যায় এবং সে তুচ্ছ বিলের মধ্যে, জলার মধ্যে, ছড়াইয়া পড়ে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, আপনার সত্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া সংকীর্ণতা

নহে, নিশ্চেষ্টতা নহে। বস্তুত, সেই সীমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই মানুষ উদার হয়, সেই সীমার মধ্যে বিধৃত হওয়ার দ্বারাই মানুষের চেষ্টা বেগবান হইয়া উঠে। ব্যক্তি ব্যক্তি-হওয়ার দ্বারাই মানুষের মধ্যে গণ্য হয়; জাতি জাতীয়ত্ব-লাভের দ্বারাই সর্বজাতির মধ্যে স্থান পাইতে পারে। যে জাতি জাতীয়তা লাভ করে নাই সে বিশ্বজাতীয়তাকে হারাইয়াছে। যে লোক বড়ো লোক সেই লোকই সকলের চেয়ে বিশেষ করিয়া নিজেকে পাইয়াছে। যে ব্যক্তি নিজেকে পাইয়াছে তাহার আর জড়তার মধ্যে পড়িয়া থাকিবার জো নাই; সে আপনার কাজ পাইয়াছে, সে আপনার স্থান পাইয়াছে, সে আপনার আনন্দ পাইয়াছে; নদীর মতো সে বিনা দ্বিধায় আপনার বেগে আপনিই চলিতে থাকে, তাহার সত্য সীমাই সত্য পরিণামের দিকে তাহাকে সহজে চালনা করিয়া লইয়া যায়।

আবিরাবীর্ম এধি। যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি আমার মধ্যে, আমারই সীমার মধ্যে, প্রকাশিত হউন, ইহাই আমাদের সত্য প্রার্থনা। যদি আমার সীমাকে অবজ্ঞা করি তবে সেই অসীমের প্রকাশকে বাধা দিব। পাহি মাং নিত্যম্। আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। আমার সত্যের মধ্যে, সীমার মধ্যে আমাকে রক্ষা করো; আমি যেন সীমার বাহিরে আপনাকে হারাইয়া না ফেলি। আমি যাহা পূর্ণরূপে তাহাই হইয়া যেন তোমার প্রসন্নতাকে, তোমার আনন্দকে সুস্পষ্টরূপে নিজের মধ্যে অনুভব করি। অর্থাৎ, আমার যে সীমার মধ্যে তোমার বিলাস সেই সীমাকেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমি যেন নিজের জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, ইহাই আমার অস্তিত্বের মূলগত অন্তরতর প্রার্থনা।

লণ্ডন

সীমা ও অসীমতা

ধর্ম শব্দের গোড়াকার অর্থ, যাহা ধরিয়া রাখে। religion শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে বুঝা যায় তাহারও মূল অর্থ, যাহা বাঁধিয়া তোলে।

অতএব, এক দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায়, মানুষ ধর্মকে বন্ধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ধর্মই মানুষের চেষ্টার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই বন্ধনকে স্বীকার করা, এই সীমাকে লাভ করাই মানুষের চরম সাধনা।

কেননা সীমাই সৃষ্টি। সীমারেখা যতই সুবিহিত সুস্পষ্ট হয় সৃষ্টি ততই সত্য ও সুন্দর হইতে থাকে। আনন্দের স্বভাবই এই, সীমাকে উদ্ভিন্ন করিয়া তোলা।

বিধাতার আনন্দ বিধানের সীমায় সমস্ত সৃষ্টিকে বাঁধিয়া তুলিতেছে। কর্মীর আনন্দ, কবির আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ— কেবলই স্ফুটতররূপে সীমা রচনা করিতেছে।

ধর্মও মানুষের মনুষ্যত্বকে তাহার সত্য সীমার মধ্যে স্ফুটতর করিয়া তুলিবার শক্তি। সেই সীমাটি যতই সহজ হয়, যতই সুব্যক্ত হয়, ততই তাহা সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে। মানুষ ততই শক্তি ও স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য লাভ করে, মানুষের মধ্যে আনন্দ ততই প্রকাশমান হইয়া উঠে।

ধর্মের সাহায্যে মানুষ আপনার সীমা খুঁজিতেছে, অথচ সেই ধর্মের সাহায্যেই মানুষ আপনার অসীমকে খুঁজিতেছে। ইহাই আশ্চর্য। বিশ্বসংসারে সমস্ত পূর্ণতার মূলেই আমরা এই দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। যাহা ছোটো করে তাহাই বড়ো করে, যাহা পৃথক করিয়া দেয় তাহাই এক করিয়া আনে, যাহা বাঁধে তাহাই মুক্তিদান করে; অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে। বস্তুত, এই দ্বন্দ্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা। যেখানে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া একটা দিকই প্রবল হইয়া ওঠে সেইখানেই যত অমঙ্গল। অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেখানে তাহা শূন্য, সীমা যেখানে অসীমকে নির্দেশ করে না সেখানে তাহা নিরর্থক। মুক্তি যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার করে সেখানে তাহা উন্মত্ততা, বন্ধন যেখানে মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন। আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্তু, আসল কথা এই, অসীম হইতে বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা হইতে বিযুক্ত অসীমও মায়া।

যে গান আপনার সুরের সীমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে সে গান কেবলমাত্র সুরসমষ্টিকে প্রকাশ করে না— সে আপনার নিয়মের দ্বারাই আনন্দকে, সীমার দ্বারাই সীমার চেয়ে বড়োকে ব্যক্ত করে। গোলাপ-ফুল সম্পূর্ণরূপে আপনার সীমাকে লাভ করিয়াছে বলিয়াই সেই সীমার দ্বারা সে একটি অসীম সৌন্দর্যকে প্রকাশ করিতে থাকে। এই সীমার দ্বারা গোলাপ-ফুল প্রকৃতিরাজ্যে একটি বস্তুবিশেষ, কিন্তু ভাবরাজ্যে আনন্দ। এই সীমাই তাহাকে এক দিকে বাঁধিয়াছে, আর-এক দিকে ছাড়িয়াছে।

এইজন্যই দেখিতে পাই, মানুষের সকল শিক্ষারই মূলে সংযমের সাধনা। মানুষ আপনার চেষ্টাকে সংযত করিতে শিখিলেই তবে চলিতে পারে, ভাবনাকে বাঁধিতে পারিলে তবেই ভাবিতে পারে। সেই কারুকরই সুনিপুণ যে লোক কর্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছে এবং মানিয়াছে। সেই লোকই নিজের জীবনকে সুন্দর করিতে পারিয়াছে যে তাহাকে সংযত করিয়াছে। এবং সতী স্ত্রী যেমন সতীত্বের সংযমের দ্বারাই আপনার প্রেমের পূর্ণ চরিতার্থতাকে লাভ করে, তেমনি যে

মানুষ পবিত্রচিত্ত, অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছাকে সত্য সীমায় বাঁধিয়াছে, সেই তাঁহাকে পায় যিনি সাধনার চরম ফল, যিনি পরম আনন্দস্বরূপ।

এই ধর্মকে বন্ধনরূপে দুঃখরূপে স্বীকার করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে, ধর্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের মতো দুর্গম। সে পথ যদি অসীমবিস্তৃত হইত তবে সকল মানুষই যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারিত, কাহারও কোথাও কোনো বাধাবিপত্তি থাকিত না। কিন্তু, সে পথ সুনিশ্চিত নিয়মের সীমায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, এইজন্যই তাহা দুর্গম। ধ্রুবরূপে এই সীমা-অনুসরণের কঠিন দুঃখকে মানুষের গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ, এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দ প্রকাশমান হইতেছে। এইজন্যই উপনিষদে আছে, তিনি তপস্যার দুঃখের দ্বারাই এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

কবি কীট্‌স্‌ বলিয়াছেন, সত্যই সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যই সত্য। সত্যই সীমা, সত্যই নিয়ম, সত্যের দ্বারাই সমস্ত বিধৃত হইয়াছে; এই সত্যের অর্থাৎ সীমার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অসীমের সৌন্দর্য এই সত্যের সীমার মধ্যে প্রকাশিত।

সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বরুদ্ধ করিয়া দেখি তবে মানুষের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোনো সেতু নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই মিথ্যা।

কিন্তু মানুষের ধর্ম মানুষকে বলিতেছে, 'তুমি আপনার সীমাকে পাইলেই অসীমকে পাইবে। তুমি মানুষ হও; সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই তোমার অনন্তের সাধনা সফল হইবে।' এইখানেই আমাদের অভয়, আমাদের অমৃত। যে সীমার মধ্যে আমাদের সত্য সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা। এইজন্যই উপনিষৎ বলিয়াছেন, ইনিই ইহার পরমা গতি, ইনিই ইহার পরমা সম্পৎ, ইনিই ইহার পরম আশ্রয়, ইনিই ইহার পরম আনন্দ। অসীমতা এবং সীমা, ইনি এবং এই— একেবারেই কাছাকাছি; দুই পাখি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ, সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি অসীমও সীমার পক্ষে ততখানি, উভয়ের উভয়কে নহিলে নয়।

মানুষ কখনো কখনো ঈশ্বরকে দূর স্বর্গরাজ্যে সরাইয়া দিয়াছে। অমনি মানুষের ঈশ্বর ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই ভয়ংকরকে বশ করিবার জন্য ভয়গ্রস্ত মানুষ নানা মন্ত্রতন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান পুরোহিত ও মধ্যস্থের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু, মানুষ

যখন তাঁহাকে অন্তরতর করিয়া জানিয়াছে তখন তাহার ভয় ঘুচিয়াছে, এবং মধ্যস্থকে সরাইয়া দিয়া প্রেমের যোগে তাঁহার সঙ্গে মিলিতে চাহিয়াছে।

মানুষ কখনো কখনো সীমাকে সকলপ্রকার দুর্নাম দিয়া গালি পাড়িতে থাকে। তখন সে স্বভাবকে পীড়ন করিয়া ও সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া, অসম্ভব ব্যায়ামের দ্বারা অসীমের সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ তখন মনে করে, সীমা জিনিসটা যেন তাহার নিজেরই জিনিস, অতএব তাহার মুখে চুনকালি মাখাইলে সেটা আর-কাহারও গায়ে লাগে না। কিন্তু, মানুষ এই সীমাকে কোথা হইতে পাইল। এই সীমার অসীম রহস্য সে কীই বা জানে। তাহার সাধ্য কী সে এই সীমাকে লঙ্ঘন করে।

মানুষ যখন জানিতে পারে সীমাতেই অসীম, তখনি মানুষ বুঝিতে পারে—এই রহস্যই প্রেমের রহস্য; এই তত্ত্বই সৌন্দর্যতত্ত্ব; এইখানেই মানুষের গৌরব; আর, যিনি মানুষের ভগবান, এই গৌরবেই তাঁহারও গৌরব। সীমাই অসীমের ঐশ্বর্য, সীমাই অসীমের আনন্দ; কেননা সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিতেছেন।

লণ্ডন

শিক্ষাবিধি

এখানে আসিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল, এখানকার বিদ্যালয়গুলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া লইব—শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কিনা তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্য কিছু দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা রকমের উদ্ভাবিত হইতেছে। এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত; আর-এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে দুঃখের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্য পাকা করিয়া মানুষ করা যায় না। এক দল বলিতেছে, চোখে-কানে ভাবে-আভাসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা; আর-এক দল বলিতেছে, সচেষ্টভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। বস্তুত এ দ্বন্দ্ব কোনোদিনই মিটিবে না—কেননা, মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব সত্য; সুখও

তাহাকে শিক্ষা দেয়, দুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয়; শাসন নহিলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই; এক দিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জিনিসের প্রবেশদ্বার খোলা, আর-এক দিকে তাহার খাটিয়া-আনা জিনিসের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত। এ কথা বলা সহজ যে, দুইয়ের মাঝখানের পথটিকে পাকা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লও; কিন্তু কার্যত তাহা অসাধ্য। কারণ জীবনের গতি কোনোদিনই একেবারে সোজা রেখায় চলে না— অন্তর-বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে সে নদীর মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মতো সিধা পড়িয়া থাকে না; অতএব, তাহার মাঝখানের রেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবলই স্থানপরিবর্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্যরেখা আর-একসময় তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্তরেখা; এক জাতির পক্ষে যাহা প্রান্তপথ আর-এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্যপথ। নানা অনিবার্য কারণে মানুষের ইতিহাসে কখনো যুদ্ধ আসে, কখনো শান্তি আসে; কখনো ধনসম্পদের জোয়ার আসে, কখনো তাহার ভাঁটার দিন উপস্থিত হয়; কখনো নিজের শক্তিতে সে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কখনো নিজের অক্ষমতাবোধে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় মানুষ যখন এক দিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর-এক দিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সংশিক্ষা। মানুষের প্রকৃতি যখন সবলভাবে সজীব থাকে তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভারসামঞ্জস্যের পথ সে বাছিয়া লয়। যে মানুষের নিজের শরীরের উপর দখল আছে সে যখন এক দিক হইতে ধাক্কা খায় তখন সে স্বভাবতই অন্য দিকে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয়; কিন্তু, মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাত হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। য়ুরোপের ছেলেদের মানুষ করিবার পন্থা আপনা-আপনি পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাদের চিত্ত যতই নানা ভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংস্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন দ্রুত হইতেছে।

অতএব, চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু, যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না, এইজন্যই কোনোদিনই কোনো একজন বা একদল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু, যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে এক-চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা।

সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না— অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর-কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনতরো। যেমন, নদী সরিয়া যাইতেছে কিন্তু বাঁধা ঘাট একই জায়গায় পড়িয়া আছে, খেয়ানৌকার পথ একই জায়গায় নির্দিষ্ট ; সে ঘাট ছাড়া অন্য ঘাটে নামিলে ধোবা নাপিত বন্ধ। সুতরাং ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নৌকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না ; আমাদিগকে দুই-চারি হাজার বৎসর পূর্বকালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব, মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের বর্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই। একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মানুষের কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শূদ্র হইতে বলিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাহার এই একটা কালোপযোগী দাবি ছিল, সুতরাং এই দাবির প্রতি লক্ষ রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র আকারে আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। কারণ, সৃষ্টির নিয়মই তাই ; একটা মূল ভাবের বীজ জীবনের তাগিদে স্বতই আপন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া ওঠে, বাহির হইতে কেহ ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জুড়িয়া দেয় না। আমাদের বর্তমান সমাজের কোনো সজীব দাবি নাই— এখনো সে মানুষকে বলিতেছে, 'ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও।' যাহা বলিতেছে তাহা সত্যভাবে পালন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নহে, সুতরাং মানুষ তাহাকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবার কালে ব্রহ্মচর্য নাই ; মাথা মুড়াইয়া তিন দিনের প্রহসন-অভিনয়ের পর গলায় সূত্রধারণ আছে। তপস্যার দ্বারা পবিত্র জীবনের শিক্ষা ব্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না, কিন্তু পদধূলিদানের বেলায় সে অসংকোচে মুক্তপদ। এ দিকে জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ্য বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। খাঁচাটাকে তাহার সমস্ত লোহার শিক ও শিকল -সমেত মানিতেই হইবে, অথচ পাখিটা মরিয়া গেছে। দানাপানি নিয়ত জোগাইতেছি অথচ তাহা কোনো প্রাণীর খোরাকে লাগিতেছে না। এমনি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়াতে আমরা কেবল যে অনাবশ্যক কালবিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়া আছি তাহা নহে, আমরা সামাজিক সত্যরক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা

মূল্য দিতেছি ও লইতেছি, অথচ তাহার পরিবর্তে কোনো সত্যবস্তু নাই। শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেছে, কিন্তু গুরু শিষ্যকে গুরুর দেনা শোধ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না; এবং গুরু পুরাকালের বিস্মৃত ভাষায় শিষ্যকে উপদেশ দিতেছে, শিষ্যের তাহা গ্রহণ করিবার মতো শ্রদ্ধাও নাই, সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফল হইতেছে এই, সত্যবস্তুর যে কোনো প্রয়োজন আছে এই বিশ্বাসটাই আমরা ক্রমশ হারাইতেছি। এই কথা স্বীকার করিতে আমরা লেশমাত্র লজ্জাও বোধ করি না যে, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট। এমন-কি, এ কথা বলিতেও আমাদের বাধে না যে, ব্যবহারতঃ যথেচ্ছাচার করো কিন্তু প্রকাশ্যতঃ তাহা কবুল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই। এমনতরো মিথ্যাচার মানুষকে দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, যখন তোমার শ্রদ্ধা অন্য পথে গিয়াছে তখনো সমাজ যদি কঠোর শাসনে আচারকে একই জায়গায় বাঁধিয়া রাখে, তাহা হইলে সমাজের পনেরো-আনা লোক মিথ্যাচারকে অবলম্বন করিতে লজ্জা বোধ করে না। কারণ, মানুষের মধ্যে বীরপুরুষের সংখ্যা অল্প, অতএব সত্যকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার দণ্ড যেখানে অসহ্যরূপে অতিমাত্র সেখানে কপটতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা আর চলে না। এইজন্য আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়, মানুষ একটা জিনিসকে ভালো বলিয়া স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে অথচ সেই মুহূর্তেই অম্লানবদনে বলিতে পারে যে 'সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না'। আমরাও এই মিথ্যাচারকে ক্ষমা করি যখন চিন্তা করিয়া দেখি, এ সমাজে নিজের সত্য বিশ্বাসকে কাজে খাটাইবার মাশুল কত অসাধ্যরূপে অতিরিক্ত।

অতএব, সমাজ যেখানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্যের পথ একেবারেই খোলা রাখে নাই, সুতরাং পুরাতনকালের ব্যবস্থা যেখানে পদে পদে বাধাস্বরূপ হইয়া তাহাকে বদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেখানে মানুষের যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে; তাহা তদপেক্ষা ভয়ংকর, তাহা আছে অথচ নাই, তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কলুষিত করিয়া তোলে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের তো এই বদ্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিদ্যালয়। সেও একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সবচেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের

মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মৎলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিস্তার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের ঝুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিদ্যালয়ের নূতন শিকল দুইই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধিতেছে সে পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না। ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। নতুবা নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক কষা মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি, আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য শস্তা পথ খুঁজি। মনে করি, উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না। মানুষ বারবার সেই চেষ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি-না কেন শেষকালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল, এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে। এ দেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক-একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন; তাঁহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণ্যস্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভদিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখো। ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ড্‌সন, ডেভিড হেয়ার, ইহারা শিক্ষক ছিলেন; শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যূহ এমন ভয়ংকর পাকা ছিল না; তখন তাহার মধ্যে আলো এবং হাওয়া -প্রবেশের উপায় ছিল; তখন নিয়মের ফাঁকে শিক্ষক আপন আসন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিতেন।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বাহ্য পন্থায় আমরা আমাদের চেষ্টাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ কোনো ফল পাইতেছি না। সেই শক্তিকে ও উদ্যমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে চান এইটেই তাঁহাদের সবচেয়ে

প্রধান কাজ। নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সচল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে যথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই স্বভাবের নিয়মে শিক্ষকপরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা-কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না— তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না— সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনি সে মানুষ না হইয়া মাস্টারমশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীবদেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতা-মাতার উপর। কিন্তু, পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই, অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; তাহা স্নেহ প্রেম ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারক রস; তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ংকর ভার আর-কিছুই নাই; তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া

হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই ; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

চ্যাল্‌ফোর্ড্‌
৩১ শ্রাবণ ১৩১৯

লক্ষ্য ও শিক্ষা

আমার কোনো-এক বন্ধু[১] ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে-সব মানুষ বিশেষ কিছুই নহে, যাহাদের জীবনে হাঁ এবং না জিনিসটা খুব স্পষ্ট করিয়া দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায় না। তাহাদের সম্বন্ধে শুভগ্রহ ও অশুভগ্রহের ফল কী তাহা হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন। বাতাস যখন জোরে বহে তখন পালের জাহাজ হুহু করিয়া দুই দিনের রাস্তা এক দিনে চলিয়া যাইবে, এ কথা বলিতে সময় লাগে না ; কিন্তু, কাগজের নৌকাটা এলোমেলো ঘুরিতে থাকিবে কি ডুবিয়া যাইবে, কি কী হইবে তাহা বলা যায় না— যাহার বিশেষ কোনো-একটা বন্দর নাই তাহার অতীতই বা কী আর ভবিষ্যৎই বা কী। সে কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিবে, কিসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবে। তাহার আশা-তাপমানযন্ত্রে দুরাশার উচ্চতম রেখা অন্য দেশের নৈরাশ্যরেখার কাছাকাছি।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে এই অবস্থাটাই সবচেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা। আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় শক্তির অপব্যয় ঘটিতে পারে না, এইজন্য আশা যেখানে নাই শক্তি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে, চক্ষুমান প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল গুহাবাসী হইয়া থাকে তখন তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়। আলোক থাকিবে না অথচ দৃষ্টি থাকিবে এই অসংগতি যেমন প্রকৃতি সহিতে পারে না, তেমনি আশা নাই অথচ শক্তি আছে ইহাও প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য। এইজন্য বিপদের মুখে পলায়নের যখন উপায় নাই, পলায়নের শক্তিও তখন আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।

১ প্রিয়নাথ সেন। 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের "ফলিত জ্যোতিষ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই কারণে দেখা যায়, আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি তখন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জোর করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা। লোকসংখ্যার কোনো মূল্য নাই— কিন্তু, সমাজে যতগুলি লোক আছে তাহাদের অধিকাংশের যথাসম্ভব শক্তিসম্পদ কাজে খাটিতেছে, মাটিতে পোঁতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধি। শক্তি যেখানে গতিশীল হইয়া আছে সেইখানেই মঙ্গল, ধন যেখানে সজীব হইয়া খাটিতেছে সেইখানেই ঐশ্বর্য।

এই পাশ্চাত্যদেশে লক্ষ্যবেধের আহ্বান সকলেই শুনিতে পাইয়াছে; মোটের উপর সকলেই জানে সে কী চায়; এইজন্য সকলেই আপনার ধনুক বাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞসম্ভবা যাজ্ঞসেনীকে পাইবে, এই আশায় যে লক্ষ্য বহু উচ্চে ঝুলিতেছে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সকলেই পণ করিয়াছে। এই লক্ষ্যবেধের নিমন্ত্রণ আমরা পাই নাই। এইজন্য কী পাইতে হইবে সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক এবং কোথায় যাইতে হইবে তাহাও আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট নাই।

এইজন্য যখন এমনতরো প্রশ্ন শুনি 'আমরা কী শিখিব— কেমন করিয়া শিখিব— শিক্ষার কোন্ প্রণালী কোথায় কী ভাবে কাজ করিতেছে'— তখন আমার এই কথাই মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব, এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।

চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ো ত্যাগে টানিতেছে না— ওঠা-বসা খাওয়া-ছোঁওয়ার কতকগুলা কৃত্রিম নিরর্থক নিয়মপালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর-কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই; সেখানকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, এবং সেই বেড়ার ছিদ্র দিয়া আমরা যেটুকু দেখিতে পাই তাহাও অতি যৎসামান্য।

জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবতঃ মনেই আসে না। সে সম্বন্ধে যেটুকু চিন্তা করিতে যাই তাহা পুঁথিগত চিন্তা, যেটুকু কাজ করিতে যাই সেটুকু অন্যের অনুকরণ। আমাদের আরও বিপদ এই যে, যাহারা আমাদের খাঁচার দরজা এক মুহূর্তের জন্য খুলিয়া দেয় না তাহারাই রাত্রিদিন বলে, 'তোমাদের উড়িবার শক্তি নাই।' পাখির ছানা তো বি. এ. পাস করিয়া উড়িতে শেখে না; উড়িতে পায় বলিয়াই উড়িতে শেখে। সে তাহার স্বজনসমাজের সকলকেই উড়িতে দেখে; সে নিশ্চয় জানে, তাহাকে উড়িতেই হইবে। উড়িতে পারা যে সম্ভব, এ সম্বন্ধে কোনোদিন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়া তাহাকে দুর্বল করিয়া দেয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলিয়াই, এবং সেই সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনো ক্ষেত্র পাই না বলিয়াই, অন্তরে অন্তরে নিজের সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া যায়। এমনি করিয়া আপনার প্রতি যে লোক বিশ্বাস হারায় সে কোনো বড়ো নদী পাড়ি দিবার চেষ্টা পর্যন্তও করিতে পারে না; অতি ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে ডাঙার কাছে কাছে সে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে এবং যেদিন সে কোনো গতিকে বাগবাজার হইতে বরানগর পর্যন্ত উজান ঠেলিয়া যাইতে পারে সেদিন সে মনে করে, 'আমি অবিকল কলম্বসের সমতুল্য কীর্তি করিয়াছি।'

তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুল-মাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা— এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

কিন্তু, যদি কেহ মনে করেন তবে বুঝি দেশের সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তবে তিনি ভুল বুঝিবেন। আমরা কোথায় আছি, কোন্ দিকে চলিতেছি, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া জানা চাই। সে জানাটা যতই অপ্রিয় হউক তবু সেটা সর্বাগ্রে আবশ্যক। আমরা এ পর্যন্ত বারবার নিজের দুর্গতি সম্বন্ধে নিজেকে কোনোমতে ভুলাইয়া আরাম পাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ বিশ্বসংসারে সকল সমাজের সেরা। এতবড়ো

একটা অদ্ভুত অত্যুক্তি যাহা মানবের ইতিহাসে প্রত্যক্ষতই প্রত্যহ আপনাকে অপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে আড়ম্বর-সহকারে ঘোষণা করা নিশ্চেষ্টতার গায়ের-জোরি কৈফিয়ত— যে লোক কোনোমতেই কিছু করিবে না এবং নড়িবে না সে এমনি করিয়াই আপনার কাছে ও অন্যের কাছে আপনার লজ্জা রক্ষা করিতে চায়। গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা চাই। বিষফোড়ার চিকিৎসক যখন অস্ত্রাঘাত করে তখন সেই ক্ষত আপনার আঘাতের মুখকে কেবলই ঢাকিয়া ফেলিতে চায়; কিন্তু সুচিকিৎসক ফোড়ার সেই চেষ্টাকে আমল দেয় না, যতদিন না আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয় ততদিন প্রত্যহই ক্ষতমুখ খুলিয়া রাখে। আমাদের দেশের প্রকাণ্ড বিষফোড়া বিধাতার কাছ হইতে মস্ত একটা অস্ত্রাঘাত পাইয়াছে; এই বেদনা তাহার প্রাপ্য; কিন্তু প্রতিদিন ইহাকে সে ফাঁকি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে আপনার অপমানকে মিথ্যা করিয়া লুকাইতে গিয়া সেই অপমানের ফোড়াকে চিরস্থায়ী করিয়া পুষিয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু যতবার সে ঢাকিবে চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাত ততবারই তাহার সেই মিথ্যা অভিমানকে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। এ কথা তাহাকে একদিন সুস্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, ফোড়াটা তাহার বাহিরের জোড়া-দেওয়া আকস্মিক জিনিস নহে; ইহা তাহার ভিতরকারই ব্যাধি। দোষ বাহিরের নহে, তাহার রক্ত দূষিত হইয়াছে; নহিলে এমন সাংঘাতিক দুর্বলতা, এমন মোহাবিষ্ট জড়তা মানুষকে এত দীর্ঘকাল এমন করিয়া সকল বিষয়ে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের নিজের সমাজই আমাদের নিজের মনুষ্যত্বকে পীড়িত করিয়াছে, ইহার বুদ্ধিকে ও শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, সেইজন্যই সে সংসারে কোনোমতেই পারিয়া উঠিতেছে না। এই আপনার সম্বন্ধে আপনার মোহকে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া ভাঙিতে দেওয়া নৈরাশ্য ও নিশ্চেষ্টতার লক্ষণ নহে। ইহাই চেষ্টার পথকে মুক্তি দিবার উপায় এবং মিথ্যা আশার বাসা ভাঙিয়া দেওয়াই নৈরাশ্যকে যথার্থভাবে নির্বংশ করিবার পন্থা।

আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণতঃ ইস্কুল হইতে হয় না, এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাদ্যই তৈরি হয়। মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল সেইখানেই তাহার বিদ্যা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিদ্যাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।

এ কথা মনে উদয় হইতে পারে, তবে আর আমাদের আশা কোথায়। কারণ, জীবনের চালনাক্ষেত্র তো সম্পূর্ণ আমাদের হাতে নাই; পরাধীন জাতির কাছে তো শক্তির দ্বার খোলা থাকিতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুত, শক্তির ক্ষেত্র সকল জাতির পক্ষেই কোনো না কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। সর্বত্রই অন্তরপ্রকৃতি এবং বাহিরের অবস্থা উভয়ে মিলিয়া আপোষে আপনার ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করিয়া লয়। এই সীমানির্দিষ্ট ক্ষেত্রই সকলের পক্ষে দরকারি; কারণ, শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা শক্তিকে ব্যবহার করা নহে। কোনো দেশেই অনুকূল অবস্থা মানুষকে অবারিত স্বাধীনতা দেয় না, কারণ তাহা ব্যর্থতা। ভাগ্য আমাদিগকে যাহা দেয় তাহা ভাগ করিয়াই দেয়—এক দিকে যাহার ভাগে বেশি পড়ে অন্য দিকে তাহার কিছু না কিছু কম পড়িবেই।

অতএব, কী পাইলাম সেটা মানুষের পক্ষে তত বড়ো কথা নয়, সেটাকে কেমন ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে যত বড়ো। সামাজিক বা মানসিক যে-কোনো ব্যবস্থায় সেই গ্রহণের শক্তিকে বাধা দেয়, সেই ব্যবহারের শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, তাহাই সর্বনাশের মূল। মানুষ যেখানে কোনো জিনিসকেই পরখ করিয়া লইতে দেয় না, ছোটো বড়ো সকল জিনিসকেই বাঁধা বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাঁধা নিয়মের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা যতই অনুকূল হউক-না কেন মনুষ্যত্বকে শীর্ণ হইতেই হইবে। আমাদের অবস্থার সংকীর্ণতা লইয়া আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের অবস্থা যে যথার্থতঃ কী তাহা আমরা জানিই না; তাহাকে আমরা সকল দিকে পরখ করিয়া দেখি নাই, সেই পরখ করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিকেই আমরা অপরাধ বলিয়া সর্বাগ্রে দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়াছি; মানবপ্রকৃতির উপর ভরসা নাই বলিয়া এ কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছি যে, মানুষকে ভুল করিতে না দিলে মানুষকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। মানুষকে সাহস করিয়া ভালো হইয়া উঠিবার প্রশস্ত অধিকার দিব না, তাহাকে সনাতন নিয়মে সকল দিকেই খর্ব করিয়া ভালো-মানুষির জেলখানায় চিরজীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়া রাখিব, এমনতরো যাহাদের ব্যবস্থা, তাহারা যতক্ষণ নিজের বেড়ি নিজে খুলিয়া না ফেলিবে এবং বেড়িটাকেই নিজের হাত পায়ের চেয়ে পবিত্র ও পরম ধন বলিয়া পূজা করা পরিত্যাগ না করিবে, ততক্ষণ ভাগ্যবিধাতার কোনো বদান্যতায় তাহাদের কোনো স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে না।

নিজের অবস্থাকে নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার মতো দীনতা আর-কিছু নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার বেগকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ,

ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র প্রলুব্ধতা হইতে উপরের দিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই, তাহার এমন কোনো বাহ্য অবস্থাই নাই যাহার মধ্য হইতে সে বাড়িয়া উঠিতে পারে না; এমন-কি, সে অবস্থায় বাহিরের দারিদ্র্যই তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে। কাঁঠাল-গাছকে দ্রুতবেগে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের দেশে তাহার চারাকে বাঁশের চোঙের মধ্যে ঘিরিয়া বাঁধিয়া রাখে। সে চারা আশেপাশে ডালপালা ছড়াইতে পারে না, এইজন্য কোনোমতে চোঙের বেড়াকে ছাড়াইয়া আলোকে উঠিবার জন্য সে আপনার শক্তিকে একাগ্রভাবে চালনা করে এবং সিধা হইয়া আপন বন্ধনকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু, সেই চারাটির মজ্জার মধ্যে এই দুর্নিবার বেগটি সজীব থাকা চাই যে, 'আমাকে উঠিতেই হইবে, বাড়িতেই হইবে। আলোককে যদি পাশেই না পাই তবে তাহাকে উপরে খুঁজিতে বাহির হইব, মুক্তিকে যদি এক দিকে না পাই তবে তাহাকে অন্য দিকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা ছাড়িব না।' 'চেষ্টা করাই অপরাধ— যেমন আছি তেমনিই থাকিব' কোনো প্রাণবান জিনিস এমন কথা যখন বলে তখন তাহার পক্ষে বাঁশের চোঙও যেমন অনন্ত আকাশও তেমনি।

মানুষের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী তাহা কখনো অসাধ্য হইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে। আমাদের জাতির মুক্তি যদি পার্শ্বের দিকে না থাকে তবে উপরের দিকে আছেই, এ কথা একমুহূর্ত ভুলিলে চলিবে না। ডালপালা ছড়াইয়া পাশের দিকের বাড়টাকেই আমরা চারি দিকে দেখিতেছি, এইজন্য সেইটেকেই একমাত্র পরমার্থ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু, উচ্চের দিকের গতিও জীবনের গতি, সেখানেও সার্থকতার ফল সম্পূর্ণ হইয়াই ফলে। আসল কথা, এক দিকে হউক বা আর-এক দিকে হউক, ভূমার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে; আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে, আরও বড়ো হইতে হইবে। সেই বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে যাহা আমাদিগকে কোণের বাহির করে, যাহা আমাদিগকে অনায়াসে আত্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়, যাহা কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও চাকরির খাঁচাটুকুর মধ্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বদ্ধ করিয়া রাখে না। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বেগ যখন সঞ্চারিত হইবে, সেই শক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন প্রতি মুহূর্তেই আমাদের অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিতে থাকিব; তখন আমাদের বাহ্য অবস্থার কোনো সংকোচ আমাদিগকে কিছুমাত্র লজ্জা দিতে পারিবে না।

বর্তমানের ইতিহাসকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেখা যায় না; এইজন্য যখন আলোক আসন্ন তখনো অন্ধকারকে চিরন্তন বলিয়া ভয় হয়। কিন্তু, আমি তো স্পষ্টই মনে করি, আমাদের চিত্তের মধ্যে একটা চেতনার অভিঘাত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার

বেগ ক্রমশই আপনার কাজ করিতে থাকিবে, কখনোই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিবে না। আমাদের প্রাণশক্তি কোনোমতেই মরিবে না, যে দিক দিয়া হউক তাহাকে বাঁচিতেই হইবে; সেই আমাদের দুর্জয় প্রাণচেষ্টা যেখানে একটু ছিদ্র পাইতেছে সেইখান দিয়াই এখনি আমাদিগকে আলোকের অভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতেছে। মানুষের সম্মুখে যে পথ সর্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বলিয়াই মানুষ যে পথ ভুলিয়া থাকে, রাজা যে পথে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্র্য যে পথের পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, স্পষ্ট দেখিতেছি, সেই ধর্মের পথ আমাদের এই সর্বত্রপ্রতিহত চিত্তকে মুক্তির দিকে টানিতেছে। আমাদের দেশে এই পথযাত্রার আহ্বান বারম্বার নানা দিক হইতে নানা কণ্ঠে জাগিয়া উঠিতেছে। এই ধর্মবোধের জাগরণের মতো এত বড়ো জাগরণ জগতে আর-কিছু নাই, ইহাই মূককে কথা বলায়, পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়। ইহা আমাদের সমস্ত চিত্তকে চেতাইবে, সমস্ত চেষ্টাকে চালাইবে; ইহা আশার আলোকে এবং আনন্দের সংগীতে আমাদের বহুদিনের বঞ্চিত জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে। মানবজীবনের সেই পরম লক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে ততই আপনাকে অকৃপণ ভাবে আমরা দান করিতে পারিব, এবং সমস্ত ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই। আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্মস্থান হইবে, এইখানেই ত্যাগীর সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নি জ্বলিবে— এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে।

চ্যাল্‌ফোর্ড, গ্লস্টর্‌শিয়র
১৯ অগস্ট, ১৯১২

আমেরিকার চিঠি

আজ রবিবার। গির্জার ঘণ্টা বাজিতেছে। সকালে চোখ মেলিয়াই দেখিলাম, বরফে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বাড়িগুলির কালো রঙের ঢালু ছাদ এই বিশ্বব্যাপী সাদার আবির্ভাবকে বুক পাতিয়া দিয়া বলিতেছে, 'আধো আঁচরে বোসো!' মানুষের চলাচলের রাস্তায় ধুলাকাদার রাজত্ব একেবারে ঘুচাইয়া দিয়া শুভ্রতার নিশ্চল ধারা যেন শতধা হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। গাছে একটিও পাতা নাই; শুক্রম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ডালগুলির উপরের চূড়ায় তাঁহার আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। রাস্তার দুই ধারের ঘাস যৌবনের শেষ চিহ্নের মতো এখনো সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় নাই, কিন্তু তাহারা ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করিয়া হার মানিতেছে। পাখিরা ডাক বন্ধ করিয়াছে, আকাশে কোথাও কোনো শব্দ নাই। বরফ উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহার পদসঞ্চার কিছুমাত্র শোনা যায় না— বর্ষা আসে বৃষ্টির শব্দে, ডালপালার মর্মরে, দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া দিয়া রাজবদুন্নতধ্বনিঃ— কিন্তু আমরা সকলেই যখন ঘুমাইতেছিলাম আকাশের তোরণদ্বার তখন নীরবে খুলিয়াছে, সংবাদ লইয়া কোনো দূত আসে নাই, সে কাহারও ঘুম ভাঙাইয়া দিল না। স্বর্গলোকের নিভৃত আশ্রম হইতে নিঃশব্দতা মর্তে নামিয়া আসিতেছেন; তাঁহার ঘর্ঘরনিনাদিত রথ নাই; মাতলি তাঁহার মত্ত ঘোড়াকে বিদ্যুতের কষাঘাতে হাঁকাইয়া আনিতেছে না; ইনি নামিতেছেন ইঁহার সাদা পাখা মেলিয়া দিয়া, অতি কোমল তাহার সঞ্চার, অতি অবাধ তাহার গতি; কোথাও তাহার সংঘর্ষ নাই, কিছুকেই সে কিছুমাত্র আঘাত করে না। সূর্য আবৃত, আলোকের প্রখরতা নাই; কিন্তু, সমস্ত পৃথিবী হইতে একটি অপ্রগল্‌ভ দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এই জ্যোতি যেন শান্তি এবং নম্রতায় সুসম্বৃত, ইহার অবগুণ্ঠনই ইহার প্রকাশ।

স্তব্ধ শীতের প্রভাতে এই অপরূপ শুভ্রতার নির্মল আবির্ভাবকে আমি নত হইয়া নমস্কার করি— ইহাকে আমার অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লই। বলি, 'তুমি এমনি ধীরে ধীরে ছাইয়া ফেলো; আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত কর্ম আবৃত করিয়া দাও। গভীর রাত্রির অসীম অন্ধকার পার হইয়া তোমার নির্মলতা আমার জীবনে নিঃশব্দে অবতীর্ণ হউক, আমার নবপ্রভাতকে অকলঙ্ক শুভ্রতার মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলুক— বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব— কোথাও কোনো কালিমা কিছুই রাখিয়ো না, তোমার স্বর্গের আলোক যেমন নিরবচ্ছিন্ন শুভ্র আমার জীবনের ধরাতলকে তেমনি একটি অখণ্ড শুভ্রতায় একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করিয়া দাও।'

অন্ধকার প্রভাতের এই অতলস্পর্শ শুভ্রতার মধ্যে আমি আমার অন্তরাত্মাকে অবগাহন করাইতেছি। বড়ো শীত, বড়ো কঠিন এই স্নান। নিজেকে যে একেবারে শিশুর মতো নগ্ন করিয়া দিতে হইবে, এবং ডুবিতে ডুবিতে একেবারে কিছুই যে বাকি থাকিবে না— ঊর্ধ্বে শুভ্র, অধোতে শুভ্র, সম্মুখে শুভ্র, পশ্চাতে শুভ্র, আরম্ভে শুভ্র, অন্তে শুভ্র— শিব এব কেবলম্— সমস্ত দেহমনকে শুভ্রের মধ্যে নিঃশেষে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া নমস্কার— নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

বার্ধক্যের কান্তি যে কী মহৎ, কী গভীর সুন্দর, আমি তাহাই দেখিতেছি। যত-কিছু বৈচিত্র্য সমস্ত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঢাকা পড়িয়া গেল, অনবচ্ছিন্ন একের শুভ্রতা সমস্তকেই আপনার আড়ালে টানিয়া লইল। সমস্ত গান ঢাকা পড়িল, প্রাণ ঢাকা পড়িল, বর্ণচ্ছটার লীলা সাদায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু, এ তো মরণের ছায়া নয়। আমরা যাহাকে মরণ বলিয়া জানি সে যে কালো; শূন্যতা তো আলোকের মতো সাদা নয়, সে যে অমাবস্যার মতো অন্ধকারময়। সূর্যের শুভ্র রশ্মি তাহার লাল নীল সমস্ত ছটাকে একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু, তাহাকে তো বিনাশ করে নাই, তাহাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে। আজ নিস্তব্ধতার অন্তর্নিগূঢ় সংগীত আমার চিত্তকে অন্তরে রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। আজ গাছপালা তাহার সমস্ত আভরণ খসাইয়া ফেলিয়াছে, একটি পাতাও বাকি রাখে নাই; সে তাহার প্রাণের সমস্ত প্রাচুর্যকে অন্তরের অদৃশ্য গভীরতার মধ্যে সম্পূর্ণ সমাহরণ করিয়া লইয়াছে। বনশ্রী যেন তাহার সমস্ত বাণী নিঃশেষ করিয়া দিয়া নিজের মনে কেবল ওঙ্কারমন্ত্রটি নীরবে জপ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন তাপসিনী গৌরী তাঁহার বসন্তপুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া শুভ্রবেশে শিবের শুভ্রমূর্তি ধ্যান করিতেছেন। যে কামনা আগুন লাগায়, যে কামনা বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহাকে তিনি ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছেন। সেই অগ্নিদগ্ধ কামনার সমস্ত কালিমা একটু একটু করিয়া ঐ তো বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; যত দূর দেখা যায় একেবারে সাদায় সাদা হইয়া গেল, শিবের সহিত মিলনে কোথাও আর বাধা রহিল না। এবার যে শুভপরিণয় আসন্ন, আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের পুণ্য-আলোকে যাহার বার্তা লিখিত আছে এই তপস্যার গভীরতার মধ্যে তাহার নিগূঢ় আয়োজন চলিতেছে; উৎসবের সংগীত সেখানে ঘনীভূত হইতেছে, মালাবদলের ফুলের সাজি বিশ্বচক্ষুর অগোচরে সেখানে ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে। এই তপস্যাকে বরণ করো, হে আমার চিত্ত, আপনাকে নত করিয়া নিস্তব্ধ করিয়া দাও— শুভ্র শান্তি তোমাকে স্তরে স্তরে আবৃত করিয়া স্থিরপ্রতিষ্ঠ গূঢ়তার মধ্যে তোমার সমস্ত চেষ্টাকে আহরণ করিয়া লউক, নির্মলতার দেবদূত আসিয়া একবার এ জীবনের সমস্ত আবর্জনা এক প্রান্ত হইতে

আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিক ; তাহার পরে এই তপস্যার রুদ্ধ আবরণটি একদিন উঠিয়া যাইবে, একেবারে দিগ্‌দিগন্তর আনন্দকলগীতে পূর্ণ করিয়া দেখা দিবে নূতন জাগরণ, নূতন প্রাণ, নূতন মিলনের মঙ্গলোৎসব।

৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৯

—

ছেলেবেলা

ভূমিকা

গোঁসাইজির কাছ থেকে অনুরোধ এল ছেলেদের জন্যে কিছু লিখি। ভাবলুম ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক। চেষ্টা করলুম সেই অতীতের প্রেত-লোকে প্রবেশ করতে। এখনকার সঙ্গে তার অন্তরবাহিরের মাপ মেলে না। তখনকার প্রদীপে যত ছিল আলো তার চেয়ে ধোঁওয়া ছিল বেশি। বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয় নি, সম্ভব-অসম্ভবের সীমাসরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো। সেই সময়টুকুর বিবরণ যে ভাষায় গেঁথেছি সে স্বভাবতই হয়েছে সহজ, যথাসম্ভব ছেলেদেরই ভাবনার উপযুক্ত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষি কল্পনাজাল মন থেকে কুয়াশার মতো যখন কেটে যেতে লাগল তখনকার কালের বর্ণনার ভাষা বদল করি নি, কিন্তু ভাবটা আপনিই শৈশবকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয় নি— কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর-বয়সের মুখোমুখি এসে পৌঁছিয়েছে। সেইখানে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালে বোঝা যাবে কেমন ক'রে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। সমস্ত বিবরণটাকেই ছেলে-বেলা আখ্যা দেওয়ার বিশেষ সার্থকতা এই যে, ছেলেমানুষের বৃদ্ধি তার প্রাণশক্তির বৃদ্ধি। জীবনের আদিপর্বে প্রধানত সেইটেরই গতি অনুসরণ-যোগ্য। যে পোষণপদার্থ তার প্রাণের সঙ্গে আপনি মেলে বালক তাই চারি দিক থেকে সহজে আত্মসাৎ করে চলে এসেছে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী-দ্বারা তাকে মানুষ করবার চেষ্টাকে সে মেনে নিয়েছে অতি সামান্য পরিমাণেই।

এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা, সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হল কাকলি ; সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে। ফলের সঙ্গে চার দিকের ডালপালাকে মিলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিছুকাল হল একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পদ্যের ফিল্‌মে। বইটার নাম 'ছড়ার ছবি'। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। এ বইটাতে বালভাষিত গদ্যে।

বালক

বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা

ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।

উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক,

বারান্দাটার রেলিঙ-'পরে ডাকত এসে কাক।

ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ও পার থেকে

তপ্‌সিমাছের ঝুড়িখানা গামছা দিয়ে ঢেকে।

বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা,

সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হত তাঁর সাধা।

জুটেছি বউদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,

মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।

চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে

স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।

কিশোরী চাটুজ্যে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে,

বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।

দ্রুতলয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া,

থাকত আমার খাতা লেখা, প'ড়ে থাকত পড়া;

মনে মনে ইচ্ছে হত যদিই কোনো ছলে

ভরতি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে,

ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,

গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে

হঠাৎ দেখি, মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে,

ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল-ঢালা সব নলে।

অন্ধকারে শোনা যেত রিম্‌ঝিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা।
ম্যাপে যে-সব পাহাড় জানি, জানি যে-সব গাঙ
কুয়েন্‌লুন আর মিসিসিপি, ইয়াংসিকিয়াঙ—
জানার সঙ্গে আধেক-জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা,
নানারকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেরা
সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা—
ভাবনাগুলো তারি মধ্যে ফিরত থাকি থাকি
বানের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪

ছেলেবেলা

আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্‌ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁস্‌ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চ'ড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার আধঘোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদবৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি ; তার মানে, লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পরপুরুষের সামনে, ফস্‌ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্‌ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও ; বড়োমানুষের ঝিবউদের পালকির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘেটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, দাড়ি চোমরানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পালকি-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাক্স সাজিয়ে, তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনফা থাকত। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান, বখরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত, কখনো বা কাঁচা শাক-সুদ্ধ মুলো খেত আরামে আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম 'রাধাকৃষ্ণ' ; সে যতই হাঁ-হাঁ করে দু হাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্টদেবতার নাম শোনবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।

তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ।

মাস্টারমশায়[১] মিট্‌মিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট্‌বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বারবার শুনতে হত, মাস্টারমশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা ব'লে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুরুখ্যু হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহিরমহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়্‌খড়ির আব্রু-দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিট্‌মিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূত প্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে। কোন্ দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নির নাকি সুর, দড়াম করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে-ভূতটা সবচেয়ে ছিল বদমেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন-পাতা-ওয়ালা বাদামগাছ, তারই ডালে এক পা আর অন্য পা'টা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্ মূর্তি— তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন তখন চাকররা মনে করত লোকটার ধর্মজ্ঞান একটুও নেই, দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে, তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলে ছিল যে, টেবিলের নীচে পা রাখলে পা সুড়্‌সুড়্ করে উঠত।

তখন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁখে ক'রে কলসী ভ'রে মাঘ-ফাগুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নীচের তলায় সেই-সব স্যাঁৎসেতে এঁধো কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করে ছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উলটো দিকে। সেই ভূতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়িভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগাত তাড়া।

১ "মাস্টার অঘোর বাবু" —জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ ২৮৬

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হত ঝরঝর কলকল করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উলটো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি গাড়ি রাবিশ। পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ-ছায়া-পড়া আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদামগাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই ব্রহ্মদত্যির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।

২

পালকিখানা ঠাকুরমাদের আমলের। খুব দরাজ বহর তার, নবাবি ছাঁদের। ডাণ্ডা দুটো আট আট জন বেহারার কাঁধের মাপের। হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লালরঙের হাতকাটা মেরজাই-পরা বেহারার দল সূর্য-ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধনদৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে। এই পালকির গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার গেছে ক্ষয়ে, দাগ ধরেছে যেখানে সেখানে, নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের গদি থেকে। এ যেন একালের নামকাটা আসবাব, পড়ে আছে খাতাঞ্চিখানার বারান্দায় এক কোণে। আমার বয়স তখন সাত-আট বছর। এ সংসারে কোনো দরকারি কাজে আমার হাত ছিল না; আর ঐ পুরানো পালকিটাকেও সকল দরকারের কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এইজন্যেই ওর উপরে আমার এতটা মনের টান ছিল। ও যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, আর আমি ছুটির দিনের রবিন্‌সন্‌-ক্রুসো, বন্ধ দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চার দিকের নজরবন্দি এড়িয়ে বসে আছি।

তখন আমাদের বাড়িভরা ছিল লোক, আপন পর কত তার ঠিকানা নেই; নানা মহলের চাকর দাসীর নানা দিকে হৈ হৈ ডাক।

সামনের উঠোন দিয়ে প্যারীদাসী ধামা কাঁখে বাজার করে নিয়ে আসছে তরি-তরকারি, দুখন বেহারা বাঁক কাঁধে গঙ্গার জল আনছে, বাড়ির ভিতরে চলেছে তাঁতিনি নতুন-ফ্যাশান-পেড়ে শাড়ির সওদা করতে, মাইনে-করা যে দিনু স্যাকরা গলির পাশের

ঘরে ব'সে হাপর ফোঁস ফোঁস ক'রে বাড়ির ফরমাশ খাটত সে আসছে খাতাঞ্চিখানায় কানে-পালখের-কলম-গোঁজা কৈলাস মুখুজ্জের কাছে পাওনার দাবি জানাতে; উঠোনে ব'সে টং টং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরি। বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুস্তির প্যাঁচ কষছে। চটাচট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়, ডন ফেলছে বিশ-পঁচিশ বার ঘন ঘন। ভিখিরির দল বসে আছে বরাদ্দ ভিক্ষার আশা ক'রে।

বেলা বেড়ে যায়, রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে ওঠে; পালকির ভিতরকার দিনটা ঘণ্টার হিসাব মানে না। সেখানকার বারোটা সেই সাবেক কালের, যখন রাজবাড়ির সিংহদ্বারে সভাভঙ্গের ডঙ্কা বাজত, রাজা যেতেন স্নানে, চন্দনের জলে। ছুটির দিন দুপুরবেলা যাদের তাঁবেদারিতে ছিলুম তারা খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুম দিচ্ছে। একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পালকি, হাওয়ায় তৈরি বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলছে পালকি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে-সব দেশের বইপড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখনো বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জল্‌জল্‌ করছে, গা করছে ছম্‌ছম্‌। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম্‌, ব্যাস্‌ সব চুপ। তার পরে এক সময়ে পালকির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খি, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্‌ছপ্‌ ছপ্‌ছপ্‌, ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, সামাল সামাল, ঝড় উঠল। হালের কাছে আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশমাছ আর কচ্ছপের ডিম।

সে আমার কাছে গল্প করেছিল— একদিন চত্তির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী। ভীষণ তুফান, নৌকো ডোবে ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁৎরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি। গল্পটা এত শিগ্‌গির শেষ হল, আমার পছন্দ হল না। নৌকোটা ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এ তো গপ্‌পই নয়। বারবার বলতে লাগলুম 'তার পর'?

সে বললে, 'তার পর সে এক কাণ্ড। দেখি, এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গোঁফজোড়া। ঝড়ের সময়ে সে উঠেছিল ও পারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড় গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পদ্মায়। বাঘ ভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে।

খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এত্তো বড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়ালো আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে খিদে। আমাকে দেখে তার লাল-টকটকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম 'আও বাচ্ছা'। সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্যে যতই ছটফট করে ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।'

এই পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'আবদুল, সে মরে গেল নাকি।'

আবদুল বললে, 'মরবে তার বাপের সাধ্যি কী। নদীতে বান এসেছে, বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে তো? ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ-পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দিলে। তার পরেকার কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা বেশ, বাঘ তো হল, এবার কুমির?'

আবদুল বললে, 'জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায়, মনে হয় ভারি বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স্ ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মজা হল। একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে, তার ছাগলছানা পাশে বাঁধা। কখন নদীর থেকে উঠে কুমিরটা পাঁঠার ঠ্যাঙ ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ঐ দানো-গিরগিটির গলায় পোঁচের উপর পোঁচ লাগাল। ছাগলছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'তার পরে?'

আবদুল বললে, 'তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে। আসছে-বার যখন দেখা হবে চর পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব।'

কিন্তু আর তো সে আসে নি, হয়তো খোঁজ নিতে গেছে।

এই তো ছিল পালকির ভিতর আমার সফর; পালকির বাইরে এক-একদিন ছিল আমার মাস্টারি, রেলিঙগুলো আমার ছাত্র। ভয়ে থাকত চুপ। এক-একটা ছিল ভারি দুষ্ট, পড়াশুনোয় কিচ্ছুই মন নেই; ভয় দেখাই যে বড়ো হলে কুলিগিরি করতে

হবে। মার খেয়ে আগাগোড়া গায়ে দাগ পড়ে গেছে, ছুষ্টুমি থামতে চায় না, কেননা থামলে যে চলে না, খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আরও একটা খেলা ছিল, সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে। পূজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মন্তর বানাতে হয়েছিল, নইলে পুজো হয় না।—

সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যাম্‌কুড়্‌কুড়্‌
আখরোট বাখরোট খট খট খটাস
পট পট পটাস।

এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের। আখরোট খেতে ভালোবাসতুম। খটাস শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের। আর পটাস শব্দে জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল না।[১]

৩

কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নেই। কেবলই চলছে বৃষ্টি। গাছগুলো বোকার মতো জবুস্থবু হয়ে রয়েছে। পাখির ডাক বন্ধ। আজ মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলাকার সন্ধেবেলা।

তখন আমাদের ঐ সময়টা কাটত চাকরদের মহলে। তখনও ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে-মুখস্থর বুক-ধড়াস সন্ধেবেলায় ঘাড়ে চেপে বসে নি। সেজদাদা[২] বলতেন, আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নীচে, তখনও বি-এ-ডি ব্যাড এম-এ-ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছয় নি।

নবাবি জবানিতে চাকর-নোকরদের মহলকে তখন বলা হত তোশাখানা। যদিও সেকেলে আমিরি দশা থেকে আমাদের বাড়ি নেবে পড়েছিল অনেক নীচে, তবু তোশাখানা দফতরখানা বৈঠকখানা নামগুলো ছিল ভিত আঁকড়ে।

১ দ্রষ্টব্য 'কাঠের সিঙ্গি'— ছড়ার ছবি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড
২ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই তোশাখানার দক্ষিণ ভাগে বড়ো একটা ঘরে কাঁচের সেজে রেড়ির তেলে আলো জ্বলছে মিট মিট করে, গণেশমার্কা ছবি আর কালীমায়ের পট রয়েছে দেয়ালে, তারই আশেপাশে টিকটিকি রয়েছে পোকা-শিকারে। ঘরে কোনো আসবাব নেই, মেজের উপরে একখানা ময়লা মাদুর পাতা।

জানিয়ে রাখি আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো। গাড়িঘোড়ার বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরে কোণের দিকে তেঁতুল গাছের তলায় ছিল চালাঘরে একটা পালকিগাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া। পরনের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে। অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে। যখন ব্রজেশ্বরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানে বরাদ্দ হল পাঁউরুটি আর কলাপাতা-মোড়া মাখন, মনে হল আকাশ যেন হাতে নাগাল পাওয়া গেল। সাবেক কালের বড়োমানুষির ভগ্নদশা সহজেই মেনে নেবার তালিম চলছিল।

আমাদের এই মাদুর-পাতা আসরে যে চাকরটি ছিল সর্দার তার নাম ব্রজেশ্বর। চুলে গোঁফে লোকটা কাঁচাপাকা, মুখের উপর টানপড়া শুকনো চামড়া, গম্ভীর মেজাজ, কড়া গলা, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। তার পূর্ব মনিব ছিলেন লক্ষ্মীমন্ত, নামডাকওয়ালা। সেখান থেকে তাকে নাবতে হয়েছে আমাদের মতো হেলায়-মানুষ ছেলেদের খবরদারির কাজে। শুনেছি গ্রামের পাঠশালায় সে গুরুগিরি করেছে। এই গুরুমশায়ি ভাষা আর চাল ছিল তার শেষ পর্যন্ত। বাবুরা 'বসে আছেন' না বলে সে বলত 'অপেক্ষা করে আছেন'। শুনে মনিবরা হাসাহাসি করতেন। যেমন ছিল তার গুমোর তেমনি ছিল তার শুচিবাই। স্নানের সময় সে পুকুরে নেমে উপরকার তেলভাসা জল দুই হাত দিয়ে পাঁচ-সাতবার ঠেলে দিয়ে একেবারে ঝুপ করে দিত ডুব। স্নানের পর পুকুর থেকে উঠে বাগানের রাস্তা দিয়ে ব্রজেশ্বর এমন ভঙ্গীতে হাত বাঁকিয়ে চলত যেন কোনোমতে বিধাতার এই নোংরা পৃথিবীটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারলেই তার জাত বাঁচে। চাল চলনে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ঠিক নয়, এ নিয়ে খুব ঝোঁক দিয়ে সে কথা কইত। এ দিকে তার ঘাড়টা ছিল কিছু বাঁকা, তাতে তার কথার মান বাড়ত। কিন্তু ওরই মধ্যে একটা খুঁত ছিল গুরুগিরিতে। ভিতরে ভিতরে তার আহারের লোভটা ছিল চাপা। আমাদের পাতে আগে থাকতে ঠিকমত ভাগে খাবার সাজিয়ে রাখা তার নিয়ম ছিল না। আমরা খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করত, 'আর দেব কি।' কোন্‌ উত্তর তার মনের মতো সেটা বোঝা যেত তার গলার সুরে। আমি প্রায়ই বলতুম, 'চাই নে।' তার পরে আর সে পীড়াপীড়ি করত না। দুধের বাটিটার 'পরেও তার অসামান্য রকমের টান

ছিল, আমার মোটে ছিল না। শেলফওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে। তার মধ্যে একটা বড়ো পিতলের বাটিতে থাকত দুধ, আর কাঠের বারকোশে লুচি তরকারি। বিড়ালের লোভ জালের বাইরে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়াত।

এমনি করে অল্প খাওয়া আমার ছেলেবেলা থেকেই দিব্যি সয়ে গিয়েছিল। সেই কম খাওয়াতে আমাকে কাহিল করেছিল এমন কথা বলবার জো নেই। যে ছেলেরা খেতে কসুর করত না তাদের চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি বই কম ছিল না। শরীর এত বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে, ইস্কুল পালাবার ঝোঁক যখন হয়রান করে দিত তখনও শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হল না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি, চুল জামা গেছে ভিজে, গলার মধ্যে একটু খুস্‌খুস্‌নি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায় নি। আর পেট-কামড়ানি বলে ভিতরে ভিতরে বদহজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাই নি পেটে, কেবল দরকারমত মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। শুনে মা মনে মনে হাসতেন, একটুও ভাবনা করতেন বলে মনে হয় নি। তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, 'আচ্ছা যা, মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।' আমাদের সেকেলে মা মনে করতেন, ছেলে মাঝে মাঝে পড়া কামাই করলে এতই কি লোকসান। এখনকার মায়ের হাতে পড়লে মাস্টারের কাছে তো ফিরে যেতেই হত, তার উপরে খেতে হত কানমলা। হয়তো বা মুচকি হেসে গিলিয়ে দিতেন ক্যাস্টর অয়েল। চিরকালের জন্যে আরাম হত ব্যামোটা। দৈবাৎ কখনো আমার জ্বর হয়েছে; তাকে কেউ জ্বর বলত না, বলত গা-গরম। আসতেন নীলমাধব ডাক্তার। থার্মোমিটার তখন চক্ষেও দেখি নি; ডাক্তার একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথম দিনের ব্যবস্থা করতেন ক্যাস্টর অয়েল আর উপোস। জল খেতে পেতুম অল্প একটু, সেও গরম জল। তার সঙ্গে এলাচদানা চলতে পারত। তিন দিনের দিনই মৌরলা মাছের ঝোল আর গলা ভাত উপোসের পরে ছিল অমৃত।

জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক-ধরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ তেলটা, কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন। গায়ে কোড়াকাটা ছুরির আঁচড় পড়ে নি কোনোদিন। হাম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে। শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো। মায়েরা যদি ছেলেদের শরীর এতটা নীরুগী রাখতে চান যাতে মাস্টারের হাত এড়াতে না পারে তা হলে ব্রজেশ্বরের মতো চাকর খুঁজে বের করবেন। খাবার-খরচার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাঁচাবে ডাক্তার-খরচা; বিশেষ করে এই কলের আঁতায় ময়দা আর এই ভেজাল-

দেওয়া ঘি-তেলের দিনে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, তখনও বাজারে চকোলেট দেখা দেয় নি। ছিল এক পয়সা দামের গোলাপি-রেউড়ি। গোলাপি গন্ধের আমেজ-দেওয়া এই তিলে-ঢাকা চিনির ড্যালা আজও ছেলেদের পকেট চট্‌চটে ক'রে তোলে কি না জানি নে— নিশ্চয়ই এখনকার মানী লোকের ঘর থেকে লজ্জায় দৌড় মেরেছে। সেই ভাজা মসলার ঠোঙা গেল কোথায়। আর সেই সস্তা দামের তিলে গজা? সে কি এখনও টিঁকে আছে। না থাকে তো তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার নেই।

ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্যে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুরসমেত তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু হু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা। 'ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।' তার মুখে হাসি, মাথায় টাক ঝক্ ঝক্ করছে, গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের ঝরনা সুর বাজিয়ে চলছে, পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে ওঠে যেন জলের নিচেকার নুড়ির আওয়াজ। সেই সঙ্গে চলত তার হাত পা নেড়ে ভাব-বাৎলানো। কিশোরী চাটুজ্যের সবচেয়ে বড়ো আপসোস ছিল এই যে, দাদাভাই অর্থাৎ কিনা আমি, এমন গলা নিয়ে পাঁচালির দলে ভরতি হতে পারলুম না। পারলে দেশে যা-হয় একটা নাম থাকত।

রাত হয়ে আসত, মাদুর-পাতা বৈঠক যেত ভেঙে। ভূতের ভয় শিরদাঁড়ার উপর চাপিয়ে চলে যেতুম বাড়ির ভিতরে মায়ের ঘরে। মা তখন তাঁর খুড়িকে নিয়ে তাস খেলছেন। পংখের-কাজ-করা ঘর হাতির দাঁতের মতো চক্‌চকে, মস্ত তক্তপোশের উপর জাজিম পাতা। এমন উৎপাত বাধিয়ে দিতুম যে তিনি হাতের খেলা ফেলে দিয়ে বলতেন, 'জ্বালাতন করলে, যাও খুড়ি, ওদের গল্প শোনাও গে।' আমরা বাইরের বারান্দায় ঘটির জলে পা ধুয়ে দিদিমাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠতুম। সেখানে শুরু হত দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা। মাঝখানে আমারই ঘুম ভাঙায় কে। রাতের প্রথম পহরে শেয়াল উঠত ডেকে। তখনও শেয়াল-ডাকা রাত কলকাতার কোনো কোনো পুরোনো বাড়ির ভিতের নীচে ফুকরে উঠত।

৪

আমরা যখন ছোটো ছিলুম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা যেমনি ফুরিয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বিজলি আলোর দিন। সে সময়টাতে শহরে কাজ কম কিন্তু

বিশ্রাম নেই। উনুনে যেন জলা কাঠ নিভেছে তবু কয়লায় রয়েছে আগুন। তেলকল চলে না, স্টিমারের বাঁশি থেমে থাকে, কারখানাঘর থেকে মজুরের দল বেরিয়ে গেছে, পাটের-গাঁট-টানা গাড়ির মোষগুলো গেছে টিনের চালের নীচে শহরে গোঠে। সমস্ত দিন যে শহরের মাথা ছিল নানা চিন্তায় তেতে আগুন, এখনও তার নাড়িগুলো যেন দব দব করছে। রাস্তার দু ধারে দোকানগুলোতে কেনাবেচা তেমনি আছে, কেবল সামান্য কিছু ছাই-চাপা। রকম-বেরকমের গোঙানি দিতে দিতে হাওয়াগাড়ি ছুটেছে দশ দিকে; তাদের দৌড়ের পিছনে গরজের ঠেলা কম।

আমাদের সেকালে দিন ফুরলে কাজকর্মের বাড়তি ভাগ যেন কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ত শহরের বাতি-নেবানো নীচের তলায়। ঘরে-বাইরে সন্ধ্যার আকাশ থম্ থম্ করত। ইডেন গার্ডেনে গঙ্গার ধারে শৌখিনদের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে ফেরবার গাড়িতে সইসদের হৈ হৈ শব্দ রাস্তা থেকে শোনা যেত। চৈৎ-বৈশাখ মাসে রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত 'বরীফ'। হাঁড়িতে বরফ-দেওয়া নোনতা জলে ছোটো ছোটো টিনের চোঙে থাকত যাকে বলা হোত কুলফির বরফ, এখন যাকে বলে আইস কিংবা আইসক্রীম। রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই ডাকে মন কী রকম করত তা মনই জানে। আর-একটা হাঁক ছিল 'বেলফুল'। বসন্তকালের সেই মালীদের ফুলের ঝুড়ির খবর আজ নেই, কেন জানি নে। তখন বাড়িতে মেয়েদের খোঁপা থেকে বেলফুলের গোড়ে মালার গন্ধ ছড়িয়ে যেত বাতাসে। গা ধুতে যাবার আগে ঘরের সামনে বসে সমুখে হাত-আয়না রেখে মেয়েরা চুল বাঁধত। বিনুনি-করা চুলের দড়ি দিয়ে খোঁপা তৈরি হত নানা কারিগরিতে। তাদের পরনে ছিল ফরাসডাঙার কালাপেড়ে শাড়ি, পাক দিয়ে কুঁচকিয়ে তোলা। নাপতিনি আসত, ঝামা দিয়ে পা ঘসে আলতা পরাত। মেয়েমহলে তারাই লাগত খবর-চালাচালির কাজে। ট্রামের পায়দানের উপর ভিড় করে কলেজ আর আপিস ফেরার দল ফুটবল খেলার ময়দানে ছুটত না। ফেরবার সময় তাদের ভিড় জমত না সিনেমা-হলের সামনে। নাটক-অভিনয়ের একটা ফুর্তি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু কী আর বলব, আমরা সে সময়ে ছিলুম ছেলেমানুষ।

তখন বড়োদের আমোদে ছেলেরা দূর থেকেও ভাগ বসাতে পেত না। যদি সাহস করে কাছাকাছি যেতুম তা হলে শুনতে হত 'যাও খেলা করো গে', অথচ ছেলেরা খেলায় যদি উচিতমত গোল করত তা হলে শুনতে হত 'চুপ করো'। বড়োদের আমোদ-আহ্লাদ সবসময় খুব যে চুপচাপে সারা হত তা নয়। তাই দূর থেকে কখনো কখনো বন্যার ফেনার মতো তার কিছু কিছু পড়ত ছিটকিয়ে আমাদের

দিকে। এ বাড়ির বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকতুম, দেখতুম ও বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময়। দেউড়ির সামনে বড়ো বড়ো জুড়িগাড়ি এসে জুটেছে। সদর দরজার কাছ থেকে দাদাদের কেউ কেউ অতিথিদের উপরে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গোলাপপাশ থেকে গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছেন, হাতে দিচ্ছেন ছোটো একটি করে তোড়া। নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না কখনো কখনো কানে আসে, তার মর্ম বুঝতে পারি নে। বোঝবার ইচ্ছেটা হয় প্রবল। খবর পেতুম যিনি কাঁদতেন তিনি কুলীন বটে, কিন্তু তিনি আমার ভগ্নীপতি।[১] তখনকার পরিবারে যেমন মেয়ে আর পুরুষ ছিল দুই সীমানায় দুই দিকে, তেমনি ছিল ছোটোরা আর বড়োরা। বৈঠকখানায় ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় চলছে নাচগান, গুড়গুড়ি টানছেন বড়োর দল, মেয়েরা লুকনো থাকতেন ঝরোখার ও পারে, চাপা আলোয় পানের বাটা নিয়ে, সেখানে বাইরের মেয়েরা এসে জমতেন, ফিস্‌ফিস করে চলত গেরস্তালির খবর। ছেলেরা তখন বিছানায়। পিয়ারী কিংবা শংকরী গল্প শোনাচ্ছে, কানে আসছে—

'জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটেছে—'

৫

আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনীঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহিগলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা[২] ছিলেন এই-রকম একটি শখের দলের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের ঘরপোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমনি ব্যাবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলাদেশের ছিল ভারি নেশা। এ পাড়ায় ও পাড়ায় এক-একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত। দলকর্তা অধিকারীরা সবাই যে জাতে বড়ো কিংবা লেখাপড়ায় এমন-কিছু তা নয়। তারা নাম করেছে আপন ক্ষমতায়। আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু রাস্তা নেই, ছিলুম ছেলেমানুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়যন্তর। বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারি দিকে উঠছে তামাকের ধোঁয়া। ছেলেগুলো লম্বা-চুল-ওয়ালা, চোখে-কালি-পড়া, অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে। পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট

১ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমারী দেবীর স্বামী
২ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাবুবিলাস' নাটকের লেখক

গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রঙকরা টিনের বাক্সোয়। দেউড়ির দরজা খোলা, উঠোনে পিল পিল করে ঢুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চার দিকে টগবগ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়। রাত্রি হবে ন'টা, পায়রার পিঠের উপর বাজপাখির মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্যাম, কড়া-পড়া শক্ত হাতের মুঠি দিয়ে আমার কনুই ধরে বলে, 'মা ডাকছে, চলো শোবে চলো।' লোকের সামনে এই টানাহেঁচড়ায় মাথা হেঁট হয়ে যেত, হার মেনে চলে যেতুম শোবার ঘরে। বাইরে চলছে হাঁকডাক, বাইরে জ্বলছে ঝাড়লণ্ঠন, আমার ঘরে সাড়াশব্দ নেই, পিলসুজের উপর টিম টিম করছে পিতলের প্রদীপ। ঘুমের ঘোরে মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে নাচের তাল সমে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল।

সব-তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম। কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল, হুকুম বেরল, ছেলেরাও যাত্রা শুনতে পাবে। ছিল নলদময়ন্তীর পালা। আরম্ভ হবার আগে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় ছিলুম ঘুমিয়ে। বারবার ভরসা দেওয়া হল, সময় হলেই আমাদের জাগিয়ে দেবে। উপরওয়ালাদের দস্তুর জানি, কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, কেননা তাঁরা বড়ো আমরা ছোটো।

সে রাত্রে নারাজ দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম। তার একটা কারণ, মা বললেন তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন, আর-একটা কারণ ন'টার পরে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে বেশ-একটু ঠেলাঠেলির দরকার হত। এক সময়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হল বাইরে। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। একতলায় দোতলায় রঙিন ঝাড়লণ্ঠন থেকে ঝিলিমিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চার দিকে, সাদা বিছানো চাদরে উঠোনটা চোখে ঠেকছে মস্ত। এক দিকে বসে আছেন বাড়ির কর্তারা আর যাঁদের ডেকে আনা হয়েছে। বাকি জায়গাটা যার খুশি যেখান থেকে এসে ভরাট করেছে। থিয়েটরে এসেছিলেন পেটে-সোনার-চেন-ঝোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেঁষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, ভদ্দর-লোকেরা যাদের বলে বাজে লোক। তেমনি আবার পালাগানটা লেখানো হয়েছে এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে, যারা ইংরেজি কপিবুকের মক্‌শো করে নি। এর সুর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা-করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় মেজে নি পালিশ করে।

সভায় যখন দাদাদের কাছে এসে বসলুম, রুমালে কিছু কিছু টাকা বেঁধে আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেওয়া ছিল রীতি। এতে যাত্রাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা, আর গৃহস্থের ছিল খোশনাম।

রাত ফুরোত, যাত্রা ফুরোতে চাইত না। মাঝখানে নেতিয়ে-পড়া দেহটাকে আড়কোলা করে কে যে কোথায় নিয়ে গেল জানতেও পারি নি। জানতে পারলে সে কি কম লজ্জা। যে মানুষ বড়োদের সমান সারে বসে বকশিশ দিচ্ছে ছুঁড়ে, উঠোনসুদ্ধ লোকের সামনে তাকে কিনা এমন অপমান। ঘুম যখন ভাঙল দেখি মায়ের তক্তপোশে শুয়ে আছি। বেলা হয়েছে বিস্তর, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। সূর্য উঠে গেছে অথচ আমি উঠি নি, এ ঘটে নি আর কোনোদিন।

শহরে আজকাল আমোদ চলে নদীর স্রোতের মতো। মাঝে-মাঝে তার ফাঁক নেই। রোজই যেখানে-সেখানে যখন-তখন সিনেমা, যে খুশি ঢুকে পড়ছে সামান্য খরচে। সেকালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোশ-দুকোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা ভরে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।

আগেকার কালটা ছিল যেন রাজপুত্তুর। মাঝে মাঝে পালপার্বণে যখন মর্জি হত আপন এলেকায় করত দান-খয়রাত। এখনকার কাল সদাগরের পুত্তুর, হরেক রকমের ঝক্‌ঝকে মাল সাজিয়ে বসেছে সদর রাস্তার চৌমাথায়। বড়ো রাস্তা থেকে খদ্দের আসে, ছোটো রাস্তা থেকেও।

৬

চাকরদের বড়োকর্তা ব্রজেশ্বর। ছোটোকর্তা যে ছিল তার নাম শ্যাম— বাড়ি যশোরে, খাঁটি পাড়াগেঁয়ে, ভাষা তার কলকাতায়ি নয়। সে বলত, তেনারা, ওনারা, খাতি হবে, যাতি হবে, মুগির ডাল, কুলির আম্বল। 'দোমনি' ছিল তার আদরের ডাক। তার রঙ ছিল শ্যামবর্ণ, বড়ো বড়ো চোখ, তেল-চুকচুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের 'পরে তার ছিল দরদ। তার কাছে আমরা ডাকাতের গল্প শুনতে পেতুম। তখন ভূতের ভয় যেমন মানুষের মন জুড়ে ছিল তেমনি ডাকাতের গল্প ছিল ঘরে ঘরে। ডাকাতি এখনো কম হয় না— খুনও হয়, জখমও হয়, লুঠও হয়, পুলিসও ঠিক লোককে ধরে না। কিন্তু এ হল খবর, এতে গল্পের মজা নেই। তখনকার ডাকাতি গল্পে উঠেছিল দানা বেঁধে, অনেকদিন পর্যন্ত মুখে মুখে চারিয়ে গেছে। আমরা যখন জন্মেছি তখনো এমন-সব লোক দেখা যেত যারা সমর্থ বয়সে ছিল ডাকাতের দলে। মস্ত মস্ত সব লাঠিয়াল, সঙ্গে সঙ্গে চলে লাঠিখেলার সাকরেদ। তাদের নাম শুনলেই লোকে সেলাম করত। প্রায়ই ডাকাতি

তখন গোঁয়ারের মতো নিছক খুনখারাবির ব্যাপার ছিল না। তাতে যেমন ছিল বুকের পাটা তেমনি দরাজ মন। এ দিকে ভদ্রলোকের ঘরেও লাঠি দিয়ে লাঠি ঠেকাবার আখড়া বসে গিয়েছিল। যারা নাম করেছিল ডাকাতরাও তাদের মানত ওস্তাদ বলে, এড়িয়ে চলত তাদের সীমানা। অনেক জমিদারের ডাকাতি ছিল ব্যাবসা। গল্প শুনেছি, সেই জাতের একজন দল বসিয়ে রেখেছিল নদীর মোহানায়। সেদিন অমাবস্যা, পুজোর রাত্তির, কালী কঙ্কালীর নামে মুণ্ড কেটে মন্দিরে যখন নিয়ে এল জমিদার কপাল চাপড়ে বললে, 'এ যে আমারই জামাই!'

আরও শোনা যেত রঘুডাকাত বিশুডাকাতের কথা। তারা আগে থাকতে খবর দিয়ে ডাকাতি করত, ইতরপনা করত না। দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে পাড়ার রক্ত যেত হিম হয়ে। মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তাদের ধর্মে ছিল মানা। একবার একজন মেয়ে খাঁড়া হাতে কালী সেজে উল্‌টে ডাকাতের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করেছিল।

আমাদের বাড়িতে একদিন ডাকাতের খেলা দেখানো হয়েছিল। মস্ত মস্ত কালো কালো জোয়ান সব, লম্বা লম্বা চুল। ঢেঁকিতে চাদর বেঁধে সেটা দাঁতে কামড়ে ধরে দিলে ঢেঁকিটা টপকিয়ে পিঠের দিকে। ঝাঁকড়া চুলে মানুষ ঝুলিয়ে লাগল ঘোরাতে। লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল দোতলায়। একজনের দুই হাতের ফাঁক দিয়ে পাখির মতো সুট করে বেরিয়ে গেল। দশ-বিশ কোশ দূরে ডাকাতি সেরে সেই রাত্রেই ভালোমানুষের মতো ঘরে ফিরে এসে শুয়ে থাকা কেমন করে হতে পারে, তাও দেখালে। খুব বড়ো একজোড়া লাঠির মাঝখানে আড়-করা একটা করে পা রাখবার কাঠের টুকরো বাঁধা। এই লাঠিকে বলে রণপা। দুই হাতে দুই লাঠির আগা ধরে সেই পাদানের উপর পা রেখে চললে এক পা ফেলা দশ পা ফেলার সামিল হত, ঘোড়ার চেয়ে দৌড় হত বেশি। ডাকাতি করবার মতলব যদিও মাথায় ছিল না তবু এক সময়ে এই রণপায় চলার অভ্যাস তখনকার শান্তিনিকেতনে ছেলেদের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। ডাকাতি খেলার এই ছবি শ্যামের মুখের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কতবার সন্ধে কাটিয়েছি দু হাতে পাঁজর চেপে ধরে।

ছুটির রবিবার। আগের সন্ধেবেলায় ঝিঁঝি ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘু ডাকাতের। ছায়া-কাঁপা ঘরে মিট্‌মিটে আলোতে বুক করছিল ধুক ধুক। পরদিন ছুটির ফাঁকে পালকিতে চড়ে বসলুম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলায়, উড়ো ঠিকানায়, গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্যে। নিঝুম অন্ধকারের নাড়িতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে বেহারাগুলোর হাঁই হুই হাঁই হুই, গা করছে ছম ছম। ধূ ধূ করে মাঠ, বাতাস কাঁপে

রোদ্দুরে। দূরে ঝিক ঝিক করে কালীদিঘির জল। চিক চিক করে বালি। ডাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ফাটল-ধরা ঘাটের দিকে ডালপালা-ছড়ানো পাকুড় গাছ।

গল্পের আতঙ্ক জমা হয়ে আছে না-জানা মাঠের গাছতলায়, ঘন বেতের ঝোপে। যত এগোচ্ছি দুর দুর করছে বুক। বাঁশের লাঠির আগা দুই-একটা দেখা যায় ঝোপের উপর দিকে। কাঁধ বদল করবে বেহারাগুলো ঐখানে। জল খাবে, ভিজে গামছা জড়াবে মাথায়। তার পরে?—

'রে রে রে রে রে রে!'

৭

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল চলছেই। ঘর্ঘর শব্দে এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা। তম্বুরার তারে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে। তিনি আমাদের মনে যতটা বেশি মাল বোঝাই করতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই ডিঙি উলটিয়ে তলিয়ে গেছে, এ কথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। আমার বিদ্যেটা লোকসানি মাল। সেজদাদা তাঁর বড়ো মেয়েকে শিখিয়ে তুলতে লেগেছিলেন। যথাসময়ে তাকে দিয়েছিলেন লোরেটোতে ভরতি করে। তার পূর্বেই তার ভাষায় প্রথম দখল হয়ে গেছে বাংলায়।

প্রতিভাকে বিলিতি সংগীতে পাকা করে তুললেন। তাতে করে তাকে দিশি গানের পথ ভুলিয়ে দেওয়া হয় নি সে আমরা জানি। তখনকার দিনে ভদ্র পরিবারে হিন্দুস্থানি গানে তার সমান কেউ ছিল না।

বিলিতি সংগীতের গুণ হচ্ছে তাতে সুর সাধানো হয় খুব খাঁটি করে, কান দোরস্ত হয়ে যায়, আর পিয়ানোর শাসনে তালেও ঢিলেমি থাকে না।

এ দিকে বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভরতি হতে হল। বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলার। দুই-একটা নমুনা দিই—

এক যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উলকি পরাতে।

আবার উলকি পরা যেমন-তেমন
লাগিয়ে দিল ভেলকি
ঠাকুরঝি,
উলকির জালাতে কত কেঁদেছি
ঠাকুরঝি।

আরও কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে। যেমন—

চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হল,
ফার্সি পড়ে তাঁতি।

...

গণেশের মা, কলাবউকে জ্বালা দিয়ো না,
তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনা।

অতি পুরোনো কালের ভুলে-যাওয়া খবরের আমেজ আসে এমন লাইনও পাওয়া যায়। যেমন—

এক যে ছিল কুকুর-চাটা
শেয়ালকাঁটার বন
কেটে করলে সিংহাসন।

এখনকার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে হারমোনিয়মে সুর লাগিয়ে সা রে গা মা শাধানো, তার পরে হালকা গোছের হিন্দি গান ধরিয়ে দেওয়া। তখন আমাদের পড়াশুনোর যিনি তদারক করতেন তিনি বুঝেছিলেন, ছেলেমানুষি ছেলেদের মনের আপন জিনিস, আর ঐ হালকা বাংলা ভাষা হিন্দি বুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয়। তা ছাড়া, এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া-তবলার বোলের তোয়াক্কা রাখে না। আপনা-আপনি নাড়িতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন-ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায়— এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।

তখন হারমোনিয়ম আসে নি এ দেশের গানের জাত মারতে। কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যেস করেছি। কল-টেপা সুরের গোলামি করি নি।

আমার দোষ হচ্ছে, শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন চালাতে পারে নি। ইচ্ছেমত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভরতি করেছি তাই দিয়েই।

মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না। কেননা সুযোগ ছিল বিস্তর। যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতি-গজ-গামিনী রে', আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি। সন্ধে-বেলায় মাকে সেই গান শুনিয়ে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল। আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন, হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে, গুন গুন গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চার দিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন; কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল জ্বল করত, গান ধরতেন— ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী। সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।

তখনকার আতিথ্য ছিল খোলা দরজার। চেনাশোনার খোঁজখবর নেবার বিশেষ দরকার ছিল না। যারা যখন এসে পড়ত তাদের শোবার জায়গাও মিলত, অন্নের থালাও আসত যথানিয়মে। সেই রকমের অচেনা অতিথি একদিন লেপ-মোড়া তম্বুরা কাঁধে করে তাঁর পুঁটুলি খুলে বসবার ঘরের এক পাশে পা ছড়িয়ে দিলেন। কানাই হুঁকোবরদার যথারীতি তাঁর হাতে দিলে হুঁকো তুলে।

সেকালে ছিল অতিথির জন্যে এই যেমন তামাক তেমনি পান। তখনকার দিনে বাড়ি-ভিতরে মেয়েদের সকাল বেলাকার কাজ ছিল ঐ— পান সাজতে হত রাশি রাশি, বাইরের ঘরে যারা আসত তাদের উদ্দেশে। চট্‌পট্ পানে চুন লাগিয়ে, কাঠি দিয়ে খয়ের লেপে, ঠিকমত মসলা ভ'রে, লঙ্গ দিয়ে মুড়ে সেগুলো বোঝাই হতে থাকত পিতলের গামলায়; উপরে পড়ত খয়েরের ছোপলাগা ভিজে ন্যাকড়ার ঢাকা। ও দিকে বাইরে সিঁড়ির নীচের ঘরটাতে চলত তামাক সাজার ধুম। মাটির গামলায় ছাই-ঢাকা গুল, আলবোলার নলগুলো ঝুলছে নাগলোকের সাপের মতো, তাদের নাড়ির মধ্যে গোলাপ-জলের গন্ধ। বাড়িতে যাঁরা আসতেন সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখে তাঁরা গৃহস্থের প্রথম 'আসুন মশায়' ডাক পেতেন এই অম্বুরি তামাকের গন্ধে। তখন এই একটা বাঁধা নিয়ম ছিল মানুষকে মেনে নেওয়ার।

সেই ভরপুর পানের গামলা অনেক দিন হল সরে পড়েছে, আর সেই হুঁকোবরদার জাতটা সাজ খুলে ফেলে ময়রার দোকানে তিন দিনের বাসি সন্দেশ চটকে চটকে মাখতে লেগেছে।

সেই অজানা গাইয়ে আপন ইচ্ছেমত রয়ে গেলেন কিছুদিন। কেউ প্রশ্নও করলে না। ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শুনতেম। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই, তাদের শখ অনিয়মের শেখায়। সকাল বেলার সুরে চলত 'বঙশী হমারি রে'।

তার পরে যখন আমার কিছু বয়েস হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদু ভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই ; সেইজন্যে গান শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে— ভালো লাগল কাফি সুরে 'রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া', রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে। মুশকিল হল, এই সময়ে আর-এক অতিথি হাজির হল কিছু না বলে কয়ে। বাঘ-মারা বলে তাঁর খ্যাতি। বাঙালি বাঘ মারে এ কথাটা সেদিন শোনাত খুব অদ্ভুত, কাজেই বেশির ভাগ সময় আটকা পড়ে গেলুম তাঁরই ঘরে। যে বাঘের কবলে পড়েছিলেন বলে আমাদের বুকে চমক লাগিয়েছিলেন সে বাঘের মুখ থেকে তিনি কামড় পান নি, কামড়ের গল্পটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন মিউজিয়মে মরা বাঘের হাঁ থেকে— তখন সে কথা ভাবি নি, এখন সেটা পষ্ট বুঝতে পারছি। তবু তখনকার মতো ঐ বীরপুরুষের জন্য ঘন ঘন পান-তামাকের জোগাড় করতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। দূর থেকে কানে পৌঁছত কানাড়ার আলাপ।

এই তো গেল গান। সেজদাদার হাতে আমার অন্য বিদ্যের যে গোড়াপত্তন হয়েছিল সেও খুব ফলাও রকমের। বিশেষ কিছু ফল হয় নি, সে স্বভাবদোষে। আমার মতো মানুষকে মনে রেখেই রামপ্রসাদ সেন বলেছিলেন, 'মন, তুমি কৃষিকাজ বোঝো না।' কোনোদিন আবাদের কাজ করা হয় নি।

চাষের আঁচড় কাটা হয়েছিল কোন্ কোন্ খেতে তার খবরটা দেওয়া যাক।

অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি, কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শিরশির করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াত। দালানঘরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা জমি, তাকে বলা হয় গোলাবাড়ি। নাম শুনে বোঝা যায়, শহর একদিন পাড়াগাঁটাকে আগা-

গোড়া চাপা দিয়ে বসে নি, কিছু কিছু ফাঁক ছিল। শহরে সভ্যতার শুরুতে আমাদের গোলাবাড়ি গোলা ভরে বছরের ধান জমা করে রাখত, খাস জমির রায়তরা দিত তাদের ধানের ভাগ। এই পাঁচিল ঘেঁষে ছিল কুস্তির চালাঘর। এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা করে তাতে এক মোন সরষের তেল ঢেলে জমি তৈরি হয়েছিল। সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমার প্যাঁচ কষা ছিল ছেলেখেলা মাত্র। খুব খানিকটা মাটি মাখামাখি করে শেষকালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে চলে আসতুম। সকাল-বেলায় রোজ এত ক'রে মাটি ঘেঁটে আসা ভালো লাগত না মায়ের, তাঁর ভয় হত ছেলের গায়ের রঙ মেটে হয়ে যায় পাছে। তার ফল হয়েছিল ছুটির দিনে তিনি লেগে যেতেন শোধন করতে। এখনকার কালের শৌখিন গিন্নিরা রঙ সাফ করবার সরঞ্জাম কৌটোতে করে কিনে আনেন বিলিতি দোকান থেকে, তখন তাঁরা মলম বানাতেন নিজের হাতে। তাতে ছিল বাদাম-বাটা, সর, কমলালেবুর খোসা, আরও কত কী— যদি জানতুম আর মনে থাকত তবে বেগম-বিলাস নাম দিয়ে ব্যাবসা করলে সন্দেশের দোকানের চেয়ে কম আয় হত না। রবিবার দিন সকালে বারান্দায় বসিয়ে দলন-মলন চলতে থাকত, অস্থির হয়ে উঠত মন ছুটির জন্যে। এ দিকে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে একটা গুজব চলে আসছে যে, জন্মমাত্র আমাদের বাড়িতে শিশুদের ডুবিয়ে দেওয়া হয় মদের মধ্যে, তাতেই রঙটাতে সাহেবি জেল্লা লাগে।

কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখাবার জন্যে। দেয়ালে ঝুলছে আস্ত একটা কঙ্কাল। রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের দেয়ালে এটা ঝুলত, হাওয়ায় নাড়া খেলে হাড়গুলো উঠত খট খট করে। তাদের নাড়াচাড়া করে করে হাড়গুলোর শক্ত শক্ত নাম সব জানা হয়েছিল, তাতেই ভয় গিয়েছিল ভেঙে।

দেউড়িতে বাজল সাতটা। নীলকমল[১] মাস্টারের ঘড়ি-ধরা সময় ছিল নিরেট। এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না। খট্‌খটে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেরই মতো, এক দিনের জন্যেও মাথাধরার সুযোগ ঘটল না। বই নিয়ে স্লেট নিয়ে যেতুম টেবিলের সামনে। কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্কের দাগ পড়তে থাকত— সবই বাংলায়, পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত। সাহিত্যে 'সীতার বনবাস' থেকে একদম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল 'মেঘনাদবধ' কাব্যে। সঙ্গে ছিল প্রাকৃতবিজ্ঞান। মাঝে মাঝে আসতেন সীতানাথ দত্ত[২], বিজ্ঞানের ভাসা ভাসা খবর পাওয়া যেত জানা জিনিস

১ নীলকমল ঘোষাল —জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ ২৮৩

২ সীতানাথ ঘোষ?

পরখ করে। মাঝে একবার এলেন হেরম্ব তত্ত্বরত্ন। লাগলুম কিছু না বুঝে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করে ফেলতে। এমনি করে সারা সকাল জুড়ে নানারকম পড়ার যতই চাপ পড়ে মন ততই ভিতরে ভিতরে চুরি ক'রে কিছু কিছু বোঝা সরাতে থাকে, জালের মধ্যে ফাঁক ক'রে তার ভিতর দিয়ে মুখস্থ বিদ্যে ফসকিয়ে যেতে চায়, আর নীলকমল মাস্টার তাঁর ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জারি করতে থাকেন তা বাইরের পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো হয় না।

বারান্দায় আর-এক ধারে বুড়ো দরজি, চোখে আতশ কাঁচের চশমা, ঝুঁকে প'ড়ে কাপড় সেলাই করছে, মাঝে মাঝে সময় হলে নমাজ পড়ে নিচ্ছে— চেয়ে দেখি আর ভাবি কী সুখেই আছে নেয়ামত। অঙ্ক কষতে মাথা যখন ঘুলিয়ে যায় চোখের উপর স্লেট আড়াল ক'রে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান, লম্বা দাড়ি কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়িয়ে তুলছে দুই কানের উপর দুই ভাগে। পাশে বসে আছে কাঁকন-পরা ছিপ্‌ছিপে ছোকরা দরোয়ান, কুটছে তামাক। ঐখানে ঘোড়াটা সকালেই খেয়ে গেছে বালতিতে বরাদ্দ দানা, কাকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে-পড়া ছোলা, জনি কুকুরটার কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে— ঘেউ ঘেউ করে দেয় তাড়া।

বারান্দায় এক কোণে ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর মধ্যে পুঁতেছিলুম আতার বিচি[১]। কবে তার থেকে কচি পাতা বেরবে দেখবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করছে। নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই, আর দেওয়া চাই জল। শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটে নি। যে ঝাঁটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো উড়িয়ে।

সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় হেলে পড়ে ছায়া। ন'টা বাজে। বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে। সাড়ে ন'টা বাজতেই রোজকার বরাদ্দ ডাল ভাত মাছের ঝোলের বাঁধা ভোজ। রুচি হয় না খেতে।

ঘণ্টা বাজে দশটার। বড়ো রাস্তা থেকে মন-উদাস-করা ডাক শোনা যায় কাঁচা-আম-ওয়ালার। বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলছে দূরের থেকে দূরে। গলির ধারের বাড়ির ছাতে বড়োবউ ভিজে চুল শুকোচ্ছে রোদ্দুরে, তার দুই মেয়ে কড়ি নিয়ে খেলেই চলেছে, কোনো তাড়া নেই। মেয়েদের তখন ইস্কুল যাওয়ার তাগিদ ছিল না। মনে হত মেয়ে-জন্মটা নিছক সুখের। বুড়ো ঘোড়া পালকিগাড়িতে ক'রে টেনে নিয়ে চলল আমার দশটা-চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে।

১ দ্রষ্টব্য 'আতার বিচি' —ছড়ার ছবি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড

জিম্‌নাস্টিকের মাস্টার এসেছেন। কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে উলটপালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি-আঁকার মাস্টার।

ক্রমে দিনের মরচে পড়া আলো মিলিয়ে আসে। শহরের পাঁচমিশালি ঝাপসা শব্দে স্বপ্নের সুর লাগায় ইটকাঠের দৈত্যটার দেহে।

পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি। অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীডার যেন ওত পেতে রয়েছে টেবিলের উপর। মলাটটা ঢল্‌ঢলে, পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগি, অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে— তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর। পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি। যত পড়ি তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি।…

বিছানায় ঢুকে এতক্ষণ পরে পাওয়া যায় একটুখানি পোড়ো সময়। সেখানে শুনতে শুনতে শেষ হতে পায় না— রাজপুত্তুর চলেছে তেপান্তর মাঠে।

৮

তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত ঘটেছে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মানুষের আনাগোনা, না আছে ভূতপ্রেতের। পূর্বেই জানিয়েছি, অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিঁকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দিয়েছে দৌড়। ছাদের কার্নিসে তার আরামে পা রাখবার গুজব উঠে গিয়ে সেখানে এঁঠো আমের আঁঠি নিয়ে কাকেদের চলেছে ছেঁড়াছেঁড়ি। এ দিকে মানুষের বসতি আটক পড়েছে নীচের তলায় চারকোনা দেয়ালের প্যাক্‌বাক্সে।

মনে পড়ে বাড়ি-ভিতরের পাঁচিল-ঘেরা ছাদ। মা বসেছেন সন্ধেবেলায় মাদুর পেতে, তাঁর সঙ্গিনীরা চার দিকে ঘিরে বসে গল্প করছে। সেই গল্পে খাঁটি খবরের দরকার ছিল না। দরকার কেবল সময়-কাটানো। তখনকার দিনের সময় ভরতি করবার জন্যে নানা দামের নানা মালমসলার বরাদ্দ ছিল না। দিন ছিল না ঠাসবুনুনি করা, ছিল বড়ো-বড়ো-ফাঁক-ওয়ালা জালের মতো। পুরুষদের মজলিসেই হোক, আর মেয়েদের আসরেই হোক, গল্পগুজব হাসিতামাশা ছিল খুবই হালকা দামের। মায়ের সঙ্গিনীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ব্রজ আচার্জির বোন, যাঁকে আচার্জিনী বলে ডাকা হত। তিনি ছিলেন এ বৈঠকে দৈনিক খবর সরবরাহ

করবার কাজে। প্রায় আনতেন রাজ্যির বিদকুটে খবর কুড়িয়ে কিংবা বানিয়ে। তাই নিয়ে গ্রহশান্তি-স্বস্ত্যয়নের হিসেব হত খুব ফলাও খরচায়। এই সভায় আমি মাঝে মাঝে টাটকা পুঁথি-পড়া বিদ্যের আমদানি করেছি, শুনিয়েছি সূর্য পৃথিবী থেকে ন কোটি মাইল দূরে। ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বয়ং বাল্মীকি-রামায়ণের টুকরো আউড়ে দিয়েছি অনুস্বার-বিসর্গ-সুদ্ধ ; মা জানতেন না তাঁর ছেলের উচ্চারণ কত খাঁটি, তবু তার বিদ্যের পাল্লা সূর্যের ন কোটি মাইল রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ-সব শ্লোক স্বয়ং নারদমুনি ছাড়া আর কারও মুখে শোনা যেতে পারে, এ কথা কে জানত বলো।

বাড়ি-ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে। ভাঁড়ারের সঙ্গে ছিল তার বোঝাপড়া। ওখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি, জারক নেবুকে দিত জারিয়ে। ঐখানে মেয়েরা বসত পিতলের গামলা-ভরা কলাইবাঁটা নিয়ে। টিপে টিপে টপ্‌টপ্‌ করে বড়ি দিত চুল শুকোতে শুকোতে ; দাসীরা বাসি কাপড় কেচে মেলে দিয়ে যেত রোদ্দুরে। তখন অনেকটা হালকা ছিল ধোবার কাজ। কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকনো হত, ছোটো বড়ো নানা সাইজের নানা-কাজ-করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হত, রোদ-খাওয়া সরষের তেলে মজে উঠত ইঁচড়ের আচার। কেয়াখয়ের তৈরি হত সাবধানে, তার কথাটা আমার বেশি করে মনে রাখবার মানে আছে। যখন ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় আমাকে জানিয়ে দিলেন আমাদের বাড়ির কেয়াখয়েরের নাম তাঁর শোনা আছে, অর্থ বুঝতে শক্ত ঠেকল না। যা তাঁর শোনা আছে সেটা তাঁর জানা চাই। তাই বাড়ির সুনাম বজায় রাখবার জন্য মাঝে মাঝে লুকিয়ে ছাদে উঠে দুটো-একটা কেয়াখয়ের— কী বলব— চুরি করতুম বলার চেয়ে বলা ভালো অপহরণ করতুম। কেননা রাজা-মহারাজারাও দরকার হলে, এমন-কি না হলেও, অপহরণ করে থাকেন আর যারা চুরি করে তাদের জেলে পাঠান, শূলে চড়ান। শীতের কাঁচা রৌদ্রে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা দায় ছিল মেয়েদের। বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর, বউদিদি[১]র আমসত্ত্ব-পাহারা, তা ছাড়া আরও পাঁচরকম খুচরো কাজের সাথি। পড়ে শোনাতুম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'[২]। কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়ত

১ কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

২ "বইটি যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনী লইয়া বিরচিত।" —প্রতাপচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত
প্রথম প্রকাশ : প্রথমখণ্ড ১৭৯১ শক [১৮৬৯], দ্বিতীয়খণ্ড ১৮০৬ শক [১৮৮৪]

জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল, সে কথা কিছুতেই বউঠাকরুন মানতেন না, এমন-কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার সুপুরি-কাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে সুপুরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড়বেগে। উসকিয়ে দেবার লোক না থাকাতে সরু করে সুপুরি কাটার হাত অনেক দিন থেকে অন্য সরু কাজে লাগিয়েছি।

ছাদে-মেলে-দেওয়া এই-সব মেয়েলি কাজে পাড়াগাঁয়ের একটা স্বাদ ছিল। এই কাজগুলো সেই সময়কার যখন বাড়িতে ছিল ঢেঁকিশাল, যখন হত নারু কোটা, যখন দাসীরা সন্ধেবেলায় বসে উরুতের উপর সলতে পাকাত, আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকৌড়ির নেমন্তন্নে। রূপকথা আজকাল ছেলেরা মেয়েদের মুখ থেকে শুনতে পায় না, নিজে নিজে পড়ে ছাপানো বই থেকে। আচার চাটনি এখন কিনে আনতে হয় নতুনবাজার থেকে— বোতলে ভরা, গালা দিয়ে ছিপিতে বন্ধ।

পাড়াগাঁয়ের আরও-একটা ছাপ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে। ঐখানে গুরুমশায়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেদেরও ঐখানেই বিদ্যের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়। আমিও নিশ্চয় ঐখানেই স্বরে-অ স্বরে-আ'র উপর দাগা বুলোতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সৌরলোকের সবচেয়ে দূরের গ্রহের মতো সেই শিশুকে মনে-আনা-ওয়ালা কোনো দূরবীন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই।

তার পরে বই পড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে সে ষণ্ডামার্ক মুনির পাঠশালার বিষম ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ-অবতার— বোধ করি সীসের ফলকে খোদাই করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে। আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক।[১]

আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছোটো থেকে বড়ো বয়স পর্যন্ত আমার নানা রকমের দিন ঐ ছাদে নানা ভাবে বয়ে চলেছে। আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন তাঁর জায়গা ছিল তেতালার ঘরে। চিলেকোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কতদিন দেখেছি, তখনো সূর্য ওঠে নি, তিনি সাদা পাথরের মূর্তির মতো ছাদে চুপ করে বসে আছেন, কোলে দুটি হাত জোড়-করা। মাঝে মাঝে তিনি অনেক দিনের জন্য চলে যেতেন পাহাড়ে পর্বতে, তখন ঐ ছাদে যাওয়া ছিল আমার সাত-সমুদ্দুর-পারে যাওয়ার আনন্দ। চিরদিনের নীচেতলায় বারান্দায় বসে বসে রেলিঙের

১ তুলসীর 'শিশুবোধক'। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সংগৃহীত ও কলিকাতা, আহিরিটোলা, হইতে প্রকাশিত।

ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছি রাস্তায় লোক-চলাচল ; কিন্তু ঐ ছাদের উপর যাওয়া লোকবসতির পিল্‌পেগাড়ি পেরিয়ে যাওয়া। ওখানে গেলে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে মন চলে যায় যেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে। নানা বাড়ির নানা গড়নের উঁচুনিচু ছাদ চোখে ঠেকে, মধ্যে মধ্যে দেখা যায় গাছের ঝাঁকড়া মাথা। আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুর বেলায়। বরাবর এই দুপুর বেলাটা নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে। ও যেন দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগি হয়ে যাবার সময়। খড়খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে ঘরের ছিট্‌কিনি দিতুম খুলে। দরজার ঠিক সামনেই ছিল একটা সোফা ; সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে বসতুম। আমাকে পাকড়া করবার চৌকিদার যারা, পেট ভরে খেয়ে তাদের ঝিমুনি এসেছে, গা মোড়া দিতে দিতে শুয়ে পড়েছে মাদুর জুড়ে। রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর, চিল ডেকে যেত আকাশে। সামনের গলি দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়ালা। সেদিনকার দুপুরবেলাকার সেই চুপচাপ বেলা আজ আর নেই, আর নেই সেই চুপচাপ বেলার ফেরিওয়ালা।

হঠাৎ তাদের হাঁক পৌঁছত যেখানে বালিশের উপর খোলা চুল এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ির বৌ, দাসী ডেকে নিয়ে আসত ভিতরে, বুড়ো চুড়িওয়ালা কচি হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত পছন্দমত বেলোয়ারি চুড়ি। সেদিনকার সেই বৌ আজকের দিনে এখনো বৌএর পদ পায় নি, সেকেণ্ড্‌ ক্লাসে সে পড়া মুখস্থ করছে। আর সেই চুড়িওয়ালা হয়তো আজ সেই গলিতেই বেড়াচ্ছে রিক্‌শ ঠেলে। ছাদটা ছিল আমার কেতাবে-পড়া মরুভূমি, ধু ধু করছে চার দিক। গরম বাতাস হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, আকাশের নীল রঙ এসেছে ফিকে হয়ে।

এই ছাদের মরুভূমিতে তখন একটা ওয়েসিস দেখা দিয়েছিল। আজকাল উপরের তলায় কলের জলের নাগাল নেই। তখন তেতালার ঘরেও তার দৌড় ছিল। লুকিয়ে-ঢোকা নাবার ঘর, তাকে যেন বাংলা দেশের শিশু লিভিংস্টন এইমাত্র খুঁজে বের করলে। কল দিতুম খুলে, ধারাজল পড়ত সকল গায়ে। বিছানার একখানা চাদর নিয়ে গা মুছে সহজ মানুষ হয়ে বসতুম।

ছুটির দিনটা দেখতে দেখতে শেষের দিকে এসে পৌঁছল। নীচের দেউড়ির ঘণ্টায় বাজল চারটে। রবিবারের বিকেল বেলায় আকাশটা বিশ্রী রকমের মুখ বিগড়ে আছে। আসছে-সোমবারের হাঁ-করা মুখের গ্রহণ-লাগানো ছায়া তাকে গিলতে শুরু করেছে। নীচে এতক্ষণে পাহারা-এড়ানো ছেলের খোঁজ পড়ে গেছে।

এখন জলখাবারের সময়। এইটে ছিল ব্রজেশ্বরের একটা লালচিহ্ন-দেওয়া দিনের ভাগ। জলখাবারের বাজার করা ছিল তারই জিম্মায়। তখনকার দিনে দোকানিরা ঘিয়ের দামে শতকরা ত্রিশ-চল্লিশ টাকা হারে মুনফা রাখত না, গন্ধে স্বাদে জলখাবার তখনো বিষিয়ে ওঠে নি। যদি জুটে যেত কচুরি সিঙাড়া, এমন-কি আলুর দম, সেটা মুখে পুরতে সময় লাগত না। কিন্তু যথাসময়ে ব্রজেশ্বর যখন তার বাঁকা ঘাড় আরও বাঁকিয়ে বলত 'দেখো বাবু আজ কী এনেছি', প্রায় দেখা যেত কাগজের ঠোঙায় চীনেবাদাম-ভাজা! সেটাতে আমাদের যে রুচি ছিল না তা নয়, কিন্তু ওর দরের মধ্যেই ছিল ওর আদর। কোনোদিন টুঁ শব্দ করি নি। এমন-কি, যেদিন তালপাতার ঠোঙা থেকে বেরত তিলেগজা সেদিনও না।

দিনের আলো আসছে ঘোলা হয়ে। মন খারাপ নিয়ে একবার ছাদটা ঘুরে আসা গেল, নীচের দিকে দেখলুম তাকিয়ে— পুকুর থেকে পাতিহাঁসগুলো উঠে গিয়েছে। লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে ঘাটে, বটগাছের ছায়া পড়েছে অর্ধেক পুকুর জুড়ে, রাস্তা থেকে জুড়িগাড়ির সইসের হাঁক শোনা যাচ্ছে।

৯

দিনগুলো এমনি চলে যায় একটানা। দিনের মাঝখানটা ইস্কুল নেয় খাবলিয়ে, সকালে বিকেলে ছিটকিয়ে পড়ে তারই বাড়তির ভাগ। ঘরে ঢুকতেই ক্লাসের বেঞ্চি-টেবিলগুলো মনের মধ্যে যেন শুকনো কনুইয়ের গুঁতো মারে। রোজই তাদের একই আড়ষ্ট চেহারা।

সন্ধেবেলায় ফিরে যেতুম বাড়িতে। ইস্কুলঘরে তেলের বাতিটা তুলে ধরেছে পরদিনের পড়াতৈরি-পথের সিগ্‌ন্যাল। এক-একদিন বাড়ির আঙিনায় আসে ভালুক-নাচ-ওয়ালা। আসে সাপুড়ে সাপ খেলাতে। এক-একদিন আসে ভোজবাজিওয়ালা, একটু দেয় নতুনের আমেজ।

আমাদের চিৎপুর রোডে আজ আর ওদের ডুগ্‌ডুগি বাজে না। সিনেমাকে দূর থেকে সেলাম ক'রে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। শুকনো পাতার সঙ্গে এক জাতের ফড়িঙ যেমন বেমালুম রঙ মিলিয়ে থাকে আমার প্রাণটা তেমনি শুকনো দিনের সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে থাকত।

তখন খেলা ছিল সামান্য কয়েক রকমের। ছিল মার্বেল, ছিল যাকে বলে ব্যাটবল —ক্রিকেটের অত্যন্ত দূর কুটুম্ব। আর ছিল লাটিম-ঘোরানো, ঘুড়ি-ওড়ানো। শহরে

ছেলেদের খেলা সবই ছিল এমনি কম্‌জোরি। মাঠজোড়া ফুটবল-খেলার লম্ফঝম্প তখনো ছিল সমুদ্রপারে। এমনি করে একই মাপের দিনগুলো শুকনো খুঁটির বেড়া পুঁতে চলেছিল আমাকে পাকে পাকে ঘিরে।

এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বৌ[1], কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ।

দুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতর-কোঠায়। নবাবি কায়দা তখনো চলে আসছে। মনে আছে দিদি[2] বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বৌকে পাশে নিয়ে, মনের কথা -বলাবলি চলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগকাটা গণ্ডির বাইরের। আবার শুকনো মুখ করে ফিরতে হবে সেই ছ্যাংলাপড়া পুরোনো দিনের আড়ালে।

হঠাৎ দূর পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে সাবেক বাঁধের তলা ক্ষইয়ে দেয়, এবার তাই ঘটল। বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্ত্রী। বৌঠাকরুনের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে। নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমানুষ। বৌঠাকরুন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন, এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পানতা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে যখন আত্মীয়-বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চটিজুতোজোড়া দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা-কোনো দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করতুম। বলতে হত, 'তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে। আমি কি চৌকিদার।' তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।'

এ কালের মেয়েদের হাসি পাবে, তাঁরা বলবেন, নিজের ছাড়া সংসারে কি পরের দেওর ছিল না কোনোখানে। কথাটা মানি। এখনকার কালের বয়স সকল দিকেই

১ কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী
২ 'মেজদিদি' বর্ণকুমারী দেবী

তখনকার থেকে হঠাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে। তখন বড়ো-ছোটো সবাই ছিল ছেলেমানুষ।

এইবার আমার নির্জন বেছুয়িনি ছাদে শুরু হল আর-এক পালা— এল মানুষের সঙ্গ, মানুষের স্নেহ। সেই পালা জমিয়ে দিলেন আমার জ্যোতিদাদা[১]।

১০

ছাদের রাজ্যে নতুন হাওয়া বইল, নামল নতুন ঋতু।

তখন পিতৃদেব জোড়াসাঁকোয় বাস ছেড়েছিলেন। জ্যোতিদাদা এসে বসলেন বাইরের তেতলার ঘরে। আমি একটু জায়গা নিলুম তারই একটি কোণে।

অন্দর-মহলের পর্দা রইল না। আজ এ কথা নতুন ঠেকবে না, কিন্তু তখন এত নতুন ছিল যে মেপে দেখলে তার থই পাওয়া যায় না। তারও অনেক কাল আগে, আমি তখন শিশু, মেজদাদা[২] সিভিলিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছেন। বোম্বাইয়ে প্রথম তাঁর কাজে যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকদের অবাক করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বৌঠাকরুনকে[৩] সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়ির বৌকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই তো ছিল যথেষ্ট, তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই— এ যে হল বিষম বেদস্তুর। আপন লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

বাইরে বেরবার মতো কাপড় তখনও মেয়েদের মধ্যে চলতি হয় নি। এখন শাড়ি জামা নিয়ে যে সাজের চলন হয়েছে তারই প্রথম শুরু করেছিলেন বৌঠাকরুন[৩]।

বেণী দুলিয়ে তখনও ফ্রক ধরে নি ছোটো মেয়েরা। অন্তত আমাদের বাড়িতে। ছোটোদের মধ্যে চলন ছিল পেশোয়াজের। বেথুন ইস্কুল যখন প্রথম খোলা হল আমার বড়দিদির[৪] ছিল অল্প বয়স। সেখানে মেয়েদের পড়াশোনার পথ সহজ করবার প্রথম দলের ছিলেন তিনি। ধবধবে তাঁর রঙ। এ দেশে তার তুলনা পাওয়া যেত না। শুনেছি পালকিতে করে স্কুলে যাবার সময় পেশোয়াজ-পরা তাঁকে চুরি-করা ইংরেজ মেয়ে মনে করে পুলিসে একবার ধরেছিল।

আগেই বলেছি সেকালে বড়ো ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না। কিন্তু

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ 'মেজো বৌঠাকরুন' জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

৪ সৌদামিনী দেবী

এই-সকল পুরোনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোটো। বয়সের এত দূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম এই আশ্চর্য। আরও আশ্চর্য এই যে, তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি ব'লে কখনও আমার মুখ চাপা দেন নি। তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয় নি। আজ ছেলেদের মধ্যেই আমার বাস। পাঁচরকম কথা পাড়ি, দেখি তাদের মুখ বোজা। জিজ্ঞেসা করতে এদের বাধে। বুঝতে পারি, এরা সব সেই বুড়োদের কালের ছেলে যে কালে বড়োরা কইত কথা আর ছোটোরা থাকত বোবা। জিজ্ঞাসা করবার সাহস নতুন কালের ছেলেদের ; আর বুড়োকালের ছেলেরা সব-কিছু মেনে নেয় ঘাড় গুঁজে।

ছাদের ঘরে এল পিয়ানো। আর এল একালের বার্নিশকরা বৌবাজারের আসবাব। বুকের ছাতি উঠল ফুলে। গরিবের চোখে দেখা দিল হাল-আমলের সস্তা আমিরি।

এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।

দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে একগ্লাস বরফ-দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচিপান।

বৌঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনও তা ফিরিয়ে নেন নি। সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভ'রে।

ছাদটাকে বৌঠাকরুন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিল্পের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ, আশেপাশে চামেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধা করবী দোলনচাঁপা। ছাদ-জখমের কথা মনেই আনেন নি, সবাই ছিলেন খেয়ালি।

প্রায় আসতেন অক্ষয় চৌধুরী। তাঁর গলায় সুর ছিল না সে কথা তিনিও জানতেন, অন্যেরা আরও বেশি জানত। কিন্তু তাঁর গাবার জেদ কিছুতে থামত না। বিশেষ করে বেহাগ রাগিণীতে ছিল তাঁর শখ। চোখ বুজে গাইতেন, যারা শুনত তাদের মুখের ভাব দেখতে পেতেন না। হাতের কাছে আওয়াজওয়ালা কিছু পেলেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে পটাপট শব্দে তাকেই বাঁয়া-তবলার বদলি করে নিতেন।

মলাট-বাঁধানো বই থাকলে ভালোই চলত। ভাবে ভোর মানুষ, তাঁর ছুটির দিনের সঙ্গে কাজের দিনের তফাত বোঝা যেত না।

সন্ধেবেলার সভা যেত ভেঙে। আমি চিরকাল ছিলুম রাত-জাগিয়ে ছেলে। সকলে শুতে যেত, আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম, ব্রহ্মদত্তির চেলা। সমস্ত পাড়া চুপচাপ। চাঁদনি রাতে ছাদের উপর সারি সারি গাছের ছায়া যেন স্বপ্নের আলপনা। ছাদের বাইরে সিসু গাছের মাথাটা বাতাসে দুলে উঠছে, ঝিল্‌মিল্‌ করছে পাতাগুলো। জানি নে কেন সবচেয়ে চোখে পড়ত সামনের গলির ঘুমন্ত বাড়ির ছাদে একটা ঢালু-পিঠ-ওয়ালা বেঁটে চিলেকোঠা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিসের দিকে যেন আঙুল বাড়িয়ে রয়েছে।

রাত একটা হয়, দুটো হয়। সামনের বড়ো রাস্তায় রব ওঠে, 'বলো হরি হরিবোল।'

১১

খাঁচায় পাখি পোষার শখ তখন ঘরে ঘরে ছিল। সবচেয়ে খারাপ লাগত পাড়ার কোনো বাড়ি থেকে পিঁজরেতে-বাঁধা কোকিলের ডাক। বৌঠাকরুন জোগাড় করেছিলেন চীনদেশের এক শ্যামা পাখি। কাপড়ের ঢাকার ভিতর থেকে তার শিস উঠত ফোয়ারার মতো। আরও ছিল নানা জাতের পাখি, তাদের খাঁচাগুলো ঝুলত পশ্চিমের বারান্দায়। রোজ সকালে একজন পোকাওয়ালা পাখিদের খোরাক জোগাত। তার ঝুলি থেকে বেরত ফড়িঙ, ছাতুখোর পাখিদের জন্যে ছাতু।

জ্যোতিদাদা আমার সকল তর্কের জবাব দিতেন। কিন্তু মেয়েদের কাছে এতটা আশা করা যায় না। একবার বৌঠাকরুনের মর্জি হয়েছিল খাঁচায় কাঠবিড়ালি পোষা। আমি বলেছিলুম কাজটা অন্যায় হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন গুরুমশায়গিরি করতে হবে না। এ'কে ঠিক জবাব বলা চলে না। কাজেই কথা-কাটাকাটির বদলে লুকিয়ে দুটি প্রাণীকে ছেড়ে দিতে হল। তার পরেও কিছু কথা শুনেছিলুম, কোনো জবাব করি নি।

আমাদের মধ্যে একটা বাঁধা ঝগড়া ছিল কোনোদিন যার শেষ হল না, সে কথা বলছি।

উমেশ ছিল চালাক লোক। বিলিতি দরজির দোকান থেকে যত-সব ছাঁটাকাটা নানা রঙের রেশমের ফালি জলের দরে কিনে আনত, তার সঙ্গে নেটের টুকরো আর খেলো লেস মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হত। কাগজের প্যাকেট খুলে সাবধানে মেলে ধরত মেয়েদের চোখে, বলত 'এই হচ্ছে আজকের দিনের ফ্যাশন'। ঐ মন্ত্রটার টান মেয়েরা সামলাতে পারত না। আমাকে কী দুঃখ দিত বলতে পারি নে। বারবার

অস্থির হয়ে আপত্তি জানিয়েছি, জবাবে শুনেছি জ্যাঠামি করতে হবে না। আমি বৌঠাকরুনকে জানিয়েছি, এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক ভদ্র, সেকেলে সাদা কালাপেড়ে শাড়ি কিংবা ঢাকাই। আমি ভাবি আজকালকার জর্জেট-জড়ানো বৌদিদিদের রঙ-করা পুতুল-গড়া রূপ দেখে দেওরদের মুখে কি কোনো কথা সরছে না। উমেশের সেলাই-করা ঢাকনি -পরা বৌঠাকরুন যে ছিলেন ভালো। চেহারার উপর এত বেশি জালিয়াতি তখন ছিল না।

তর্কে বৌঠাকরুনের কাছে বরাবর হেরেছি, কেননা তিনি তর্কের জবাব দিতেন না। আর হেরেছি দাবাখেলায়, সে খেলায় তাঁর হাত ছিল পাকা।

জ্যোতিদাদার কথা যখন উঠে পড়েছে তখন তাঁকে ভালো করে চিনিয়ে দিতে আরও কিছু বলার দরকার হবে। শুরু করতে হবে আরও-একটু আগেকার দিনে।

জমিদারির কাজ দেখতে প্রায় তাঁকে যেতে হত শিলাইদহে। একবার যখন সেই দরকারে বেরিয়েছিলেন আমাকেও নিয়েছিলেন সঙ্গে। তখনকার পক্ষে এটা ছিল বেদস্তুর, অর্থাৎ যাকে লোকে বলতে পারত 'বাড়াবাড়ি হচ্ছে'। তিনি নিশ্চয় ভেবে-ছিলেন, ঘর থেকে এই বাইরে চলাচল এ একটা চলতি ক্লাসের মতো। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ছিল আকাশে-বাতাসে-চ'রে-বেড়ানো মন— সেখান থেকে আমি খোরাক পাই আপনা হতেই। তার কিছুকাল পরে জীবনটা যখন আরও উপরের ক্লাসে উঠেছিল আমি মানুষ হচ্ছিলুম এই শিলাইদহে।

পুরোনো নীলকুঠি[1] তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউগাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যাবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। আজ কুঠিয়াল সাহেবের দাবরাব একেবারে থম থম করছে। কোথায় নীলকুঠির যমের দূত সেই দেওয়ান, কোথায় লাঠি-কাঁধে কোমর-বাঁধা পেয়াদার দল, কোথায় লম্বা-টেবিল-পাতা খানার ঘর যেখানে ঘোড়ায় চ'ড়ে সদর থেকে সাহেবরা এসে রাতকে দিন করে দিত— ভোজের সঙ্গে চলত জুড়ি-নৃত্যের ঘূর্ণিপাক, রক্তে ফুটতে থাকত শ্যাম্পেনের নেশা, হতভাগা রায়তদের দোহাই-পাড়া কান্না উপর-ওয়ালাদের কানে পৌঁছত না, সদর জেলখানা পর্যন্ত তাদের শাসনের পথ লম্বা হয়ে চলত। সেদিনকার আর যা-কিছু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, কেবল সত্য হয়ে আছে দুই সাহেবের দুটি গোর। লম্বা লম্বা ঝাউগাছগুলি দোলাদুলি করে বাতাসে, আর

১ তুলনীয় 'জন্মদিনে', ১৯-সংখ্যক কবিতা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ ৬৩

সেদিনকার স্বারভদের নাভি-নাতনিরা কখনো কখনো দুপুররাত্রে দেখতে পায় সাহেবের ভূত বেড়াচ্ছে কুঠিবাড়ির পোড়ো বাগানে।

একলা থাকার মন নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর, যত বড়ো ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি। অজানা ভিন দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। এই সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে পদ্যে। সেগুলো যেন ঝ'রে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফসলের আমের বোল— ঝরেও গেছে।

তখনকার দিনে অল্প বয়সের ছেলে, বিশেষত মেয়ে, যদি অক্ষর গুণে দু ছত্র পদ্য লিখত তা হলে দেশের সমজদাররা ভাবত, এমন যেন আর হয় না, কখনো হবে না।

সে-সব মেয়ে-কবিদের নাম দেখেছি, কাগজে তাদের লেখাও বেরিয়েছে। তার পরে সেই অতি সাবধানে চোদ্দো অক্ষর বাঁচিয়ে লেখা ভালো ভালো কথা আর কাঁচা কাঁচা মিল যেই গেল মিলিয়ে, অমনি তাদের সেই নাম-মোছা পটে আজকালকার মেয়েদের সারি সারি নাম উঠছে ফুটে।

ছেলেদের সাহস মেয়েদের চেয়ে অনেক কম, লজ্জা অনেক বেশি। সেদিন ছোটো বয়সের ছেলে-কবি কবিতা লিখেছে মনে পড়ে না, এক আমি ছাড়া। আমার চেয়ে বড়ো বয়সের এক ভাগনে[১] একদিন বাংলিয়ে দিলেন চোদ্দো অক্ষরের ছাঁচে কথা ঢাললে সেটা জমে ওঠে পদ্যে। স্বয়ং দেখলুম এই জাদুবিদ্যের ব্যাপার। আর হাতে হাতে সেই চোদ্দো অক্ষরের ছাঁদে পদ্মও ফুটল; এমন-কি তার উপরে ভ্রমরও বসবার জায়গা পেল। কবিদের সঙ্গে আমার তফাত গেল ঘুচে, সেই অবধি এই তফাত ঘুচিয়েই চলেছি।

মনে আছে, ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাসে যখন পড়ি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ গোবিন্দবাবু গুজব শুনলেন যে, আমি কবিতা লিখি। আমাকে ফরমাশ করলেন লিখতে, ভাবলেন নর্মাল-স্কুলের নাম উঠবে জ্বলজ্বলিয়ে। লিখতে হল, শোনাতেও হল ক্লাসের ছেলেদের, শুনতে হল যে এ লেখাটা নিশ্চয় চুরি। নিন্দুকরা জানতে পারে নি, তার পরে যখন সেয়ানা হয়েছি তখন ভাব-চুরিতে হাত পাকিয়েছি। কিন্তু এ চোরাই মালগুলো দামি জিনিস।

মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম, তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে, সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউয়ে পদ্মটা

১ জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না। অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন; আত্মীয়রা বললেন, ছেলেটির লেখবার হাত আছে।

বৌঠাকরুনের ব্যবহার ছিল উলটো। কোনোকালে আমি যে লিখিয়ে হব, এ তিনি কিছুতে মানতেন না। কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন, কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না। আমি মন-মরা হয়ে ভাবতুম, তাঁর চেয়ে অনেক নীচের ধাপের মার্কা যদি মিলত তা হলে মেয়েদের সাজ নিয়ে তাঁর খুদে দেওর-কবির অপছন্দ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধত।

জ্যোতিদাদা ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন। বৌঠাকরুনকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল। শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাট্টু ঘোড়া। সে জন্তুটা কম দৌড়বাজ ছিল না। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন রথতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে।[১] সেই এবড়ো-খেবড়ো মাঠে পড়ি-পড়ি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আনতুম। আমি পড়ব না, তাঁর মনে এই জোর ছিল বলেই আমি পড়ি নি। কিছুকাল পরে কলকাতার রাস্তাতেও আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়েছিলেন। সে টাট্টু নয়, বেশ মেজাজি ঘোড়া। একদিন সে আমাকে পিঠে নিয়ে দেউড়ির ভিতর দিয়ে সোজা ছুটে গিয়েছিল উঠোনে যেখানে সে দানা খেত। পরদিন থেকে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

বন্দুক-ছোঁড়া জ্যোতিদাদা অভ্যস্ত করেছিলেন, সে কথা পূর্বেই জানিয়েছি। বাঘ-শিকারের ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে। বিশ্বনাথ শিকারী একদিন খবর দিল, শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে। তখনি বন্দুক বাগিয়ে তিনি তৈরি হলেন। আশ্চর্যের কথা এই, আমাকেও নিলেন সঙ্গে। একটা মুশকিল কিছু ঘটতে পারে, এ যেন তাঁর ভাবনার মধ্যেই ছিল না।

ওস্তাদ শিকারী ছিল বটে বিশ্বনাথ। সে জানত, মাচানের উপর থেকে শিকার করাটা মরদের কাজ নয়। বাঘকে সামনে ডাক দিয়ে লাগাত গুলি। একবারও ফসকায় নি তার তাক।[১]

ঘন জঙ্গল। সেরকম জঙ্গলের ছায়াতে আলোতে বাঘ চোখেই পড়তে চায় না। একটা মোটা বাঁশগাছের গায়ে কঞ্চি কেটে কেটে মইয়ের মতো বানানো হয়েছে। জ্যোতিদাদা উঠলেন বন্দুক হাতে। আমার পায়ে জুতোও নেই, বাঘটা

১ দ্রষ্টব্য ১১-সংখ্যক কবিতা —জন্মদিনে। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড

তাড়া করলে তাকে যে জুতোপেটা করব তারও উপায় ছিল না। বিশ্বনাথ ইশারা করলে। জ্যোতিদাদা অনেকক্ষণ দেখতেই পান না। তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে ঝোপের মধ্যে বাঘের গায়ের একটা দাগ তাঁর চশমাপরা চোখে পড়ল। মারলেন গুলি। দৈবাৎ লাগল সেটা তার শিরদাঁড়ায়। সে আর উঠতে পারল না। কাঠকুটো যা সামনে পায় কামড়ে ধ'রে লেজ আছড়ে ভীষণ গর্জাতে লাগল। ভেবে দেখলে মনে সন্দেহ লাগে। অতক্ষণ ধরে বাঘটা মরবার জন্যে সবুর করে ছিল, সেটা ওদের মেজাজে নেই বলেই জানি। তাকে আগের রাত্রে তার খাবার সঙ্গে ফিকির করে আফিম লাগায় নি তো! এত ঘুম কেন।

আরও একবার বাঘ এসেছিল শিলাইদহের জঙ্গলে। আমরা দুই ভাই যাত্রা করলুম তার খোঁজে, হাতির পিঠে চ'ড়ে। আখের খেত থেকে পট পট করে আখ উপড়িয়ে চিবতে চিবতে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলল হাতি ভারিক্কি চালে। সামনে এসে পড়ল বন। হাঁটু দিয়ে চেপে, শুঁড় দিয়ে টেনে গাছগুলোকে পেড়ে ফেলতে লাগল মাটিতে। তার আগেই বিশ্বনাথের ভাই চামরুর কাছে গল্প শুনেছিলুম, সর্বনেশে ব্যাপার হয় বাঘ যখন লাফ দিয়ে হাতির পিঠে চ'ড়ে থাবা বসিয়ে ধরে। তখন হাতি গাঁ গাঁ শব্দে ছুটতে থাকে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে, পিঠে যারা থাকে গুঁড়ির ধাক্কায় তাদের হাত পা মাথার হিসেব পাওয়া যায় না। সেদিন হাতির উপর চ'ড়ে ব'সে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে ছিল ঐ হাড়গোড়-ভাঙার ছবিটা। ভয় করাটা চেপে রাখলুম লজ্জায়। বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে চাইতে লাগলুম এ দিকে, ও দিকে। যেন বাঘটাকে একবার দেখতে পেলে হয়। ঢুকে পড়ল হাতি ঘন জঙ্গলের মধ্যে। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। মাহুত তাকে চেতিয়ে তোলবার চেষ্টাও করল না। দুই শিকারী প্রাণীর মধ্যে বাঘের 'পরেই তার বিশ্বাস ছিল বেশি। জ্যোতিদাদা বাঘটাকে ঘায়েল করে মরিয়া করে তুলবেন, নিশ্চয় এটাই ছিল তার সবচেয়ে ভাবনার কথা। হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ। যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রওয়ালা ঝড়ের ঝাপটা। আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল -দেখা নজর—এ যে ঘাড়ে-গর্দানে একটা একরাশ মুরদ, অথচ তার ভার নেই যেন। খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুরবেলার রৌদ্রে চলল সে দৌড়ে। কী সুন্দর সহজ চলনের বেগ। মাঠে ফসল ছিল না। ছুটন্ত বাঘকে ভরপুর করে দেখবার জায়গা এই বটে—সেই রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।

আর-একটা কথা বাকি আছে, শুনতে মজা লাগতে পারে। শিলাইদহে মালী

ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত। আমার মাথায় খেয়াল গেল ফুলের রঙিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে।[১] টিপে টিপে যে রসটুকু পাওয়া যায় সে কলমের মুখে উঠতে চায় না। ভাবতে লাগলুম, একটা কল তৈরি করা চাই। ছেঁদাওয়ালা একটা কাঠের বাটি, আর তার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাবার মতো একটা হামান-দিস্তের নোড়া হলেই চলবে। সেটা ঘোরানো যাবে দড়িতে-বাঁধা একটা চাকায়। জ্যোতিদাদাকে দরবার জানালুম। হয়তো মনে মনে তিনি হাসলেন, বাইরে সেটা ধরা পড়ল না। হুকুম করলেন, ছুতোর এল কাঠকোঠ নিয়ে। কল তৈরি হল। ফুলে-ভরা কাঠের বাটিতে দড়িতে-বাঁধা নোড়া যতই ঘোরাতে থাকি ফুল পিষে কাদা হয়ে যায়, রস বেরয় না। জ্যোতিদাদা দেখলেন, ফুলের রস আর কলের চাপে ছন্দ মিলল না। তবু আমার মুখের উপর হেসে উঠলেন না।

জীবনে এই একবার এঞ্জিনিয়ারি করতে নেবেছিলুম। যে যা নয় নিজেকে তাই যখন কেউ ভাবে তার মাথা হেঁট করে দেবার এক দেবতা তৈরি থাকেন, শাস্ত্রে এমন কথা আছে। সেই দেবতা সেদিন আমার এঞ্জিনিয়ারির দিকে কটাক্ষ করেছিলেন, তার পর থেকে যন্ত্রে হাত লাগানো আমার বন্ধ, এমন-কি সেতারে এসরাজেও তার চড়াই নি।

জীবনস্মৃতিতে লিখেছি, ফ্লটিলা কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের নদীতে স্বদেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে কী করে জ্যোতিদাদা নিজেকে ফতুর করে দিলেন। বৌঠাকরুনের মৃত্যু হয়েছে তার আগেই।[২] জ্যোতিদাদা তাঁর তেতালার বাসা ভেঙে চলে গেলেন। শেষকালে বাড়ি বানালেন রাঁচির এক পাহাড়ের উপর।[৩]

১২

এইবার তেতলা ঘরের আর এক পালা আরম্ভ হল আমার সংসার নিয়ে।...

একদিন গোলাবাড়ি, পালকি, আর তেতলার ছাদের খালি ঘরে আমার ছিল যেন বেদের বাসা— কখনো এখানে, কখনো ওখানে। বৌঠাকরুন এলেন ছাদের ঘরে বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এল পিয়ানো, নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল।

১ দ্রষ্টব্য ১৯-সংখ্যক কবিতা —জন্মদিনে। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড

২ ৮ বৈশাখ, ১২৯১

৩ 'শান্তিধাম', রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়ে

পূর্বদিকের চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি খাওয়ার সরঞ্জাম হত সকালে। সেই সময়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর কোনো-একটা নতুন নাটকের প্রথম খসড়া। তার মধ্যে কখনো কখনো কিছু জুড়ে দেবার জন্যে আমাকেও ডাক পড়ত আমার অত্যন্ত কাঁচা হাতের লাইনের জন্যে। ক্রমে রোদ এগিয়ে আসত— কাক-গুলো ডাকাডাকি করত উপরের ছাদে বসে রুটির টুকরোর 'পরে লক্ষ করে। দশটা বাজলে ছায়া যেত ক'য়ে, ছাতটা উঠত তেতে।

দুপুরবেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নীচের তলায় কাছারিতে। বৌঠাকরুন ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে ছড়ানো হত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে-ঠাণ্ডা-করা। সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের রুমাল ঢেকে মোরাদাবাদি খুঞ্চেতে করে জলখাবার বেলা একটা-দুটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।

তখন বঙ্গদর্শনের[১] ধুম লেগেছে ; সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা।

বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলায় কারও ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না ; কেননা আমার একটা গুণ ছিল, আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুন ভালোবাসতেন। তখন বিজুলিপাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বৌঠাকরুনের হাতপাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।

১৩

মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যেতেন হাওয়া বদল করতে গঙ্গার ধারের বাগানে। বিলিতি সওদাগরির ছোঁওয়া লেগে গঙ্গার ধার তখনো জাত খোওয়ায় নি। মুষড়ে যায় নি তার দুই ধারে পাখির বাসা, আকাশের আলোয় লোহার কলের শুঁড়গুলো ফুঁসে দেয় নি কালো নিশ্বাস।

গঙ্গার ধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে, মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ও পারে বনের মাথায়। অনেকবার এইরকম দিনে নিজে গান

১ প্রকাশ ১২৭৯ বৈশাখ [ইং ১৮৭২ এপ্রিল]

তৈরি করেছি, সেদিন তা হল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে, 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।' নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্ধুকটাতে। মনে পড়ে, থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেধে গেছে ডালে-পালায়, ডিঙিনৌকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ ঝপ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর। বৌঠাকরুন ফিরে এলেন; গান শোনালুম তাঁকে; ভালো লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন। তখন আমার বয়স হবে ষোলো কি সতেরো। যা-তা তর্ক নিয়ে কথা-কাটাকাটি তখনো চলে, কিন্তু ঝাঁজ কমে গিয়েছে।

তার কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হল মোরান সাহেবের বাগানে। সেটা রাজবাড়ি বললেই হয়। রঙিন কাঁচের জানলা দেওয়া উঁচুনিচু ঘর, মার্বল পাথরে বাঁধা মেজে, ধাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। ঐখানে রাত জাগবার ঘোর লাগত আমার মনে, সেই সাবরমতী নদীর ধারের পায়চারি[১]র সঙ্গে এখানকার পায়চারির তাল মেলানো চলত। সে বাগান আজ আর নেই, লোহার দাঁত কড়মড়িয়ে তাকে গিলে ফেলেছে ডাণ্ডির কারখানা।

ঐ মোরান-বাগানের কথায় মনে পড়ে এক-একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছ-তলায়। সে রান্নায় মসলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ। মনে পড়ে পইতের সময় বৌঠাকরুন আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিন দিন তার স্বাদে, তার গন্ধে, মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের।

আমার একটা বড়ো মুশকিল ছিল, শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। বাড়ির আর-আর যে-সব ছেলে রোগে পড়তে জানত তারা পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শুধু যে তাঁর সেবা পেত তা নয়, তাঁর সময় জুড়ে বসত। আমার ভাগ যেত কমে।

সেদিনকার সেই তেতালার দিন মিলিয়ে গেল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে। তার পরে আমার এল তেতালার বসতি, আগেকার সঙ্গে এর ঠিক জোড়-লাগানো চলে না।

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি যৌবনের সদর দরজায়। আবার ফিরতে হল সেই ছেলেবেলার সীমানার দিকে।

এবার ষোলো বছর বয়সের হিসাব দিতে হচ্ছে। তার আরম্ভের মুখেই দেখা

১ জীবনস্মৃতির 'আমেদাবাদ' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত —রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড

দিয়েছে ভারতী[১]। আজকাল দেশে চার দিকেই ফুটে ফুটে উঠছে কাগজ বের করবার টগ্‌বগানি। বুঝতে পারি সে নেশার জোর, যখন ফিরে তাকাই সেদিনকার খেপামির দিকে। আমার মতো ছেলে যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল, অথচ সেটা কারও নজরে পড়ল না— এর থেকে জানা যায়, চার দিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল। দেশে একমাত্র পাকা হাতের কাগজ তখন দেখা দিয়েছিল বঙ্গদর্শন। আমাদের এ ছিল কাঁচাপাকা; বড়দাদা[২] যা লিখছেন তা লেখাও যেমন শক্ত বোঝাও তেমনি, আর তারই মধ্যে আমি লিখে বসলুম এক গল্প[৩]— সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন ক'রে খোলে নি।

এইখানে বড়দাদার কথাটা বলে নেবার সময় এল। জ্যোতিদাদার আসর ছিল তেতালার ঘরে, আর বড়দাদার ছিল আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়। এক সময়ে তিনি ডুবেছিলেন আপন-মনে ভারি ভারি তত্ত্বকথা নিয়ে, সে ছিল আমাদের নাগালের বাইরে। যা লিখতেন, যা ভাবতেন, তা শোনাবার লোক ছিল কম। যদি কেউ রাজি হয়ে ধরা দিত তাকে উনি ছাড়তে চাইতেন না, কিংবা সে ওঁকে ছাড়ত না— ওঁর উপর যা দাবি করত সে কেবল তত্ত্বকথা শোনা নিয়ে নয়। একটি সঙ্গী বড়দাদার জুটেছিলেন, তাঁর নাম জানি নে, তাঁকে সবাই ডাকত ফিলজফার ব'লে। অন্য দাদারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন কেবল তাঁর মটনচপের 'পরে লোভ নিয়ে নয়, দিনের পর দিন তাঁর নানা রকমের জরুরি দরকার নিয়ে। দর্শনশাস্ত্র ছাড়া বড়দাদার শখ ছিল গণিতের সমস্যা বানানো। অঙ্কচিহ্নওয়ালা পাতাগুলো দক্ষিণে হাওয়ায় উড়ে বেড়াত বারান্দাময়। বড়দাদা গান গাইতে পারতেন না, বিলিতি বাঁশি বাজাতেন, কিন্তু সে গানের জন্য নয়— অঙ্ক দিয়ে এক-এক রাগিণীতে গানের সুর মেপে নেবার জন্যে। তার পরে এক সময়ে ধরলেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে। তার গোড়ায় শুরু হল ছন্দ বানানো। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিকে বাংলা ভাষার ধ্বনির বাটখারায় ওজন করে করে সাজিয়ে তুলতেন— তার অনেকগুলো রেখেছেন, অনেকগুলি রাখেন নি, ছেঁড়া পাতায় ছড়াছড়ি গেছে। তার পরে কাব্য লিখতে লাগলেন; যত লিখে রাখতেন তার চেয়ে ফেলে দিতেন অনেক বেশি। যা লিখতেন তা সহজে পছন্দ হত না। তাঁর সেই-সব ফেলাছড়া লাইনগুলো কুড়িয়ে রাখবার মতো বুদ্ধি আমাদের ছিল না। যেমন যেমন

১ প্রকাশ ১২৮৪ শ্রাবণ [ইং ১৮৭৭]

২ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ভিখারিনী' —ভারতী, ১২৮৪ শ্রাবণ-ভাদ্র

লিখতেন শুনিয়ে যেতেন, শোনবার লোক জমত তাঁর চার দিকে। আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই মেতে গিয়েছিলুম এই কাব্যের রসে। পড়ার মাঝে মাঝে উচ্চহাসি উঠত উথলিয়ে। তাঁর হাসি ছিল আকাশ-ভরা; সেই হাসির ঝোঁকের মাথায় কেউ যদি হাতের কাছে থাকত তাকে চাপড়িয়ে অস্থির করে তুলতেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাণের একটি ঝরনাতলা ছিল এই দক্ষিণের বারান্দা, শুকিয়ে গেল এর স্রোত, বড়দাদা চলে গেলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমে। আমার কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ে, ঐ বারান্দার সামনেকার বাগানে মন-কেমন-করা শরতের রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে, আমি নতুন গান তৈরি করে গাচ্ছি 'আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়'। আর মনে আসে একটি তপ্ত দিনের ঝাঁ ঝাঁ দুই প্রহরের গান 'হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-সনে'।

বড়দাদার আর-একটি অভ্যাস ছিল চোখে পড়বার মতো, সে তাঁর সাঁতার কাটা। পুকুরে নেমে কিছু না হবে তো পঞ্চাশ বার এপার-ওপার করতেন। পেনেটির বাগানে যখন ছিলেন তখন গঙ্গা পেরিয়ে চলে যেতেন অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁর দেখাদেখি সাঁতার আমরাও শিখেছি ছেলেবেলা থেকে। শেখা শুরু করেছিলুম নিজে নিজেই। পায়জামা ভিজিয়ে নিয়ে টেনে টেনে ভরে তুলতুম বাতাসে। জলে নামলেই সেটা কোমরের চার দিকে হাওয়ার কোমরবন্দর মতো ফুলে উঠত। তার পরে আর ডোববার জো থাকত না। বড়োবয়সে যখন শিলাইদহের চরে থাকতুম তখন একবার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পেরিয়েছিলুম। কথাটা শুনতে যতটা তাক-লাগানো আসলে ততটা নয়। মাঝে মাঝে চরা-পড়া সেই পদ্মার টান ছিল না তাকে সমীহ করবার মতো; তবু ডাঙার লোকের কাছে ভয়-লাগানো গল্পটা শোনাবার মতো বটে, শুনিয়েওছি অনেকবার। ছেলেবেলায় যখন গিয়েছি ড্যালহৌসি পাহাড়ে, পিতৃদেব আমাকে একা-একা ঘুরে বেড়াতে কখনো মানা করেন নি। পায়ে-চলা রাস্তায় আমি ফলাওয়ালা লাঠি হাতে এক পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ে উঠে যেতুম। তার সকলের চেয়ে মজা ছিল মনে মনে ভয় বানিয়ে তোলা। একদিন ওৎরাই পথে যেতে যেতে পা পড়েছিল গাছের তলায় রাশ-করা শুকনো পাতার উপর। পা একটু হড়কে যেতেই লাঠি দিয়ে ঠেকিয়ে দিলুম। কিন্তু না ঠেকাতেও তো পারতুম। ঢালু পাহাড়ে গড়াতে গড়াতে অনেকদূর নীচে ঝরনার মধ্যে পড়তে কতক্ষণ লাগত। কী যে হতে পারত সেটা এতখানি করে মা'র কাছে বলেছি। তা ছাড়া ঘন পাইনের বনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ভালুকের সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারত, এও একটা শোনাবার মতো জিনিস ছিল বটে। ঘটবার মতো কিছুই ঘটে নি, কাজেই অঘটন সব জমিয়েছিলুম মনে।

আমার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পার হওয়ার গল্পও এ-সব গল্পের থেকে খুব বেশি তফাত নয়।

সতেরো বছরে পড়লুম যখন, ভারতীর সম্পাদকি বৈঠক থেকে আমাকে সরে যেতে হল।

এই সময়ে আমার বিলেত যাওয়া ঠিক হয়েছে। আর সেই সঙ্গে পরামর্শ হল, জাহাজে চড়বার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিলিতি চালচলনের গোড়াপত্তন করে নিতে হবে। তিনি তখন জজিয়তি করছেন আমেদাবাদে; মেজবৌঠাকরুন আর তাঁর ছেলেমেয়ে আছেন ইংলণ্ডে, ফর্লো নিয়ে মেজদাদা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন এই অপেক্ষায়।

শিকড়সুদ্ধ আমাকে উপড়ে নিয়ে আসা হল এক খেত থেকে আর-এক খেতে। নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু হল। গোড়াতে সব-তাতেই খটকা দিতে লাগল লজ্জা। নতুন লোকের সঙ্গে আলাপে নিজের মানরক্ষা করব কী করে এই ছিল ভাবনা। যে অচেনা সংসারের সঙ্গে মাখামাখিও সহজ ছিল না, আর পথ ছিল না যাকে এড়িয়ে যাওয়ার, আমার মতো ছেলের মন সেখানে কেবলই হুঁচট খেয়ে মরত।

আমেদাবাদে একটা পুরনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে। দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে; বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভূতে-পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল, সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্ছার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিআনার।

কলকাতায় আমরা মানুষ, সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখি নি। আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলন্তি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ'[১]-এর গল্পের।

সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবৎখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে আট প্রহরের রাগিণীতে, রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝক্‌ঝকিয়ে।

১ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রিশ খণ্ড

বাদশাহি দরবারের চার দিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুস্‌ফাস্‌। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাবজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝন্‌ঝনি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে-যাওয়া গল্পের মতো; তার চার দিকে কোথাও নেই সেই রঙ, নেই সেই-সব ধ্বনি— শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি।

পুরনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের করে; তার মাথায় খুলিটা আছে, মুকুট নেই। তার উপরে খোলস মুখোস পরিয়ে একটা পুরোপুরি মূর্তি মনের জাদুঘরে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি তা বললে বেশি বলা হবে। চালচিত্তির খাড়া করে একটা খসড়া মনের সামনে দাঁড় করিয়েছিলুম, সেটা আমার খেয়ালেরই খেলনা। কিছু মনে থাকে, অনেকখানি ভুলে যাই ব'লে এইরকম জোড়াতাড়া দেওয়া সহজ হয়। আশি বছর পরে এসে নিজেরই যে-একখানা রূপ সামনে আজ দেখা দিয়েছে আসলের সঙ্গে তার সবটা লাইনে লাইনে মেলে না, অনেকখানি সে মনগড়া।

এখানে কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন, বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেইরকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির কোনো-একটি এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে[১] ঝক্‌ঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলেম তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেন নি, মেনে নিয়েছিলেন। কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে— সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে; শুনলেন সেটা ভোর-বেলাকার ভৈরবী সুরে; বললেন, 'কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।' এর থেকে বোঝা যাবে, মেয়েরা যাকে আদর জানাতে চায় তার কথা একটু মধু মিশিয়ে বাড়িয়েই বলে, সেটা খুশি ছড়িয়ে দেবার জন্যেই।

১ অন্নপূর্ণা তরখড়কর বা আনা তরখড়, ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ'এর কন্যা

মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকত। যেমন, একবার আমাকে বিশেষ ক'রে বলেছিলেন, 'একটা কথা আমার রাখতেই হবে, তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না, তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।' তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত রাখা হয় নি, সে কথা সকলেরই জানা আছে। আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে-থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।

১৪

যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল— সেটাকেই বলি ছেলে-বেলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই। তার মালমসলা নিজের মধ্যেই জমা ছিল, আর কিছু কিছু ছিল ঘরের হাওয়া আর ঘরের লোকের হাতে। অনেক সময়ে এইখানেই গড়নের কাজ থেমে যায়। এর উপরে লেখাপড়া-শিক্ষার কারখানাঘরে যাদের বিশেষ রকম গড়ন-পিটন ঘটে তারা বাজারে বিশেষ মার্কার দাম পায়।

আমি দৈবক্রমে ঐ কারখানাঘরের প্রায় সমস্তটাই এড়িয়ে গিয়েছিলুম। মাস্টার পণ্ডিত যাঁদের বিশেষ করে রাখা হয়েছিল তাঁরা আমাকে তরিয়ে দেবার কাজে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায় ছিলেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মশায়ের পুত্র, বি. এ. পাস-করা। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, লেখাপড়া-শেখার বাঁধা রাস্তায় এ ছেলেকে চালানো যাবে না। মুশকিল এই যে, পাস-করা ভদ্রলোকের ছাঁচে ছেলেদের ঢালাই করতেই হবে, এ কথাটা তখনকার দিনের মুরুব্বিরা তেমন জোরের সঙ্গে ভাবেন নি। সেকালে কলেজি বিদ্যার একই বেড়াজালে ধনী অধনী সকলকেই টেনে আনবার তাগিদ ছিল না। আমাদের বংশে তখন ধন ছিল না কিন্তু নাম ছিল, তাই

রীতিটা টিঁকে গিয়েছিল। লেখাপড়ার গরজটা ছিল ঢিলে। ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস থেকে এক সময়ে আমাদের চালান করা হয়েছিল ডিক্রুজ সাহেবের বেঙ্গল একাডেমিতে। আর-কিছু না হোক, ভদ্রতা রক্ষার মতো ইংরেজি বচন সড়গড় হবে, অভিভাবকদের এই ছিল আশা। ল্যাটিন শেখার ক্লাসে আমি ছিলুম বোবা আর কালা, সকলরকম এক্সেসাইজের খাতাই থাকত বিধবার থান কাপড়ের মতো আগাগোড়াই সাদা। আমার পড়া না করবার অদ্ভুত জেদ দেখে ক্লাসের মাস্টার ডিক্রুজ সাহেবের কাছে নালিশ করেছিলেন। ডিক্রুজ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পড়াশোনা করবার জন্যে আমরা জন্মাই নি, মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে দেবার জন্যেই পৃথিবীতে আমাদের আসা। জ্ঞানবাবু কতকটা সেইরকমই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি একটা পথ কেটেছিলেন। আমাকে আগাগোড়া মুখস্থ করিয়ে দিলেন কুমারসম্ভব। ঘরে বন্ধ রেখে আমাকে দিয়ে ম্যাকবেথ তর্জমা করিয়ে নিলেন। এ দিকে রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশায় পড়িয়ে দিলেন শকুন্তলা। ক্লাসের পড়ার বাইরে আমাকে দিয়েছিলেন ছেড়ে, কিছু ফল পেয়েছিলেন। আমার ছেলেবয়সের মন গড়বার এই ছিল মালমসলা, আর ছিল বাংলা বই যা তা, তার বাছবিচার ছিল না।

উঠলুম বিলেতে গিয়ে, জীবনগঠনে আরম্ভ হল বিদিশি কারিগরি— কেমিস্ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি। এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমত নিয়মে কিছু বিদ্যা শিখে নিতে; কিছু কিছু চেষ্টা হতে লাগল, কিন্তু হয়ে উঠল না। মেজবোঠান ছিলেন, ছিল তাঁর ছেলেমেয়ে, জড়িয়ে রইলুম আপন ঘরের জালে। ইস্কুলমহলের আশেপাশে ঘুরেছি; বাড়িতে মাস্টার পড়িয়েছেন, দিয়েছি ফাঁকি। যেটুকু আদায় করেছি সেটা মানুষের কাছাকাছি থাকার পাওনা। নানা দিক থেকে বিলেতের আবহাওয়ার কাজ চলতে লাগল মনের উপর।

পালিত সাহেব[১] আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন ঘরের বাঁধন থেকে। একটি ডাক্তারের বাড়িতে বাসা নিলুম। তাঁরা আমাকে ভুলিয়ে দিলেন যে, বিদেশে এসেছি। মিসেস স্কট আমাকে যে স্নেহ করতেন সে একেবারে খাঁটি। আমার জন্যে সকল সময়েই মায়ের মতো ভাবনা ছিল তাঁর মনে। আমি তখন লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে ভরতি হয়েছি, ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি মরলি। সে তো পড়ার বই থেকে চালান দেওয়া শুকনো মাল নয়। সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর গলার সুরে প্রাণ পেয়ে উঠত— আমাদের সেই মরমে পৌঁছত যেখানে প্রাণ চায় আপন

১ তারকনাথ পালিত

খোরাক, মাঝখানে রসের কিছুই লোকসান হত না। বাড়িতে এসে ক্ল্যারেণ্ডন প্রেসের বইগুলি থেকে পড়বার বিষয় উলটে-পালটে বুঝে নিতুম। অর্থাৎ নিজের মাস্টারি করার কাজটা নিজেই নিয়েছিলুম। নাহক থেকে থেকে মিসেস স্কট মনে করতেন, আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তিনি জানতেন না, ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে ব্যামো হবার গেট বন্ধ। প্রতিদিন ভোরবেলায় বরফ-গলা জলে স্নান করেছি। তখনকার ডাক্তারি মতে এরকম অনিয়মে বেঁচে থাকাটা যেন শাস্ত্র ডিঙিয়ে চলা।

আমি য়ুনিভর্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র। কিন্তু আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মালমসলা। তিন মাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধেবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পালা ক'রে কাব্যনাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন। বিলেতে গেলেম, ব্যারিস্টর হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত মেলানো— আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।

—

সভ্যতার সংকট

সভ্যতার সংকট

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে ; সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্রপরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে ; নিয়তই আলোচনা চলত সেক্স্‌পিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়্‌রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচারপ্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, সেইসময় জন্‌ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ

পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে-একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

'সিভিলিজেশন', যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত— তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম— সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক-শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব-আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।

যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কিরকম সম্পদ্‌বান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য শাসনের রূপ। আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়— সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল— দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না; তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে— এক ইংরেজ, আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী ক'রে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্ন্‌মেণ্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এইরকম গভর্ন্‌মেণ্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার

শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতাসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটে নি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ— সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারে নি। এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল।

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল। পরে এক সময়ে স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্মেণ্টের তলায় ইংলণ্ড কিরকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয় নি, তবু য়ুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল। সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে।

আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত-শাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে এণ্ড্রুজের নাম করতে পারি; তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃস্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণবয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলেম, আমার শেষবয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক-মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি এঁদের নিকটতম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানবজাতির বন্ধু বলে মান্য করি। এঁদের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে, ইংরেজের মহত্ত্বকে এঁরা সকলপ্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তা হলে পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে

আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

এমনসময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৪৮

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে মুদ্রিত হইল।]

'ছড়া' ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইলেও গ্রন্থটির মুদ্রণ তাঁহার জীবদ্দশাতেই শুরু হইয়াছিল।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এক পাঠসভায়, এরূপ "নূতন কবিতা" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর ছাত্রদের যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অনুলিপি ১৩৪৭ বৈশাখের প্রবাসীতে 'নূতন কবিতা' নামে মুদ্রিত হয়; উক্ত সংখ্যার ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই কবিতাগুলির ভাষা ও ছন্দ প্রসঙ্গে 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থের ভূমিকাটিও (রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড) স্মরণযোগ্য।

প্রথম কবিতার একটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পাঠ 'শনিবারের চিঠি'তে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়। কবিতাটির উক্ত পূর্বতন পাঠ এখানে সংকলিত হইল—

ছড়া

সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।
মনিব মিঞা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য।
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজে রে ডুগ্‌ডুগি—
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগ্‌বুগি।

রামছাগলের মোটা গলার ভ্যাভ্যা রবের ডাকে
সুড়্‌সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে
বাতাস জুড়ে ঘন ঘন কোদাল যেন পাড়ে।
দত্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া
আঁৎকে উঠে কাঁখের থেকে বৌ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান,
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।

হাঁচির ধাক্কা এতখানি, এটা গুজব মিথ্যে—
এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধাঁধা। রাগল অপর পক্ষে ;
বললে, 'ফিজিক্‌স্‌ পড়ে কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে।
অন্য দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ সে।'
এই নিয়ে দুই দলে মিলে ইঁট পাটকেল ছোঁড়া—
হায় রে কারও ভাঙল কপাল, কেউ বা হল খোঁড়া।
গোলদিঘি লালদিঘি জুড়ে বীরপুরুষের বড়াই—
সমুদ্দুরের এ পারেতে এরেই বলে লড়াই।
সিন্ধুপারে মৃত্যুদূতের চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।
সত্য হোক বা আজগুবি হোক— আদমদিঘির পাড়ে
বাঁদর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে।
ছেলেরা সব হাততালি দেয়, বাজে রে ডুগ্‌ডুগি—
গভীর জলে কাংলা খেলায়, জল ওঠে বুগ্‌বুগি।

—শনিবারের চিঠি, ১৩৪৮ ভাদ্র, পৃ ৫৯৩

কবির হাতে লেখা, 'ছড়া'র পঞ্চম কবিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। নিম্নে উহা সংকলিত হইল—

চলচ্চিত্র

মাথার থেকে ধানী রঙের ওড়নাখানা সরে যায়,
চীনের টবে হাস্‌নুহানার গন্ধে বাতাস ভরে যায়।
তিনটে পাঠান মালী আছে নবাবজাদার বাগানে,
দুয়ারে তার ডালকুত্তো চীৎকারে রাত-জাগানে।
ধানশ্রীতে সানাই বাজে কুঞ্জবাবুর ফটকে,
দেউড়িতে ভিড় জমে গেছে নাটক দেখার চটকে।
কোমর-ঘেরা আঁচলখানা, হাতে পানের কৌটা,
ঘোষপাড়াতে হন্‌হনিয়ে চলে নাপিত-বউটা।

গাছে চড়ে রাখাল ছোঁড়া জোগায় কাঁচা সুপুরি,
দুবেলা পান বাঁধা আছে, আরো আছে উপুরি।
সের পঁচিশেক কদমা ছিল কলুবুড়ির ধামাতে
জলের মধ্যে উলটে গেল ঘাটের ধারে নামাতে।
মাছ এল তাই কাৎলাপাড়া খয়রাহাটি ঝেঁটিয়ে,
মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে পাঁকের তলা ঘেঁটিয়ে।
চিনির পানা খেয়ে খুশি, ডিগবাজি খায় কাৎলা—
চাঁদা মাছের চ্যাপটা জঠর রইল না আর পাৎলা।
শেষে দেখি ইলিশ মাছের মিষ্টিতে আর রুচি নাই,
চিতল মাছের মুখটা দেখেই প্রশ্ন তারে পুছি নাই।
ননদকে ভাজ বললে, তুমি মিথ্যে এ মাছ কোট, ভাই,
রাঁধতে গিয়ে দেখি এ যে মিঠাই-গজার ছোটো ভাই।

রোদের তাপে হাওয়া কাঁপে, মাঠের বালি তেতে যায়।
পাকুড়তলার ঘাটে গোরু দিঘিতে জল খেতে যায়।
ডিঙি চলে ধিকি ধিকি, নদীর ধারা ঝিহি—
দুপুর-রোদে আকাশে চিল ডাক দিয়ে যায় চিঁ হি।
লখা চলে ছাতা মাথায় গৌরী কনের বর—
ড্যাং ড্যাডাড্যাং বাদ্যি বাজে, চড়কডাঙায় ঘর।

হাঁটুজলে পার হয়ে যায় মরা নদীর সোঁতা,
পাড়ির কাছে পাঁকে ডিঙি আধখানা রয় পোঁতা।
এনামেলের বাসন-ভরা চলেছে এক বাঁকা,
কামার পিটোয় ঝুম্‌ঝুমিয়ে গোরুর গাড়ির চাকা।
মাঠের পারে ধক্‌ধকিয়ে চল্‌তি গাড়ির ধোঁওয়া
আকাশ বেয়ে ছেঁটে চলে কালো বাঘের রোঁওয়া।
কাঁসারিটা বাজিয়ে কাঁসা জাগায় গলিটাকে,
কুকুরগুলোর অসহ্য হয়— আর্তনাদে ডাকে।
ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে বসে আছেন কল্লে,
মোচার ঘণ্ট বানাতে চান কোন্ মানুষের জন্যে।

গামলা চেটে পরখ করে গাইটা দড়ি-বাঁধা,
উঠোনের এক কোণে জমা কয়লাগুঁড়োর গাদা।
ভালুক নাচের ডুগ্‌ডুগি ওই বাজছে ও পাড়াতে,
কোন্‌-দিশী ওই বেদের মেয়ে নাচায় লাঠি হাতে।
অশথতলায় পাটল গোরু আরামে চোখ বোজে,
ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায় কচি ঘাসের খোঁজে।
হঠাৎ কখন বাদুলে মেঘ জুটল দলে দলে,
পশলা কয়েক বৃষ্টি হতেই মাঠ ভাসালো জলে।
মাথায় তুলে কচুর পাতা সাঁওতালি সব মেয়ে
উচ্চহাসির রোল তুলে যায় গাঁয়ের পথে ধেয়ে।
মাথায় চাদর বেঁধে নিয়ে হাট ভেঙে যায় হাটুরে,
ভিজে কাঠের আঁটি বেঁধে চলছে ছুটে কাঠুরে।

বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে লক্‌লকি,
বাঁশের পাতা চমকে ওঠে ঝক্‌ঝকি।
চড়কডাঙায় ঢাক বাজে ওই ড্যাড্যাং ড্যাং।
মাঠে মাঠে মক্‌মকিয়ে ডাকে ব্যাঙ।

২৭।৩।১৯৪০

—সঞ্চয়িতা, ১৩৫০, পৃ ৮১১

সপ্তম কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক "২১।১১।৩৯" তারিখে অঙ্কিত ও "সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি" কবিকৃত এই মন্তব্য-সংবলিত একটি কৌতুকচিত্র-সহ 'অবচেতনার অবদান' নামে ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রথম মুদ্রিত হয়। কবিতাটির মুখবন্ধ-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি বাক্য উক্ত মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল—

অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।

—শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৫

'ছড়া'র অন্যান্য কয়েকটি কবিতার সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

গ্রন্থে সংখ্যা	পত্রিকায় শিরোনাম	পত্রিকা	কাল
৩	পরিস্থিতি	প্রবাসী	১৩৪৭ বৈশাখ
৪	মামলা	প্রবাসী	১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
৫	চলচ্চিত্র	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৩৪৭ শারদীয়া
৬	শ্রাদ্ধ	প্রবাসী	১৩৪৬ চৈত্র
৯	রবিবারী সংস্করণ	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪৭ বৈশাখ

শেষ লেখা

'শেষ লেখা' রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়।

এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রচিত সর্বশেষ কবিতাগুলি সংকলিত হইয়াছে। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নে মুদ্রিত হইল—

এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই।

'শেষ লেখা'র কয়েকটি কবিতা তাঁহার স্বহস্তলিখিত; অনেকগুলি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত, নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা সেইগুলি লিখিয়া লইতেন, পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অনুমতি দিতেন।

'সমুখে শান্তি-পারাবার' গানটি 'ডাকঘর' নাটিকার অভিনয়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। এই অভিনয়ের সংকল্প কার্যে পরিণত হয় নাই; গানটি তাঁহার দেহান্তের পর গীত হয়, পূজনীয় পিতৃদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনুসারে ইহা তাঁহার পরলোকযাত্রার পর (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও ৩২শে শ্রাবণ শ্রাদ্ধবাসরে শান্তিনিকেতনে গীত হয়।

ভ্রমক্রমে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে 'সমুখে শান্তি-পারাবার' গানটির ষষ্ঠ পংক্তিতে 'জ্যোতি ধ্রুবতারকার' স্থলে 'জ্যোতির ধ্রুবতারকা' পাঠ এবং 'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে' কবিতাটির চতুর্থ পংক্তিতে 'কষ্টের বিকৃত ভান' স্থলে 'কষ্টের বিকৃত ভাল' পাঠ ছাপা হইয়াছে। প্রথম ভ্রমটি শ্রীনলিনীকান্ত সরকার সর্বপ্রথম অনুমান করেন ও এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

'বিবাহের পঞ্চম বরষে' কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর বিবাহের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত।

'শুভ জন্মদিবসের দানের উৎসবে' কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রচিত।

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে' কবিতাটি তিনি মুখে মুখে বলিয়াছিলেন এবং পরে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' কবিতাটিও এইরূপ মুখে মুখে রচিত, কিন্তু এটি সংশোধন করিবার অবসর ও সুযোগ তাঁহার হয় নাই।

—বিজ্ঞপ্তি, শেষ লেখা

'শেষ লেখা'র যে-সকল কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

গ্রন্থে সংখ্যা	পত্রিকার শিরোনাম	পত্রিকার নাম	কাল
১		বিশ্বভারতী নিউজ	১৯৪১ অগস্ট
২	অনন্ত আমি	প্রবাসী	১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ[১]
৪	শূন্য চৌকি	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪৮ বৈশাখ
৬		প্রবাসী	১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ[২]
৭	জীবন	প্রবাসী	১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ
৮	পঞ্চম বার্ষিকী	প্রবাসী	১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ
৯	ধূলি	প্রবাসী	১৩৪৮ আষাঢ়
১০		প্রবাসী	১৩৪৮ শ্রাবণ[৩]
১১	কঠিনেরে ভালোবাসিলাম	জয়শ্রী	১৩৪৮ আষাঢ়
১৪	রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবিতা	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৩৪৮ শ্রাবণ ২৪

৪ ও ৫ -সংখ্যক কবিতায় উল্লিখিত "চৌকি" বা "আসনখানি" প্রসঙ্গে শ্রীপ্রতিমা ঠাকুরের 'নির্বাণ' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ প্রণিধানযোগ্য বিবেচনায় উদ্‌ধৃত হইল—

এই অসুখের সময় যে চৌকিতে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] সব সময়ে বসতেন তার একটু ইতিহাস এখানে লিখলে বোধ হয় অবান্তর হবে না। তিনি যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে যান[৪] [ইং ১৯২৪ সাল] সেই সময় সেখানকার প্রসিদ্ধ লেখিকা ম্যাডাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্প'র তিনি অতিথি হন, ইনি বাবামশায়ের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।··· আমেরিকায় শরীর খারাপ হতে বাবামশায় দেশে চলে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।··· অনেক হাঙ্গামা ক'রে জাহাজ তো ঠিক হল, ভিক্টোরিয়া Cabin de luxe রিজার্ভ করে দিলেন পাছে বাবামশায়ের সমুদ্রপথে কোনো কষ্ট বা অসুবিধে হয়। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট

১ প্রবাসী অনুসারে কবিতাটির বাংলা রচনা-তারিখ ২৫ বৈশাখ, ১৩৪৭।

২ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের উপসংহার-স্বরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল।

৩ কবিতাটি প্রবাসী অনুসারে "শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, আই. সি. এস্.-কে বাঁকুড়ায় প্রেরিত।"

৪ দ্রষ্টব্য 'যাত্রী'র গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড।

৫ কবি ইঁহার বাংলা নামকরণ করিয়াছিলেন, বিজয়া। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থটি সেই নামে ইঁহাকেই উৎসর্গীকৃত। রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

হতে না পেরে তাঁর নিজের ড্রইংরুমের একখানি আরাম-চেয়ার জাহাজে তুলে দিলেন।... সেই চৌকিখানি সেবার নানা দেশ ঘুরে অবশেষে উত্তরায়ণে পৌঁচেছিল। অনেকদিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেন নি, আমাদের কাছেই পড়ে ছিল। আজ আবার ব্যামোর মধ্যে দেখলুম ঐ চৌকিখানিতে বসা তিনি পছন্দ করছেন, সমস্ত দিনই প্রায় ঘুম বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর বসে থাকতেন।

—নির্বাণ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৫৯-৬০

চৌকিখানি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

১৫-সংখ্যক কবিতাটি ১৩৪৮ সালের ৩২ শ্রাবণ তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমে 'আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসর' উপলক্ষ্যে প্রথম মুদ্রিত হয় ও শ্রাদ্ধের 'অনুষ্ঠান পদ্ধতি'র সহিত সর্বসাধারণে বিতরিত হয়। উক্ত মুদ্রিত পত্রীর পাদটীকা অংশ প্রাসঙ্গিকবোধে নিম্নে মুদ্রিত হইল—

বিগত ৩০শে জুলাই, ১৯৪১ (১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪৮), বুধবার, প্রাতে সাড়ে নয় ঘটিকায় অস্ত্রোপচারের অব্যবহিত পূর্বে গুরুদেব এই কবিতাটি মুখে মুখে রচনা করেন, ইহা পরিমার্জিত করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। ইহাই তাঁহার শেষ রচনা।

মুক্তির উপায়

'মুক্তির উপায়' নাটকটি 'অলকা' মাসিক পত্রের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতে (১৩৪৫ আশ্বিন) মুদ্রিত হইয়াছিল, গ্রন্থাকারে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

গল্পগুচ্ছের 'মুক্তির উপায়' গল্পটি অবলম্বনে নাটকটি রচিত। এই গল্পটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষোড়শ খণ্ডে মুদ্রিত আছে।

লিপিকা

'লিপিকা' ১৩২৯ [ইং ১৯২২ অগস্ট] সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫২ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত সংস্করণে ১৩২৭ বৈশাখের ভারতী হইতে একটি নূতন রচনা সংকলিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে লিপিকার শেষে সংযোজনরূপে উহা মুদ্রিত হইল।

লিপিকার সমুদয় রচনা ১৩২৪-২৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার একটি সূচী নিম্নে দেওয়া হইল—

রচনার নাম	পত্রিকা	কাল
তোতা-কাহিনী	সবুজপত্র	১৩২৪ মাঘ
স্বর্গ-মর্ত	সবুজপত্র	১৩২৫ ফাল্গুন

রচনার নাম	পত্রিকা	কাল
ঘোড়া[১]	সবুজপত্র	১৩২৬ বৈশাখ
প্রথম শোক[২]	সবুজপত্র	১৩২৬ আষাঢ়
কর্তার ভূত	প্রবাসী	১৩২৬ শ্রাবণ
অস্পষ্ট[৩]	সবুজপত্র	১৩২৬ শ্রাবণ
বাণী[৪]	সবুজপত্র	১৩২৬ ভাদ্র
পায়ে চলার পথ	প্রবাসী	১৩২৬ আশ্বিন
প্রশ্ন	ভারতী	১৩২৬ আশ্বিন
মেঘলা দিনে[৫]	ভারতী	১৩২৬ আশ্বিন
পুরোনো বাড়ি	মানসী ও মর্মবাণী	১৩২৬ আশ্বিন
আগমনী	আগমনী	১৩২৬ মহালয়া
মেঘদূত	প্রবাসী	১৩২৬ কার্তিক
বাঁশি	সবুজপত্র	১৩২৬ কার্তিক
কৃতঘ্ন শোক	ভারতী	১৩২৬ কার্তিক
সতেরো বছর	ভারতী	১৩২৬ কার্তিক
সন্ধ্যা ও প্রভাত	মানসী ও মর্মবাণী	১৩২৬ কার্তিক
একটি চাউনি	প্রবাসী	১৩২৬ অগ্রহায়ণ
একটি দিন	প্রবাসী	১৩২৬ অগ্রহায়ণ
গলি[৬]	সবুজপত্র	১৩২৬ অগ্রহায়ণ
সওগাত	শান্তিনিকেতন	১৩২৬ পৌষ
মুক্তি	শান্তিনিকেতন	১৩২৬ পৌষ
প্রাণমন[৭]	সবুজপত্র	১৩২৬ ফাল্গুন
গল্প[৮]	প্রবাসী	১৩২৭ বৈশাখ
রথযাত্রা	অঙ্কুর	১৩২৭ বৈশাখ
কণিকা	ভারতী	১৩২৭ বৈশাখ
সুয়োরানীর সাধ	পার্বণী	১৩২৭ আশ্বিন
নতুন পুতুল	প্রবাসী	১৩২৮ ভাদ্র
নামের খেলা	মোসলেম ভারত	১৩২৮ ভাদ্র
পট	সবুজপত্র	১৩২৮ ভাদ্র
রাজপুত্তুর	ভারতী	১৩২৮ আশ্বিন

রচনার নাম	পত্রিকা	কাল
ভুল স্বর্গ	প্রবাসী	১৩২৮ কার্তিক
মীনু	ভারতী	১৩২৮ কার্তিক
সিদ্ধি	সবুজপত্র	১৩২৮ মাঘ-ফাল্গুন
বিদূষক	ভারতী	১৩২৯ বৈশাখ
উপসংহার	ভারতী	১৩২৯ বৈশাখ
পরীর পরিচয়	বঙ্গবাণী	১৩২৯ বৈশাখ
প্রথম চিঠি	শান্তিনিকেতন	১৩২৯ বৈশাখ
পুনরাবৃত্তি	প্রবাসী	১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ

অঙ্ক-চিহ্নিত রচনাগুলির পত্রিকায়-মুদ্রিত শিরোনাম: ১ মুক্তির ইতিহাস ২ কথিকা ৩ কথিকা ৪ কথিকা ৫ অকমর্তা ৬ কথিকা ৭ আমার কথা ৮ গল্প বল।

রবীন্দ্রনাথের অন্য বহু রচনায় যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি সাময়িকের ও পুস্তকের পাঠে বহু স্থলে মিল নাই। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, 'মেঘলা দিনে' ও 'প্রাণমন' লিপিকায় পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে 'মুক্তি' কথিকাটির লিপিকায় গৃহীত পাঠ পূর্ববর্তী পাঠ হইতে সংস্কৃত ও সংক্ষিপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'লিপিকা'য় প্রথম তিনি বাংলা গদ্যকবিতা লিখিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি— বোধকরি ভীরুতাই তার কারণ।" লিপিকার প্রথম ভাগের অধিকাংশ রচনাই উক্ত বক্তব্যের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। লিপিকার প্রথম মুদ্রণকালে ঐরূপ রচনায় বাক্যের মাঝে মাঝে ছন্দের বিরামস্থলগুলিতে বেশি ফাঁক দেখানো হইয়াছিল। গ্রন্থে সংকলনের পূর্বে, লিপিকার একটি রচনার বাক্যাবলীকে আবৃত্তির ছন্দ-অনুযায়ী ভাঙিয়া সাজানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভারতীতে। এই স্থলে উহা যথাযথ উদ্ধৃত করা গেল—

প্রশ্ন

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি— গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ,— একলা গলির উপরকার জান্‌লার ধারে,

কি ভাবচে তা সে আপনি জানেনা।

সকালের রৌদ্র সামনের বাড়ির নীম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে;

কাঁচা-আমওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে; খোকা জিজ্ঞাসা করলে "মা কোথায়?"

বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বল্লে, "স্বর্গে।"

সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ,

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠ্‌ছে।

দুয়ারে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড় টিক্‌টিকি।

সাম্‌নে খোলা ছাদ, কখন্‌ খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।

চারদিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারাওয়ালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্চে।

উলঙ্গগায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করচে, "কোথায় স্বর্গের রাস্তা?"

আকাশে তার কোনো সাড়া নেই;

কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

—ভারতী, ১৩২৬ আশ্বিন

লিপিকার প্রথমাংশের কয়েকটি রচনার পূর্বতন রূপ পাওয়া যায় ১২৯২ বৈশাখের ভারতীতে প্রকাশিত 'পুষ্পাঞ্জলি'-নামক রবীন্দ্রনাথের একটি পুরাতন রচনায়। উক্ত রচনাটি সপ্তদশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গ্রন্থপরিচয়ের 'জীবনস্মৃতি' অংশে (পৃ ৪৮৫-৯৫) আদ্যোপান্ত মুদ্রিত হইয়াছে।

সে

'সে' ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চিত্রিত করিয়াছিলেন। বর্তমান সংস্করণে উক্ত চিত্রের অনেকগুলিই পুনর্মুদ্রিত হইল।

নবপর্যায় 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের আশ্বিনে কার্তিকে এবং অগ্রহায়ণে এই গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের কোনো কোনো অংশের পূর্বতন পাঠ প্রকাশিত হয়। রংমশাল পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৪৩ কার্তিক, পৃ ১-৬) যাহা মুদ্রিত হয় প্রায় তাহাই 'সে' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সংকলিত হইয়াছে; ভূমিকাংশটি (রংমশালের পাঠ) 'সে' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ঈষৎ রূপান্তরিত ভাবে

গ্রথিত আছে। ২২৮-২৯ পৃষ্ঠায় 'এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ' কবিতাটি ১৩৪১ বৈশাখের 'মুকুল' পত্রিকায় (নবপর্যায়, পৃ ১-২) 'বাঘের শুচিতা' নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

গল্পসল্প

'গল্পসল্প' ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার নামপত্রখানি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত।

দু-একটিমাত্র বাদে গল্পসল্পের সমস্ত রচনা রবীন্দ্রজীবনের শেষ বৎসরের ফসল। ইহার প্রবেশক কবিতাটি ('আমারে পড়েছে আজ ডাক') ১৩৪৭ বৈশাখের 'ভাইবোন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়; উহাতে গ্রন্থে-সংকলিত পাঠের অতিরিক্ত এই দুইটি ছত্র সর্বশেষে ছিল—

যদি বল 'কথাগুলো যেন dry bones'
রাগব না, ছুটি নিয়ে যাও ভাইবোনs।

গল্প ও কবিতাগুলির রচনাকাল নিম্নে সংকলিত হইল—

বিজ্ঞানী	৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
পাঁচটা না বাজতেই	১ মার্চ ১৯৪১
রাজার বাড়ি	৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে	২ মার্চ ১৯৪১
বড়ো খবর	১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪
চণ্ডী	১০ মার্চ ১৯৪১
যেমন পাজি তেমনি বোকা	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০
রাজরানী	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
আসিল দিয়াড়ি হাতে	৩ মার্চ ১৯৪১
মুনশি	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
ভীষণ লড়াই তার	৮ মার্চ ১৯৪১
ম্যাজিশিয়ান	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
যেটা যা হয়েই থাকে	১১ মার্চ ১৯৪১
পরী	২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

বেটা তোমায় লুকিয়ে জানা	১১ মার্চ ১৯৪১
আরও-সত্য	২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
আমি যখন ছোটো ছিলুম	২ মার্চ ১৯৪১
ম্যানেজার বাবু	২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
তুমি ভাবো এই-যে বোঁটা	৩ ডিসেম্বর ১৯৪০
বাচস্পতি	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
যার যত নাম আছে	৯ মার্চ ১৯৪১
পান্নালাল	২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
মাটি থেকে গড়া হয়	১১ মার্চ ১৯৪১
চন্দনী	২ মার্চ ১৯৪১
দিনখাটুনির শেষে	১০ মার্চ ১৯৪১
ধ্বংস	৬ মার্চ ১৯৪১
মানুষ সবার বড়ো	৫ মার্চ ১৯৪১
ভালোমানুষ	৭ মার্চ ১৯৪১
মণিরাম সত্যাই স্যায়না	২৩ জানুয়ারি ১৯৪১
মুক্তকুন্তলা	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
'দাদা হব' ছিল বিষম শখ	১২ মার্চ ১৯৪১

বাংলাভাষা-পরিচয়

'বাংলাভাষা-পরিচয়' ইংরেজি ১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -কর্তৃক প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে ইহার 'ভূমিকা'টি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (১৩৪৫) মুদ্রিত হয়। পত্রিকায়-মুদ্রিত 'ভূমিকা'র কিয়দংশ (ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ) গ্রন্থপ্রকাশকালে উহার উপসংহাররূপে সংকলিত হইয়াছে। উক্ত উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ নিজের যে পত্রাংশ উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে লিখিত হইয়াছিল।

পথের সঞ্চয়

'পথের সঞ্চয়' ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৩৫৪ সালের বৈশাখে উক্ত গ্রন্থের যে পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বাহির হয় রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে তাহাই মুদ্রিত

হইল। ১৯১২ সালে বিদেশযাত্রার প্রারম্ভে ও পথে এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পরিভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল প্রবন্ধ রচনা করেন ইহা তাহারই সমষ্টি।

এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে, প্রবাসকালে লিখিত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র হইতে কয়েকটি নির্বাচিত রচনা "পরিবর্তিত আকারে" প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে নূতন প্রবন্ধ যোগ করা হইয়াছে বলিয়া, সমস্ত রচনাই মূলপাঠ অনুসারে মুদ্রিত হইল। যে-কয়টি চিঠি প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছিল সেগুলি বর্তমান সংস্করণ হইতে বর্জিত হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালায় যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। এই-জাতীয় অন্যান্য বহু বিলাতের চিঠি ইতিপূর্বেই 'চিঠিপত্র' চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৯১২ সালে কবির প্রবাসচিন্তার সমষ্টিরূপে পরিকল্পিত 'পথের সঞ্চয়'এর এই দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে, ১৯২০ সালে লিখিত 'বিলাত-যাত্রীর পত্র'[1] বর্জিত হইয়াছে; ইহাও 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইবে।

বর্তমান সংস্করণে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি সমস্তই বাংলা ১৩১৯ সালে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে মুদ্রিত। নিম্নে প্রকাশসূচী দেওয়া গেল—

রচনা	পত্রিকা	কাল
যাত্রার পূর্বপত্র	তত্ত্ববোধিনী	আষাঢ়
বোম্বাই শহর	তত্ত্ববোধিনী	আষাঢ়
জলস্থল	প্রবাসী	শ্রাবণ
সমুদ্রপাড়ি	তত্ত্ববোধিনী	শ্রাবণ
যাত্রা	তত্ত্ববোধিনী	শ্রাবণ
আনন্দরূপ	তত্ত্ববোধিনী	শ্রাবণ
দুই ইচ্ছা	প্রবাসী	শ্রাবণ
অন্তর বাহির	ভারতী	শ্রাবণ
খেলা ও কাজ	তত্ত্ববোধিনী	ভাদ্র
লণ্ডনে	প্রবাসী	ভাদ্র
বন্ধু	ভারতী	কার্তিক
কবি য়েট্‌স্‌	প্রবাসী	কার্তিক
স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুক[2]	প্রবাসী	কার্তিক

১ প্রথমসংস্করণ পথের সঞ্চয়ে 'বিচিত্র' নামে মুদ্রিত

২ 'বিলাতের চিঠি' এই নামে প্রবাসীতে মুদ্রিত।

রচনা	পত্রিকা	কাল
ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ	তত্ত্ববোধিনী	কার্তিক
ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি	তত্ত্ববোধিনী	পৌষ
সংগীত	ভারতী	অগ্রহায়ণ
সমাজভেদ	তত্ত্ববোধিনী	আশ্বিন
সীমার সার্থকতা	তত্ত্ববোধিনী	আশ্বিন
সীমা ও অসীমতা	তত্ত্ববোধিনী	কার্তিক
শিক্ষাবিধি	প্রবাসী	আশ্বিন
লক্ষ্য ও শিক্ষা	তত্ত্ববোধিনী	অগ্রহায়ণ
আমেরিকার চিঠি	তত্ত্ববোধিনী	ফাল্গুন

ছেলেবেলা

'ছেলেবেলা' ১৩৪৭ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রিত হয়।

ইংরেজি ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে মংপু-বাসের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলার জীবনীচিত্র গদ্যছন্দে প্রথম লিখিতে শুরু করেন বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রসদনে-রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে দুইটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে ; নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

পালকি

প্রপিতামহী-আমলের সেই পালকিখানা
নবাবি-যুগের অভিমান মেলে আছে
আয়ত তার আসনে,
ষোলো বেহারার কাঁধের মাপের ডাণ্ডায়।
এ দিকে, এ কালের বরখাস্ত-করা
নাম্-কাটা অপমানের নানা দাগ
তার সকল গায়ে।
সে প'ড়ে থাকত দালানের বারান্দার এক ধার ঘেঁষে
ঠেলামারা ব্যস্ত কালকে পথ ছেড়ে দিয়ে।
আমার ভুলিয়ে-যাওয়া ডুবসাঁতার ছিল ওরই গভীরে
ছুটির দিনে, দরজা বন্ধ ক'রে।

খুঁজে বের করার অতীত ছিলেম আমি
এতেই ছিল আমার খুশি,
এক মুহূর্তে পেরিয়ে যেতুম
সতর্ক সংসারের সকল নজরবন্দির বাইরে।

বাইরে বাড়িভরা লোক,
সামনের আঙিনায় চলছেই আনাগোনা।
যখন আটটা-ন'টা বেলা
এই আঙিনায় ভিখিরি জমেছে মুষ্টিভিক্ষার চালের জন্যে,
প্যারীবুড়ি ধামা কাঁখে হাত দুলিয়ে আনছে তরিতরকারি,
বাঁক কাঁধে নিয়ে চলেছে দুখন বেহারা
গঙ্গার জল ঘড়ায় ভ'রে—
অন্দরমহলে তাঁতিনি যাচ্ছে
নতুন-ফ্যাশান শাড়ির সওদা করতে,
স্যাকরা আসছে পাওনার দাবি জানাতে
খাতাঞ্চিখানায়,
পুরনো লেপের তুলো ধুনতে
এসেছে ধুনুরি—
দেউড়িতে মাঝে মাঝে বাজছে ঘণ্টা।

আমি একলা,
এইটুকু সীমানার অসীমে আমি একেশ্বর।
মনে মনে চলেছে সেই পালকি—
বাহক নেই, পথ নেই
দিনরাতের চিহ্ন-হীন অবকাশে।
বালকের ইচ্ছাভ্রমণের বাহন ঐ পালকি,
ও তার গল্পের জগতের অচল গতির পক্ষিরাজ।

আগের সন্ধেবেলায়
ঝিঁঝিঁ ডাকছিল বাইরের ঝোপে,

রোঘো ডাকাতের গল্প জমেছিল
ছায়া-কাঁপা ঘরে মিট্‌মিটে আলোতে—
দেয়ালে টিক টিক করে চলছিল ঘড়ি।
ছুটির দিনের জাদু লাগল।
বিনা চলায় চলল আমার পালকি
অদৃশ্য ঠিকানায় ভয়ের খোঁজে।
নিঃশব্দের শিরায় শিরায় তাল দিতে লাগল
বেহারাগুলোর হাঁইহুঁই হাঁইহুঁই।

ধূ ধূ করে মাঠ,
বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে,
আকাশের রসহীন জিভ যেন তৃষ্ণায় করছে হাঁ হাঁ।
দূরে ঝিক ঝিক করে কালীদিঘির জল
চিক চিক করে বালি—
ডাঙার উপর থেকে হেলে পড়েছে ফাটল-ধরা ঘাটের দিকে
প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ।

ঐ অখ্যাত ভূবৃত্তান্তে
জমা হয়ে আছে ঝাঁকড়া চুল নিয়ে গল্পের আতঙ্ক
গাছের তলায়, ঝোপের মধ্যে।
এগোচ্ছি কাছে, দুর দুর করছে বুক,
ভয় পাচ্ছি পুলকিত মনে।
বাঁশের লাঠির পিতল-বাঁধানো আগাগুলো
দেখা যাচ্ছে দুটো-একটা ঝোপের উপর দিকে।
কাঁধ বদল করবে বেহারাগুলো ঐখেনে,
জল খাবে—
তার পরে?
রেরেরেরে রেরেরেরে!

দেউড়িতে ঘণ্টা বাজল— এক দুই তিন,
একালের সময় এসে পড়ল

পালকির পাল্কি ডিঙিয়ে,
চিৎপুর রোডে পাহারাওয়ালা
দাঁড়িয়ে আছে গরুটাকে দাঁড়িয়ে দিয়ে।[1]

মংপু
২৪ এপ্রিল ১৯৪০

বাল্যদশা

ভদ্র ঘরের ছেলে,
ছাঁচে-ঢালা পালিশ-করা সংসার।
অসমান নেই কোথাও কিছু,
হঠাৎ চমক লাগে না কোনোখানে।
দিনগুলো চলে লম্বা সারে পোষা পশুর মতো
একটার পিছনে আর-একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

মল্লিকদের বাড়ি ঘণ্টা বাজে।
নিয়মনিষ্ঠ মাস্টার আসে ঠিক সময়ে
সাতটা বাজতেই।
নিয়মভীরু আমি পড়ি ফার্স্ট্ বুক রীডার—
কালো মলাটটা ঢিলে,
পাতাগুলো অনিচ্ছুক হাতের অবহেলায় দাগ-পড়া।
নিজের বুদ্ধি নিয়ে রোজই শুনি একই বিচার,
মন্তব্যটা স্মরণীয় হয় চড়ে চাপড়ে।
পাশের বারান্দায় বুড়ো দর্জি, চোখে চশমা,
ঝুঁকে প'ড়ে কাপড় সেলাই করছে একমনে—
দেখি তাকে আর ভাবি, সুখে আছে নেয়ামত।
দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান লম্বা দাড়ি
কাঠের কাঁকুই দিয়ে আঁচড়ে তুলছে
দুই কানে দুই ভাগে,
কাছে বসে আছে কাঁকন-পরা ছোকরা দরোয়ান

১ ছেলেবেলার ২ পরিচ্ছেদের আরম্ভাংশ ও ৩ পরিচ্ছেদের শেষাংশের সহিত কবিতাটি তুলনীয়।

কুটছে দোক্তা।
উঠোনে ঘোড়া ছুটো সকালেই খেয়ে গেছে
বালতিতে বরাদ্দর দানা।
কাকগুলো ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে-পড়া ছোলা,
জনি কুকুরটা খামকা অনাবশ্যক কর্তব্যবুদ্ধিতে
সশব্দে দিচ্ছে এসে তাড়া।

সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় পড়ে বাঁকা ছায়া,
ন'টা বাজে।
বেঁটে কালো গোবিন্দ, কাঁধে হলদে রঙের গামছা,
নিয়ে যায় স্নান করাতে।
সাড়ে ন'টা বাজতেই দৈনিক অন্নের পুনরাবৃত্তি—
খেতে হয় না রুচি।
নির্মম ঘণ্টা বাজে দশটায়।
মন-উদাস-করা হাঁক শোনা যায় দূরে
কাঁচা আম -ওয়ালার।
বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলেছে গলি বেয়ে
দূরের থেকে দূরে।
বড়োবউদিদি পাশের বাড়িতে
ভিজে চুল এলিয়ে দিয়েছে পিঠে,
পশমের গলাবন্ধ বুনছে মাথা নিচু করে।
ছাতের উপর কুসুম আর মণি
কড়ি নিয়ে খেলেই যাচ্ছে,
কোনো তাড়া নেই।
বুড়ো ঘোড়া আমাকে টেনে নিয়ে যায় পালকিগাড়িতে
আমার দৈনিক নির্বাসনে।
সমস্ত পথে দুর্ভাবনার অটল সহচর
মাস্টারমশায়ের
বেঞ্চে-সমাসীন ক্ষমাহীন মূর্তি।

ফিরে আসি ইস্কুল থেকে।
বিরস দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে আসে
ইটকাঠের জটিল জঙ্গলে।
বিশ্রামহীন শহরের পাঁচমিশেলি ঝাপসা শব্দ
স্বপ্নের সুর লাগায়
তন্দ্রাজড়িম প্রকাণ্ড বাস্তকলেবরে।
পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি,
অনবচ্ছিন্ন শাসনবিধির তর্জনী-শিখা—
পরদিনের পড়া চাই।
কঠিন গাঁঠ বেঁধে দেয় সন্ধ্যা
এ দিনের বেরঙা অভ্যাসের সঙ্গে ও দিনের।
পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি।
বিছানায় ঢোকার আগে একটুখানি থাকে পোড়ো অবকাশ,
সেখানে শুনতে শুনতে শোনা শেষ হয় না—
রাজপুত্র চলেছে তেপান্তর পার হতে।

একদিন বাজল সানাই বারোঁয়া সুরে।
শুকনো ডাঙায় প্লাবন নেমে
ঢেকে দিল তার ক্যাকাসে চেহারা।
বাড়িতে এলো নতুন বউ,
কচি বয়সের লাবণ্যে ঢলঢল।
কাঁচা-শামলা রঙের হাতে সরু সোনার চুড়ি।
মলিন দিনশ্রেণীর কালো-ছাপ-লাগা পাঁচিল
ছুঁফাঁক হয়ে গেল জাদুমন্ত্রে,
দেখা দিল অপূর্ব দেশের অপরূপ রাজকন্যা।
ছম ছম করতে লাগল সন্ধ্যা,
কাঁপতে লাগল অদৃশ্য আলোয়।
ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে।
ও দিকে থাকে অভাবনীয়, এ দিকে থাকে উপেক্ষিত।

রাত হয়ে আসে।
স্বরূপসর্দার হাঁক দিয়ে যায়।
ছেঁড়া শেলাই-করা দড়িতে-ঝোলানো মশারি,
তার ভিতরের আকাশ ভরে ওঠে
গোধূলিলগ্নের সিঁদুরি রঙে,
চেলির রাঙা অন্ধকারে।[২]

মংপু
২৮।৪।৪০

শেষের কবিতাটি শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ, পৃ ২৪১-৪৪) উদ্‌ধৃত হইয়াছে। "মল্লিকদের বাড়ি ঘণ্টা বাজে" পংক্তিটির পরে সেখানে তিনটি অতিরিক্ত পংক্তি পাওয়া যায়—

অন্দর মহল থেকে দুধ আসে এক বাটি,
আমার তখন দুধ-বিতৃষ্ণার বয়েস—
খেতেই হয় যে ক'রেই হোক।

"একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে" হইতে শেষ পঙ্‌ক্তিকয়টিকে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে পাণ্ডুলিপির এক স্থলে 'বধূ' নামে স্বতন্ত্র কবিতা বলিয়াও নির্দেশ দিয়াছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থপরিচয়ের 'জীবনস্মৃতি' অংশ প্রণিধানযোগ্য। এই গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক তথ্যের পূর্ণতর পরিচয় সেখানে পাওয়া যাইবে।

ছেলেবেলার 'ভূমিকা'য় উল্লিখিত "গোঁসাইজি" শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী।

সভ্যতার সংকট

'সভ্যতার সংকট' ১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ তারিখে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পুস্তিকা-আকারে বিতরণ করা হইয়াছিল। এই অশীতিবর্ষপূর্তি-উৎসবই রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সর্বশেষ জন্মোৎসব। নববর্ষের সায়াহ্নলগ্নে, উত্তরায়ণ-

২ ছেলেবেলার ৭ পরিচ্ছেদের শেষাংশের সহিত কবিতাটি তুলনীয়।

প্রাঙ্গণে সমবেত আশ্রমবাসী ও অতিথি-অভ্যাগতের সমক্ষে পঠিত এই অভিভাষণই কবিজীবনের সর্বশেষ অভিভাষণ। কবির উপস্থিতিতে শ্রীক্ষিতিমোহন সেন সেদিন ইহা পাঠ করিয়াছিলেন; তৎপূর্বে মুখবন্ধস্বরূপে আশ্রমবাসীদের সম্বোধন করিয়া কবি যাহা বলেন, 'নির্বাণ' গ্রন্থে তাহা মুদ্রিত আছে।[১] উপসংহারে 'ঐ মহামানব আসে' গানটি সভায় গীত হইয়াছিল।

১ শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর-প্রণীত নির্বাণ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৫৪-৫৫

সংশোধন। পৃ ২৫, শেষ ছত্রে '১৯৪০' স্থলে: ১৯৩৯

বর্ণানুক্রমিক সূচী